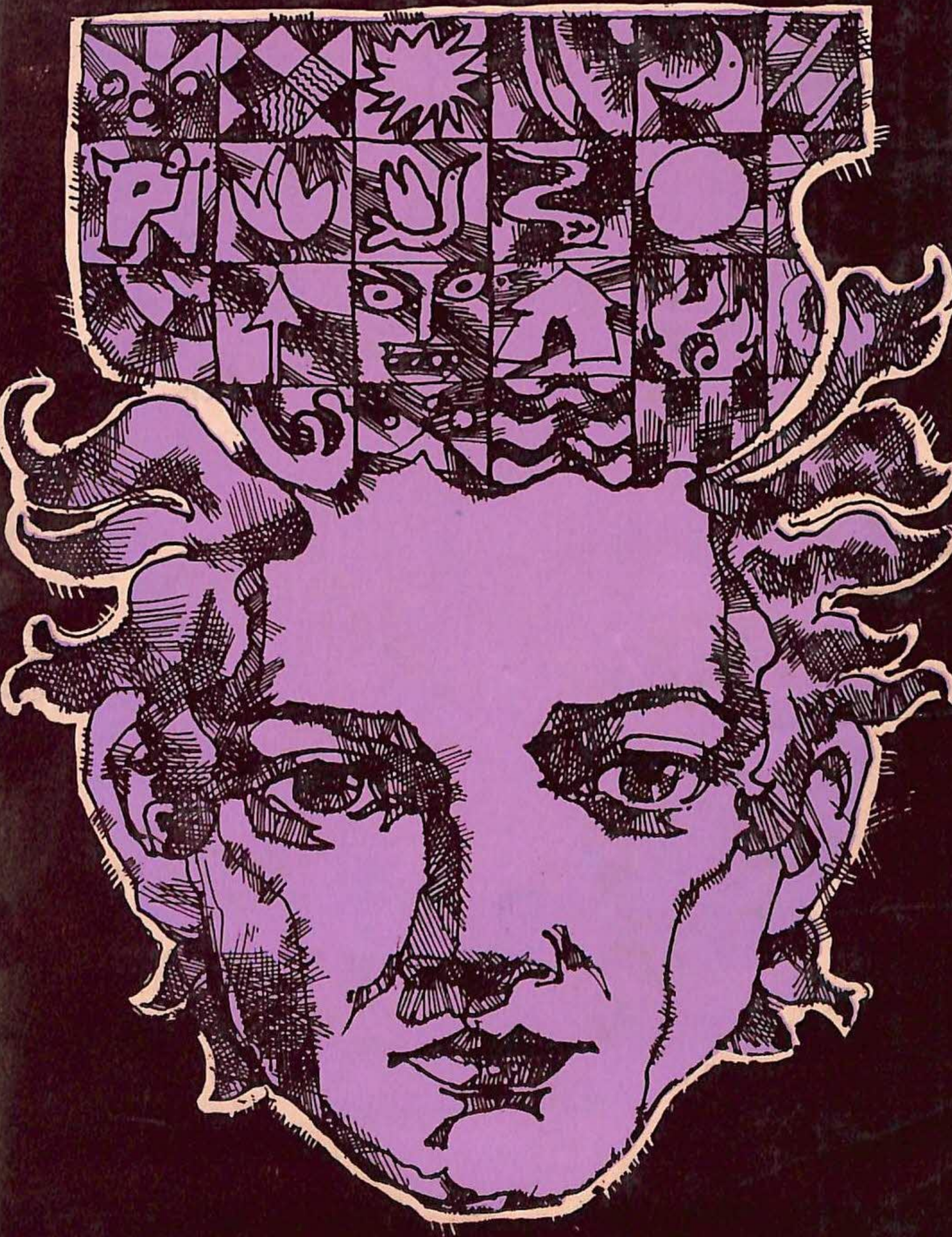
পাভলভ পরিচিতি

ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়



ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

পাভলভ পরিচিতি

দ্বিতীয় পর্ব

প্রথম খণ্ড ॥ সুপ্তি স্বপ্ন সম্মোহন

দ্বিতীয় খণ্ড ॥ মনের রোগ

● সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কারপ্রাপ্ত ●

এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-বম্বে-দিল্লী-হায়দ্রাবাদ

এই দ্বিতীয় পর্বের আংশিক খরচ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অনুদান থেকে প্রাপ্ত।

প্রথম প্রকাশ :

ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬
পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ
জানুয়ারী, ১৯৮৫

প্রকাশক :

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
১৩২/১এ. বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৪

পরিবেশক :

এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

মুদ্রক :

রবীন্দ্রনাথ দাশ
মুদ্রাকর প্রেস
১০/১ সি, মারহাট্টা ডিচ্ লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৩

প্রচ্ছদ :

গৌতম বসু

দাম : টাঃ 32·00
£ 3·20
$ 8·00

সূচী

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

উৎসর্গ

অকৃত্রিম সুহৃদ

ডাক্তার শিবদাস বাসুর স্মৃতির উদ্দেশে

সাইকিয়াট্রি বনাম অ্যান্টিসাইকিয়াট্রি

বাতুলতা শুধু মনের ডাক্তার ও মনস্তাত্ত্বিকদের গবেষণা-আলোচনার বিষয় নয়। সমাজতাত্ত্বিক, শিল্পী-সাহিত্যিক ও সমাজ পরিবর্তনে আগ্রহী নয়া-বামরাও (নিউ লেফট) এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু। সমাজতাত্ত্বিকরা প্রধানত সামাজিক বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে বাতুলতার সম্পর্ক নির্ণয়ে তৎপর, আর বামপন্থী বিপ্লবীরা বাতুলতা সৃষ্টির জন্য পরিবার ও সমাজের তথাকথিত 'সুস্থ' মানুষদের দায়ী করে থাকেন। ১৯৬৭ সালে জুলাই মাসে লণ্ডনে "ডায়ালেকটিস্ অব লিবারেশন" নিয়ে একটি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। তারপর থেকে র‍্যাডিকাল ও অতি-বামপন্থী-দের ধ্যানধারণার সঙ্গে সাধারণের পরিচয় ঘটে। David Cooper সম্পাদিত The Dialectics of Liberation (Penguin 1971) বইটিতে এই কংগ্রেসে পঠিত লেখাগুলি সন্নিবিষ্ট আছে। এই কংগ্রেসে চারজন মনোরোগ চিকিৎসক যোগদান করেন। তাঁদের নাম অনেকেরই জানা। Herbert Mercusse-এর বিপ্লব সম্পর্কিত মতবাদ দ্বারা এঁদের অনেকেই প্রভাবিত। Dr. David Cooper ছাড়া আর যে তিনজন চিকিৎসক এই কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের নাম Dr. R. D. Laing, Dr. Joseph Burke ও Dr. Leon Redler। ডাঃ কুপারের লেখা মুখবন্ধের সারমর্ম তুলে দিচ্ছি। এ থেকে এঁদের ধারণা সম্পর্কে পাঠক কিছুটা আভাস পাবেন।

পারিবারিক বিশৃঙ্খলা যখন চরমে ওঠে, পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে স্বার্থের সংঘাতে পারস্পারিক সম্পর্ক যখন তিক্ত হয়ে ওঠে তখন একজনকে—যে এই স্বার্থের সংঘর্ষে অংশ গ্রহণে বিমুখ এবং তার ফলে পারিবারিক ও সমাজ-জীবনে সক্রিয় অংশ গ্রহণে অক্ষম বা অনিচ্ছুক—'স্কেপগোট' হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। তারা স্বেচ্ছায় 'স্কিজোফ্রেনিক' বলে চিহ্নিত ও চিকিৎসিত হতে না চাইলে, বিশেষ লাইসেন্সপ্রাপ্ত চিকিৎসক পরিবারকে সাহায্য করেন। সার্টি-ফিকেটের জোরে তাদের উন্মাদাশ্রমে নির্বাসিত করা হয় এবং সেখানে তাদের বেয়াড়াপনার জন্য প্রয়োজন হলে বৈদ্যুতিক শক্ দিয়ে, মস্তিষ্ককে খণ্ডিত করে চিকিৎসা করা বা শাস্তি দেওয়া হয়। যে সময়ে সমাজে ব্যক্তি ও স্থিতাবস্থা-রক্ষাকারী রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে বিবাদ বা মতভেদ চরমে ওঠে তখন এই ধরনের বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

এই কংগ্রেসে তদানীন্তন প্রধান সমস্যা—ভিয়েতনামে আমেরিকার রক্তপিপাসু অভিযান সম্পর্কে এক সর্বাঙ্গীন আলোচনাচক্র আয়োজিত হয়েছিল এবং প্রধানত

হার্বার্ট মার্কিউসপন্থী সমাজতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের সমাবেশ ঘটেছিল। আমেরিকার ভিয়েতনাম আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল শোষণভিত্তিক সমাজের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি ও যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করা। এই কংগ্রেসে উপস্থিত মনোরোগ চিকিৎসক চতুষ্টয় ভিয়েতনাম যুদ্ধের এবং সাধারণভাবে আমেরিকার সমাজ ব্যবস্থার, তথা শোষণ ভিত্তিক সমাজের স্থিতাবস্থা বজায় রাখার সঙ্গে শ্রেণী সমাজের শোষণ-ভিত্তিক পারিবারিক ব্যবস্থা বজায় রাখার প্রচেষ্টার সাদৃশ্য প্রদর্শন করতে গিয়ে স্কিজোফ্রেনিয়া প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন। ভিয়েতনাম পিতৃস্থানীয় অভিভাবক আমেরিকার পরামর্শ না মেনে নিজের অগ্রগতির জন্য, নিজের বিবেচনা মত যুক্তিসম্মত পথ বেছে নিতে চেয়েছিল। অভিভাবক এই ইচ্ছা ও কার্যকলাপকে আত্মধ্বংসী উন্মাদ আচরণ মনে করে জনমানসের চিকিৎসার জন্যে, তাঁদের মতে, সুব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। সামাজিক স্থিতাবস্থা ও শান্তিরক্ষার এই প্রচেষ্টাকে দুষ্টলোকে সাধুবাদ না জানালেও পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশের পরোক্ষ শাসক ও প্রত্যক্ষ অভিভাবকরা কিন্তু আদৌ বিচলিত বোধ করেননি। David Cooper লিখেছেন যে, যুদ্ধকালে শত্রুপক্ষকে যেমন আমরা সব রকমের গর্হিত বিশেষণে ভূষিত করে তাদের অমানুষ বলে প্রতিপন্ন করতে চাই, (তা না হলে বীভৎস-ভাবে তাদের হত্যা করা, তাদের পুরুষদের হিংস্র পশু মনে করে নির্বিচারে তাদের ওপর উৎকট অত্যাচার চালানো এবং তাদের মেয়েদের উপর সুযোগ পেলেই বলাৎকার করার যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না), তেমনি গৃহযুদ্ধ চলাকালে আমরা এই শোষণ ও অপশাসন-ভিত্তিক সমাজের প্রতিবাদমুখর বাধাদানকারীদের উন্মাদ আখ্যা দিয়ে তাদের সদয় ও মানবোচিত চিকিৎসার ব্যবস্থা করে অথবা তাদের বাতুলাশ্রমে আবদ্ধ রেখে এই সমাজের স্থিতাবস্থা ও শুচিতা বজায় রাখতে চাই।

Dr. Laing ঐ কংগ্রেসে বলেছিলেন যে, সমস্ত সামাজিক ব্যাপারটা একটা ডাক্তারী রূপকে পরিণত হয়। সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশের চাপে সৃষ্ট মস্তিষ্কের কার্মিক বিশৃঙ্খলাকে প্রাথমিক ব্যাপার বলে মনে করা হয় এবং বাতুলাশ্রমে, নির্বাসিত কিছু সমাজবিদ্রোহী এবং তাদের তত্ত্বাবধানকারী চিকিৎসক ও সেবিকাকে নিয়ে এই রূপকের রাজ্য তৈরী হয়। যাদের আচরণ ও ধারণা আমাদের প্রাত্যহিক আচরণ ও ধারণার সঙ্গে মিলছে না, তাদের গায়ে উন্মাদ লেবেল এঁটে দেওয়া হয়।

দু'একটা দৃষ্টান্তও দিয়েছেন Dr. Laing। যে ব্যক্তি ইস্লামধর্মাবলম্বীদের নমাজ পড়া সম্পর্কে অজ্ঞ, সে যদি দেখে একটি লোক রাস্তার এক পাশে হাঁটুতে ভর দিয়ে বিড়বিড় করে অনেক কিছু বলে যাচ্ছে, তার আশেপাশে কোন লোক নেই; তাহলে ঐ বিড়বিড় করা লোকটিকে অজ্ঞ লোকটি অস্বাভাবিক বা উন্মাদ ভাববে। তার চিকিৎসার প্রয়োজন আছে—এই কথা ভাবা অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে

বিচিত্র নয়। মেডিক্যাল রূপকের মাধ্যমে সব কিছু বোঝাবার বা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতে অভ্যস্ত শিল্প সমৃদ্ধ দেশের মানুষ তার সমাজের 'নর্মস্'-এর যে কোনো রকমের ব্যত্যয়কে উন্মত্ত বা অস্বাভাবিক আচরণ বলে বিবেচনা করে থাকেন।

Dr. Laing যা বলেছেন, তার সঙ্গে পুরোপুরি সব জায়গায় আমরা একমত নই। তবে এ কথা বলা চলে এই 'র‍্যাডিক্যাল' অভিমতের কিছুটা মূল্য আছে। সমাজের ও পরিবারের পাগলামি—'Social norm' বলে অভিহিত; আমরা পাগলামি বলে ভাবতে পারি না, ভাবতে চাই না। কেননা, তাহলে আমাদের মধ্যে সেই সব উপসর্গ দেখা দেবে, যা মনোরোগ চিকিৎসকদের মতে উন্মত্ততার উপসর্গ বলে গণ্য হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ও ভিয়েতনামের ধ্বংসপ্রয়াসে আক্রমণমুখী শ্রেণীর যে নিষ্ঠুরতা ও অমানবিকতা অভিব্যক্ত হয়েছে—তার বীভৎসতার সঙ্গে মানসিক আরোগ্যশালায় অথবা আমাদের দেশের বন্দীশালায় আবদ্ধ 'ম্যানিয়াক'-দের প্রতি আচরণ কি কম বীভৎস? রাসায়নিক ও পারমাণবিক যুদ্ধের পরিকল্পনা ও তার জন্যে কোটি কোটি টাকা খরচ করা এবং পৃথিবীর অর্ধেক মানুষকে অভুক্ত অবাসিত রাখা যদি উন্মত্ততা না হয়, তাহলে এই metaphor-এর অন্তর্গত ম্যানিয়াক্ বা স্কিজোফ্রেনিক বলে কথিত মানুষগুলোকে উন্মাদ বলা চলে কি? এই সব যুক্তিতর্ক অতি পরিচিত বলেই কিছু পাঠকদের কাছে মনে হতে পারে; এর মধ্যে অবাক হবার মত কিছু তাঁরা হয়তো খুঁজে পাবেন না। অস্বাভাবিক আচরণের সংজ্ঞা দেশ কাল সংস্কৃতিভেদে স্বতন্ত্র। অষ্ট্রেলিয়ার শ্বেতকায়দের আদিবাসীদের গুলি করে মারা, আমেরিকার শ্বেতকায়দের নিগ্রো-লিঞ্চিং, এই সেদিনও বেশির ভাগ সাদা চামড়ার সভ্য মানুষদের মধ্যে স্বাভাবিক বলেই পরিগণিত হতো। 'হোয়াইটম্যান্স্ বার্ডেন' (white man's burden) বলে অভিহিত উপনিবেশের কালো বা তামাটে চামড়ার মানুষকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করার মতোই পবিত্র কাজ মনোরোগের চিকিৎসা। এই সমাজের বা আমাদের পরিচিত স্বাভাবিকতার সংজ্ঞার বাইরের যে কোনো আচরণই আমরা অস্বাভাবিক ব্যবহার বলে অভিহিত করি এবং তাদের প্রকারভেদে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করি, বেশ একটা পোষাকী নামে ভূষিত করি এবং **বহুজাতিক ওষুধ** তৈরীর কারখানায় এই রোগীর নিরাময় ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা চালাই।

মনোরোগী, বিশেষ করে, স্কিজোফ্রেনিকদের বিরুদ্ধে নানাবিধ আয়ুধের সাহায্যে লড়াই চালিয়ে আমরা সুস্থ সমাজের স্বাভাবিক ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য সর্বদা সচেষ্ট। এই অসামাজিক বা সমাজবিদ্রোহীদের কিন্তু এসব কথা জানানো হয় না। ভর হওয়া, ভূতে পাওয়া, ইত্যাদি কথাগুলো মধ্যযুগের কুসংস্কার আচ্ছন্নেরা ব্যবহার করলেও, আমরা মনস্তাত্ত্বিক বা মনোরোগ চিকিৎসকরা (পরামনোবিদ্‌দের কথা স্বতন্ত্র; তাঁদের আমরা বিজ্ঞানী বলতে রাজি নই) ব্যবহার করি না। এদের জানতে দিই না যে আমরা লড়াই চালাচ্ছি, এমন কি আমরা

নিজেরাই অনেকে জানি না যে আমরা সমাজ ও রাষ্ট্রপ্রধানদের সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য শিক্ষিত ও দীক্ষিত সৈনিক।

বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে Laing বলেছেন, আরোগ্যলাভের পর এই সব রোগী ডাক্তারের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তখনই যখন অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর মতো মগজের অবস্থা এদের থাকে না।

র‍্যাডিকালদের এই ধরনের 'অ্যান্টি-সাইকিয়াট্রি' তত্ত্বের সঙ্গে আমরা অনেক ব্যাপারেই একমত হতে না পারলেও একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে পরিবার তথা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এই সব ব্যক্তিকে—যাদের আমরা 'নিউরোটিক' বা 'সাইকোটিক' বলে অভিহিত করি—আমরা ঠিকমত বুঝতে চেষ্টা করি খুব কম ক্ষেত্রেই। নির্জ্ঞানে অবস্থিত অবদমিত কামনা-বাসনা, ঈডিপাস গূঢ়ৈষা অথবা মস্তিষ্ক কোষের কার্মিক বিশৃঙ্খলা (functional disorder of brain cells or Patho-physiology of Central Nervous Sysetm) নিয়েই আমরা প্রধানত মাথা ঘামাই। এই দুই ভাবে দেখাই আংশিক দেখা, সার্বিক দেখা নয়। কোন ব্যক্তির আচরণের বা কথাবার্তায় সঠিক তাৎপর্য বুঝতে গেলে স্থির-চিত্রে অবস্থিত একটি দৃশ্যে তার অবস্থান পর্যবেক্ষণই যথেষ্ট নয়। চলচ্চিত্রে যেমন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ছবি তুলে পরিস্থিতি ও ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক ও ঘাতপ্রতিঘাতের প্রতিক্রিয়া বোঝানোর প্রচেষ্টা চলে, তেমনি অপ্রকৃতিস্থ লেবেল মারা কথাবার্তা ও আচরণ-ব্যবহারের তাৎপর্য নানা কোণ থেকে পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। সেই ব্যক্তির মস্তিষ্কের টাইপ, আর্থ-সামাজিক পরিবেশে তার অবস্থানের বিশিষ্টতা, পারিবারিক কাঠামো, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, সব কিছুর সন্ধান না পেলে আমরা তার আচরণের সঠিক বিশ্লেষণে সক্ষম হবো না। কোনো ছেলে পড়ার ঘরের দরজা বন্ধ করে বইয়ের পাতার দিকে না তাকিয়ে সামনের কোনো কল্পিত ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথনে রত, অন্যজন একলা থাকলেই আপন মনে হাসে বা বিড়বিড় করে, আর একজন বাবা বা মায়ের কথার জবাব না দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়: শুধু এই ধরণের উপসর্গ দেখে যদি অভিভাবক ছেলেকে মনোরোগী মনে করেন এবং চিকিৎসকও যদি সেই সন্দেহের ভিত্তিতে চিকিৎসা শুরু করেন, তাহলে অবশ্য Dr. Cooper বা Dr. Laing-এর অনুযোগের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। এ রকম ঘটনা ওঁদের দেশে, মানে শিল্পসমৃদ্ধ সম্পদশালী দেশের আনুপাতিক সংখ্যা আমাদের দেশের থেকে নিঃসন্দেহে বেশী, কিন্তু তা বলে মনোরোগ চিকিৎসকদের সব রোগীই বিশেষ 'স্ট্রাটাজেমের ফাঁদে বন্দী: মানসিক রোগ, বিশেষ করে 'স্কিজোফ্রেনিয়া' নামক রোগটি সামাজিক স্থিতিবস্থা বজায় রাখার, বিপ্লব এড়াবার উদ্দেশ্যে উদ্ভাবিত একটি কল্পিত নাম—এ আমরা মনে করি না। তবে হ্যাঁ, পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্ক বর্তমানে উন্নত দেশের শোষক শ্রেণীর মধ্যে অস্বাভাবিক ও বিষাক্ত হয়ে উঠেছে—

তার বহু তথ্য প্রমাণ আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে প্রকাশিত পুস্তিকা থেকে পাওয়া গেছে। তা বলে কি বলা চলে যে, সব পিতামাতাই এক ছাঁচে ঢালা, একই রকমের নিষ্ঠুর এবং রাষ্ট্রীয় আগ্রাসনের অংশীদার হয়ে নিজেদের সন্তানসন্ততিদের ওপর অত্যাচার চালায়? সবাই কি খাওয়া বন্ধ করে, ভয় দেখিয়ে, সন্তানদের যে ভালবাসেন—সেইটে প্রমাণ করতে চান।

শোষণের দেশে, শক্তিশালী ভয় দেখানোর দেশে, সব মানুষই একই ছাঁচে ঢালা হয় না। সেই সব দেশেও Laing, Cooper-এর মত চিকিৎসক থাকে, Klaus Fuchs-এর মত মানুষ থাকে, যুদ্ধ বিরোধী সমাজ পরিবর্তনে প্রয়াসী নামী দামী বিজ্ঞানসাধক থাকে। সাইকিয়াট্রিকে পুরোপুরি একটা 'পলিটিক্যাল অপারেশন' বলা চলে না। আমরা 'এ্যান্টি-সাইকিয়াট্রিক' সমর্থক নই। তবে মনোরোগ সম্পর্কে যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী অথবা রহস্যবাদীদের অলৌকিক দৃষ্টিভঙ্গী—যার প্রতিক্রিয়ায় এই র‍্যাডিক্যাল মতবাদের আবির্ভাব, এ্যান্টি সাইকিয়াট্রিক তত্ত্বের প্রসার—এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীরই বিরোধী। যে দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর দাবী করেন, এ্যান্টি-সাইক্রিয়াটিস্টরা—সেই দৃষ্টিভঙ্গী দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী বা মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নয়।

নকশাল আন্দোলনের পরবর্তীকালে সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে অ্যান্টি-সাইকিয়াট্রি সম্পর্কে আমাদের দেশের জ্ঞাণীগুণীদের আগ্রহ পরিলক্ষিত হতে থাকে। আশির দশকে ষাট-সত্তর দশকের রণক্লান্ত, পুলিশী নির্যাতনে পর্যুদস্ত কিছু যুবক-দের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার বৈপ্লবিক রূপের পরিবর্তন ঘটে: এদের মধ্যে হ্যালুসিনেশন ও ডিলুইশনের (hallucination and delusion) উপসর্গ দেখা দিতে থাকে। নির্যাতিত হবার পর নির্যাতনের ভয়কে কি persecutory delusion বলা চলে? স্বভাবতই এই প্রশ্ন আমাদের মতো চিকিৎসকদের মনে জাগে। প্রচলিত ওষুধ-পত্রে এদের উপসর্গের প্রশমন ঘটে না। বিপ্লবের ও র‍্যাডিক্যাল চিন্তাধারার সমর্থকরা স্বভাবতই অ্যান্টি-সাইকিয়াট্রি নিয়ে পড়াশুনো করছেন; কিন্তু এঁদের সবাইকে চিকিৎসক বা মনস্তাত্ত্বিক ভাবলে ভুল হবে। এই ধরনের শিক্ষিত পরিবারে সমাজ-পরিবর্তনের আশু প্রয়োজনীয়তা বনাম অসম্ভাব্যতা নিয়ে আলো-চনার কিশোর শ্রোতার মনে দ্বন্দ্ব-বিরোধের উদ্ভব ঘটাই স্বাভাবিক। এবং অন্য কোনো অধিকতর উত্তেজনার খোরাকের জোগান না পেলে সেই দ্বন্দ্ববিরোধের প্রতিক্রিয়ার ফলে দুর্বল স্নায়ুতন্ত্রের অধিকারী কিশোর মনে সন্দেহ-ভয়-অবিশ্বাসের লক্ষণ দেখা দিতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে এই সব রোগ লক্ষণের দরুন, এই সব লক্ষণযুক্ত ছেলেমেয়েদের স্কিজোফ্রেনিয়া আক্রান্ত বলেই মনে হবে। 'এ্যান্টি-সাইকিয়াট্রি' স্কুলের চিকিৎসক এদের রোগী মনে করবেন কিনা জানি না। তবে অন্যান্য স্কুলের চিকিৎসকরা এদের স্কিজোফ্রেনিক বলেই মনে করেন। এ্যান্টি-সাইকিয়াট্রি তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত পরিবারের এই রকম দুটি কিশোরের কাহিনী অতি সংক্ষেপে এখানে লিপিবদ্ধ করছি। এদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রোগীর

মুখে এ্যান্টি-সাইকিয়াট্রি শব্দটি প্রথম শুনি।

(ক) মোহন—বয়স ১৬ ; পাতলা চেহারা। উজ্জ্বল চোখে মুখে বুদ্ধিমত্তার ছাপ। এই পরিবারের কর্তা, কর্ত্রী ও এই ছেলেটি বাড়ীতে ইংরিজীতেই কথা বলে। বাবা ভারতের নানাস্থানের বড় বড় কোম্পানীর হিসাব-নিকাশ-বিষয়ক পরামর্শদাতা। উচ্চবিত্ত শ্রেণীর অতি আধুনিক এই পরিবারের মধ্যে রোগীর পিতামহ সনাতনপন্থী ও খুবই গোঁড়া। মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর-এর ধারে কাছে এক গ্রামে এঁদের বাসস্থান। সেই গ্রামের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে। মাঝে মাঝে এসে মাস কয়েকের জন্য পুত্রের কলকাতার বাড়ীতে থেকে যান। সেই সময় মোহন তাঁর কাছে গ্রামের কথা ও অপাংক্তেয় নীচুজাতি ও অধিবাসীদের দুঃখকষ্টের কথা শোনে আর মনে মনে ব্যথিত হয়। পিতাজিকে বাঙ্গালোর মাদ্রাজ দিল্লী যেতে হয় বছরে চার বার, সব সময়ে ব্যস্ত। কলকাতায় যখন থাকেন তখন জাতীয় সংহতি রক্ষার প্রধান শর্ত নীচুজাতি অদিবাসীদের উন্নয়ন, তাদের ওপর নির্যাতন বন্ধের আন্দোলন জোরদার করার জন্য সভা-সমিতিতে যোগদান করেন ও বর্ণাশ্রমকে আক্রমণ করে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। প্রগতিশীল বলে তাঁর পরিচিতিতে তিনি গর্ব অনুভব করেন। মোহনের সঙ্গে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের কথাবার্তায় এই সব জানা গেল। মোহন দিল্লী বোর্ডের পরীক্ষা দেবার বছর অসুস্থ হয়ে পড়ে। দুই তিন সহ-কর্মীর হাত ঘুরে আমাদের কাছে আসে। তার রোগের প্রধান উপসর্গ তখন পাড়ার মন্দিরের কালীমাতার প্রতি ভয় ও ঘৃণা। মন্দিরের রাস্তা সে মাড়ায় না, অনেক ঘুরে বড় রাস্তায় পড়ে। বাবার গাড়ীতে বাবার সঙ্গে থাকলে ঐ পথ দিয়ে যেতে বাধ্য হলে, মন্দির ও অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উদ্দেশ্যে গালিগালাজ করে।

একটা কথা এখানে বলা দরকার। রোগীর পিতা স্টেটসের এক বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। ষাটের দশকের শেষ থেকে নয়াবাম আন্দোলনের এবং 'এ্যান্টি-সাইকিয়াট্রি' তত্ত্বের সমর্থক। তাঁর সঙ্গে দু-চারদিন কথা বলে জানতে পারি—জানানোর ইচ্ছে অবিশ্যি তাঁর ছিল না—ছেলের অসুখের চিকিৎ-সার জন্য তিনি সাইক্রিয়াটিস্টের শরণাপন্ন হয়েছেন রোগ লক্ষণ প্রকাশ পাবার বছর দুয়েক পরে। ছেলের সঙ্গে শিক্ষকদের গোলযোগ বাধে রোগের প্রথম পর্বে। ছেলের ধারণা হয়েছিল মাষ্টররা তাকে ভুল করে বা ইচ্ছে করে সাপ্তাহিক পরীক্ষায় C বা D গ্রেড দিচ্ছিলেন। ডঃ ইন্দ্রনীল—রোগীর পিতা মনে করেছিলেন এটা তার 'এ্যান্টি-এস্ট্যাবলিশমেণ্ট' মনোভাবেরই অভিব্যক্তি। তিনি ছেলের পরীক্ষার খাতা পড়ে দেখার সময় পাননি। ছেলের অভিযোগকে তিনি ছাত্র বিদ্রোহের মনোভাব বলে ধরে নিয়েছিলেন এবং মনে মনে খুশিও হয়েছিলেন। তারপর যখন ছেলে প্রমোশন পেল না এবং বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ছাত্রকে ট্রান্সফার নেবার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানালেন, তখন তাঁর হুশ হল। মনে করলেন, এই

সমাজের মধ্যে ছেলেকে মানুষ করতে হলে তাঁর নিজের মতামতের ওপর নির্ভর করা চলবে না। এ ছাড়া ছেলের মা-ও চিকিৎসা করার জন্য পীড়াপীড়ি কান্না-কাটি শুরু করলেন। কাজেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই সব ট্রাংকুলাইজার গেলাবার জন্য সাইক্রিয়াট্রির শরণাপন্ন হতে হয়েছে। স্কুল ছাড়ার পর ছেলের অভিযোগের প্রকাশ ঘটল মন্দির ও ঠাকুরদেবতাকে কেন্দ্র করে। কেন? আমার এই প্রশ্নের উত্তরে ছেলেটি বলল—"The goddess is nude and merciless. She slaughters men and does not feel guilty ; wears a necklace made of human hands slaughtered by her" ওকে ঘৃণা করার যথেষ্ট যুক্তি আছে। ডঃ ইন্দ্রনীল নয়া বামপন্থী ও প্রগতিবাদী, তবুও ছেলের এই যুক্তিকে মেনে নিতে পারলেন না। যদিও বক্তৃতা ও বিতর্ক সভায় তিনি বর্ণাশ্রমী হিন্দুধর্মকে নস্যাৎ করেন, কিন্তু বাড়ীতে স্ত্রীর নিত্যপূজো ও মানতরক্ষায় তিনি তো বাধা দেনই না, বরং পরোক্ষ উৎসাহ দেখান। "He is a humbug. He doesn't do what he preaches ; কথাগুলো ছেলেটির। বরং ঠাকুরদা প্রাচীনপন্থী হলেও বুজরুক নয়—বললো ছেলেটি। গ্রামের নীচুজাতির হাতে জল খান না বটে, তবে তাদের হয়ে জমিদার জোতদারদের বিরুদ্ধে মামলা লড়েন। তাদের নির্যাতনের প্রতিকারকল্পে মিছিল মিটিং করেন; পুলিশ ফাঁড়ি, থানা ঘেরাও করার ব্যাপারে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। বাবা গ্রামে গেলে এদের নেতাদের সঙ্গে পানভোজন করেন বটে, কিন্তু বাড়ী ফিরে মায়ের চাপে সর্বাঙ্গে গঙ্গাজল ছিটিয়ে ও গঙ্গোদক পান করে প্রায়শ্চিত্ত করেন। অবশ্য এসব কাজ খুব গোপনে সম্পন্ন করেন। একবার এক কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে তিনি কালীবাড়িতে স্ত্রীকে নিয়ে গোপনে পূজো পাঠিয়েছিলেন—এ খবরও শুনলাম মোহনের মুখে। ওর মায়ের সঙ্গে কথা বলে ওর কথাগুলোর সত্যতা যাচাই করলাম। 'ডিলুইশন' নয়। একদিন এই সব কথা আমার কাছে ফাঁস করে দেওয়ার অপরাধে আপাতদৃষ্টিতে স্নেহপরশীল পিতা ছেলেকে মারধোর করেন। ছেলে তার পরদিন ডঃ ইন্দ্রনীলের সামনেই তাঁর বিরুদ্ধে আরো অনেক অভিযোগ করে।

কিছুদিনের মধ্যেই ডঃ ইন্দ্রনীল আবার এ্যান্টিসাইক্রিয়াটিস্ট হয়ে গেলেন। তৃতীয় চিকিৎসককে—অর্থাৎ এই অধমকে পরিবর্জন করে ছেলেটিকে গ্রামে পাঠিয়ে দিলেন সিদ্ধ বাবার দৈব চিকিৎসার জন্য।

রোগীর মাইক্রো সোশিও-পলিটিক্যাল ওয়ার্লড এবং ম্যাক্রো-সোশিও পলিটিক্যাল জগতের সম্পর্কটা খুবই স্পষ্ট। পরিবার তো আসলে সমাজেরই একটা ছোট ইউনিট। মোহন নিঃসন্দেহে বিদ্রোহী; পিতার সামাজিক রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে তাঁর আচরণ ও কার্যকলাপের কোনো সম্পর্ক নেই। ছেলের মতে বাবা মিথ্যাচারী ও শ্রদ্ধার অযোগ্য। ধর্মীয় কুসংস্কারের ফলে নীচু

জাতি ও আদিবাসীরা উঁচুজাতের নির্যাতন ভোগ করছে। ঠাকুরদাদা ধর্ম মানেন আবার নীচুজাতি ও আদিবাসীদের দুঃখকষ্টের লাঘবের চেষ্টা করেন। এটাও এক ধরনের duplicity,—ভ্রষ্টাচার। কাজেই সে প্রথমে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ও পিতৃবিদ্বেষী, পরিবারের আরাধ্যাদেবীর প্রতি শ্রদ্ধাহীন শুধু নয়, সব দেবদেবী তার ঘৃণার পাত্র। 'র‍্যাডিক্যাল' চিকিৎসকদের মতে সে মূলত সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায় বলেই পরিবার ও সাইক্রিয়াটিস্ট মিলিত প্রচেষ্টায় তাকে পোষ মানাতে চায়। হয়তো এই 'stratagem' সম্পর্ক কেউই সচেতন নন। নিজেদের অজ্ঞাতেই তাঁরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে নিয়োজিত। কিন্তু ঠিক এই ধরনের কথা এই কেসটি সম্পর্কে বলা চলে কি? রোগীর পিতা তো অ্যান্টি-সাইক্রিয়াট্রি তত্ত্বে বিশ্বাসী। তাঁর বিশ্বাসের ভিত্তি খুব দৃঢ় নয় বলা চলে? কি প্রথমটায় ছেলেকে দুই বছর চিকিৎসা করাননি, পরে আবার চিকিৎসা বন্ধ করলেন। কারণ কি? তাঁর বিশ্বাস দৃঢ় নয়—শুধু এইটুকুই বললেই কি ডঃ ইন্দ্রনীলের আচরণের সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়? এই সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর না দেওয়া গেলেও এ কথা বেশ স্পষ্টভাবে বলা চলে যে ছেলেটির সাইকিয়াট্রিক চিকিৎসা প্রয়োজন। বাবা ও ঠাকুরদার বিশ্বাস ও আচরণের অসঙ্গতিই তার অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত আচরণের জন্য দায়ী; বাবা, ঠাকুরদা, তার পরিবার বর্তমানের কুসংস্কারাচ্ছন্ন শোষণভিত্তিক সমাজের পরিবৃত্তিকালীন সঙ্কটের দোটানায় পড়ে আত্মদ্বন্দ্বে নিপীড়িত। সমাজ যদি বেশির ভাগ লোককে নিরাপত্তা দানে অক্ষম হয় তাহলে সমাজের আমূল দ্রুত পরিবর্তন বা বিপ্লবের কথা যেমন ভাবতে হবে, তেমনি আবার এই সমাজের অসুস্থ লোকদের যথাসাধ্য চিকিৎসার ব্যবস্থাও করতে হবে। বিপ্লব হলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এ ধরনের ছেলেমানুষী 'ইউটোপিয়ান' ধারণায় আচ্ছন্ন থাকা চলবে না।

এই ছেলেটি 'অ্যান্টি-সাইকিয়াট্রি' কথাটি বোধহয় জানতো না। কিছু কিছু অল্পবয়সী ছেলেদের মুখে কথাটি শুনেছি। তারা আরো বলেছে, বাবা, পুলিশ ও নার্সিং হোমের কর্তা—এই ত্র্যহস্পর্শের প্রভাবে তাদের জীবন অসহনীয় হয়ে উঠেছে। সেই রকমের একটি কেস রিপোর্ট দিলে 'অ্যান্টি-সাইকিয়াট্রি' তত্ত্ব আরো একটু স্পষ্ট হতে পারে।

(খ) ফোনে সময় ঠিক করে দেখা করতে এল বছর কুড়ির একটি ছেলে। অবিন্যস্ত চুল, অপরিচ্ছন্ন পোষাক, অসঙ্কোচ হাবভাব; ছেলেটি প্রথম দর্শনেই আকৃষ্ট করল। নামধাম, পরিচয় কিছুই বলতে রাজি হলো না। অন্য রোগী এরকম ব্যবহার করলে আমি তার কথা শুনতে চাইতাম না। কিন্তু এর কথা শুনতেই হলো। প্রথমেই বলল—জানি, নামধাম ও অভিভাবকের পরিচয় ছাড়া আপনারা রোগী দেখতে চাইবেন না। কিন্তু আমার কথা আপনাকে শুনতেই হবে। আমি চিকিৎসার জন্য আসিনি, কাজেই আমার বক্তব্য শুনতে আপনি

নিশ্চয়ই রাজি হবেন। আমি জানি ডাঃ কুপারের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে, আপনি পেশায় মনোরোগ চিকিৎসক হলেও জানি আপনি সাইকিয়াট্রিস্টদের আসল পরিচয় জানেন। ওদের সবাই (স্থানীয় কয়েকজন নামকরা চিকিৎসকের নাম করল) আমার বাবার বন্ধু বা বলতে পারেন সাকরেদ বা paid agents। আরেক দল 'সিয়া'র চর। কিন্তু মজাটা হয়েছে কি জানেন? বাবার আবার নকশালপন্থাদের সঙ্গেও যোগাযোগ আছে। যারা এখনও 'অ্যাকৃটিভিস্ট' — তাদের সঙ্গে। একটু উল্টোপাল্টা লাগছে আমার কথাগুলো, ঠিক 'কনভেন্‌শনাল' নয়। বাবা খুব নামকরা লোক। ব্যবসার টাকা। অঢেল পয়সা। এখনকার নয়া বামপন্থী জুটো। লিটল ম্যাগাজিনের তিনই পৃষ্ঠপোষক : মানে ব্যাঙ্কার। আমাদের বাড়ীর ভল্টে অনেক টাকা। এ টাকা নিশ্চয়ই বাইরে থেকে আসে। কোলকাতার সব 'আঁতেল'রা সপ্তাহে একদিন বাবার সেলারের 'ওল্ড ওয়াইন' পান করতে জড়ো হয়। আমি সব জেনে গেছি, তাই আমাকে সরাতে চায় বাবা আর তার সাঙ্গপাঙ্গোরা। নকশালদের দলে আছি এই অপবাদে ওরা সি. বি. আই.-এর হাতে আমাকে ছেড়ে দিতে পারে অথবা সাইকিয়াট্রিস্টদের দিয়ে সার্টিফায়েড করে আমাকে পাগলা গারদে পুরে রাখতে পারে। আমাকে বাঁচাতে পারেন শুধু আপনি।

এই ছেলেটি কৈশোরে আলোকপ্রাপ্তদের সাহচর্য পেয়েছিল। বাবার অর্থাগমের পন্থা বৈধ কি অবৈধ, সে খবর আমার জানার সুযোগ হয়নি। কিন্তু তার সঙ্গতিহীন কথাবার্তার মধ্যে পিতৃদ্রোহিতার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা থেকে অনায়াসে অনুমান করা চলে যে মোহনের বাবার মতোই এই ছেলেটির পিতাও তাত্ত্বিক বিপ্লবী, হয়তো মার্কিউসপন্থী ও এস্ট্যাবলিশমেণ্ট-বিরোধী।

ছেলেটির মুখে অ্যান্টি-সাইকিয়াট্রি ও অ্যান্টি-এস্ট্যাবলিশমেণ্ট এই দুটি কথা একাধিকবার উচ্চারিত হতে শুনেছি। এ-ছাড়া দরিদ্রজনগণ-দরদী পিতার বিপ্লবী চেতনা চোরাবাজারে কেনা দামী স্কচ্‌ পানের পর অনেকখানি বাড়ে—এই কথা শুনিয়ে আমার ঘরের চারপাশে তাকিয়ে সভয়ে ফিসফিস করে বলেছে : এ কথা যেন তিনি না জানেন, তাহলে আমাকে নকশালবাড়ীর ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেবেন কিম্বা বন্ধু সাইকিয়াট্রিস্টদের হাতে তুলে দেবেন ; আমাকে আপনি বিদেশে পাঠিয়ে দিন, আমি লড়াই করতে পারব না, ইলেকট্রিক শক্‌ খেতেও পারব না।

প্রথম ছেলেটিকে ও দ্বিতীয় ছেলেটিকে তাদের অভিভাবক, সমাজের অভিভাবক, মনোরোগ চিকিৎসকরা মিলিতভাবে উন্মাদ প্রতিপন্ন করতে চাইছেন, অথবা 'মনোরোগ' কথাটি বুর্জোয়া সমাজের স্থিতাবস্থা রক্ষাকারীদের একটা প্রয়োজনীয় উদ্ভাবন—এই ধারণা ভুল। সব দেশের প্রাচীন সাহিত্য, ইতিকথা, 'মিথ', ও পুরাণে উন্মাদ ও অস্বাভাবিক মানুষের সাক্ষাৎ মেলে। ইতিহাসের পাতাতেও বহু খ্যাতকীর্তি উন্মাদের উল্লেখ আছে।

হিপোক্রাটেস-পর্ব (খৃ. পূ. ৫ম শতাব্দী) যুগেও উন্মাদের অভাব ছিল না, হয়তো বর্তমান সংজ্ঞা ছিল না। তখন ভর হওয়া তত্ত্বটাই বেশি চালু ছিল। তখন ভাবা হতো দুই ধরনের আত্মা বা spirit মানুষকে ভর করে। সৎ আত্মার ভর হলে, ভরগ্রস্ত ভালো ভালো কথা বলতেন, অনেক হিতোপদেশ দিতেন, অনেক সময় ভগবানের দূত বা মহাপুরুষ বলে অভিহিত হতেন। কিন্তু ভরগ্রস্ত যদি মারামারি কাটাকাটি করতেন অথবা গোষ্ঠীপ্রধানদের অবাধ্য হতেন তাহলে মনে করা হতো যে দুষ্ট আত্মার ভর হয়েছে। এদের আত্মার কবল থেকে মুক্ত করার জন্য রোজা বা পুরোহিত ডাকা হতো। হিপোক্রাটেসই প্রথম বললেন যে এরা এক রকমের রোগী। আয়ুর্বেদেও নাকি ঐ রকম বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে পিথাগোরাস আরো বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করলেন, মস্তিষ্কের কোষের কার্মিক বিকলতার (functional disturbance of cerebral cells) কথা বললেন। বংশানুক্রমতার কথাও উঠল। রোজাদের নিষ্ঠুর ব্যবহার নিষিদ্ধ হলো প্রাচীন গ্রীসে। এরপর প্লেটো অ্যারিস্টটল-এর ভাববাদী ধারণার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও উন্মাদ রোগ সম্পর্কে বস্তুবাদী তথ্য ও জ্ঞান বাড়তে লাগল। আলেকজান্দ্রিয়াতেই বোধহয় উন্মাদ রোগীদের প্রথম আবাসিক চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তৃতীয় শতাব্দীতে গালেন-এর মৃত্যুর পর থেকে অন্ধকার যুগের সূচনা। রোমের পতনের পর হিপোক্রাটেস-এর কথা ইওরোপের মানুষ ভুলে গেল; বর্বর যুগের প্রতিষ্ঠা ঘটল। কিন্তু মধ্যযুগেও আরব দেশে গ্রীস-রোমের উন্নত মানের চিন্তাধারা বেঁচে রইল। ইবেন সিনা-র (Avicenna, ৯৮০-১০৩০ খৃঃ) লেখায় হিষ্টিরিয়া, এপিলেপ্সি, ম্যানিক, ডিপ্রেসিভ ইত্যাদি কথাগুলি পাওয়া যায়। বাগদাদে ৮ম শতাব্দীতে মানসিক রোগের হাসপাতাল খোলা হয়। মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনের শেষে রেনেসাঁসের সঙ্গে সঙ্গে পারাসেলসাস (১৪৯০-১৫৪১) নতুন যুগের সূচনা করলেন। এর পর Phillipe Pinel (১৭৭৫-১৮২৬)-এর প্রচেষ্টায় বাতুলদের শৃঙ্খলমুক্তি ঘটলো, তাদের মানুষ বলে গণ্য করা হলো। বাতুলতা সম্পকিত বৈজ্ঞানিক ধারণা ও বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা সভ্যতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত।

সাইকিয়াট্রি এখনও খুব উন্নত মানের বিদ্যা হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ: 'সাইক্' বা মন সম্পর্কিত ভাববাদী ও দ্বয়বাদীদের ভ্রান্ত ধারণা। 'স্কিজোফ্রেনিয়া' চিকিৎসকদের কল্পনা নয়, সত্যিই মস্তিষ্কের এক ধরনের কার্মিক বিশৃঙ্খলা। তবে এ কথা পরিষ্কারভাবে বলা উচিত যে, আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন, ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ববিরোধের নিরসন ও ব্যক্তি নিরাপত্তার ক্রমবৃদ্ধি ছাড়া মনোরোগের প্রতিরোধ সম্ভব নয়।

সুপ্তি

এক

সম্মোহন কি ?

তোমার প্রশ্নটি খুবই সামান্য, কিন্তু উত্তরে যে মনোবিদ্যার মহাভারত লেখা হতে পারে, সেটা তুমি খেয়াল করেছ কি ? সম্মোহনবিদ্যার ইতিবৃত্ত লিখতে গেলে শুরু করতে হবে সেই আদিম কৌম-সমাজের রীতিনীতি, বিধিনিষেধ, ধ্যানধারণা থেকে, আর শেষ করতে হবে এ-যুগের দুই মহারথী পাভলভ ও ফ্রয়েডের পরস্পরবিরোধী তত্ত্বকথায় এসে।

শেষ থেকেই শুরু করা যাক।

নিজেকে জানবার চেষ্টা—অন্তরজগতের রহস্য উদ্ঘাটন-প্রয়াস—সৃষ্টির আদিপর্ব থেকেই শুরু করে এসেছে মানুষ। কিন্তু তার এই প্রয়াসের সাফল্যসূচনা মাত্র সে-দিনের কথা। সৌরজগৎ, পদার্থজগৎ, জীবজগৎ, উদ্ভিদজগৎ তাকে অনেক বেশি আকৃষ্ট করল; তার অনুসন্ধিৎসা তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে উৎসাহিত করল। গড়ে উঠল বিচ্ছিন্নভাবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা। গত শতকেই আবার এই সব বহির্জাগতিক বিজ্ঞানের মধ্যে পরস্পর-সান্নিধ্যের সূত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল। এঙ্গেল্‌সের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি-বিচারে ধরা পড়ল বস্তুর গতিপ্রকৃতির পার্থক্য ও ঐক্য। পদার্থবিজ্ঞান তাঁর মতে—the mechanics of molecules, রসায়নবিজ্ঞান—the physics of atoms, আর জীববিজ্ঞান—the chemistry of albumin। সে-সময় নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, মলিকিউলার বায়োলজি, আধুনিক এ্যাসট্রোফিজিক্স-এর সূচনা হয়নি। ঘনসংযুক্ত বস্তুর গঠন-স্বাতন্ত্র্য নিয়ে গবেষণা শুরু হয়নি। কাজেই শুধু গতির প্রকারভেদ ও রূপান্তরণের দিকেই এঙ্গেল্‌সের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল। সে যাই হোক, এর ফলে বিজ্ঞানের শাখাপ্রশাখার গবেষণায় ঘটল দ্রুত উন্নয়ন। এক শাখার গবেষণালব্ধ জ্ঞান অন্য শাখাকে প্রভাবিত করল। কিন্তু হায় ! মনোবিদ্যা পড়ে রইল একপাশে অনাদৃত ও অবহেলিত। বাইরের জগতকে জানার সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তার বাঁচার সংগ্রাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই বহির্জাগতিক সমস্যা সমাধানের এই সামগ্রিক সংকল্পনিষ্ঠ প্রচেষ্টা। ক্রমশ বাইরের জগতের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে,

প্রকৃতির নিয়মশৃঙ্খলের হদিশ পেয়ে প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করার ক্ষমতা আয়ত্তে এনেছে মানুষ। অমিত শক্তির অধিকারী হয়ে বুঝেছে আত্মজ্ঞান না জন্মালে—নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে না শিখলে—তার বহিরঙ্গের জ্ঞান হয়ত কোনো কাজেই লাগবে না, শুধু আত্মধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়া ছাড়া।

তুমি বলবে, সর্বকালের ধর্মশাস্ত্র তো এই জ্ঞানই প্রচার করেছে এতকাল। ভুলে যেও না, অতি আধুনিক ধর্মমতও অন্তত হাজার বছরের পুরণো। এ কথা স্বীকার করবে নিশ্চয়ই যে, দাস-শ্রমনির্ভর কৃষিসমাজে ধর্মশাস্ত্রদত্ত আত্মজ্ঞান হয়তো আত্মনিয়ন্ত্রণের পথ দেখাতে পেরেছিল, কিন্তু বর্তমান সমাজব্যবস্থায় সেই জ্ঞান অচল। আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে জানবার প্রচেষ্টা একান্তই স্বাভাবিক। তাই বলছিলাম, পাভলভ ও ফ্রয়েড দিয়েই শুরু করা যাক।

এই দুই মহারথীকে (বলা উচিত তাঁদের তত্ত্বকে কেন্দ্র করে) ঘিরে সারা পৃথিবীতে দুটি যুধ্যমান চমূ ঠাণ্ডা-লড়াই-এর আবহাওয়াকে আরো ঘোরালো করে তুলেছে। পাভলভকে ঘিরে রয়েছেন অবজেকটিভ দৃষ্টিভঙ্গীধারী পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়াসীরা, আর ফ্রয়েডকে কেন্দ্র করে ভিড় জমিয়েছেন সাবজেকটিভ-স্কুলের অন্তর্দর্শনে বিশ্বাসী রথীবৃন্দ। এই দুই মনীষী সমসাময়িক। পাভলভ জন্মেছিলেন ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে আর ফ্রয়েড তার আট বছর পরে। মৃত্যুকাল যথাক্রমে ১৯৩৬ ও ১৯৩৯। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত দুজনেই সক্রিয় ও স্বধর্মনিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ী যোদ্ধা ছিলেন। তাঁদের গবেষণাপদ্ধতি ছিল কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টো ধরনের—তত্ত্বও পরস্পরবিরোধী। মানসিকতা ও মনোবিকারের ইতিবৃত্ত-অন্বেষণে পাভলভ প্রকৃতিবিজ্ঞানের পথে উচ্চমস্তিষ্কের ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার গবেষণা নিয়ে মেতেছিলেন, আর ফ্রয়েড মানসিকতার হাদশ পেতে চেয়েছিলেন মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানের সহায়তা ছাড়াই মনের নিরুদ্ধ গুহার অভ্যন্তরে। দেহসম্পর্কবর্জিত চিত্তলোকের আদিম-কল্পনা প্রভাবিত করেছিল ফ্রয়েডকে। পাভলভ গিয়েছিলেন উচ্চস্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার বিজ্ঞানানুসৃত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে, ফ্রয়েড চলেছিলেন নিজের ও রোগীদের মনোসমীক্ষার পথে। দুজনেই নতুন দিগন্ত আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করতে পারেন। দুজনেই নতুন পথের নির্দেশ দিয়েছেন বলে দাবী করেছেন। পাভলভের আবিষ্কার—'উচ্চতর স্নায়ুবিজ্ঞান' আর ফ্রয়েডের আবিষ্কার—'অবচেতন মনের বিজ্ঞান'।

এঁদের পরস্পর বিরোধিতা শুধু সম্মোহনবিদ্যা ও অঙ্গাঙ্গীসম্পর্কিত ঘুম, স্বপ্ন ইত্যাদি ব্যাপারেই নিবদ্ধ নয়। এছাড়া আরো অনেক ব্যাপারে, যেমন শিশুমন, শিশুশিক্ষা, মনোবিকারের কারণ ও চিকিৎসা, জীববিদ্যা, নৃবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি নানা দিকে এঁদের তত্ত্ব ও বিধান সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থার নির্দেশক।

তোমার ঔৎসুক্য শুধু 'সম্মোহনবিদ্যা' নিয়ে আমি জানি। কিন্তু অন্য বিষয় আমার চিঠিতে এসে পড়বেই। সম্মোহন সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলে ঘুম আর স্বপ্নের কথা আসতে বাধ্য। সম্মোহনের ইংরাজী নাম হিপনসিস্। বেয়ার্ড নামে এক ইংরেজ চিকিৎসকের দেওয়া নাম : ঘুমেরই নামান্তর। আগে নাম ছিল মেসমেরিজম। ডক্টর মেসমার সম্মোহিত অবস্থায় অভিভাবনের সাহায্যে রোগ সারিয়ে ইয়োরোপে একসময় আলোড়ন এনেছিলেন। শেষ বয়সে পরাজিত অপমানিত জীবনের বোঝা টানতে হয়েছিল তাঁকে। তবুও তাঁর নামের সঙ্গে অতি-প্রাচীন এই বিদ্যা এখনও জড়িয়ে আছে। তিনি অবশ্য মনে করতেন চৌম্বকশক্তির বিশেষ বিকাশ ঘটে সম্মোহিত অবস্থায়। তাঁর কথা এখন থাক। পাভলভ-ফ্রয়েডের কথাতেই আসা যাক। ঘুমন্ত আর সম্মোহিত অবস্থার সাদৃশ্য সকলেই লক্ষ্য করেছেন। সম্মোহনকারী ঘুমের অভিভাবন দিয়ে শুরু করেন তাঁর সম্মোহন-পর্ব। "ঘুমিয়ে পড়ুন—ঘুমিয়ে পড়ুন! হাত-পা ভারী হয়ে আসছে, সারা দেহ অসাড় অবশ হয়ে আসছে …। আপনার ঘুম আসছে, গভীর ঘুম আসছে। .. বাইরের সব শব্দ অস্পষ্ট হয়ে গেছে। আমার কথা ছাড়া অন্য কোনো কথা, অন্য কোনো শব্দ আপনার কানে যাচ্ছে না।" —কথাগুলো পরিচিত বলেই মনে হচ্ছে – তাই না? পাভলভ ও ফ্রয়েড দুজনেই সম্মোহিত অবস্থাকে এক ধরনের ঘুমন্ত অবস্থা বলেই মনে করেছেন। অবশ্য এই ঘুম সম্পর্কে তাঁদের দুজনের ধারণার মধ্যে কোনো মিল নেই।

ঘুম নিয়ে যত কাব্য রচিত হয়েছে, রামধনু বা প্রজাপতি নিয়েও বোধহয় তত হয়নি। রাত্রির ঘুম একটি দিনের মৃত্যু আর ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি দিনের জন্ম। জন্ম মৃত্যুর মতোই ঘুম আর জাগরণে ছন্দোময় আমাদের জীবন, তাই ঘুম জুগিয়েছে কবিমনে প্রেরণা। আবার কাব্যের পাশাপাশি ঘটেছে ঘুম নিয়ে নানা দার্শনিক চিন্তাধারার বিকাশ। সবটাই তার অতীন্দ্রিয় রহস্যময়তা।

আদিম মানুষ ঘুমকে যে অলৌকিক স্বপ্নলোকে প্রয়াণের সেতু মনে করবে এর মধ্যে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। দেহ নিশ্চল, বাইরের উদ্দীপকে সাড়া নেই, জীবনধারা স্তিমিত। কিন্তু স্বপ্নে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে বল্‌গা হরিণের পিছু ধাওয়া করে হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ এড়িয়ে উপস্থিত হয়েছে সে এক নতুন রাজ্যে, যেখানে দেখা হল মৃত পূর্বপুরুষদের সঙ্গে। আদিম মানুষ স্বপ্নঘটনাকে বাস্তব থেকে আলাদা করে দেখতে শেখেনি। কাজেই তার মনে জন্মেছিল দেহাতীত আত্মার প্রতীতি। বেশির ভাগ ধর্মশাস্ত্রে দেহ-মনের সম্পর্ক বিশ্লেষণ এই স্বপ্ন-নায়ক আত্মাকে নিয়ে। মানুষের আদিম ধর্মবিশ্বাস, 'সর্বপ্রাণবাদ'—এই স্বপ্ননায়ক আত্মাকে কেন্দ্র করে। ঘুম আর স্বপ্ন মানুষের জীবনাদর্শকে খুবই প্রভাবিত

করেছে। স্পেন্সার ও ডারউইনের লেখায় এর স্বাক্ষর রয়েছে। এঙ্গেল্স লিখেছেন—

"From the very early times when men, still completely ignorant of the structure of their own bodies, under the stimulus of dream apparitions came to believe that their thinking and sensations were not actitvities of their bodies, but of a distinct soul which inhabits the body and leaves it at death—from this time men have been driven to reflect about the relation between the soul and the outside world."

'দ্য গোল্ডেন বাউ'-এর লেখক ফ্রেজারও বলেছেন—আদিম মানুষ ঘুমোতে ভয় পেতো, তারা ভাবতো ঘুমোলে দেহের খুদে মানুষটি (আত্মা) দেহত্যাগ করে যাবে।

প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে অসহায় অজ্ঞ আদিম মানুষের মনে স্বভাবতই ঘুম আর স্বপ্ন কুসংস্কার ও অলৌকিক বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিল। তা বলে মনে কোরো না এ-দিক দিয়ে আদিম যুগ পেরিয়ে আমরা খুব বেশি এগিয়েছি। দুঃস্বপ্ন দেখে আমরা আজও উদ্বিগ্ন হই। ধর্ম-বিশ্বাসের ঢাকনা দিয়ে পুরণো দিনের অনেক রহস্যময় অন্ধ-কুসংস্কারকে আমরা আজও পোষণ করছি। এখনও মুখে 'বিশ্বাস করি না' বলেও হস্তরেখাবিদদের কাছে হাত বাড়িয়ে দিই, ছেলেমেয়েদের কোষ্ঠি-ঠিকুজি তৈরী করাই। জন্মলগ্নে গ্রহনক্ষত্রের সমাবেশ ও অবস্থান জানতে সকলেই উদ্‌গ্রীব। তাই দৈনিক পত্রিকাগুলোতেও সাম্প্রতিককালে সামুদ্রিক-বিদ্যার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কিন্তু বিজ্ঞান আজ বদ্ধপরিকর কুসংস্কার আর রহস্যময়তার বিরুদ্ধে অভিযানে।

সম্মোহনের ইতিবৃত্ত জানবার আগে তোমাকে জানতে হবে ঘুম আর স্বপ্নের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা। তবেই বুঝবে সম্মোহিত অবস্থার শারীরবৃত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য।

ঘুম সম্পর্কে বহুরকমের তত্ত্ব প্রচলিত। আমি কিন্তু ফ্রয়েড আর পাভলভের তত্ত্ব তোমাকে জানাব। কেননা এই দুটিরই গুরুত্ব বেশি।

দুই

জীবন ছন্দোময়। শুধু জীব নয়, গাছপালার মধ্যেও দেখবে এই ছন্দের খেলা। জীবনের জোয়ার-ভাঁটার ওঠানামা। অনেক গাছের পাতা রাত্রে গুটিয়ে

যায়, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার নিজেদের মেলে ধরে। বিপাক ক্রিয়ার তারতম্য ঘটে দিবারাত্রির পরিবর্তনে। তবে উচ্চ প্রাণী, বিশেষ করে মানুষের মধ্যেই দেখা যায় ঘুম আর জাগরণের নির্দিষ্ট সীমারেখা ও পরিক্রমা-ছন্দের সুসম বিকাশ।

ঘুম আর জাগরণের সঙ্গে মাত্রা রেখে জৈবক্রিয়ার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে ঘুমের বিভিন্ন মাত্রা লক্ষ্য করা যায়। এই মাত্রার বৈশিষ্ট্য প্রজাতির বিশেষ পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। কুকুর বিড়াল ইত্যাদি গৃহ-পালিত প্রাণী দিনরাতে অনেকবার ঘুমোয়। কোনো কোনো প্রাণী দিনে ঘুমিয়ে রাত্রে শিকারের সন্ধানে বের হয়। কুকুর-বিড়ালের ঘুমকে বলা হয় বহুমাত্রিক ঘুম আর মানুষের ঘুমকে বলি একমাত্রিক ঘুম। অবশ্য বয়স ও অবস্থা-ভেদে এর তারতম্য ঘটে। শিশুদের ঘুম বহুমাত্রিক। বৃদ্ধ ও অনেক লোক (যাঁদের দুপুরে কাজ থাকে না) দ্বিমাত্রিক ঘুমে অভ্যস্ত।

শিফ্ট ডিউটি যাঁরা করেন, তাঁরা অবস্থানুযায়ী ঘুমের সময়কে বদলে নিতে অভ্যস্ত। কোনো কোনো প্রাণী একটা গোটা ঋতু ঘুমিয়ে কাটায়। শীতকালীন বা গ্রীষ্মকালীন এই ঋতু-নিদ্রা বা **hibernation**-এর সঙ্গে দৈনন্দিন ঘুমের কিছুটা পার্থক্য আছে। ঋতু-নিদ্রাকালীন অবস্থায় প্রাণীদেহে এক বিশেষ ধরনের বিপাক ক্রিয়া চলে। অনেক প্রাণীর দৈহিক তাপমাত্রা এ সময়ে বাইরের তাপমাত্রার সমানাঙ্কে এসে পৌঁছায়।

না-খেয়ে থাকার চেয়ে না-ঘুমিয়ে থাকা অনেক বেশি কষ্টকর। মানুষই হোক আর ইতর প্রাণীই হোক, না ঘুমিয়ে কেউ বাঁচতে পারে না। কুকুরের বাচ্চাদের ওপর পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা গেছে যে ৪।৫ দিন না ঘুমোতে দিলে তারা বাঁচে না। বয়স্ক কুকুরদের অবশ্য ২০।২২ দিন বাঁচতে দেখা গেছে। এক আধুনিকতম পরীক্ষায় দেখা গেছে ৮ দিনের দিন কুকুরগুলো (নিদ্রানিবারক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও) ঘুমিয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে দুটি কুকুর আর ঘুম থেকে ওঠেনি।

জীবনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ ঘুমিয়ে কাটায়। নিদ্রিত মানুষ কিন্তু অসাড়ে ঘুমোয় না, বাইরের জগতের সঙ্গে তার সব সম্পর্ক চুকে যায় না। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু মস্তিষ্ক কোষ জেগে বা আধা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। সামগ্রিকভাবে উচ্চ মস্তিষ্ক কাজ করে না বটে, কিন্তু বাইরের জগতের সঙ্গে ঘুমন্ত মানুষের আংশিক যোগাযোগ থাকে। সে পাশ ফেরে, নড়াচড়া করে, মাঝে মাঝে কথা বলে, স্বপ্ন দেখে। অসুস্থ মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় এককভাবে ছোটখাটো নাটক অভিনয় করতে পারে। স্বপ্নচারিতার (somnambution) রহস্য এখন উদ্ঘাটিত। ডঃ জুলিয়াস সেগাল ১৯৬৫ সাল থেকে ঘুম নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন, অনেক নতুন তথ্য আহরণ করেছেন। এ ছাড়া,

আরো অনেক গবেষক, চিকিৎসক, মনস্তাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক ইত্যাদি জীবনের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশের ওপর আলোকপাতের চেষ্টা করেছেন এবং করছেন। ঘুমের প্রয়োজন খাদ্যের চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয়। তিন সপ্তাহ কিছু না খেয়ে মানুষ বেঁচে থেকেছে এবং আবার খাদ্য পেলে দুর্বলতা দূর করে সবল হয়ে উঠেছে। কিন্তু তিন সপ্তাহ না ঘুমিয়ে মানুষ খুব কম ক্ষেত্রেই সুস্থ থাকতে পারে। তাদের মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যে যে স্বপ্ন দেখি তারও প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব আছে। সময়মত সে কথা বলবো। ঘুমের বিষয়ে সব কথা বলতে হলে বেশ কয়েকশো পৃষ্ঠার আলাদা একখানা বই লেখা দরকার। শুধু এই খবরটুকু জানিয়ে রাখছি বর্তমান কালে—যে কালকে একজন নামকরা মনোরোগবিশারদ 'age of anxiety' বলে অভিহিত করেছেন—ঘুমের বড়ি এবং 'ট্রাংকুইলাইজার'-এর বিক্রীর মাত্রা বৃদ্ধি অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের একজন বিশেষজ্ঞের মতে শতকরা পঞ্চাশজন বয়স্ক ব্যক্তির ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। তাঁদের অনেকেই ঘুমের ওষুধ বা প্রশান্তির ওষুধে (hypnotic and tranquiliser) অভ্যস্ত। সবার ক্ষেত্রে কিন্তু ঘুমের ওষুধ বা প্রশান্তির ওষুধে কাজ নাও হতে পারে; কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্ষতিরও সম্ভাবনা আছে। অভিজ্ঞ মনোরোগ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ঘুমের জন্য ওষুধ ব্যবহার যেমন ঠিক নয়, তেমনি আবার ঘুমের ওষুধে অভ্যস্ত হয়ে পড়ার ভয়ে (addiction) ঘুমের জন্য ওষুধ সেবনে আপত্তিও অবিবেচনার কাজ। ঘুমের জন্যে অনেক সময় বিষণ্ণতারোধক (antidepressant) ওষুধের প্রয়োজন হতে পারে। বিষাদ রোগের প্রারম্ভে অনেক ক্ষেত্রেই ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে থাকে; তখন চিকিৎসকরা ঘুমের ওষুধের বদলে বিষাদ নিরোধক ওষুধ সেবনেরই নির্দেশ দিয়ে থাকেন। স্কিজোফ্রেনিয়া রোগের এক বিশেষ অবস্থায় ঘুমের ওষুধের বদলে জাগিয়ে রাখার (উত্তেজনাবর্ধক) ওষুধে ফল পাওয়া যায়।

ঘুমের গুরুত্ব অসীম; ঘুম জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। নিশ্চয়ই তুমি মুচকি হেসে ভাবছ—আমি বাড়িয়ে বলছি।

গত বছর তুমি যখন 'অনিদ্রারোগে' ভুগেছিলে, আমি তোমাকে অন্য কথা বলেছিলাম। মাস তিনেক তুমি ঘুমোতে পারোনি। অনেক রোগী বছরের পর বছর না ঘুমিয়ে বেঁচে থাকে—তোমাকে বলেছিলাম। মিথ্যা কিন্তু বলিনি। 'অনিদ্রা রোগ' মস্তিষ্কের বিশেষ অসুস্থ অবস্থা। এই অবস্থায় মস্তিষ্কের অনেকগুলো কোষ প্রায় ঘুমন্ত অবস্থাতেই থাকে। রাত্রে ৬।৭ ঘণ্টা গভীর ঘুমের মধ্য দিয়ে কোষগুলো সজীব ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। অধিকাংশ অনিদ্রারোগে গভীর ঘুম হয় না বটে, কিন্তু আধঘুমন্ত অবস্থার মধ্য দিয়ে দিনরাত কাটে। কাজেই মস্তিষ্ককোষগুলোর ক্ষয়-ক্ষতি বিশেষ কিছু ঘটে না। যখন স্নায়ুকোষের উত্তেজনা

নিয়ে আলোচনা করব তখন ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। এখন শুধু জেনে রাখো, ঘুম আর জাগরণের মাঝামাঝি অবস্থায় আমরা সুস্থ মানুষেরাও অনেক সময় কাটাই—যাকে পাভলভপন্থীরা বলেন—hypnoid state, এবং এই অবস্থায় মস্তিষ্ককোষগুলো খুব বেশি পরিশ্রান্ত হয় না। অনিদ্রারোগে এই 'hypnoid state' দীর্ঘতর হয়, কাজেই গভীর ঘুম না হলেও খুব বেশি ক্ষতি হয় না।

জাগ্রত আর নিদ্রিত অবস্থার মধ্যে শারীরবৃত্তিক পার্থক্য অনেক। জাগ্রত অবস্থায় তুমি তোমার পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন। চোখ কান সজাগ। ধর, তুমি ক্লাসে লেকচার শুনছ। কোন ছেলে কিভাবে তোমার দিকে তাকাচ্ছে, তা তোমার নজর এড়াচ্ছে না। তোমার পিছনের বেঞ্চের ছেলেরা ফিস ফিস করে যে কথাগুলো বলছে তাও তোমার কানে আসছে। পাশের মেয়েটির চুলের সুবাস তোমার নাকে যাচ্ছে। মৃদুস্পর্শের অনুভূতিও তোমাকে চঞ্চল করতে পারে। ঘরের তাপমাত্রার আধিক্য তোমাকে বিচলিত করতে পারে। ক্লাস থেকে উঠে ছেলেদের ভিড় এড়িয়ে, চৌকাঠ পেরিয়ে কমনরুমে আসতে তোমার অসুবিধা হবে না। এত কথা বলার অর্থ, তোমার কেন্দ্রীয় স্নায়ু-সংস্থা ও ইন্দ্রিয়গুলো এই জাগ্রত অবস্থায় পুরোপুরি সক্রিয়। সব সময় অবশ্য এর বহিঃপ্রকাশ নজরে পড়বে না। যখন দুপুরে খাওয়ার পর তোমাদের বারান্দার ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে দূরের পাহাড়টার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাক তখন হয়ত মনে হবে তোমার মস্তিষ্ক কাজ করছে না। তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিশ্চল, দৃষ্টি দূরবদ্ধ, আঁচলটা লুটিয়ে পড়েছে, ভিজে চুলগুলো নিয়ে বাতাস খেলা করছে। মৃদু নিঃশ্বাসের সঙ্গে বুকের ওঠানামা ছাড়া জীবনের আর কোন লক্ষণই তোমার মধ্যে নেই। কিন্তু তুমি জাগ্রত। তোমার কেন্দ্রীয় স্নায়ুসংস্থা ও ইন্দ্রিয়গুলো সক্রিয়। পরিবেশের পরিবর্তন যত সূক্ষ্মই হোক না কেন, তোমার ইন্দ্রিয় মারফত মস্তিষ্কে পৌঁছুচ্ছে। তোমার পেশী, অস্থিসংযোগ, গ্রন্থি, পাকাশয়, লিভার, বৃক্ক, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি দেহের ভিতরকার সমস্ত যন্ত্র তাদের খবর পাঠাচ্ছে মস্তিষ্কের কাছে। মস্তিষ্ক খবরগুলো শুধুই যে গ্রহণ করছে,—তা মনে কোরো না। সঙ্গে সঙ্গে অবস্থানুযায়ী নির্দেশ পাঠাচ্ছে ঐসব আন্তরযন্ত্রের কাছে। তাদের সুষ্ঠু ও সুসমন্বিত পরিচালনা নির্ভর করছে এই নির্দেশের ওপর। বাইরের জগতের সূক্ষ্মতম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আন্তরযন্ত্রগুলিরও সাংগঠনিক পরিবর্তন ঘটছে। কেন্দ্রীয় স্নায়ুকেন্দ্র এই পরিবর্তনের নিয়ন্ত্রক। এইবার ভাবা যাক, বাইরের পাহাড়টার চূড়ায় একখণ্ড ধূসর মেঘ ভেসে আসতে ঝাপসা হয়ে গেল পাহাড়টার রূপরেখা। বিস্মৃতির অতল থেকে হারিয়ে যাওয়া একটা মুখ তোমার মনের মুকুরে অস্পষ্ট ছায়া ফেলল। চোখ বুজিয়ে মুখটাকে তুমি স্মৃতির তুলির টানে উজ্জ্বল করার চেষ্টা করছ। নিশ্চল দেহ, স্তিমিত শ্বাসপ্রশ্বাস,

মুদ্রিত নয়ন, কিন্তু এখনও তুমি জেগে আছ। মস্তিষ্ক স্মৃতিমন্থনে রত। কল্পমূর্তি গঠনে ব্যস্ত। তোমার সুঠাম গ্রীবা আরও সুন্দর দেখাচ্ছে; চাপা উত্তেজনায় পেশীগুলো ঈষৎ স্ফীত।

এবার ঘুমন্ত তোমাকে কল্পনা করা যাক। সমস্ত পেশী শ্লথ হয়ে গেছে। সুন্দর মুখের রেখাগুলো নিশ্চিহ্ন। একটা হাত এলিয়ে পড়েছে দেহ বরাবর, আর একটা হাত বুকের উপর। গ্রীবার সে মনোরম ভঙ্গি আর নেই—পেশী-গুলো শিথিল। ঠোঁট দুটো সন্নিবদ্ধ নয়; দন্তরুচিকৌমুদীর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। যে রেখাগুলো তোমার ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলত—তাদের অভাবে তোমাকে অন্যরকম দেখাচ্ছে। এককথায়, একটু বোকা বোকা মনে হচ্ছে তোমাকে। তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ। বাইরের উদ্দীপনায় (যদি খুব তীব্র না হয়) সাড়া দেবার ক্ষমতা হারিয়েছ। ইন্দ্রিয়গুলো আর ভালমতো কাজ করছে না। অনুভূতি, কল্পনা সবই মন্দীভূত। শৈশবে যখন ঘুমিয়ে পড়তে, তখন একে-বারে নিষ্ক্রিয় হয়ে যেত ইন্দ্রিয়গুলো। এখন অতটা না হলেও আলতো ছোঁয়া, মৃদু শব্দ তোমার কেন্দ্রীয় স্নায়ুসংস্থানে পৌঁছুচ্ছে না। একটা মশা কানের কাছে গুঞ্জন করছে—তুমি শুনছ না। আলগোছে তোমার ঠোঁটের ওপর বসল, তুমি হস্ত সঞ্চালনে তাড়াবার চেষ্টা করলে না। বাইরে তোমার প্রিয় পাখিটি ডেকে উঠল, তোমার চোখেমুখে খুসির ঝিলিক খেলল না। তোমার স্নায়ুসংস্থা নিস্তেজিত।

এই অবস্থায় কিন্তু সব পেশী শিথিল হয়ে পড়েনি। দেহের ক্লেদাদি যাতে অসাড়ে নির্গত না হয় এইজন্যে মস্তিষ্কের বন্দোবস্ত অনুসারে মূত্রাশয় ও বৃহদন্ত্রের পেশীগুলো প্রেষিত।

এই অবস্থায় তোমার আর কি কি শারীরবৃত্তিক পরিবর্তন ঘটছে, শুনবে? হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন মৃদু ও মন্থর হয়েছে। রক্তের চাপ কমে গেছে। রক্তপ্রবাহ মন্দগতি হয়েছে—বিশেষ করে মস্তিষ্ক, যকৃৎ, বৃক্ক ইত্যাদিতে। রক্তবাহী সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরাগুলো প্রসারিত হওয়ার ফলে ত্বক উষ্ণতর, যদিও বিপাকক্রিয়া মন্দীভূত হওয়ায় দেহের তাপ নিম্নমুখী। শ্বাসপ্রশ্বাস গভীর ও সমছন্দ। মাঝে মাঝে সশব্দে গর্জন করে উঠছে তোমার নাসিকা। রাগ করলে? রাগ কোরো না। এটা শরীর-ধর্ম। শুধু আমার নয়, তোমার মত সুন্দরীর নাসিকাও মাঝে মাঝে ধ্বনিময় হয়। ঘুমের মধ্যে তালুর যে-অংশ নরম সেটা শিথিল হয়ে ঝুলে পড়ার ফলে শব্দ হচ্ছে। এটা স্বাভাবিক ব্যাপার, নিন্দনীয় নয়। বাতাস ঐ ঝুলে পড়া তালুতে ধাক্কা খাচ্ছে তাই এই শব্দ। যন্ত্রপাতি কম কাজ করছে। এখন তাদের বিশ্রাম। কিন্তু সকলের নয়। পাকযন্ত্র তার সমস্ত গ্রন্থি সমেত বেশ সক্রিয়। রাতের খাওয়াটা হজম করতে ব্যস্ত। আর সক্রিয় স্বেদগ্রন্থিগুলো। তোমার

কপালে স্বেদবিন্দু চক্‌চক্‌ করছে। ভালই দেখাচ্ছে।

দিনের বেলায় জাগ্রত অবস্থায় দেহের ক্ষয়ক্ষতি ঘটছে, এখন ঘুমের ভেতর দিয়ে ক্ষতিপূরণ হচ্ছে। এ ক্ষতিপূরণ কোন অংশের বেশি প্রয়োজন, জান? উচ্চ মস্তিষ্কের যে অংশকে কর্টেক্স বলি সেই দামী অংশের। এখানকার কোষগুলো ভারী কোমল, এতটুকু আঘাতেই ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু এরা তেজবীর্য ও কর্মশক্তিতে কারো থেকে কম যায় না। পেশী ও গ্রন্থির কোষগুলোর সাময়িক পুষ্টির বন্দোবস্ত নিজেদের মধ্যেই খানিকটা সঞ্চিত থাকে। মস্তিষ্ককোষেরা সে সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাদের কোনো স্থানীয় ভাণ্ডার নেই। আবার প্রয়োজনও এদের বেশি, বিশেষ করে অক্সিজেন আর গ্লুকোজ চাই সাধারণ কোষের থেকে কয়েকগুণ বেশি। সারা দেহযন্ত্রের নিয়ন্ত্রক আর নিয়ামক এরা—কাজেই তোয়াজে রাখতে হয়। তোয়াজে রাখার বন্দোবস্ত কিন্তু ঠিকই আছে। লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এমন জটিল ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে, যার ফলে এই কোমল অথচ অসীম শক্তিশালী অমূল্য স্নায়ুকোষগুলো তাদের নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপ সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যেতে পারে। রক্ত কোষগুলোতে খাদ্য আর অক্সিজেন যোগায়, এটা নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে। মস্তিষ্ককোষে এই রক্ত সরবরাহের ঢালাও ব্যবস্থা। প্রতিটি কোষের চারদিকে কৈশিক রক্তবাহী শিরা। প্রতিটি কোষ যেন শিরা-উপশিরার জালে জড়ানো। মস্তিষ্কের রক্তবাহী শিরা-উপশিরা সব একসঙ্গে করলে কত লম্বা হবে জান? প্রায় ১০০ কিলোমিটার। মিনিটে এক লিটার করে রক্ত এর ভেতর দিয়ে সঞ্চারিত হচ্ছে। যে শিরাটি মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ করে তার মধ্যে রক্তের গতিবেগ অন্যান্য অংশে সরবরাহকারী শিরার গতিবেগের ১৫০ গুণ বেশি। কাজেই রসদভাণ্ডার না থাকলেও এরা খাদ্যাভাবে কষ্ট পায় না। রসদভাণ্ডার থাকলে কিন্তু এই কোষগুলো তাদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলত। প্রাণশক্তি ও কর্মক্ষমতা কমে যেত। মেল ট্রেন না হয়ে মালগাড়ি হয়ে যেত। এছাড়া তোমাকে আগেই বলেছি জাগ্রত অবস্থাতেও মস্তিষ্কের সব থেকে সক্রিয় অংশগুলো মাঝে মাঝে বিশ্রাম পায়। এক অংশ যখন উত্তেজিত তখন অন্যান্য অংশে নিস্তেজনা নেমে আসে।

কিন্তু তবুও এরাই একটানা খাটুনিতে সব থেকে আগে জখম হয়। বিশ্রাম এদের চাই-ই চাই। কেন্দ্রীয় স্নায়ুসংস্থা, বিশেষ করে মস্তিষ্ক বল্কলের কোষগুলোর ঘুমের প্রয়োজন সব থেকে বেশি।

এখন শোনো এই নিদ্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে দিকপালদের অভিমত। অবশ্য তা হলে তোমার আরামশয্যা থেকে উঠে বসতে হবে। রীতিমতো মনঃসংযোগ করতে হবে। আমি এখন যা বলতে যাচ্ছি তা বেশ খটমট।

শারীরবিদ্যার ছাত্রদের কাছে সাধারণত ঘুম সম্বন্ধে তিনটি বিভিন্ন তত্ত্ব প্রচলিত।

রক্ত-সঞ্চালনতত্ত্ব, রাসায়নিক তত্ত্ব, আর নিদ্রাকেন্দ্রিক তত্ত্ব। এ-সবগুলো মোটামুটি তোমার জানা আছে। তবে আসরে ফ্রয়েড-পাভলভকে আমদানী করতে হলে পূর্বসূরীদের সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলা দরকার।

ইটালীর এক পণ্ডিত রক্ত-সঞ্চালন তত্ত্বের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা। মস্তিষ্কে রক্ত-সঞ্চালনের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে ঘুম আসে—এই এঁর অভিমত। জার্মান বৈজ্ঞানিক আর্নেস্ট ওয়েবারের মত অবশ্য আলাদা। তাঁর মতে অন্ত্রে রক্ত-সঞ্চালনের আধিক্য ঘুম নিয়ে আসে, মস্তিষ্কে রক্ত-প্রবাহ কমে যাওয়ার জন্য নয়। এমনিও কণ্ঠের রক্ত-নালীতে চাপ দিলে মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে। আবার এও দেখা গেছে যে মস্তিষ্কে টিউমার হলে সেখানকার রক্তসঞ্চালন বাড়ে—এ অবস্থাতেও ঘুম বেশি হয়। এ কিন্তু স্বাভাবিক ঘুম নয়। অস্বাভাবিক একটা অবস্থা,—বলা যেতে পারে মূর্ছা। তবে হ্যাঁ, ঘুমের মধ্যে রক্তচাপ কমে যায়, আর মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চালনও হ্রাস পায়। তবে ঘুমের ফলে এ-অবস্থা ঘটে। এ-অবস্থার জন্য ঘুম আসে—একথা ঠিক নয়।

রাসায়নিক তত্ত্বের মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে জাগ্রত অবস্থায় বিপাক ক্রিয়া সঞ্জাত অনেক বিষাক্ত দ্রব্য জমা হয় মস্তিষ্কে, যাদের বলা হয় হিপনোটক্সিন। তার ফলে ঘুম আসে। লেগেন্দ্রে ও পিয়েরোঁ—ফরাসী দুই শারীরবৃত্তবিদ এই তত্ত্ব নিয়ে অনেক কাজ করেছেন।

কয়েকদিন জাগিয়ে রাখা কুকুরের রক্ত থেকে সেরাম ইনজেকশন দিলে সুস্থ কুকুরকে ঘুমিয়ে পড়তে দেখা যায়। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে এ তত্ত্বও খুব টেকসই নয়। প্রথমত, কুকুরকে জাগিয়ে রাখার জন্য তাকে দিয়ে কঠিন মেহনত করানো হয়েছে। ফলে তার রক্তে অস্বাভাবিক বিপাক ক্রিয়ার দরুন টক্সিন জমা আশ্চর্য নয়। স্বাভাবিক ঘুম কঠিন শ্রমজাত অবস্থা থেকে সব সময়ে আসে—এমন নয়। আবার ঘুম যদি টক্সিনের ফলে হবে, তবে হঠাৎ হবে কেন? ধীরে ধীরে টক্সিন জমে, সুতরাং ঘুমও ধীরে আসবে। তেমনি ঘুম থেকে জেগে ওঠাটাও হবে একটা ক্রমান্বয়িক প্রক্রিয়া। দুজন সোভিয়েত বিজ্ঞানী (আনোখিন ও আলেক্সেইভা) যুক্ত-যমজের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে টক্সিন-তত্ত্বের অযৌক্তিকতা দেখিয়ে দিয়েছেন। যুক্ত-যমজের মস্তিষ্ক দুটো, কিন্তু রক্তসঞ্চালনটা এজমালি। অর্থাৎ একই রক্ত দুজনের ধমনীতে প্রবাহিত হয়। একজনের রক্তে কোনো রাসায়নিক দ্রব্য ঢুকিয়ে দিলে আর একজনের রক্তে সেটা পাওয়া যায়। একজনকে বসন্তের টিকা দেওয়া হলে, অন্যটি তার ফল ভোগ করে। এদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র যে আলাদা সেটা তাদের অঙ্গসংস্থান থেকেই বোঝা যায়। মাথা দুটো, মেরুদণ্ডও দুটো। একজনের হাতে পিনের খোঁচা দিলে, অন্যজন হাত সরিয়ে নেবে না। চেষ্টা করে এদের ঘুমের সময়ের এদিক ওদিক করে দেখা

গেছে যে কিছুদিন পরে ঘুম আসার সময়, জাগার সময়, ঘুমের মাত্রা—সবই এদের দুজনের আলাদা রকম হচ্ছে। একজন যখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে, অন্যজন তখন দিব্যি তাকিয়ে রয়েছে। এই তথ্য রাসায়নিক তত্ত্বকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। যদি রক্তে হিপনোটক্সিন জমার জন্যে ঘুম আসতো তবে এই একরক্তবাহী যমজদের ঘুমের তারতম্য হতে পারতো না। অবশ্য একথা ঠিক যে অতি-পরিশ্রমে দেহের অন্যান্য স্থানের মত স্নায়ুসংস্থাতেও টক্সিনের মত জিনিস জমতে পারে। এবং এর ফলে সহজে নিদ্রাকর্ষণও হতে পারে। কিন্তু এই তত্ত্ব দিয়ে ঘুমের রীতিপ্রকৃতি বা ঘুমের সময়ে মস্তিষ্ককোষের ক্রিয়াকলাপের সঠিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।

এবার 'নিদ্রা-কেন্দ্র' তত্ত্বের কথা শোনো। শ্বাস-প্রশ্বাসের কেন্দ্র, রক্তসঞ্চালনের কেন্দ্র মস্তিষ্কে আছে আমরা জানি। ঘুম একটা অতি-প্রয়োজনীয় জৈবিক প্রক্রিয়া। সুতরাং তার জন্যে একটা আলাদা কেন্দ্র থাকবে না কেন? একদল শারীরবৃত্তবিদ এইভাবে তর্ক তুলে বলেন, ঘুমের জন্যও একটা আলাদা কেন্দ্র আছে এবং তার অবস্থান মস্তিষ্ক বল্কলের তলদেশে—বল্কল-নিম্ন অঞ্চল। অস্ট্রিয়ার গবেষক ইকোনোমো কয়েকটি এন্‌সেফালাইটিস রোগীর শবব্যবচ্ছেদ করে মস্তিষ্কের তলদেশে খানিকটা জায়গা রোগগ্রস্ত হয়েছে দেখতে পান। এই সব রোগীর প্রধান রোগলক্ষণ হল একটানা ঘুম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এরা ঘুমোতে থাকে। অনেক চেষ্টা করেও এদের জাগিয়ে রাখা যায় না। তিনি সহজেই ধারণা করেন, মস্তিষ্কের নিম্নদেশে অবস্থিত 'নিদ্রা-কেন্দ্র' ঐ রোগের ফলে প্রভাবিত হওয়ায় ঘুমের উদ্রেক। সুইটজারল্যাণ্ডের হেস্ জীবন্ত কুকুরের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে ইলেক্‌ট্রোড চালিয়ে তড়িৎ তরঙ্গ প্রয়োগ করে একটি আকর্ষণীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। দেখা গেছে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ যখন একটি বিশেষ স্থানে,—মস্তিষ্কের নিম্নদেশে (হাইপোথ্যালামাস) প্রবাহিত হয় তখনই কুকুর ঘুমিয়ে পড়ে। অন্য অংশের উত্তেজনায় ঘুম আসে না। এই স্থানটি 'নিদ্রাকেন্দ্র' বলে পরিচিত।

পাভলভ কিন্তু এই ব্যাখ্যাতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। পাভলভ তত্ত্ব পেশ করার সময় আমরা তাঁর মতামত নিয়ে আলোচনা করব এবং এই 'বল্কল-নিম্ন নিদ্রাকেন্দ্রে'র কথা আবার তুলব। এখন এইটুকু জেনে রাখো, 'নিদ্রা-কেন্দ্র' বলে কোনো বিশেষ কেন্দ্র মস্তিষ্কে নেই। তবে ঘুম মস্তিষ্ক-বল্কল থেকে যেমন নেমে আসতে পারে, তেমনি উঠে আসতে পারে নিম্নমস্তিষ্কের কোষগুলোর নিস্তেজনা থেকে। নিস্তেজনা কথাটি দিয়ে আমি 'ইনহিবিশন' (inhibition) বোঝাতে চেয়েছি। এই 'ইনহিবিশন' নিয়ে সবিস্তার লেখা আছে প্রথম পর্বে। পাভলভের তত্ত্ব বুঝতে হলে এই 'ইন্‌হিবিশন'কে ভাল করে বুঝতে হবে। যে সব তাত্ত্বিকদের উল্লেখ করলাম তাঁদের সবাই 'ঘুম কি' এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে, ঘুম কিভাবে আসে—এই সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত। তত্ত্বগুলি তাই একপেশে হয়ে পড়েছে। ঘুমের

গৌরচন্দ্রিকাতেই বোধ হয় তোমার ঘুম এসে গেছে। মস্তিষ্ক বল্কল, সূক্ষ্মজালতন্ত্র ও অন্যান্য জটিল নীরস বিষয়ের অবতারণা এখন করতে গেলে তোমার খুবই খারাপ লাগবে, তাই ভাবছি এবার কিছু খেয়াল কল্পনার কথা বলব। রসিয়ে বলার ক্ষমতা সকলের থাকে না। তবে আশা রাখি, তোমার রসিক মনের বদান্যতায় আমার নীরস বক্তব্যও সরস হয়ে উঠবে।

ঘুম সম্বন্ধে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব সত্যিই চিত্তাকর্ষক। আর ফ্রয়েডের কোন্ তত্ত্বই বা নয়? আদিম প্রথম রিপুর রসসিঞ্চিত ফ্রয়েড-তত্ত্বের পাঠকসংখ্যা তাই অগণিত। ঘুমোতে যাওয়ার আগে আমরা সব গাত্রাবরণ খুলে ফেলি। খুলে ফেলি চশমা, বাঁধান দাঁত, আর ঐ ধরনের সব যা দিয়ে দৈহিক ত্রুটি ঢেকে রাখি। এইভাবে দেহকে নিরাভরণ, নিরাবরণ করি। এ ছাড়া মনের আবরণও নামিয়ে রাখি ঘুমোবার আগে।

> "In addition to this, when they go to sleep they perform a perfectly analogous dismantling of their minds—they lay aside most of their mental acquisitions ; thus both physically and mentally approaching remarkably close to the situation in which they began life."

দেহের দিক থেকে ঘুম একধরনের পিছু-হটা। ভূমিষ্ঠপূর্ব ভ্রূণাবস্থায় ফিরে যাওয়া। ঘুমোনোর সময় হাঁটু-দুটো গুটিয়ে থুতনির কাছ বরাবর আন কি? তুমি না আনলেও—অনেকে আনে। জরায়ুর ভেতরে যে নিশ্চিত নিরাপত্তা, নিদ্রিত মানুষের অঙ্গভঙ্গিতে তারই আভাস ফুটে ওঠে। ফ্রয়েডীয় পরিভাষায় এই অবস্থাকে বলা হয় regression। শুধু দেহ নয়, মনের দিক থেকেও ঘটে রিগ্রেশন - সেই আদিম অলীক বিশ্বাসের যুগে ফিরে যাওয়া; বাইরের জগৎ থেকে চিত্তকে পুরোপুরি নিবৃত্ত করে এনে আত্মকেন্দ্রিক হওয়া। ঘুমন্ত অবস্থায় আমরা নাকি নার্সিসাসের মত আত্মরতির আনন্দে বিভোর হয়ে থাকি। ফ্রয়েডের মতে এই নার্সিসিজ্‌ম বা স্বকামপর্ব প্রতিটি মানুষকেই অতিক্রম করতে হয়। অতি-প্রাথমিক যৌনস্তর এই স্বকামপর্বকে পেরিয়ে শৈশবের সমকাম (homo-sexual) স্তরকে উতরিয়ে আমরা ভিন্নকামী (hetero-sexual) অবস্থায় পৌছুই। প্রতি রাত্রে ঘুমের মধ্যে আমরা এই স্বকামপর্ব শৈশবে ফিরে যাই। 'অহং'কে প্রশ্রয় দিই নিদ্রিতাবস্থায়। পারিবারিক ও সামাজিক দায় থেকে মুক্তি পেতে চাই আমরা সবাই, আত্মপ্রেমে মশগুল হয়ে থাকতে চাওয়া আমাদের অবচেতন মনের কামনা,—তাই প্রতিরাত্রে পিছু হটে কয়েক ঘণ্টার জন্যে 'নার্সিসিজ্‌ম পর্ব' উপভোগ করি। অনেকে, বিশেষ করে তোমার মত আধুনিকারা, এমনিতেই অহংবাদী। তোমরা ফ্রয়েডের মতে এই নার্সিসিজ্‌মপর্ব

কাটাতে পারোনি। থেকে থেকে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ছোট আয়না বের করে মুখ দেখ কি তুমি? —নিজের প্রশংসা শুনে উল্লাস হয় কি তোমার? —নিশ্চয়ই তুমি 'নার্সিসাস কমপ্লেক্সে' ভুগছ—ফ্রয়েড বলবেন। কি করে জানলেন ফ্রয়েড।

"It is of course the study of dreams; which has taught us what we know of the mental characteristics of sleep"

—এই হল ফ্রয়েডের উত্তর। স্বপ্নে উত্তম পুরুষই নায়ক। স্বপ্নবৃত্তান্ত ফ্রয়েডীয়ান বিশ্লেষণের ফলে শেষ পর্যন্ত যৌনধর্মী। ঘুম মাত্রেই রিগ্রেশন, স্বকাম পর্বে ফিরে যাওয়া!

এবার আর খুব নীরস লাগছে না বোধ হয়।

ফ্রয়েডের মতে ঘুমের মাধ্যমে আমরা অলীক বিশ্বাসের যুগে ফিরে যেতে চাই! 'অলীক বিশ্বাসে'র যুগ বলছি এই জন্য যে ফ্রয়েড বর্ণিত এই আদিম যুগের অস্তিত্ব—আধুনিক কোনো নৃতাত্ত্বিক লোকতাত্ত্বিক স্বীকার করেন না। ফ্রয়েডও জানতেন যে রবার্টসন স্মিথের অনুমান বিজ্ঞানগ্রাহ্য নয়। কী এই অনুমান? কোন্ যুগের কথা ফ্রয়েড বলছেন? অনেক, অনেকদিন আগে প্রাগৈতিহাসিক মানুষ তখন নির্মম অত্যাচারী দলপতির কঠোর শাসনে দিন কাটাত। গোষ্ঠী গড়ে ওঠে নি, টোটেম (totem) চালু হয়নি, ট্যাবুর (taboo) বালাই নেই। দলের সমস্ত মেয়েদের একমাত্র ভোগস্বত্বাধিকারী দলপতি বা পিতা। ছেলেদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা দল থেকে বিতাড়িত হত; পাছে পিতার ভোগদখলে বাধা সৃষ্টি করে। মানবমন এসময় পশুমনের মতই অসংগঠিত। মানে, সংজ্ঞান তখনো নির্জ্ঞান থেকে আলাদা হয়ে যায়নি। ফ্রয়েডীয় ইগো-সুপারইগোর আভাস নেই। মনের মধ্যে কর্তব্য-অকর্তব্য, উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায় নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। আদর্শ বলে কোনো কথাই তৈরী হয়নি। প্রবৃত্তি আর অন্ধ আবেগকে বাধা দেবার বা অবদমনের কোন অন্তর্মানসিক বিধিব্যবস্থাই নেই। প্রবৃত্তি আর আবেগকে বশীভূত করতে পারে একমাত্র দলপতির শাসন। মন অখণ্ড, অবিভক্ত—জড় জগতের সঙ্গে একাত্ম। মানসিক দ্বন্দ্বসংঘর্ষ অজানা। যা কিছু দ্বন্দ্ব বাইরের। সংঘর্ষ লড়াই নিজেদের মধ্যে অথবা পশুর সঙ্গে। অন্তর্দ্বন্দ্বহীন এই যুগকে ফ্রয়েড অলীক বিশ্বাসের যুগ বলেছেন। এর পরই পিতৃনিধন পর্ব। অপরাধমন্যতা ও টোটেম-ট্যাবুর আবির্ভাব। মানব-মনের উন্মেষ। সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলেই ফেলি, না হলে 'অলীক বিশ্বাসের' যুগ সম্পর্কে তোমার ধারণাটা ঝাপসা থেকে যাবে। ভারী মজার গল্প। ঐ সব খেদিয়ে দেওয়া ছেলের দল একদিন দল বেঁধে ফিরে এল। দলপতি পিতাকে হত্যা করে অত্যাচারের প্রতিশোধ নিল। শুধু তাই নয়, তার মাংস দিয়ে করল বিরাট ভোজের ব্যবস্থা।

ফলে, প্রথম পাপবোধের সঞ্চার ঘটলো মানবমনে। ইদ আর ইগোর মধ্যে প্রথম পাঁচিল এই আদিম পাপবোধ। এই পাপবোধই জন্ম দিল সেন্সর সুপার ইগোর। ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য ইত্যাদির বিচার শুরু হোলো মানুষের মনে। 'অবদমন' এখন থেকে হয়ে উঠল প্রচণ্ড শক্তিশালী মননক্রিয়া। তুমি ভাবছ, আমি বানিয়ে বলছি? ফ্রয়েডের কোটেশনই তুলে দিচ্ছি। তাহলে বিশ্বাস হবে নিশ্চয়ই।

"They hated the father who stood so powerfully in the way of their sexual demands .. After they had satisfied their hate by his removal and had carried out their wish for identification (by devouring him)...a sense of guilt was formed. (Freud, Basic Writings, New York, 1938 pp 916-17)".

'ধান ভানতে শিবের গীত' নয়। ফ্রয়েডীয় মতে ঘুমের ইতিবৃত্ত বোঝাতে গিয়ে ইতিকথা, পুরাতত্ব আসবেই। কেননা ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ব পুরাতত্ব-আশ্রিত। কিছু পরে আসবে পাভলভীয় শারীরবৃত্ত—যা আবার পাভলভীয় মনস্তত্বের অধঃস্তর।

প্রসঙ্গত বলা উচিত, ফ্রয়েড মনে করতেন মানবসভ্যতার বিকাশ মানে আদিম সহজাত প্রবৃত্তির অবদমন। লোকগাথা, ইতিকথা—এর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস, একথা ফ্রয়েড মানতেন। তবে এ সবকিছুরই ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ফ্রয়েড শুধু প্রথম রিপুর সূত্র খুঁজেছেন। অন্য কোনো দিক তাঁর নজরে পড়েনি। প্রমেথিউসের গল্পের ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা শুনেছ কি? আগুনের লেলিহান শিখা ফ্রয়েডের মতে লিঙ্গের প্রতীক। আদিম সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ প্রথমে চেয়েছিল,

..."to gratify an infantile pleasure in respect of it and put it out with a stream of urine...the flames shooting upwards, like tongues, were originally felt to have a phallic sense. Putting out the fire by urinating therefore represented a sexual act with a man, an enjoyment of masculine potency in homo-sexual rivalry".

এই সমকামী ঈর্ষাপ্রবৃত্তি অবদমন করে প্রমেথিউস অগ্নিকে পোষ মানালেন। প্রাকৃতিক শক্তিকে বশীভূত করে সভ্যতার গোড়াপত্তন করলেন।

"By curbing the fire of his own sexual passion he was able to tame fire as a force of nature. This great

cultural victory was thus a reward for refraining from gratification of an instinct''.

কিন্তু এই অবদমনের জন্য তাঁকে বিশেষ মূল্য দিতে হল। পাহাড়ের সঙ্গে লোহার শিকল বাঁধা প্রমেথিউসের দেহ থেকে তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে মাংস ছিঁড়ে ক্ষুন্নি-বৃত্তি করলো শকুনি-গৃধিনীর দল। 'ইদের' প্রতিহিংসা কি ভীষণ! কাম রিপুর অবদমনের ফলে সভ্যতা; সভ্যতার ফলে ব্যক্তিমানসের দুর্দশা—এই হচ্ছে ফ্রয়েডীয় প্রতিপাদন।

'অলীক বিশ্বাসের যুগে' ফিরে যেতে চাই আমরা ঘুমের মাধ্যমে,—এই কথার তাৎপর্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ—এখন বোধহয় সেটা বুঝতে পারছ। ঘুমের মধ্যে আমরা বাইরের জগৎ থেকে সরে এসে ফেলে আসা সেই স্বর্ণযুগে ফিরে যেতে চাই। অবদমনপূর্ব এই স্বর্ণযুগে সুপার ইগোর অনুশাসন নেই, ইদ-ইগোর দ্বন্দ্ব নেই, অপরাধবোধের জ্বালা নেই। ঘুমের মধ্যে খণ্ডিত সত্তার সঙ্গে পুনর্মিলিত হই। এই যুগে প্রবৃত্তির অবাধ স্বাধীনতা। অবদমিত কামনা-বাসনা নোঙর-ছেঁড়া নৌকার মত যথেচ্ছ ভেসে চলেছে। সেন্সরের কড়া পাহারা আর নেই, তাই তারা নির্জ্ঞান থেকে সংজ্ঞানে আসবার প্রয়াস পাচ্ছে। কিন্তু এতে ঘুমের বিঘ্ন ঘটতে পারে। তাই মানসিক জগতে গড়ে উঠেছে এক সুন্দর অথচ সুদৃঢ় প্রতিরোধ ব্যবস্থা। ব্যবস্থাটা কী জান? স্বপ্ন দেখা! এই ব্যবস্থার দৌলতে আদিম বাসনা-কামনার পরিতৃপ্তি ঘটে, আবার ঘুমও ভাঙ্গে না। অবচেতন মনের অলীক অভিলাষ পূরণের জন্য, অন্য কথায়, স্বপ্ন দেখার জন্যই যেন আমরা ঘুমোই। —এই হল সংক্ষেপে ঘুম সম্পর্কে ফ্রয়েড-লিখিত সমাচার। 'স্বপ্নবৃত্তান্ত কথা অমৃত সমান।' তবে এখন মুলতুবি থাকবে স্বপ্ন আলোচনা। ঘুমের কথা এখনও শেষ হয়নি।

তিন

ঘুম সম্বন্ধে পাভলভের ব্যাখ্যা বিশেষভাবেই লিখব। তোমরা তো আমাকে পাভলভের প্রতি পক্ষপাতিত্ব-দোষে দোষী করে রেখেছই। আমি সেজন্য লজ্জিত নই।

রিফ্লেক্স, মানে পরাবর্ত থেকেই সুরু করব। অনেকবার এ নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে, কিন্তু আমার মনে হয়েছে আমি তোমাকে ঠিকমত বোঝাতে পারিনি, কিম্বা তুমি ঠিকমত বুঝতে পারোনি। ও দুইই এক। আলোচনার সময় হাই তুলেছ, ঘড়ি দেখেছ, খোঁপা ঠিক আছে কি না পরখ করেছ। এবার মন দিয়ে পড়, খুব দুর্বোধ্য লাগবে না।

স্নায়ুতন্ত্রের প্রাথমিক ক্রিয়া হল এই রিফ্লেক্স। বাইরের উদ্দীপক স্নায়ুতন্ত্রে যে সাড়া জাগায় তারই নাম রিফ্লেক্স। পাভলভের অনেক আগেই রিফ্লেক্স কথাটা চালু ছিল। রিফ্লেক্স হচ্ছে সহজাত আদিম অতিসরল জৈবক্রিয়া, যাকে simple instinctive activity বলা হয়। তোমার চোখের সামনে যদি হঠাৎ হাজার ওয়াটের আলো জ্বলে ওঠে তোমার চোখের পাতা আপনা থেকে বন্ধ হয়ে যাবে। কুকুরের মুখে যদি খাদ্য দেওয়া হয়, তার লালা ঝরতে থাকবে। তরল অ্যাসিড মুখে পড়লেও লালা বেরুবে। এ সবগুলোই রিফ্লেক্স ক্রিয়ার নিদর্শন। পাভলভের মতে রিফ্লেক্স হচ্ছে—

> "The mechanism of definite connection by means of the nervous system between certain phenomena of the external world and the corresponding definite reactions of the organism".

বহির্বাস্তবের ঘটনাবিশেষের সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সংযোজন ব্যবস্থার ফলে জীবদেহের নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়াকে রিফ্লেক্স বলা হয়। 'নির্দিষ্ট' কথাটি বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়। কোনো বিশেষ উদ্দীপক যতবারই প্রয়োগ করা হোক না কেন, নির্দিষ্ট স্নায়ু-সংযোজনের ফলে এক বিশেষ নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে।

কী ভাবে এই শারীরক্রিয়া সংঘটিত হয়? বাইরের উদ্দীপক প্রথমে স্নায়ু-বিশেষকে উত্তেজিত করে স্নায়ুপ্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়। তারপর এই উত্তেজনা কেন্দ্রাভিগামী (**centripetal**) নার্ভ মাধ্যমে স্নায়ুতন্ত্রে গিয়ে পৌঁছয়। সেখান থেকে কেন্দ্রাভিগ (**centrifugal**) নার্ভ বেয়ে উত্তেজনা কোনো একটি পেশী, গণ্ড বা দেহযন্ত্রে গিয়ে সাড়া জাগায়। এই প্রতিক্রিয়া স্থায়ী ও সুনির্দিষ্ট। একই জাতীয় প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে একটি বিশেষ উদ্দীপক প্রতিবারই একই ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটায়।

পাভলভীয় পরিভাষায় এই রিফ্লেক্সের নাম আনকণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স বা শর্তহীন পরাবর্ত। এই ক্রিয়ার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন নেই। এই ক্রিয়ার কেন্দ্রস্থল নিম্নমস্তিষ্ক।

এবার কণ্ডিশন্ড রিফ্লেক্সের আলোচনায় আসা যাক্। কুকুরকে খাবার দিলে তার লালা পড়বে—এটা জানা আছে। প্রতিবারে খাবার দেবার ঠিক আগে একটা আলো জ্বালা হচ্ছে। কয়েকবার আলো জ্বালা আর খাবার দেওয়া এক সঙ্গে ঘটল। পরে দেখা যাবে শুধু আলো জ্বালালেই কুকুরটির লালা ঝরতে থাকবে ও সে আলোর দিকে যাবার চেষ্টা করবে। এর আগে কিন্তু আলো জ্বাললে কুকুরটির উপর কোনো প্রতিক্রিয়াই হচ্ছিল না। আর অন্য কুকুরের উপরও এ-আলোর কোনো প্রভাব পড়বে না। এই আলোটিকে বলা হয়

শর্তাধীন উদ্দীপক (কণ্ডিশন্‌ড্‌ স্টিমুলাস), আর কুকুরের উপর তার প্রতিক্রিয়াকে বলা হয় শর্তাধীন পরাবর্ত। কণ্ডিশন্‌ড্‌ রিফ্লেক্স নিয়ে জীব জন্মায় না। বাইরের পরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে গিয়ে আয়ত্ত করে। আলোর রশ্মি উচ্চ-মস্তিষ্কের দর্শনকেন্দ্রে যে উদ্দীপনা জাগায়, সেই উদ্দীপনার সঙ্গে সহজাত জৈবক্রিয়ার দরুন (খাদ্য মুখে পড়লে লালা নিঃসরণ) নিম্নমস্তিষ্কের উদ্দীপনার যোগাযোগ ঘটার ফলে পরবর্তীকালে শুধু আলোই খাদ্য রিফ্লেক্স জাগিয়ে তোলে। এইভাবে মানবশিশু জন্মের পর থেকেই বহির্বাস্তবের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে নতুন গুণ আয়ত্তে এনে পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে শেখে। কণ্ডিশন্‌ড্‌ রিফ্লেক্স তৈরী হয় শুধু উচ্চমস্তিষ্কে। আনকণ্ডিশন্‌ড্‌ রিফ্লেক্স প্রজাতিগত বৈশিষ্ট্য আর কণ্ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য। মনে রেখো, জটিলতার মধ্যে না গিয়ে সহজভাবে প্রাথমিক জ্ঞান পরিবেশন করে তোমার কৌতূহল জাগাতে চেষ্টা করছি। তুমি বিশদ ও বিস্তারিত ভাবে ব্যাপারটাকে জানতে আগ্রহী হও, এই আমার উদ্দেশ্য।

তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ, ঘুমের কথা বলতে গিয়ে আদিকাণ্ড থেকে শুরু করলাম কেন? ঘুম, পাভলভের মতে সর্বাত্মক নিস্তেজনা বা ইনহিবিশন। এই 'ইনহিবিশন' বুঝতে হলে কণ্ডিশন্‌ড্‌ রিফ্লেক্স সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান থাকা দরকার। পাভলভ ছিলেন হাতে-কলমে কাজ করা বৈজ্ঞানিক। নিজস্ব কোনো ধারণার মধ্যে তথ্যগুলোকে ঢুকিয়ে দিয়ে মনগড়া কোনো তত্ত্ব খাড়া করার চেষ্টা করেননি কোনো দিন। এই রিফ্লেক্স নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলেই নিস্তেজনা ও পরে ঘুম সম্পর্কিত ধারণাগুলো তাঁর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর নিজের কথাতেই বলি—"শর্তাধীন পরাবর্ত সম্পর্কিত গবেষণাকালে আমাদের প্রায়ই নিদ্রাবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। এই পরিস্থিতি যেহেতু আমাদের পরীক্ষাকার্যকে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া এবং স্বাভাবিক পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া বহুলাংশে জটিল করিয়া তুলিতেছিল, সেইহেতু স্বভাবতই আমরা সে বিষয়ে (ঘুমের) বিশেষ মনোযোগ দিতে বাধ্য হই। ...জন্তুটিকে একটি বিচ্ছিন্ন কক্ষে আবদ্ধ করিয়া পরীক্ষামঞ্চে রাখিয়া দিলে, সে ধীরে ধীরে তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পড়ে ও পরে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়। ...পূর্বে, সাধারণভাবে কুকুরকে মঞ্চে রাখিবার সঙ্গে সঙ্গেই পরীক্ষা শুরু হইত—কুকুরটিকে বিশেষ শর্তাধীন উদ্দীপকের ক্রিয়াধীন করা হইত এবং শর্তহীন উদ্দীপকরূপে দেওয়া হইত খাদ্য। এই অবস্থাগুলি ঘুমন্ত অবস্থা সৃষ্টি করিত না। কিন্তু এখন কতকগুলি আনুষঙ্গিক অবস্থার কারণে কুকুরটিকে পূর্বের তুলনায় দীর্ঘতর সময়ের জন্য পরীক্ষা আরম্ভ হইবার অপেক্ষায় মঞ্চে রাখিয়া দেওয়া হইত। নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ক্রিয়াশীল এই একঘেয়ে পরিবেশই ক্রমশ ঘুমন্ত অবস্থা সৃষ্টির হেতু। ...যেহেতু নিদ্রাবস্থা সৃষ্টি সম্পর্কিত বিশদ তথ্যাদি আমাদের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ

ছিল, তাই আমরা এই প্রশ্নটি লইয়া পরম অধ্যাবসায়ের সহিত পরীক্ষা করিবার সিদ্ধান্ত করি।" (পাভলভ)

এর আগেও পাভলভ লক্ষ্য করেছিলেন যে কয়েকবার আলো দেখিয়ে (শর্তাধীন উদ্দীপক) যদি খাদ্য (শর্তহীন উদ্দীপক) দেওয়া না হয়, লালাঝরা থেমে যায়। আরও দেখেছিলেন যে শর্তাধীন পরাবর্ত চলাকালীন (আলোর উদ্দীপনায় লালা-নিঃসরণ) যদি সহসা নতুন কোনো লোক ঘরে আসে বা খুব জোরে কেউ দরজা বন্ধ করে, তা হলেও লালা-নিঃসরণ থেমে যায়; কুকুর মুখ তুলে লোকটিকে দেখে বা শব্দটির দিকে তাকায়। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে নিস্তেজনা ও ঘুম সম্পর্কিত গবেষণার সূত্রপাত।

সেচেনফ্ অবশ্য আগেই অনুমান করেছিলেন মস্তিষ্ককোষের দুই বিপরীত-ধর্মী গুণের অস্তিত্ব। আলো বা ঘণ্টা বা খাদ্য স্নায়ুকোষকে উত্তেজিত করছে, লালা পড়ছে। লালা পড়া থেমে যাওয়া মানে উত্তেজনার নিরসন নয়। একে শুধু নঙর্থক ক্রিয়া মনে করলে ভুল করবে। আর একটি প্রক্রিয়া—উত্তেজনার সম্পূর্ণ বিপরীত যার ধর্ম—শুরু হয়েছে। এর নাম নিস্তেজনা—ইনহিবিশন।*

উত্তেজনা স্নায়ুকেন্দ্র ও অধীনস্থ যন্ত্রপাতিকে ক্রিয়াশীল রাখে আর নিস্তেজনা প্রয়োজনমত এই ক্রিয়াশীলতা কমিয়ে বা থামিয়ে দেয়।

নিস্তেজনাধর্ম না থাকলে নিরবচ্ছিন্ন ও সুসমন্বিতভাবে কাজ করে যাওয়া সম্ভব হোতো না স্নায়ুকোষের পক্ষে। কোটি কোটি বছরের বিবর্তন অভিযোজনের ফলে স্নায়ুকোষে এই দুই বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়েছে। উত্তেজনা ও নিস্তেজনা স্নায়ুতন্ত্রের স্বভাবধর্ম।

ঘুমের শারীরবৃত্ত বুঝতে হলে নিস্তেজনা সম্পর্কিত আরো কিছু আলোচনা দরকার। কৌতূহলী মনকে আলোচনায় শেষ পর্যন্ত নিবিষ্ট রাখো। যতই বিরস হোক না কেন—লাইনগুলো বাদ দিয়ে যেও না। তা হলে যা জানতে চেয়েছো সেই সম্মোহন রহস্য চিররহস্যময়ই থেকে যাবে।

প্রধানত নিস্তেজনাকে দুভাগে ভাগ করেছেন পাভলভ—শর্তহীন বা বহিরাগত; শর্তাধীন বা অন্তর্জাত।

আগেই বলেছি, পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় সহসা যদি প্রাণীর পরিবেশে আকস্মিক কোনো পরিবর্তন ঘটে, শর্তাধীন রিফ্লেক্স সাময়িকভাবে থেমে যায়। কুকুর খাচ্ছে, তার লালা ঝরছে, সাইরেন বাজলো। কুকুর চমকে উঠবে। তার

* "Our whole life" says Pavlov "is a continuous interaction of these two processes these processes are inseparable, they are always present not only in the nerve cell but in each nerve fibre".

লালা নিঃসরণ থেমে গেছে, সে শব্দের উৎস সন্ধান অনুসরণ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। মস্তিষ্কের অন্যস্থান উত্তেজিত হয়ে উঠেছে আর একটি শর্তহীন পরাবর্তের প্রভাবে। অনুসন্ধান বা ইনভেস্টিগেশন রিফ্লেক্সের জন্য এই উত্তেজনা। এটি শর্তহীন বা আনকণ্ডিশন্‌ড্‌ রিফ্লেক্স এবং কাজে কাজেই প্রজাতির জন্মগত ও স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। মস্তিষ্কের স্বভাবধর্মানুযায়ী একস্থানের উত্তেজনার দরুন অন্যস্থানে ঘটেছে নিস্তেজনার উদ্ভব। একে বলা হয় নেগেটিভ কন্‌ডাকশন বা নঙর্থক আবেশন। এই নিস্তেজনা শর্তহীন বা বহিরাগত শ্রেণীতে পড়ে।

শর্তাধীন বা অন্তর্জাত নিস্তেজনার উদাহরণও আগে দিয়েছি। এই নিস্তেজনা উত্তেজনাকেন্দ্রেই সরাসরি উদ্ভূত হয়। শর্তাধীন উদ্দীপককে যদি নিয়মিত শর্তহীন উদ্দীপক দিয়ে সক্রিয় রাখা না হয় অথবা শর্তহীনের মাত্রা যদি কমিয়ে দেওয়া হয় তবেই এই শর্তাধীন নিস্তেজনার উন্মেষ ঘটবে। আলো দেখিয়ে যাচ্ছি অথচ খাবার দিচ্ছি না; কয়েকবার এমনি হলে লালার পরিমাণ কমতে কমতে একেবারে শূন্যের কোঠায় এসে ঠেকবে। যে আলোক উদ্দীপক উত্তেজনা আনছিল, সেই এখন নিস্তেজনা আনছে। শর্তহীন উদ্দীপক প্রয়োগ না করে শর্তাধীন উদ্দীপক প্রয়োগ করে চললে নিস্তেজনা দীর্ঘস্থায়ী হবে।

নিস্তেজনা মানে উত্তেজনার অভাব বা অনুপস্থিতি মাত্র নয়। প্রাণীর কাছে শর্তহীন উদ্দীপকটি অর্থহীন নিষ্ক্রিয় ভাবলে ভুল হবে। এ-নিয়ে দস্তুরমত পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে।

কুকুরটির আর একটি খাদ্য-রিফ্লেক্স তৈরী করা হল ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে। এই ঘণ্টাধ্বনি রিফ্লেক্সে ৫০ ফোঁটা লালা ঝরছে। এখন এর সঙ্গে আলোর উদ্দীপকটি যোগ কর। ঘণ্টা বাজিয়ে আলো দেখাও; রিফ্লেক্সের ক্রিয়ার মাত্রা অনেকখানি কমে গেছে দেখতে পাবে। ৫০ এর জায়গায় মাত্র ২০ ফোঁটা লালা পড়ছে। নিস্তেজনা একটি সক্রিয় ধর্ম। নঙর্থক ভূমিকার জন্য একে নঙর্থক উদ্দীপক বলা চলে।

"মস্তিষ্কের সদর্থক (উত্তেজনাধর্মী) ও নঙর্থক (নিস্তেজনাধর্মী) এই দুই ধরনের স্নায়ুপ্রক্রিয়ার অস্তিত্ব বিশ্বপ্রকৃতির সব কিছুতেই যে মৌলিক দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য বিদ্যমান তারই নিদর্শন।" আসলে একই প্রক্রিয়ার দুই ব্যঞ্জনা—এই নিস্তেজনা আর উত্তেজনা। দুয়ে মিলে সামগ্রিক স্নায়ুপ্রক্রিয়ার আসল রূপ।

নিস্তেজনা ছাড়া বাইরের জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে সমন্বয় সম্ভব হতো না। অযথা শক্তির অপব্যয় ঘটতো। ঘণ্টা বাজানোর সঙ্গে কণ্ডিশন্‌ড্‌ করা হয়েছে; অথচ খাবার দেওয়া হচ্ছে না। নিস্তেজনাপ্রক্রিয়া না থাকলে অকারণে লালা পড়তেই থাকতো। কোনো এক বিশেষ অবস্থায় একটা অভ্যাস তৈরী হলে, সে অভ্যাস আর ছাড়া যেত না। কি বিশ্রী অবস্থা ভাব দেখি! জীবনধারণ,

প্রজাতিসংরক্ষণ ও আত্মরক্ষামূলক শর্তহীন পরাবর্তকে কেন্দ্র করে একবার যেসব শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে উঠতো তারা একেবারে পরশুরামের কুঠারের মতই চিরস্থায়ী হয়ে সত্তার সঙ্গে লেগে থাকতো। খুবই মুস্কিল হতো না কি ?

এখন তুমি সেই বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে দূরের পাহাড়টির দিকে তাকিয়ে আছ। হাতে একখানা বই—কোনানডয়েল। ঘরের রেডিওতে রবীন্দ্রসঙ্গীত বেজে চলেছে। বাগান থেকে নাকে আসছে সত্যফোটা যুঁইফুলের গন্ধ। চড়াই পাখীর কিচির মিচির, কাকের কা-কা ছাড়াও অনেক রকমের শব্দ আশেপাশে। ঠাকুর পেঁয়াজ ভাজছে—কটু গন্ধ থেকে বুঝলে। পাহাড়টার মাথার উপর দিয়ে একটা এরোপ্লেন উড়ে যাচ্ছে। পিওনকে ঢুকতে দেখলে গেটের মধ্যে। তূমি সচকিত হয়ে উঠে চটিতে পা লাগিয়ে, দ্রুত পদসঞ্চারে সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে চললে পিওনের দিকে। একখানা বিশেষ চিঠি তুমি আশা করছ। (মনোবিদের চিঠি নয়, বলাই বাহুল্য !) পিওনটি এখানে তোমার কাছে সব থেকে জোরালো উদ্দীপক। কোনানডয়েল, রবীন্দ্রসঙ্গীত, ফুলের গন্ধ, দো-পেঁয়াজির আস্বাদ সম্ভাবনা—ছোটবড় মাঝারি নানা রকমের উত্তেজনা আবর্ত তুলে চলেছিল তোমার মস্তিষ্ককোষে। অবশ্য রবীন্দ্রসঙ্গীতের দরুন উত্তেজনা-আবর্তটি সব থেকে জোরালো উত্তেজনা-আবর্ত। ঠিক কি রকমের জান ? শান্ত পুকুরে টুপ করে একটা ঢিল ফেলে দেখেছ কখনো ? কেন্দ্রাভিগ আবর্তের সৃষ্টি হয়। মস্তিষ্কের উত্তেজনা-আবর্ত অনেকটা ঐরকম, যে ইন্দ্রিয় মারফত উদ্দীপক মস্তিষ্কে পৌছয় সেই ইন্দ্রিয় সন্নিবেশকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট ঢেউ-এর মত ছড়িয়ে পড়তে থাকে উত্তেজনা, অন্য জায়গার থেকে ওঠা ঢেউ-এর সঙ্গে এদের বাধে সংঘর্ষ। এইভাবে ঢেউ-এর ভাঙ্গাগড়া খেলা চলে।

একস্থানের উত্তেজনা পাশের কেন্দ্রে নিস্তেজনা নিয়ে আসে। তুমি যতক্ষণ বসেছিলে, ঐ রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া আর কোনো উদ্দীপকই বেশী জোরালো সাড়া জাগায়নি। কাজেই তারা শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করছিল। পিওনের প্রবেশ তোমার কাছে একটা বিশেষ ঘটনা। তোমার মস্তিষ্ককে বিশেষভাবে উত্তেজিত করল। অন্য উত্তেজনাগুলো সাময়িকভাবে অন্তর্হিত হল। সে সব জায়গায় নিস্তেজনা নেমে এল—শর্তহীন বা বহিরাগত উত্তেজনার ফলে। পুরোপুরি বিজ্ঞান-সম্মত না হলেও উদাহরণটা ভালই। তোমাকে নিয়ে কিছু বলা হল ; কাজেই তোমার মনে থাকবে।

ভাবা যাক, ঐ খাকী পোষাক পরা পিওনের ব্যাগে রোজ তোমার নামে থাকে একখানি সুদৃশ্য খামে ভরা রহস্যময় লিপি। সাগরপার থেকে একটি লোক রোজ নানা ছন্দে নানা সুরে লিখে জানাচ্ছে—'ভালবাসি, ভালবাসি'। কথাটি

পুরণো হলেও মাদকতা তার অসীম। বক্তব্য অতি স্পষ্ট –তবু তোমার কাছে তাতেই অপার রহস্য। কোনো পুরুষ যেন কোনোদিন কোনো নারীকে ঐ দুটি কথা বলেনি! অন্তত অত সুন্দরভাবে বলেনি! দেশী বিদেশী কবিতার কোটেশন যেন আর কোনো প্রেমিক তার প্রেমিকাকে পাঠায়নি! সাড়ে নটা নাগাদ পিওনের ইপ্সিত মূর্তি পথের বাঁকে দেখা যায়। তখনই তোমার বুকের রক্ত নেচে ওঠে। বিশ্বসংসারের আর সবকিছু মুছে যায়। লালা-নিঃসরণ মাপবার একটা বন্দোবস্ত করেছিলেন পাভলভ। খাদ্য সন্দর্শনে কুকুরের উত্তেজনার পরিমাপটা তাই আমরা সংখ্যাসূচিত করতে পারি। তোমার উত্তেজনা মাপবার যন্ত্র এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। তবুও অনুমান করতে পারি মস্তিষ্কের বিশেষ কেন্দ্র থেকে উত্তেজনা-প্রবাহ ছড়িয়ে পড়েছে। প্রেম-হর্মোন বলে যদি কিছু থাকে তবে তার নিঃসরিত রস হচ্ছে প্রেম-হর্ষরস। নেগেটিভ ইন্‌ডাকশনের দরুন অন্য সব কেন্দ্রে নিস্তেজনা নেমে এসেছে। তিন মাস ধরে ঐ চিঠি পেয়ে আসছ। প্রেম এখানে আন-কণ্ডিশন্‌ড্‌ উদ্দীপক, প্রেমপত্রবাহক পিওন কণ্ডিশন্‌ড্‌ উদ্দীপক, আর তোমার হর্ষ-রস নিঃসরণ এখানে কণ্ডিশন্‌ড্‌ রিফ্লেক্স। কিছু মনে কোরো না ; এবার অকরুণ দৃশ্যের অবতারণা করছি। যে কোনো কারণে পত্র আসা বন্ধ হল। লিপিকার নীরব। একদিন, দুদিন,...... পনেরো দিন ধরে তুমি গেটের কাছে পাকড়াও করে অনেক জেরা করলে। তবুও সুদৃশ্য খামে ভরা রহস্যময় চিঠি সে দিতে পারল না। পিওনস-ন্দর্শনে হর্ষরস নিঃসরণের মাত্রা কমে আসতে লাগল। সে আবেগ, সে চাঞ্চল্য, সে ছুটে যাওয়া আর নেই। আরো কিছুদিন পরে দেখা যাবে, পথের বাঁকে পিওনের আবির্ভাবের সময় তুমি বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে থাকলেও দৃষ্টি তোমার কোনানডয়েলের পাতায় নিবদ্ধ। তোমার দেহে-মনে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। অর্থাৎ হর্ষরস শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। পিওনের দিকে নজর পড়লেও তুমি তাকে দেখতেই পাচ্ছ না। কণ্ডিশন্‌ড্‌ রিফ্লেক্স আপন নিয়মে ভেঙে গেছে। ঐ মুহূর্তে অন্তর্জাত বা কণ্ডিশন্‌ড্‌ নিস্তেজনার সঞ্চার হয়েছে তোমার মস্তিষ্কে।

এতক্ষণ ধরে যে-নিস্তেজনা নিয়ে অনেক কথা বললাম, সেই নিস্তেজনা প্রাণীর অভিযোজনের পক্ষে অত্যন্ত দরকারী। পরিবেশের বিভিন্ন সঙ্কেতের সঠিক বিশ্লেষণ নিস্তেজনা ছাড়া চলেই না। এ ছাড়া আর এক ধরনের নিস্তেজনার উল্লেখ করেছেন পাভলভ। ঘুমের প্রসঙ্গে এই নিস্তেজনা-ক্রিয়াই বিশেষ ভাবে আলোচ্য। পাভলভের আবিষ্কারগুলোর মধ্যে এটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, নিঃসন্দেহ। সব মস্তিষ্ক কোষেরই সহনশক্তি সসীম। উচ্চমস্তিষ্কের কোষগুলো অতিশয় কোমল, অল্পতেই সাড়া দেয়। আবার বেশীক্ষণ এই সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা তার থাকে না। দীর্ঘস্থায়ী উত্তেজনা বা স্বল্পস্থায়ী অতি-উত্তেজনা কোষগুলোর

পক্ষে ক্ষতিকর। মস্তিষ্কের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে প্রকৃতি সব সময়েই সজাগ; লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের ফলশ্রুতি। কোনো স্থানের উত্তেজনা যখন নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখনই উত্তেজনার প্রান্তদেশ থেকে নিস্তেজনার আবর্ত সারা মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়ে। এই বিশেষ ধরনের নিস্তেজনার নাম প্রতিরক্ষামূলক নিস্তেজনা, বা প্রোটেকটিভ ইনহিবিশন। এই প্রতিরক্ষামূলক নিস্তেজনা কোষের ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধ করে, শ্রান্তি দূর করে তাদের সতেজ সক্রিয় করে তোলে। প্রতিরক্ষা-মূলক নিস্তেজনা যেন মস্তিষ্কের অভিভাবক। পরীক্ষার আগে যখন বেশি রাত জেগে পড়তে, তোমার বাবা এসে আলো নিভিয়ে বই কেড়ে নিতেন, —তোমার কাছেই শোনা। তোমার স্বাস্থ্যরক্ষার প্রচেষ্টা। এই অভিভাবকটিও চেষ্টা করে মস্তিষ্ককোষগুলোকে সব রকম ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে।

পাভলভের মতে ঘুম আত্মরক্ষামূলক নিস্তেজনারই এক বিশেষ রূপ। নিস্তেজনা বিশেষ কয়েকটি নার্ভকোষের পক্ষে যেমন দরকারী, ঘুমও তেমনি দরকারী গোটা স্নায়ুতন্ত্রের পক্ষে; অতি-উত্তেজনা ও তার দরুন ক্ষয়ক্ষতি থেকে মস্তিষ্ককোষকে রক্ষা করবার এক জৈবিক প্রক্রিয়া। নিস্তেজনা কয়েকটি কোষের বা স্থানীয় প্রতিরক্ষার উপায় আর ঘুম গোটা স্নায়ুতন্ত্রের। অন্তর্জাত নিস্তেজনা নেমে আসার সময় শুধু যে লালাঝরা থেমে যায় তা নয়, পরীক্ষাধীন কুকুর ঝিমুচ্ছে বা ঘুমিয়ে পড়েছে—প্রায়শই এরকম দেখা যায়। তেমনি আবার বহিরাগত নিস্তেজনার পরীক্ষাকালে দেখা গেছে ঘুম আর নিস্তেজনা একসঙ্গে আসছে। দীর্ঘস্থায়ী একঘেয়ে মৃদু উদ্দীপক যে ঘুম নিয়ে আসতে পারে, এ অভিজ্ঞতা সকলেরই আছে। উদ্দীপক যদি সমমাত্রিক বা ছন্দোময় হয় তবে ঘুম আরও তাড়াতাড়ি আসে। শিশুদের দোল দিয়ে, পিঠ চাপড়ে, গান গেয়ে ঘুম পাড়ানো হয়। এ-বিদ্যায় তুমি তো ওস্তাদ। তোমার বৌদিদের কাছে তাই তো তোমার এত দাম। ভ্রূকুঞ্চিত হল নিশ্চয়ই! আহা—তোমার অন্য মূল্য এর দ্বারা অস্বীকার করা হচ্ছে না। পাত্রভেদে মূল্যভেদ। আসল কথাটা হচ্ছে এই মস্তিষ্কের কয়েকটি কোষ কিছুক্ষণ ধরে মৃদুভাবে উত্তেজিত হতে থাকলে সেই কোষগুলোতে নিস্তেজনা-তরঙ্গ ওঠে। সেই তরঙ্গ ধীরে ধীরে বা কোনো সময়ে অতিদ্রুত সমস্ত মস্তিষ্ককোষে,—নিম্নমস্তিষ্ক সমেত গোটা স্নায়ুসংস্থায় ছড়িয়ে পড়ে। উত্তেজনার ঢেউ-এর মত নিস্তেজনার ঢেউও বাধা না পেয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এইভাবে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি।

স্বাভাবিক ঘুম কেমন করে আসে? সারাদিনের কাজ কর্মের মধ্যে মস্তিষ্কের কতকগুলো কোষ বিশেষভাবে উত্তেজিত হয়। এই উত্তেজনার মাত্রা যখন একটা বিশেষ পর্যায়ে ওঠে, যখন কোষগুলোর সহ্যের সীমানা ছাড়িয়ে যেতে চায় উত্তেজনা, তখন প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা ঘুম বা সর্বাত্মক নিস্তেজনা নেমে আসে।

বিচ্ছিন্ন কোষগুলো থেকে ছোট ছোট নিস্তেজনার ঢেউ সমস্ত মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বেশি পরিশ্রান্ত হলে বসে বসেও ঘুমিয়ে পড়ে মানুষ। কিন্তু ঘুমের জন্য সাধারণত কিছু নির্দিষ্ট শর্ত দরকার। এগুলো সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। অভ্যাসের ফলে শর্তগুলি তৈরী হয়। মে মাসের দুপুরে পিচগলানো গরমে কোলকাতার রাস্তায় রিক্‌স্‌ওয়ালা বা ঝাঁকামুটে যে ভাবে ঘুমোতে পারে, তুমি সে ভাবে পারো না। নরম বিছানা, আধা অন্ধকার ঘর, ফ্যানের হাওয়া—এ না হলে তোমার ঘুম আসবে না। তোমার থেকেও উচ্চবিত্তের দরকার হবে এয়ারকণ্ডিশনড্‌ ঘরের। আবার বিশেষ অবস্থায়, শ্রান্তির মাত্রা চরমে উঠলে, তুমিও যে ঝাঁকা মাথায় দিয়ে গলির ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়তে পারবে না; এমন নয়।

নিস্তেজনা ও উত্তেজনায় মস্তিষ্ককোষের জৈবরাসায়নিক যে সব পরিবর্তন ঘটে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তোমারই ঘুম এসে যাবে। কেন না তোমার রসায়নের জ্ঞান যৎকিঞ্চিৎ; কাজেই দুর্বোধ্য ঠেকবে আমার বক্তব্য। তুমি বেশী করে চেষ্টা করবে বুঝতে, অর্থাৎ মস্তিষ্ককোষের ঘটবে চেষ্টাকৃত উত্তেজনা। অথবা বুঝতে না পারার দরুন আমার চিঠির লাইনগুলো খাদ্যবিহীন ঘণ্টাধ্বনির মত তোমার কাছে অর্থহীন উত্তেজনা হয়ে দাঁড়াবে। যাই করো, ফলে প্রথমে কোষকেন্দ্রিক নিস্তেজনা, পরে সর্বাত্মক নিস্তেজনা বা ঘুম। তবে এইটুকু জেনে রাখো যে বিপাকক্রিয়া মানে metabolism জাত কতকগুলো রাসায়নিক পদার্থ মস্তিষ্ককোষগুলোকে নিস্তেজিত করে তোলে। ঘুম তখনই আসে যখন নিস্তেজনা চরমে পৌছয় এবং সারা মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়ে। পাভলভের কথাতেই বলি* ঘুম মানে বিশ্রাম—শুধু স্নায়ুসংস্থার নয়, সমগ্র জীবদেহের বিশ্রাম: আর বিশ্রাম মানে ক্ষয়-ক্ষতির পূরন, বিপাকক্রিয়াজাত রস (যা নিস্তেজনার ঢেউ তুলেছিল) ঘুমের মধ্যে বিশ্রামের দরুণ নিঃশেষিত হয়ে যায়। সকালে ঘুম ভাঙার পর নতুন উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে তুমি নতুন প্রভাতকে অভ্যর্থনা জানাও।

এবার আর কয়েকটি দরকারী কথা বলে ঘুমের পর্ব শেষ করব। আগেই

* "Inhibition is partial, fragmentary, narrowly limited strictly localised sleep, confined within definite boundaries under the influence of the opposing process—that of excitation; sleep on the contrary is an inhibition which has spread over a great section of the cerebrum, over the entire hemisphere, and even into the lower lying midbrain ... either the inhibition spreads and sleep sets in or the inhibition is limited and sleep disappears."

বলেছি দীর্ঘস্থায়ী একঘেয়ে মৃদু উদ্দীপক ঘুম নিয়ে আসে। ট্রেনে উঠে ইঞ্জিনের শব্দে অনেকেই ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু সবাই নয়। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চলমান দৃশ্য দেখে আনন্দ পেতে চায় ছোটরা। তাদের কাছে এঞ্জিনের শব্দ বা গাড়ীর দোলা ঘুম আনে না। নতুন চলমান দৃশ্য দেখার ঔৎসুক্য তাদের মস্তিষ্ককে বেশি রকম উত্তেজিত করে। কাজেই ঘুম আসে না। তদন্তকারী (Investigation) রিফ্লেক্স ছোটদের মধ্যে জোরালো। জোরালো রকমের উত্তেজনা ঘুমের পরিপন্থী। বেশি আনন্দিত হলে ঘুম আসতে চায় না—ঘুরে ফিরে সেই আনন্দপ্রদ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমাদের মস্তিষ্ক আলোড়িত হতে থাকে। তেমনি আবার দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা বা ভয় ঘুমের প্রতিবন্ধক। এগুলো জোরালো হলেও বেশি জোরালো নয়, মাঝারি রকমের উদ্দীপক। অতি জোরালো উদ্দীপক—সে ভয়ের হলেও কিন্তু ঘুম নিয়ে আসবে। অতি উত্তেজনার ফলে প্রান্তঃসীমা ছাড়িয়ে যাবে বিনিময় নিস্তেজনা। এও স্নায়ুতন্ত্রের প্রতিরক্ষাত্মক প্রতিক্রিয়া। তোমার কুকুরটিকে (নামটা ভুলে গেছি) হঠাৎ চিৎ করে ফেলে খানিকক্ষণ জোর করে চেপে রেখে দাও। যেন নড়তে চড়তে না পারে। দেখবে সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

আর একটা মজার কথা। যখন আমরা পুরোপুরি জেগে আছি মনে করছি তখনও কিন্তু অনেক সময় অনেকগুলো কোষ বেশি উত্তেজিত থাকার ফলে সন্নিবিষ্ট কতকগুলো কোষ নিস্তেজিত হয়ে থাকে। আর কতকগুলো কোষ থাকে স্বাভাবিক অবস্থায়। অর্থাৎ পুরোপুরি জেগে নেই আমরা। কতকগুলো কোষ তখনও নিস্তেজিত। আংশিকভাবে তারা ঘুমোচ্ছে। তেমনি ঘুমের সময়েও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কতকগুলো কোষ এদিক ওদিক জেগে থাকে। পুরোপুরি ঘুমোই আমরা কমই। সারা মস্তিষ্কব্যাপী গভীর নিস্তেজনার ঘুম হয় না, এমন নয় তবে দু' একটা কেন্দ্র জেগে থাকাটাই স্বাভাবিক। এই তথ্যগুলো মনে রেখো, তবেই স্বপ্নরহস্য বুঝতে পারবে।

দৈনন্দিন জীবনের কতকগুলো অতি-পরিচিত ঘটনার ব্যাখ্যা করব এবার। তোমার শৈশবে ফিরে যাও। দুপুর বেলায় তোমার মা কোলের বাচ্চাটার পাশে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। সকাল থেকে রান্নাঘরে কেটেছে ছ'ঘণ্টা। খুবই শ্রান্ত। তোমার বয়স পাঁচ কি ছয়। পাশের বাড়ীর সমবয়সী বন্ধুদের নিয়ে ঘরের মধ্যেই তোমরা লুকোচুরি খেলছ। দুপদাপ শব্দ। তুমি চোর হয়েই—'আব্বা' বলে চেঁচিয়ে উঠছ। বন্ধুদের সঙ্গে এই নিয়ে ঝগড়া বেধেছে। মার ঘুম ভাঙ্ছে না। কিন্তু বাচ্চাটা সামান্য নড়ে উঠতে বা মৃদু শব্দ করতেই তোমার মা জেগে উঠছেন। অনেকদিন এরকম ঘটেছে। তুমি খেয়াল করনি।

কারখানায় সশব্দে যন্ত্রপাতি চলছে। বয়লার এঞ্জিনের পাশে গামছা জড়িয়ে দিব্যি ঘুমিয়ে নিচ্ছে টিণ্ডেল। বয়লারের বাষ্পচাপ সামান্য এদিক ওদিক হওয়াতে

যে শব্দের তারতম্য ঘটছে—তাতেই কিন্তু ওর ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। পিকনিকে যেতে হবে ভোর পাঁচটায়। চারটেয় ঘুম ভাঙা চাইই। ঘড়িতে এলার্ম না দিয়েও মনে মনে এই কথা ভেবে শুলে ঠিক ঘুম ভেঙে যায়। কিভাবে এসব সম্ভব হয়? যেন একজন শান্ত্রীকে পাহারায় রেখে গোটা শিবির ঘুমিয়ে আছে। সামান্যতম বিপদের সঙ্কেত পেলেই সে ঘুমন্ত সৈনিকদের জাগিয়ে তুলছে। পাভলভের মতে কণ্ডিশনিং-এর দরুন এই sentry post তৈরী হয়েছে। আশেপাশের কোষগুলোর অতি-নিস্তেজনার ফলে এই বিশেষ জায়গাটি অতিমাত্রায় উত্তেজনাপ্রবণ হয়ে বাইরের উদ্দীপকের সঙ্গে সংযোগ রাখতে অভ্যস্ত রয়েছে। এই নিয়ে একটি ল্যাবরেটরী এক্সপেরিমেণ্টের উল্লেখ এখানে করব।

সেকেণ্ডে ২৫৬ স্পন্দনের একটি বাঁশির শব্দের সঙ্গে কুকুরের খাদ্য রিফ্লেক্স তৈরী করা হল। খাদ্য না দিয়ে কাছাকাছি স্পন্দনের আর একটি শব্দ (স্পন্দন ২১২) শোনানো হল কয়েকবার। প্রথমদিকে এই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে লালা ঝরতে থাকবে। তারপর এই শব্দে লালা ঝরবে না। ২৫৬ স্পন্দনের খাদ্য রিফ্লেক্সটি—(বারে বারে খাদ্য দেওয়া ও শব্দ করার ফলে) আরও শক্তিশালী করে তোলা হল। কিছু পরে কাছাকাছি অন্য কোনো শব্দেই লালা ঝরবে না। এইবার যদি ২১২ স্পন্দনের শব্দটি বেশিক্ষণ ধরে শোনানো যায়, কুকুরটি নিস্তেজনার জন্য ঘুমিয়ে পড়বে। এই ঘুমের মধ্যে যতবার ঐ স্পন্দনের বাঁশিটি বাজানো হবে, ততবারই সে জেগে উঠবে ও তার খাদ্য রিফ্লেক্স সক্রিয় হবে। ২৫৬ স্পন্দনের বাঁশির শব্দ ঐ কুকুরের কাছে এখন বিশেষ অর্থব্যঞ্জক। বাঁশির শব্দে sentry post তৈরী হয়েছে মস্তিষ্কে। কৃষ্ণের মুরলীধ্বনির সঙ্গে শ্রীরাধিকারও এমনি conditioning ঘটেছিল। তাই তিনি ঘুম থেকে উঠে ছুটে যেতেন যমুনাতীরে। জাগ্রত অবস্থায় রিফ্লেক্সটি ঘুমের মধ্যেও বজায় থাকত!

জীবজগতে এই 'sentry post' ব্যবস্থার তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অক্টোপাস যখন ঘুমোয়, সাতটা পা গুটিয়ে নেয় কিন্তু অষ্টমটি সোজা হয়ে সম্ভাব্য বিপদের সংকেত ধরবার জন্য জেগে থাকে। যূথবদ্ধ পশুরা যখন ঘুমোয়, এক আধটা জেগে থেকে শান্ত্রীর কাজ করে যায়, বিপদের গন্ধ পেলেই সবাইকে জাগিয়ে তোলে।

এই সব দেখেশুনে পাভলভ সুন্দর একটি মন্তব্য করেছেন।*

* "The waking state of the animal always includes partial sleep and precisely in the subtlest relations of the animal with the outside world and in the sleeping state there are always waking, active points in the cerebral hemispheres, which are, as it were sentries on duty".

ঘুমের শারীরবৃত্তিক আর দু-একটি বিশেষত্বের কথা উল্লেখ না করে স্বপ্ন-বৃত্তান্তে যেতে পারছি না। ঘুম, স্বপ্ন আর সম্মোহন ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। একের সঙ্গে অপরের জটিল চলমান সম্পর্ক বিদ্যমান। স্বাভাবিকভাবে তোমার চোখে ঘুম নেমে এসেছে, কিম্বা ধীরে ধীরে জেগে উঠছ, এর মধ্যে দ্রুত বিলীয়মান অনেকগুলো শারীরবৃত্তিক অবস্থা পেরিয়ে এসেছ—তা জানো কি? রাত্রে পড়বার সময় তন্দ্রার ভাব বা ঝিমুনির জন্য ছোটবেলায় মেজদির কাছে চিমটি খেতে,—মনে আছে নিশ্চয়ই। ঘুম পেলেই যেমন ঝিমুনি আসে, তেমনি ঘুম আসার আগেও আসে একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব। শরীরে খাদ্য দরকার হলে খিদে পায়, জল দরকার হলে তৃষ্ণা পায়, তেমনি ঘুমের প্রয়োজন হলে আসে তন্দ্রা বা ঝিমুনি। বাইরের দিকে তাকিয়ে আছ কিন্তু লাইনগুলি জড়িয়ে যাচ্ছে, মানে ঠিকমত বোঝা যাচ্ছে না, মাথাটা কেমন ভারী হয়ে উঠেছে; তোমার ঘুম পাচ্ছে। শরীরের পেশীগুলো শিথিল হয়ে আসছে, হাই তুলছ, আড়ামোড়া ভাঙছ, মেজদির চিমটির ভয়ে ঘুম তাড়ানোর চেষ্টা চলছে। মেজদির কিন্তু অন্যায়। তিনি জানতেন না তোমাকে জোর করে জাগিয়ে রেখে কোনো লাভ নেই। পড়ার একবর্ণও মাথায় ঢুকবে না। মাঝখান থেকে শরীর খারাপ লাগবে, মেজাজ বিগড়ে যাবে।

এখন দেখা যাক ঘুম আসবার ঠিক আগে দেহ-মনের কি অবস্থা ঘটে। রূপরসগন্ধভরা ধরণীর সঙ্গে ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয়সংযোগ বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। শব্দ-দৃশ্য-গন্ধ-স্পর্শ, মনে হয় যেন, সাত সমুদ্র তের নদীর ওপার থেকে মোটা তুলোর প্যাডের মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কে ক্ষীণ সাড়া জাগাচ্ছে। চেয়ারে বসে ঝিমোনো তোমার অভ্যেস আছে। কারুর কথা কানে যাচ্ছে না, মাথাটা নীচু হয়ে বুকে ঠেকছে, চোখ দুটো আধবোজা। হঠাৎ ফেরিওয়ালার বিচিত্র চীৎকার কানে যেতেই পরিবেশ সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠছ, আবার পর মুহূর্তেই ঝিমোনি। পুরো ঘুম না এলেও এ অবস্থায় পরিবেশের সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ রাখা অসম্ভব। যখন বাচ্চাদের পড়ার তদারক করবে আমার এই কথাগুলো মনে রেখো। তাদের জোর করে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করো না।

ঘুম থেকে জেগে ওঠাও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, একটা ধীর ও ক্রমান্বয়িক প্রক্রিয়া। বাইরের সঙ্গে পূর্ণ সংযোগ স্থাপিত হতে একটু সময় লাগে। বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। চোখে এসে আলো পড়ছে, ঘুম ভেঙ্গে আসছে, আবার ঘুমিয়ে পড়ছে।

বাচ্চা না হলেও এ-অবস্থা তোমার রোজই ভোরবেলায় হয়ে থাকে। কোনো কোনো সময় লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়ই, অনেকে ঘুম থেকে উঠে অল্পক্ষণের জন্য অদ্ভুত ব্যবহার করে। অসংলগ্ন কথা বলে, রেগে যায়, স্থানকাল সম্পর্কে সঠিক ধারণা

করতে পারে না। অযৌক্তিক ব্যবহারের কারণ পরিবেশ সম্পর্কে ক্ষণিকের আংশিক বা বিকৃত অনবধান। ঘুমিয়ে পড়লে ইন্দ্রিয়গুলো বাইরের উদ্দীপনায় সাড়া দেয় না। আবার বাইরের উদ্দীপনার মস্তিষ্কে পৌঁছবার পথগুলো, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারগুলো রুদ্ধ করলে তাড়াতাড়ি ঘুম আসে। এ-নিয়ে দু'একটা উদাহরণের উল্লেখ বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গ্যালকিন কয়েকটি কুকুরের শ্রবণ, দর্শন ও ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহী নার্ভগুলোকে কেটে দেখেছিলেন কুকুরগুলো দিনের মধ্যে ২৩ ঘন্টার বেশী ঘুমিয়ে কাটাচ্ছে। নেভ্‌স্কী জন্তুজানোয়ারের চোখ বেঁধে, কানে প্লাগ দিয়ে ঐ একই ফল পেয়েছিলেন। জার্মান ডাক্তার স্ট্রামপেলের বালক রোগীটির কথা চিকিৎসকমাত্রেই জানেন। এর এক চোখ ছিল দৃষ্টিশক্তিহীন ও একটি কান শ্রবণশক্তিহীন ঃ আবার সারা দেহের ত্বকের অনুভূতিশক্তি গিয়েছিল নষ্ট হয়ে। সুস্থ চোখ ও কান বন্ধ করে দিলেই ও ঘুমিয়ে পড়তো। পাভলভের লেখায় এমনি একজন রোগীর খবর পাওয়া যায়। মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাতের ফলে এরও একটি কান ও একটি চোখ ছাড়া আর সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই অক্ষত চোখ কান বন্ধ করা মাত্রই সে ঘুমিয়ে পড়ত। সেচেনফ লিখে গেছেন, যে ইন্দ্রিয়-উপলব্ধির অবলুপ্তি ঘটলে গভীর ঘুম আসবেই।

এই সব উদাহরণের শারীরবৃত্তিক তাৎপর্য কি? একথা মনে করা কি যুক্তিযুক্ত হবে যে ঘুম কেবলমাত্র মস্তিষ্কের উত্তেজনা নিরোধের উপর নির্ভর করে? এইসব ক্ষেত্রে ঘুমকে পাভলভ অক্রিয় ঘুম বা Passive sleep বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে মস্তিষ্কের বাইরের উদ্দীপনা কম আসার ফলে উত্তেজনা-প্রক্রিয়া দুর্বল হয়ে পড়ে। কাজেই নিস্তেজনা প্রতিস্থাপিত হয়ে সহজেই সারা মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়ে। তবে তোমাকে আগেই লিখেছি, ঘুম মূলত একটি আভ্যাসিক ব্যাপার। যে কোনো অবস্থায় যে-কোনো ভাবে মানুষ ঘুমিয়ে পড়তে পারে। সৈনিকেরা গোলাগুলির শব্দ উপেক্ষা করে চলতে চলতে ঘুমোয়। অশ্বারোহীরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে যেতে যেতে ঘুমোয়। উত্তর মেরুর অভিযাত্রী নানসেন ও তাঁর সহযাত্রীরা অনেক সময় লম্বা 'স্কি দৌড়ের' মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তেন।

মস্তিষ্কের অবসাদ থেকেই সবক্ষেত্রে ঘুম আসে, এমন নয়। পাভলভ মনে করেন যে, ঘুম একরকম শর্তাধীন পরাবর্ত (conditioned reflex)। পর্যাবৃত্ত নিয়মানুবর্তিতা অর্থাৎ একই সময়ে একই পরিবেশে, নিয়মিত শোবার ব্যবস্থা সহজেই ঘুম নিয়ে আসে। ঘুমোতে যাওয়া ও ঘুম থেকে ওঠার ব্যাপারে যারা নির্দিষ্ট নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলে, তাদের কোনোদিন ঘুমের ব্যাঘাত হয় না।

মস্তিষ্ককোষের ক্লান্তি ও অবসাদ ছাড়াও ঘুম আসতে পারে আগেই বলেছি। মনে আছে? আমার ঘুমপাড়ানিয়া খাটে শোবার আগে তুমি কত ওজর আপত্তি তুলতে। বিকেল পাঁচটায় কি ঘুম আসতে পারে? সারা দুপুর ঘুমিয়েছি, কি করে ঘুম হবে? কিন্তু তোমার ঘুম হত। আমার অভিভাবনে তুমি ঘুমিয়ে পড়তে। ঘুম আসার আগে তোমার দেহ-মনে যে পরিবর্তনগুলো ঘটে, আমি সেইগুলি আবৃত্তি করে তোমাকে অভিভাবিত করতাম। "তোমার ঘুম আসছে। —হাত পা ভারী হয়ে গেছে। সারাদেহ অসাড় অবশ আড়ষ্ট হয়ে গেছে। চোখের পাতা ভারী হয়ে ঘুমে জড়িয়ে আসছে। তুমি ঘুমিয়ে পড়ছ।" তুমি ঘুমিয়ে পড়তে। এর নাম সাজেস্টেড স্লিপ বা অভিভাবিত ঘুম। **Everything that coincides many times with the development of sleep, itself begins to aid in its onset**—এই হচ্ছে পাভলভিয়ানদের বক্তব্য। পাভলভের গবেষণাগারের কুকুরগুলোর কথা আগেই উল্লেখ করেছি। একই ঘরে, একই স্ট্যাণ্ডে পরীক্ষাকালে তারা ঘুমিয়ে পড়ত। কয়েক দিন পরে ঘরে ঢুকে দাঁড় করানোর সঙ্গে সঙ্গেই তাদের ঘুম আসছে দেখা যেত। খুব ছটফটে তেজী কুকুরও চৌকাঠ পেরিয়ে স্ট্যাণ্ডের দিকে আসতেই ঝিমোতে থাকত। পরিবেশ অনুকূল অর্থাৎ শর্তাধীন হবার ফলে তাদের ঘুম আসত। এই প্রসঙ্গে একটা মজার কথা বলি শোন। তোমাকে ঘুমের ওষুধ বলে যে পিলগুলি দিতাম, সেগুলো ঘুমের ওষুধের মত দেখতে ছিল বটে, কিন্তু আসলে সেগুলো ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেটের বড়ি। তুমি বলতে—কিছুতেই ঘুম আসছে না দেখে একটা পিল খেতেই হল। তাতে তুমি গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়তে। অভিভাবন ঘুমের আর একটা নিদর্শন। পাভলভের ল্যাবরেটরীতে ক্লোরাল হাইড্রাস [ঘুমের ওষুধ] গরম জলে মিশিয়ে কুকুরদের মলাশয়ে প্রবিষ্ট করে ঘুম পাড়াবার ব্যবস্থা ছিল। কয়েকদিন এভাবে ঘুম পাড়িয়ে পরে শুধু গরমজল ইনজেক্‌শন করেও দেখা গেল কুকুরগুলো আগের মতই ঘুমিয়ে পড়ছে। আরও পরে ইনজেক্‌শনের প্রস্তুতিপর্বেই কুকুরগুলো ঝিমোতে শুরু করত ও কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ত। ইনজেক্‌শনের প্রস্তুতি এখানে কণ্ডিশন্‌ড্ স্টিমুলাস, ক্লোরাল হাইড্রাস বা ঘুমের ওষুধ আনকণ্ডিশনড্ স্টিমুলাস, আর ঘুম কণ্ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স। তোমার বেলায় আমার সাজেশন—যে ক্যালসিয়ামের বড়িগুলো ঘুমের ওষুধ—কাজ করেছে সন্দেহ নেই; কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমের ওষুধের মত দেখতে পিল গেলবার প্রক্রিয়া কণ্ডিশন্‌ড্ স্টিমুলাসের কাজও করেছে নিশ্চয়ই। একজন সোভিয়েত ডাক্তার ঘুমের উদ্দীপকের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক দিন খুব জোরে ঘণ্টা বাজিয়ে দেখিয়েছেন যে পরে শুধু তীব্র ঘণ্টাধ্বনিই ঘুম আনতে সক্ষম।

ঘুমের শারীরবৃত্তের সঙ্গেই সম্পর্কিত আর একটি বিষয়ের অবতারণা করা

এখুনি দরকার। বিষয়টির গুরুত্ব সবিশেষ। উত্তেজনা থেকে নিস্তেজনায় রূপান্তর সর্বত্র এক সময়ে ঘটে না। মস্তিষ্ককোষে নিস্তেজনা প্রবাহ নেমে আসে ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়ে। নিস্তেজনামাত্রার কমবেশি অনুযায়ী কয়েকটি অন্তবর্তী অবস্থার উদ্ভব হয়। ঘুম থেকে জেগে ওঠার ব্যাপারেও এই অন্তর্বর্তী অবস্থা লক্ষ্য করা গেছে। বলতে পারো, ঘুমের চার দশা। কণ্ডিশন্‌ড্ স্টিমুলাস বা শর্তাধীন উদ্দীপক এই চার দশায় চার রকম রিফ্লেক্স বা পরাবর্ত সৃষ্টি করে। স্টিমুলাসের শক্তির মাত্রাবৃদ্ধিতে রিফ্লেক্সের মাত্রা বাড়বে; এই হচ্ছে সুস্থ জাগ্রত মস্তিষ্কের প্রকৃত ধর্ম; প্রকৃতিজগতের সাধারণ নিয়ম। একেই বলে 'ল অফ ফোর্স রিলেশন্‌স্'। উদ্দীপক যদি পাঁচ মাত্রার হয় মস্তিষ্ককোষের উত্তেজনাও পাঁচমাত্রা হবে। উত্তেজনার ফলে রিফ্লেক্সও হবে পাঁচমাত্রার। উদ্দীপক দশমাত্রার হলে উত্তেজনা ও রিফ্লেক্সও হবে যথাক্রমে দশমাত্রার: পনেরো মাত্রায় পনেরো মাত্রা ইত্যাদি। গোলমাল লাগছে—তাই না? আচ্ছা, একটা ল্যাবরেটরি এক্সপেরিমেণ্টের উদাহরণ টেনে ব্যাপারটাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। কুকুরের লালানিঃসরণের এক্সপেরিমেণ্টই ভালো। ধরা যাক, সেকেণ্ডে ১০০ স্পন্দন (oscillation) কোন শব্দের সঙ্গে (এক্ষেত্রে সাধারণত metronome ব্যবহার করা হয়) কুকুরের লালানিঃসরণ কণ্ডিশন্‌ড্ করা হয়েছে। ধরা যাক, দশফোঁটা লালা ঝরছে প্রতিবার। তাহলে, সেকেণ্ডে ২০০ স্পন্দনওয়ালা শব্দে ২০ ফোঁটা লালা ঝরবে। ৩০০ স্পন্দনে ৩০ ফোঁটা। এই হচ্ছে জাগ্রত অবস্থার সুস্থ মস্তিষ্কের প্রক্রিয়া। উদ্দীপকের শক্তিমাত্রা বাড়লেই রিফ্লেক্সমাত্রাও বাড়বে। জাগরণ ও ঘুমের অন্তর্বর্তীকালে এই ফলাফলের গাণিতিক হার বজায় থাকে না। প্রথমে আসবে 'সমকক্ষ' দশা—ফেজ্ অব ইকোয়ালিটি (phase of equality)। উদ্দীপকের মাত্রা বাড়াও আর কমাও, লালার পরিমাণ একই থাকবে। ১০০ স্পন্দনওয়ালা শব্দে মত ফোঁটা লালা, ৫০০ স্পন্দনওয়ালাতেও তত ফোঁটা। নিস্তেজনার ছোঁয়া লেগেছে মস্তিষ্ককোষে। নিস্তেজনার পরিমাণ আরও বাড়লে দেখা যাবে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির আবির্ভাব হয়েছে। কম মাত্রার উদ্দীপক বেশি মাত্রার উদ্দীপকের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ১০০ স্পন্দন শব্দে লালা ঝরছে ৩০ ফোঁটা, আর ৩০০ স্পন্দন শব্দে ১০ ফোঁটা। আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী এই অবস্থাকে পাভলভ paradoxical phase বলে বর্ণনা করেছেন। এরপর আসবে অতি-স্ববিরোধী বা ultra paradoxical phase। এখন আরও অদ্ভুত মস্তিষ্কের আচরণ। উদ্দীপক আদৌ উত্তেজনা আনছে না। শব্দে সাড়া দিচ্ছে না লালাগ্রন্থি। কণ্ডিশন্‌ড্ স্টিমুলাস স্বকীয় তাৎপর্য হারিয়ে ফেলেছে। এই সময় আর এক মজার ব্যাপার দেখা যাবে। নঙর্থক উদ্দীপক সদর্থক প্রতিক্রিয়া জাগাচ্ছে। অর্থাৎ যে উদ্দীপকে এর আগে লালা ঝরা বন্ধ হয়ে যেত

সেই উদ্দীপকে এখন লালা ঝরছে। মস্তিষ্কধর্মেরও ওলটপালট ঘটছে। এই তিন অন্তর্বর্তী দশার পর আসবে চতুর্থ দশা। আরও বেশি নিস্তেজনার ফলে ছোট বড় মাঝারি সব রকমের উদ্দীপকেই ক্ষীণভাবে সাড়া দেবে মস্তিষ্ক, শক্তি-সম্পর্কের সামঞ্জস্য বজায় রেখে। অর্থাৎ ১০০ স্পন্দনে যদি একফোঁটা লালা ঝরে—পাঁচশ স্পন্দনে পাচফোঁটা ঝরবে। সুস্থ জাগ্রত মস্তিষ্কের ধর্মই বজায় রয়েছে, শুধু মস্তিষ্কের সাড়া দেবার ক্ষমতা কমে গেছে। এরপর নিস্তেজনার ব্যাপ্তি ও গভীরতা বৃদ্ধি : গাঢ় ঘুম। সব শর্তাধীন পরাবর্তই নিষ্ক্রিয়। কোনো রকম সাড়াই নেই। লালানিঃসরণ আর হবে না।

সম্মোহনের স্বরূপ বুঝতে হলে অন্তর্বর্তী এই 'চার দশার' কথা মনে রাখতে হবে। স্ববিরোধী বা প্যারাডক্সিক্যাল ফেজকে পাভলভ বলেছেন, "phase of suggestion"। সাজেশন বা অভিভাবনের প্রভাব নিজের জীবনে আমরা সকলেই কম বেশি অনুভব করেছি। সম্মোহিত অবস্থায় অভিভাবনের কথা আমি বলছি না। জাগ্রত অবস্থার কথা বলছি। তুমি যখন জেগে আছ (মনে আছে তো—আমি আগের চিঠিতে লিখেছিলাম) তখনও সব সময় পুরোপুরি জেগে নেই। মস্তিষ্কের কিছু অংশ হয়ত তখন আধা ঘুমন্ত (পাভলভের ভাষায়—প্যারাডক্সিক্যাল) অবস্থায় রয়েছে। এই অবস্থায় মুখের কথার মত দুর্বল উদ্দীপক (সাজেশন মানেই মুখের কথা) মস্তিষ্কের ঐ আধাঘুমন্ত অংশে খুব জোরালো উত্তেজনার সৃষ্টি করবে।

ছোটবেলা থেকে এপর্যন্ত যতটা শিখেছ বা জেনেছ, হিসেব করে দেখলে বুঝবে, তার মধ্যে বেশিটাই অভিভাবন প্রসাদাৎ। যখন মেজদি বলেছেন পৃথিবীটা গোল, অবিশ্বাস্য লাগেনি। প্রমাণ বা যুক্তি খোঁজনি—নির্বিচারে মেনে নিয়েছ। এটা না হয় বৈজ্ঞানিক সত্য। এমন অনেক কিছু আমরা নির্বিচারে গ্রহণ করি, যার বাস্তব ভিত্তি নেই। গোটা মস্তিষ্কের যুক্তিতর্ক, সামগ্রিক বিচারপদ্ধতি আমরা সব সময়ে মেনে চলি না। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে বলা উচিত, মস্তিষ্ক সব সময়ে সামগ্রিকভাবে কাজ করে না। খণ্ডিত আধা-ঘুমন্ত অংশ সমগ্র থেকে আলাদা হয়ে অভিভাবনের জোরে আমাদের কাজকর্ম, আচার-ব্যবহারকে অনেক সময়ই নিয়ন্ত্রিত করে।*

শুধু এডুকেশন নয়, আমাদের ধ্যানধারণা, প্রাইড্-প্রেজুডিস, রাজনৈতিক

* "The basic mechanism of suggestibility is connected with the dissociation of the normal i. e. the unified work of the entire cortex : suggestion plays a particularly important part in our education." (Platanov)

মতবাদ, দলানুগত্য ইত্যাদির মধ্যে যুক্তিহীন অভিভাবনের প্রভাব কতখানি কাজ করে, তা তুমি ধারণা করতে পারবে না। তোমার নিজের ব্যাপারে ত' মানতেই চাইবে না যে তোমার বিশ্বাস-অবিশ্বাস, পছন্দ-অপছন্দ, ভালোমন্দ বিচারের মধ্যে অভিভাবনের প্রভাব আছে। ভাববে বুঝি তোমার বুদ্ধির প্রতি কটাক্ষ করছি। তোমার অজান্তে তুমি প্রভাবিত হয়েছ ও হচ্ছ। অবশ্য প্রভাব সব সময়ে চিরস্থায়ী হয় না। ভুল বিশ্বাস অনেক সময় বাস্তবের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ায় বাধা সৃষ্টি করে, তার জন্যে প্রয়োজন হয় ধ্যানধারণাগুলোকে নতুন করে যাচাই করার। ফলে পুরোণোকে পরিবর্তন করে নতুন ধারণা নতুন বিশ্বাস আমরা গ্রহণ করি। মনস্তাত্ত্বিকরা জাগ্রত অবস্থাতেও অভিভাবনের প্রভাবকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।*

এখন দেখা যাক কিভাবে দৈনন্দিন জীবনে আমরা অভিভাবিত হই।

তিরিশের জার্মানী। জার্মান জাতি হাজার সমস্যায় পীড়িত। নাৎসী নায়করা আভ্যন্তরীণ সমস্যার জন্য দায়ী করলেন ইহুদীদের। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে এই যুক্তিহীন সাজেশন মেনে নিলেন না। তাঁদের মধ্যে একজন দৈবক্রমে হিটলারের এক বক্তৃতাসভায় উপস্থিত। শ্রোতাদের ঔৎসুক্য যখন চরমে উঠেছে, তখন নাটকীয়ভাবে হিটলারের আবির্ভাব ঘটল বক্তৃতামঞ্চে। তাঁর বিশিষ্ট ভঙ্গীতে হিটলার জাতীয় সমস্যা নিয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন। নানাভাবে একই কথা বার বার বলতে থাকলেন। একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি 'chronic monotonous rhythmic stimuli'-এর কাজ করল। মস্তিষ্কের অংশবিশেষে নিস্তেজনা নেমে এল। বিশেষ করে সেই অংশগুলো যেগুলো ব্যক্তিগত নিরাপত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট,—এখন প্যারা-ডক্সিক্যাল কেন্দ্রের প্রভাবাধীন। মস্তিষ্কের অন্য অংশ থেকে বিচ্যুত বা dissociated জ্ঞানবুদ্ধি, যুক্তিবিদ্যা অন্তত সাময়িকভাবে অন্তর্হিত। এই সময়ে সাজেশন এল—জাতীয় নিরাপত্তার প্রতিবন্ধক ইহুদী তাড়াও। দৈবক্রমে এসে পড়ে জ্ঞানবৃদ্ধ অধ্যাপক ইহুদীবিদ্বেষের যুক্তিহীন সাজেশন মস্তিষ্কে নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। শুধু জার্মানীতে নয়, এ ধরনের অভিভাবন বিশেষ অবস্থায় সব দেশেই ঘটেছে। '৪৬-এর দাঙ্গার সময় আমার এক বুদ্ধিমান উকিলবন্ধু এক সন্ধ্যায়

---

* ডুবয় বলেছেন: "Suggestibility exerts a particular influence on all our deeds, colours our sensations, serves as a source of constant illusions which is very difficult to protect oneself even with the greatest possible effort of the mind."

আমার ভবানীপুরের বাসায় এসে উত্তেজিতভাবে বলতে লাগলেন, পার্কসার্কাসে ওরা যুবতী নারীর বক্ষদেশ ও শিশুর মাংস বেচছে। তিনি কিছুক্ষণ আগে এক বিশেষ রাজনৈতিক দলের পাণ্ডার কাছ থেকে এই অদ্ভুত সাজেশনটি নিয়ে এসেছেন। তাঁকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে গিয়ে লাভ তো কিছুই হল না, উপরন্তু ঘটল বন্ধুবিচ্ছেদ। দাঙ্গার বিশেষ পরিস্থিতিতে ভয়ে দুর্ভাবনায় নিরাপত্তার চিন্তার তাঁর মস্তিষ্কে আংশিক নিস্তেজনা ঘটেছিল। প্যারাডক্সিক্যাল দশায় ঐ পাণ্ডাটির কথা তাঁর মনে জোরালো অভিভাবনের কাজ করল। বিচারশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন আমার বুদ্ধিমান উকিলবন্ধু।

এই উগ্র উত্তেজনার পরিস্থিতির বিপরীত অবস্থাতেও অভিভাবনপ্রবণ-প্রবণতা বাড়তে পারে। সিনেমা নাটকের একটা দৃশ্য কল্পনা করা যাক। শান্ত সন্ধ্যা। নির্জন নদীর ধারে মুখোমুখি বসে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। নদীর টানে ডিঙ্গী ভাসিয়ে ভাটিয়ালী ধরেছে মাঝি। আকাশে পাণ্ডুর চাঁদ। ঈষৎ বিষণ্ণ রোমান্টিক পরিবেশ। ছেলেটিকে সকলেই জানে প্রফেশনাল প্রেমিক হিসেবে। মেয়েটিও জানে। এর আগে ওর প্রেমনিবেদনে মেয়েটি সাড়া দ্যায়নি। যুক্তি বুদ্ধি অনুসারে কাজ করেছে। আজকের এই বিশেষ পরিবেশে ছেলেটির আবির্ভাব অবাঞ্ছিত। কিন্তু এই পরিবেশে ছেলেটির প্রেম-নিবেদনে মেয়েটি বাধা দিতে পারছে না। বাস্তবে এরকমটি ঘটবে না, এমন নয়। 'তোমাকে না পেলে মর্ফিয়া কিম্বা পটাসিয়াম সায়ানাইড'—এই ধরনের মামুলি ন্যাকামিও মেয়েটি খুব সম্ভব বিশ্বাস করবে। মেয়েটির মস্তিষ্কের প্যারাডক্সিক্যাল দশার সুযোগ নিতে পারবে ছেলেটি। নাটক দেখতে গিয়ে আমরা এমন সব নাটকীয় ঘটনা নির্বিচারে মেনে নিয়ে থাকি, —যা অন্য সময় শুনলে হাসির উদ্রেক করবে। কারণ ঐ একই, নিস্তেজনা-প্রক্রিয়া বা প্যারাডক্সিক্যাল ফেজ। দৃশ্যপট, আলোকসম্পাত ইত্যাদি এই অবস্থা আনতে সাহায্য করে। অবশ্য অভিনয়ের আবেগধর্মিতার গুরুত্বও অনেকখানি কাজ করে।

অতি-স্ববিরোধী অবস্থা বা আলট্রা-প্যারাডক্সিক্যাল ফেজের সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলে আজকের চিঠি শেষ করব। সঙ্গে সঙ্গে শেষ হবে সম্মোহন প্রসঙ্গের আদিকাণ্ড,—নিদ্রাপর্ব। তোমাদের পাশের বাড়ীর সেই ছেলেটিকে মনে আছে? ডাকনাম ভণ্ডুল—দুধ খেতে গেলেই যার বমি আসত; বিশেষ করে যদি তার মা সামনে থাকতেন বা খেতে বলতেন। তুমি হয়ত বিশ্বাস করবে না যদি বলি যে, ওই ছেলে দুপুরে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আলমারী খুলে দুধ চুরি করে খেত! ওর মা মনে করতেন ঠাকুরের কাণ্ড। ব্যাপারটা কি হয়েছিল শুনবে? দিন রাতে, জাগ্রত, ঘুমন্ত, সব সময় ছেলেকে দুধ খাওয়ার কথা বলতেন স্নেহময়ী জননী। দুধ না খেলে পুষ্টি হবে কি করে? বার বার ঐ একই কথা শুনতে

শুনতে ছেলেটির মস্তিষ্কে দুধপান সম্পর্কে অতি-স্ববিরোধী অবস্থার বা ultra-paradoxical phase-এর সৃষ্টি হয়েছিল। দুধ খাওয়ার নির্দেশের পজিটিভ স্টিমুলাস্ নেগেটিভ রিফ্লেক্স নিয়ে আসত। শুধু লালা নয়, পাকাশয়ের জারক রসেরও ঘাটতি পড়ত। কাজেই দেখা দিত অনিচ্ছার ফলে বমনোদ্রেক। মা শেষ পর্যন্ত রেগে মেগে বলতেন—থাক, তোর খেতে হবে না, সবটা ভাইকে দেব। এই বলে দিবানিদ্রার আয়োজন করতেন। 'খেতে হবে না'—এই উদ্দীপক তখন খাবার প্রেরণা নিয়ে আসত। দুধ চুরি করত ভণ্ডুল। মা যশোদাও বোধহয় শ্রীমান ভণ্ডুলের মায়ের মতন অতি-স্নেহময়ী ছিলেন। গোপালের ননীচুরির মূলেও হয়ত ছিল এই ultra paradoxical phase।

উপসংহারে মনোবিদের উপদেশ, (বলতে পারো সাজেশন) – ভালবেসো, কিন্তু ভালোবাসার কথা বেশি বলো না প্রেমিককে। বেশি শুনতেও চেও না প্রেমের গুঞ্জন। অতি-স্ববিরোধী অবস্থার উদ্ভব হতে পারে। কয়েক সপ্তাহ লণ্ডনের চিঠি আসা যে বন্ধ আছে—সে একরকম ভালোই হয়েছে।

ঘুম সম্পর্কে আরো দুচার কথা বলে স্বপ্নের কথা বলছি। স্বপ্নের সঙ্গে প্রধানত এসব কথার সম্পর্ক। পরে বিস্তারিত ভাবে বলার চেষ্টা করব। এখন দু-এক কথা জেনে রাখো। কতক্ষণ ঘুমোই, এর গুরুত্ব নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু আরো বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় কোন ধরনের ঘুম হচ্ছে—তার ওপর। ঘুমের আবার ধরন আছে নাকি ? হ্যাঁ, আছে। পাতলা থেকে ঘুম ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হয়। ঘুমের এই গভীরতার চারটি দশা বা পর্ব আছে। প্রথম দশায়, পাতলা পাতলা ঘুমের সময় আমরা বেশি স্বপ্ন দেখি। এই ঘুমকে বলা হয় R. E. M. (rapid eye movement) ঘুম। সব সুস্থ মানুষের এই পর্বের সময় মোট ঘুমের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের সময় এর তিনগুন—মোট ঘুমের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। শেষ পর্ব অর্থাৎ গভীরতম ঘুমের মধ্যে আমরা কাটাই বাদবাকী সুপ্তিকাল। প্রথম পর্বে অর্থাৎ R. E. M. ঘুমের পর্বে যদি বাধা সৃষ্টি করা হয় তাহলে আমরা অস্বস্তি বোধ করি এবং পরবর্তী রাত্রিগুলোতে এই সময়টা বেড়ে গিয়ে মোট ঘুমের সময়ের প্রায় অর্ধেক না হলে আমাদের অস্বস্তি বোধ বা অতৃপ্তি কমবে না। এই পর্বে বাধা সৃষ্টি হলে মোট ঘুমের সময় ছয়-সাত ঘণ্টা হলেও আমাদের তৃপ্তি হবে না, অল্পতে বিরক্তি বোধ করবো বা রেগে যাবো। অন্য পর্বে এই ধরনের বাধা ঘটালে কিন্তু এই অস্বস্তি বোধ বা অতৃপ্তি ঘটবে না। প্রথম পর্বটির গুরুত্ব সর্বাধিক্য এই পর্বে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটলে অনেকের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। কিছু গবেষক মনে করেন স্বপ্ন দেখা থেকে বঞ্চিত হবার ফলে এই রকমটি ঘটছে। আবার আজ-কালকার

কিছু বিজ্ঞানকর্মীদের মতে স্বপ্নবঞ্চনা নয়: প্রাথমিক পর্বের ঘুমের ব্যাঘাতেই কেন্দ্রীয় স্নায়ু-সংস্থার বৃদ্ধি ও বিকাশ বাধা প্রাপ্ত হয়—তাই এই পর্বের অব্যাহত ঘুম, বিশেষ করে শিশুদের পক্ষে বিশেষ দরকারী। চতুর্থ পর্বের, অর্থাৎ গাঢ় ঘুমের গুরুত্বও বয়স্কদের পক্ষে কম নয়।

ঘুমের বড়ি (প্রধানত barbiturates ও amphetamine জাতীয় ওষুধ) প্রথম পর্বের ঘুমের এবং স্বপ্ন দেখার ব্যাঘাত ঘটায় বলেই ক্ষতিকর।

স্বপ্নকথা

এবার স্বপ্ন। ঘুমের পরেই স্বপ্ন। সবাই ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখবে অথবা যে স্বপ্ন দেখে তাকে যে রোজই দেখতে হবে, এরকম না ভাবলেও, ঘুম আর স্বপ্ন আদিম মানুষের মনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। দুটি শব্দের ক্রিয়াপদ সংস্কৃত ও রুশ ভাষায় নাকি একই। এ থেকে এই ধারণাই হওয়াই স্বাভাবিক যে ঘুম আর স্বপ্নকে আগের দিনে এক করে দেখা হত। তোমাকে আগেই লিখেছি মান্ধাতার আমল থেকে মানুষ স্বপ্ন-ব্যাখ্যা খুঁজতে চেষ্টা করছে। এই স্বপ্ন-ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে যেমন অনেক অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কার গড়ে উঠেছে, তেমনি আবার অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার স্বপ্ন-ব্যাখ্যাকে প্রভাবিত করেছে। গাছপালা পাহাড়-পর্বত নদী-সমুদ্র স্বপ্নের মধ্যে জীবন্ত হয়ে ওঠে, পশুপাখীর সঙ্গে কথা কই, সাতসমুদ্র তেরনদী পার হয়ে দৈত্যপুরীতে গিয়ে সোনারকাঠি ছুঁইয়ে রাজকন্যার ঘুম ভাঙাই। রূপকথার মত ঘুমের মধ্যে পাহাড় ওড়ে, সাগর স্বেচ্ছায় তার গর্ভের মণিমাণিক্যের ভাণ্ডার খুলে দেয়, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী মানুষের ভাষায় রাজপুত্রের ভাবী বিপদের ইঙ্গিত জানিয়ে তাকে সাবধান করে দিয়ে থাকে। সব বস্তুতে প্রাণ আছে—এই সর্বপ্রাণবাদতত্ত্বের প্রভাবে এ ধরনের স্বপ্ন দেখি, আর এইসব স্বপ্ন সর্বপ্রাণবাদতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে। আত্মা, পরমাত্মা, পরলোকের ধারণা স্বপ্ন থেকেই এসেছে বলে অনেকে মনে করেন। স্বপ্ন রহস্যে ভরা, আবার স্বপ্ন ভবিষ্যতের পথনির্দেশক—এই দুই ধরনের ধারণাই প্রাক্-বিজ্ঞানযুগে চালু ছিল। স্বপ্ন ঈশ্বরের অনুজ্ঞাবাহক ও অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী: এই ধারণা শুধু ব্যক্তিজীবন নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনকেও প্রভাবিত করেছে। স্বপ্নে 'ম্যায় ভুখা হুঁ'—শুনে লক্ষ্মণসেনের যুদ্ধায়োজন সুবিদিত ঐতিহাসিক ঘটনা। শোনা যায়, জাহাঙ্গীর নাকি স্বপ্নে মৃত পিতার আদেশমত এক বন্দী সভাসদকে মুক্তি দিয়েছিলেন। অজস্র কিংবদন্তী বাদ দিলেও এরকম ঐতিহাসিক ঘটনার দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

প্রাচীনকালে হিন্দুদের মধ্যে স্বপ্ন সম্বন্ধে প্রধানত দু'রকমের মতবাদ প্রচলিত ছিল। এক মতবাদ অনুসারে জাগতিক অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ আত্মা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে নিজস্ব এক জগৎ গড়ে তোলে—ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা লেনদেনের জগৎ। আর এক মত অনুসারে, ঘুমন্ত দেহপিঞ্জর ত্যাগ করে আত্মাবিহঙ্গ নতুন অভিজ্ঞতার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে;—স্বপ্ন সেই অভিজ্ঞতার ফল। সবদেশেই এই ধরনের মতবাদ প্রচলিত আছে : এই আদিম মানুষের দূরকল্পনা। এ ছাড়া প্রতিটি দেশের নিজস্ব সংস্কার-বিশ্বাস ও জীবনযাত্রার ধারার সঙ্গে যুক্ত আছে অনেক স্বপ্ন-ব্যাখ্যা। প্রসূতি যদি সাপের স্বপ্ন দেখে, বিশ্বাস করা হয় সে পুত্রসন্তান লাভ করবে। পূর্ণকুম্ভ যেমন যাত্রাকালে শুভ, স্বপ্নেও তেমনি শুভ ইংগিতবহ—অর্থপ্রাপ্তির ইংগিত। রক্তগোলাপ নেহরুর বটনহোলে স্থান পাবার অনেক আগে থেকে রক্তক্ষরা প্রেমের প্রতীক হিসেবে পরিগণিত; স্বপ্নে কিন্তু অশুভ ইংগিতের প্রতীক। এ-সব আমাদেয় দেশের স্বপ্ন-সংস্কার বলা যেতে পারে।

এ-রকম আরও অনেক স্বপ্ন-সম্বন্ধীয় সংস্কারের উল্লেখ করা যেতে পারে। হাতী বা ঘোড়ার পিঠে চড়ার স্বপ্ন যদি দেখ, (সে চিড়িয়াখানার হাতী বা দার্জিলিং-এর ঘোড়া হলেও) গ্রাম্যবিশ্বাস অনুযায়ী অর্থপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত ; তেমনি অর্থালাভের সম্ভাবনা পাহাড়ে ওঠার স্বপ্ন দেখায়। স্বপ্নে নরমাংস গ্রহণের অর্থ জান? ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করলে কি হবে? তোমার ঠাকুমা এ-স্বপ্ন দেখলে বর্তে যেতেন। এর অর্থ তোমার উচ্চাকাজ্ক্ষা ফলপ্রসূ হবে, লণ্ডনের ডাকে মোটা চিঠি আসবে। আবার ভাঙা দাঁতের স্বপ্ন দেখলে ঠাকুমা গুমরে থাকতেন কয়েকদিন, অর্থক্ষয় সুনিশ্চিত জেনে। আর যদি কোন রাতে মহিষারূঢ় হয়ে দক্ষিণ দিকে যাত্রার স্বপ্ন দেখতেন—তাহলে বাড়ীতে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ধুম পড়ে যেত। 'অবধারিত' মৃত্যুকে বাধা দেবার চেষ্টার কোনো ক্রটি থাকতো না। এ-সব হল ছকে বাঁধা স্বপ্ন। এর বাইরে, মানে—হিং টিং ছট জাতীয় স্বপ্ন দেখলে জ্যোতিষ পুরোহিতের বরাত খুলে যেত। হবুচন্দ্রের স্বপ্ন ছিল রাজকীয়, স্বপ্নার্থ-নির্ণয়েও ছিল তাই রাজকীয় ধুমধাম। অতটা না হলেও, নিশ্চয়ই সরগরম হয়ে উঠতো তোমাদের পূজোর দালান। প্রাচীন পুঁথি থেকে উদ্ভট শ্লোক আউড়ে, ঘন ঘন শিখা আন্দোলিত করে জটিল স্বপ্নের দুরূহ অর্থ-নির্ণয়ে লেগে পড়তেন তর্কচঞ্চু, স্মৃতিরত্নের দল। নস্যকণিকায় ও তাম্রকূটধূম্রে পূজোর ঘরের বাতাস ভরে যেত। বিশ্বাস হচ্ছে না? ঠোঁট বেঁকিয়ে ভুরু নাচিয়ে হাসবার আগে তোমার মাকে না হয় জিজ্ঞাসা করে দেখ।

প্রাচীন গ্রীসে অনেকদিন আগে থেকেই, ভাববাদী বস্তুবাদী দু'দল দার্শনিকই স্বপ্ন নিয়ে ঔৎসুক্য দেখিয়ে আসছেন। স্বভাবতই ভাববাদীদের উৎসাহে আতিশয্য ছিল। সক্রেটিস বলতেন, স্বপ্নের মাধ্যমে ঈশ্বর ভবিষ্যতের নির্দেশ

পাঠান, স্বপ্ন দৈববাণীরই সামিল। প্লেটো মনে করতেন, স্বপ্নের মাধ্যমে ঘটে আত্মার রহস্য উন্মোচন : শাশ্বত সনাতন সত্যের পরম অভিব্যক্তি। আবার সে-যুগের বস্তুবাদী দার্শনিক ডেমোক্রিটাসের মতে স্বপ্ন মস্তিষ্কের স্বয়ংক্রিয় কর্মতৎপরতার অভিব্যক্তি। ঘুমের মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলো নিষ্ক্রিয় থাকার দরুন মস্তিষ্কের উপলব্ধি-ক্রিয়া বন্ধ থাকে, স্বয়ংক্রিয় কর্মতৎপরতার তাই ঘটে বন্ধনহীন আধিক্য। হিপোক্রেটিসও মনে করতেন স্বপ্ন মস্তিষ্কের ক্রিয়া। এ্যারিস্টট্‌ল তো স্বপ্ন দিয়ে একখণ্ড বই-ই লিখে গেছেন। তাঁর মতে স্বপ্ন মস্তিষ্কপ্রসূত এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শুভাশুভের বা কোনোরকমের ইংগিতসূচক নয়। তিনি মনে করতেন—জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়-উপলব্ধি ও অনুভূতির প্রতিধ্বনি নিহিত থাকে স্বপ্নের মধ্যে। অনেক বস্তুবাদী দার্শনিক স্বপ্নতত্ত্ব নিয়ে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য সত্ত্বেও এ বিষয়ে তাঁরা একমত যে স্বপ্নের মধ্যে কোনো অলৌকিকত্ব নেই, অস্বাভাবিকত্ব নেই, স্বপ্ন স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক ঘটনা ; এবং স্বপ্ন নিঃসন্দেহে মস্তিষ্কের বিশেষ ধরনের ক্রিয়াকলাপ। এঁদের অভিমত যদিও প্রগতিসূচক, তবুও বিজ্ঞান-অনুমোদিত তথ্যপ্রমাণাদির অভাবে অনেকাংশে অনুমানের পর্যায়ে পড়ে। অবশ্য এঁদের যুগে মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণার কোনো সুযোগ ছিল না, কাজেই তথ্য-প্রমাণের কথা ওঠেই না। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, ওঁদের অনুমান বাস্তবঘেঁষা ও সাহসিকতার নিদর্শন। এঁদের কেউ কেউ স্বপ্ন দেখার ব্যাপারে বহির্জাত ও অন্তর্জাত উদ্দীপকের কথা তুলে সত্যের অনেকখানি কাছাকাছি পৌঁছেছেন, কিন্তু পাভলভের আগে পর্যন্ত কোনো বস্তুবাদী বিজ্ঞানীই স্বপ্নের রহস্য ভেদ করে স্বপ্নসৃষ্টির সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি।

স্বপ্ন দেখা নির্ভর করে ঘুমের গভীরতার তারতম্যের উপর। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন মানুষ যে আদৌ স্বপ্ন দেখে না, এমন নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্বপ্ন আমরা ভুলে যাই। দিনের বেলাকার তুচ্ছ কোনো ঘটনা থেকে স্বপ্নবৃত্তান্ত মনে পড়ে যেতে পারে। আবার কতকগুলো স্বপ্ন মনে এমন দাগ কেটে যায় যে, সারাজীবন আমরা মনে রাখি। বাস্তবের সঙ্গে আপাতসঙ্গতিহীন চিন্তা-কল্পনা ও রূপক স্বপ্নের বিশেষত্ব। জাগ্রত অবস্থার কল্পনা ও রূপকের বৈশিষ্ট্য স্বপ্নের মধ্যে থাকে না। যখন জেগে থাকি, তখন পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ সব কিছু উপভোগ করতে পারি। কিন্তু স্বপ্নে শুধু একটি ইন্দ্রিয়ের রূপকল্প জোরালো হয়ে ওঠে, সে ইন্দ্রিয়টি দর্শন-ইন্দ্রিয় ; তাই স্বপ্ন প্রধানত দৃশ্যময়। তা বলে স্বপ্নের মধ্যে আবেগ-অনুভূতি থাকে না, মনে করো না। তুমি ত' এক সময় ভয়ের স্বপ্ন দেখতে, স্বপ্নে আনন্দিত হতে, রেগে যেতে। তোমার মত দুঃস্বপ্ন দেখে ভয়ে ঘেমে ওঠে অনেকেই। স্বপ্নে হর্ষ-বিষাদ-আতঙ্ক আছেই।

তা ছাড়া লোভ, ঘৃণা, হিংসা ইত্যাদি রিপুও বেশ জোরালো হয়ে উঠতে পারে। মজা এই, জাগ্রত অবস্থায় যে পরিবেশ, যে ধরনের আবেগ অনুভূতিতে আমরা অভ্যস্ত, স্বপ্নে সেই পরিবেশে সেই ধরনের আবেগ অনুভূতি নাও হতে পারে। ধর, স্বপ্ন দেখলে মনুমেণ্টের তলায় একা বসে আছ। এক সিংহ মেট্রো সিনেমা থেকে সোজা বেরিয়ে এসে, তোমার কাছে বসে হাই তুলে বাজার দর নিয়ে আলোচনা শুরু করল। তুমি দিব্যি জমে গেলে। তোমার ফেভারিট কুচো চিংড়ি বাজার থেকে লোপাট হয়ে যাবার জন্য সিংহমশায় সহানুভূতি জানাতে তুমি খুশী হয়ে মশলার কৌটা থেকে মশলা বের করে তাকে খেতে দিলে। অথবা এমন স্বপ্ন দেখতে পারো, ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি বন্ধ, অথচ তোমাকে আউটরাম ঘাটের সেই রেস্তোর াঁতে যেতেই হবে। বন্ধুকে কথা দিয়েছ। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি করা যায় ভাবছ। এমন সময় খড়্গা উঁচু করে এক আসামের গণ্ডার এসে তোমাকে তার পিঠে করে লিফ্‌ট দিতে চাইল। 'থ্যাঙ্ক" বলে তার পিঠে চড়ে বসলে। শৃঙ্গী-দন্তী থেকে শত হস্ত দূরে থাকার নীতিবাক্য মানবার দরকারই নেই তোমার। 'ভয়' নামক স্বাভাবিক ইমোশনটি আদৌ প্রকাশ পেল না। আবার ঐ অতি-পরিচিত বন্ধুটিকে আউটরাম ঘাটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তুমি হয়ত ভয় পেয়ে ছুটতে আরম্ভ করলে। থামলে এসে একেবারে এসপ্ল্যানেডে। স্বপ্নে এরকম 'এ্যাবসার্ড' নাটকের অভিনয় হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়। কত উদোর পিণ্ডি যে বুধোর ঘাড়ে পড়ে তার আর ইয়ত্তা নেই।

কেউ কেউ স্বপ্নের মধ্যে কথা কয়, হাসে, কাঁদে, রীতিমত অভিনয়ও করে অনেকে। স্বপ্নের মধ্যে জটিল গাণিতিক সমস্যার মীমাংসা করে অনেকে আনন্দে লাফিয়ে উঠেছেন। শোনা যায় অনেক কবি স্বপ্নের মধ্যে কাব্য রচনা করেন। শুনতে পাই, রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গল্প-কবিতার অনুপ্রেরণা নাকি স্বপ্নদত্ত। কোলরিজ তো' গোটা একটা কবিতা লিখে ফেলেছিলেন স্বপ্নের মধ্যে। "কুবলা খাঁ—" তাই না ?

দিবা-স্বপ্নে আমরা সবাই কমবেশি অভ্যস্ত। অলস মধ্যাহ্নে বল্‌গা ছাড়া মনোরথে চেপে মাঝে মাঝে কল্পনার রাজ্যে উধাও হতে কে না চায় ? তুমি বলবে 'আমি চাই না'। আমার ভুল হয়েছে। 'মনোরথ' সেকেলে ও অতিব্যবহৃত শব্দ। লেখা উচিত ছিল 'রকেট' কিম্বা পাইলটহীন জেট প্লেন। তাহলেই তোমার কল্পনা-নদীতে বান ডাকতো। জেগে স্বপ্ন দেখতে।···ক্রয়ডন এয়ারপোর্টে নেমেছ। গুঁড়ি গুঁড়ি তুষার পড়ছে। ওকে কেব্‌ল করে যাওনি। শুধু বান্ধবী ইলাকে জানিয়েছিলে তোমার হঠাৎ লণ্ডন যাত্রার মতলব। তুমি জানতে পাশের ফ্লাটেই ও থাকে, কাজেই জানতে পারবেই। এই ভোর রাতে

আরামের ঘুম ছেড়ে ও আসবে কি এয়ারপোর্টে ? এই তোমার চিন্তা। ও যদি না আসে !—না, নিশ্চয়ই আসবে। ওর প্রেমের পরীক্ষা নেবার জন্য যেন তোমার এই আকস্মিক লণ্ডন অভিযান। স্যুটকেসের ভারে ঈষৎ হেলে যাত্রীদের সঙ্গে তুমি কাষ্টম্‌স্ অফিসের দিকে চলেছ। তোমার দৃষ্টি রেলিং-এর ওপাশের ছোট জমায়েতটির ওপর। কোথায় ও ? চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছে, এমনি সময়ে দেখলে লম্বা সুঠাম পরিচিত মূর্তিটি এগিয়ে আসছে, হ্যাট-কোট-ছত্র শোভিত হয়ে। দেখতে না পাওয়ার ভান করে তুমি এগিয়ে চললে। পুরো দু-সপ্তাহ চিঠি লেখেনি। তুমি কথা বলবে না—কিছুতেই কথা বলবে না !

ঠিক এরকমটি না হলেও, কাছাকাছি ধরনের দিবা-স্বপ্ন নিশ্চয়ই তুমি দেখে থাক। কাব্য থাক। এবার কাজের কথায় আসা যাক। ঘুমের স্বপ্ন আর দিবা-স্বপ্নের মধ্যে তফাৎটা এবার বুঝতে চেষ্টা কর। তুমি বলবে, এ ত' সোজা। দিবা-স্বপ্নে সঙ্গতি আছে, অনুবর্তিতা আছে, খুশীমত তাকে পরিচালনা করা যায়, পরিণতি তোমার ইচ্ছাধীন। না ; ঠিক তা নয়। বিচারবুদ্ধি পরিচালিত চিন্তাধারা আর দিবাস্বপ্ন এক নয়। পুরোপুরি জেগে থেকে দিবাস্বপ্ন দেখা চলে না। মস্তিষ্কের কতকগুলো জায়গা নিস্তেজিত থাকে যদি, তবেই দিবা-স্বপ্ন দেখতে পাবে। চিন্তাধারা ও রূপকল্প দিবাস্বপ্নে পুরোপুরি আয়ত্তে থাকে না। অনুপ্রাণিত কবিতার লাইনের মত যেন আপনা থেকে বেরিয়ে আসে। আধুনিক কবিতার মত প্রচ্ছন্ন সূত্রসঙ্গতি থাকলেও, স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে আপাত-অসঙ্গতিটাই নজরে পড়ে। কল্পনাবিলাসী মানুষ, যাদের মধ্যে প্রথম সাংকেতিক স্তরের প্রাধান্য, তারা ত' অনেক সময় দিবাস্বপ্নে একেবারে ডুবে যায়। নিজেদের হারিয়ে ফেলে। বাস্তব ও কল্পনার সীমারেখা তাদের প্রায় অবলুপ্ত হয়ে যায়।

দিবাস্বপ্নকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিলে কিন্তু ক্রমশ বাস্তববিমুখ হয়ে পড়বে। পলায়নী-মনোবৃত্তি জেগে উঠবে। স্বপ্ন-দুর্গে কঠোর বাস্তবের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা-ব্যূহ গড়ে আকাশ-কুসুম রচনা করে মালা গাঁথা বেশ আরামের। কিন্তু সে মালা গলায় পরতে রক্তমাংসের মানুষ কোনোদিন এগিয়ে আসবে না। সব চাওয়া পাওয়ার পরিসমাপ্তি ঘটবে স্বপ্নের মধ্যে। এইভাবে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনেকে নিউরোটিক হয়ে পড়ে। খুব সাবধান। দিবা-স্বপ্নের চরম পরিণতি অলীক বিশ্বাস (hallucination) - মানসিক রোগের লক্ষণ।

কথাটি যখন এসেই পড়লো, বিস্তারিতই করি। স্বপ্নে সম্ভব-অসম্ভব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। মৃত বন্ধুকে সিগ্রেট চাইতে দেখলে চমকে ওঠে না। শান্তি কংগ্রেসে হিটলারের মুখে বিশ্বশান্তির বক্তৃতা শুনে অবাক হয় না। হিরোসিমা থেকে হেলসিংকি যেতে স্বপ্নে মিনিট দুয়েক সময় লাগলে খুব বেশি

লেগেছে মনে হতেও পারে। কোলকাতার রাস্তায় সার বেঁধে আফ্রিকার সিংহের দল শ্লেজগাড়ী চালিয়ে চলেছে মোহনবাগানের মাঠে ছাগল আর ভেড়ার দলের ফুটবল ম্যাচ দেখতে—এ দৃশ্যও স্বপ্নের মধ্যে বিস্ময় জাগায় না। এই আন্‌-ক্রিটিক্যাল মনোভাব অলীক বিশ্বাসের বিশেষত্ব। তাই অনেক মনস্তাত্ত্বিকের মতে স্বপ্ন আর অলীক বিশ্বাস এক পর্যায়ে পড়ে, অবশ্য শারীরবৃত্তের দিক থেকে।

ভুল দেখা, ভুল শোনা মাত্রেই কিন্তু অলীক বিশ্বাস নয়। উপলব্ধি যখন ভাবাবেগে স্বপ্নের মত রঙিন, উজ্জ্বল ও জীবন্ত হয়ে ওঠে তখনই মাত্র সেটাকে অলীক বিশ্বাস অর্থাৎ hallucination বলা চলে। স্বপ্ন যেমন বাস্তবের প্রতিফলন নয়, অলীক বিশ্বাস তেমনি বাস্তবানুগ নয়। অলীক বিশ্বাসংক্রান্ত মানুষ এমন দৃশ্য দেখতে পায়, যার আদৌ কোন অস্তিত্ব নেই। এমন শব্দ বা কথা শোনে, যা উচ্চারিত হয়নি। এমন গন্ধ তার নাকে যায়—যার আধার বা বাহক কাছেপিঠে নেই। প্রত্যেকটি উপলব্ধি আবার অতিমাত্রায় জোরালো। উপলব্ধির প্রভাবে হর্ষ ভয় ইত্যাদি আবেগ সঞ্চারিত হয় তীব্রভাবে। অথচ উপলব্ধির কোনো প্রকরণ বহির্বাস্তবে নেই। আর সে কথা হ্যালুসিনেশনের রোগীকে বোঝায় কার সাধ্যি! তার দৃঢ় বিশ্বাস তার স্বর্গত মা-ই তার নাম ধরে ডাকছেন: আমরা বধির তাই শুনতে পাচ্ছি না। তার সামনে দাঁড়িয়ে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বৈকুণ্ঠপতি মৃদু মৃদু হাস্য করছেন: আমরা মূঢ়জন তাই সেই দিব্যরূপ দর্শনে বঞ্চিত। নন্দনকাননের পারিজাতের সৌরভ তার নাকেই শুধু আসছে। অন্যের সে সৌভাগ্য হয়নি বলে বড় জোর সে দুঃখিত হতে পারে; কিন্তু তার দেখা বা শোনার কোনো গোলমাল হয়েছে, একথা সে কিছুতেই মানবে না।

কেন এবং কি করে এমন ঘটে জানতে চাও? চাও আর না চাও, আমাকে বলতেই হবে। অনুভূতি-উপলব্ধি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা না জন্মালে তুমি পাভলভীয় স্বপ্ন-তত্ত্ব বুঝতে পারবে না।

*　　*　　*　　*

দেখা, শোনা ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়োপলব্ধির মূলে আছে উপলব্ধির উৎসের অস্তিত্ব। শব্দতরঙ্গই হোক আর আলোর তরঙ্গই হোক; পরিবেশের কোনো মূর্ত বস্তু থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে ইন্দ্রিয়পথে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে মস্তিষ্ককোষকে উত্তেজিত করলে তবেই উপলব্ধি ঘটে। উৎস-বস্তুটি সব সময়েই দেশ-নির্দিষ্ট। দেশের (space) এক বিশেষ বিন্দুতে তার অবস্থান নির্ণয় আমরা করতে পারি। এরোপ্লেনের শব্দ শুনে বুঝতে পারা যায় মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়লেও

এক নির্দিষ্ট পথ ধরে সেটি উড়ে যাচ্ছে। দর্শনেন্দ্রিয়ের উপলব্ধির বেলায় বস্তুটির অবস্থান আরও বেশি নির্দিষ্ট। চোখ আর উপলব্ধি-উৎসের মধ্যে কোনো আড়ালই থাকে না। তোমার মুখশ্রী অবলোকন মানে তোমার মুখাবয়বকে দৃষ্টিপথের মধ্যে পাওয়া। তোমাকে যখন দেখি, তোমার আয়ত চোখ, তোমার তিলফুল নাসা, তোমার আপেলগণ্ড, তোমার রক্তিম অধর, সবই উজ্জ্বলভাবে আমার মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হয়। তোমার কণ্ঠস্বর যখন শুনি, স্বরগ্রামের ওঠানামা, রুক্ষতা, মিষ্টতা সবই মস্তিষ্ককোষের ·উত্তেজনার তারতম্যে আমার কাছে ধরা পড়ে। বেশ স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে। আলোকতরঙ্গ বা শব্দতরঙ্গ উৎস থেকে বেরিয়ে দর্শনেন্দ্রিয়ের বা শ্রবণেন্দ্রিয়ের বাইরের প্রান্ত-উপাঙ্গ ('end organs' বোঝাতে এর থেকে ভাল শব্দ পেলাম না !) দ্বারা বিশ্লেষিত হয়ে অন্তর্বাহী নার্ভ-মারফত মস্তিষ্কে পৌঁছয়। সব ইন্দ্রিয়ের নার্ভগুলোই মস্তিষ্কের এক একটা বিশেষ জায়গায় গিয়ে শেষ হয়। উত্তেজনা স্নায়ুমাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে সংশ্লিষ্ট মস্তিষ্ক-কোষগুলোকে আলোড়িত করে। এখানে মস্তিষ্ককোষ মানে উচ্চ মস্তিষ্ক-বল্কলের (cerebral cortex) কোষ। ইন্দ্রিয়ের এ প্রান্তেরও আছে বিশ্লেষণক্ষমতা। শেষ বিশ্লেষণ এই সব কোষেরই কাজ। সূক্ষ্মতন্তুজালের (reticular formation) কথা এখন তুলছি না। একটু সরলীকরণ করছি। বহির্বাস্তবের সব উদ্দীপনাই দু' দুবার বিশ্লেষিত হয়, একবার ইন্দ্রিয়গুলোর বাইরের গেটে আর একবার ভেতরের গেটে। মস্তিষ্ক-বল্কলের কোমল কোষগুলো যেন কোম্পানীর বড় সাহেব। বড় বড় ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত। যা তা খবর দিয়ে তাঁকে বিরক্ত করা চলবে না। তাই এত কড়াকড়ি। গেটে গেটে পাহারা। মস্তিষ্ক-বল্কলের কোষের উত্তেজনা থেকে ঘটে উপলব্ধি। উপলব্ধি থেকে ধারণা বা কল্পনা,—যাকে ইংরাজীতে বলা হয় concept।

ধারণা বা কল্পনার জন্য বস্তুর উপস্থিতি নিষ্প্রয়োজন। তোমাকে না দেখেও তোমার মুখশ্রী কল্পনা করতে পারি। তবে তোমাকে দেখা এক জিনিস আর তোমার মুখশ্রী কল্পনা করা আর এক জিনিষ। দুধের তৃষ্ণা ঘোলে মেটে না। দেখার তৃপ্তি কল্পনাতে নেই। কেননা কল্পনার প্রতিবিম্ব প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মত উজ্জ্বল হতে পারে না। কল্পনাছায়ার মধ্যে তোমার মুখাবয়বের প্রতিটি সূক্ষ্ম দেখা রূপায়িত হবে না। কল্পনা উপলব্ধির তুলনায় অনেকখানি নিষ্প্রভ, খানিকটা বিমূর্ত। একটা আপেল বা আম কল্পনা করতে গেলে যেমন আপেল বা আমের সাধারণ একটা রূপ মনে আসবে—নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকবে না, তোমার মুখশ্রী কল্পনা করতে গেলে তেমনি সুন্দরী তরুণীর সামান্যীকৃত এক রূপরেখার মধ্যে তোমার মুখের বিশিষ্ট সূক্ষ্মরেখার হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে। কল্পনা বা ধারণায় বহির্বাস্তবের কোনো স্থান নেই। কোনো নির্দিষ্ট অবস্থানবিন্দু নেই

কল্পনা-উৎসের। তার মানে দেশ-সাপেক্ষ নয় কল্পনা। সুস্থ মানুষ আম বা আপেলের কল্পনা করলেও, কখনও মনে করে না কল্পনার আমটি বা আপেলটি হাতের কাছে এসে যাবে বা তা থেকে রসনার তৃপ্তি হবে। কল্পনা দেশ-সাপেক্ষ না হলেও খানিকটা কাল-সাপেক্ষ কিন্তু। অনেক দিন আগে দেখা দৃশ্য বা বস্তু-কল্পনা ক্রমশ বেশি বিমূর্ত, বেশি নিষ্প্রভ হয়ে আসে। প্রিয়তমের মুখচ্ছবিও কালের ব্যবধানে অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। সুবিধা এই, খেয়ালখুশীমত অশ্ব-মনোরথের বল্গা ছেড়ে কল্পনা করা চলে। 'মনসা-মথুরায়' সব সময় যাওয়া চলে, বাস্তব মথুরায় যাওয়া চলুক আর না চলুক। উপোষী মানুষ বিরাট ভোজের কল্পনা করতে পারে ; পেট ভরুক আর না ভরুক। এই ধারণা বা কল্পনার উৎসটা কোথায় ? এইত' তোমার প্রশ্ন। উপলব্ধির উৎস পরিবেশে, আর কল্পনার উৎস মনোদেশে। ইন্দ্রিয়ের বিশ্লেষণী স্নায়ুউত্তেজনা উপলব্ধির জন্মদাতা। উপলব্ধির পরও কিন্তু মস্তিষ্ক-প্রান্তের বিশ্লেষণী কোষে এই উত্তেজনার চিহ্ন বজায় থেকে যায়। সবটা মুছে যায় না—জের থাকে। অবশ্য প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ঔজ্জ্বল্য ও তীব্রতা তখন আর থাকে না। উপলব্ধি-জনিত উত্তেজিত নার্ভকোষগুলোই কল্পনার উৎস। অনুষঙ্গের প্রভাবে, নানাভাবে ঐ উত্তেজনার পুনরাবির্ভাব ঘটতে পারে। বহির্বাস্তব উপলব্ধির স্তর থেকে এখন কল্পনা বা ধারণার স্তরে পৌঁছেছে। 'পারসেপ্‌শন' 'কনসেপ্ট্‌'-এর জন্ম দিয়েছে।

এই হল কল্পনার শারীরবৃত্ত। এখন অলীক কল্পনা বা হ্যালুসিনেশনের ব্যাখ্যা অনেকটা সহজ হবে। মস্তিষ্কের সেই বিশেষ অবস্থার কথা ভোলনি নিশ্চয়ই—যে অবস্থায় দুর্বল উদ্দীপক প্রবল উত্তেজনা জাগায়। যাকে বলা হয় প্যারাডক্সিক্যাল ফেজ। এই আপাত-বিরোধী অবস্থার আবির্ভাবে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে ? কল্পনার উৎস, মৃদু-উত্তেজনার কেন্দ্রগুলো তীব্রভাবে আলোড়িত হবে ! কল্পনা আর কল্পনা থাকবে না -সেখানে উপলব্ধির স্পষ্টতা আর তীব্রতা দেখা দেবে। যার মস্তিষ্কে এই রকমটি ঘটবে সে স্বভাবতই মনে করবে—উপলব্ধির 'বিষয়টি' (subject) রয়েছে তার বাইরের পরিবেশে ; একটি নির্দিষ্ট অবস্থান-বিন্দুতে। আমরা তাকে বলব কিন্তু অলীক-কল্পনার রোগী। এদের মস্তিষ্কে আরও একটি অসুস্থ প্রক্রিয়া ঘটেছে। উপলব্ধির উত্তেজনা-বিন্দুগুলো স্বাভাবিকভাবে আর নিস্তেজিত হচ্ছে না। উত্তেজনাকে প্রতিহত করার শক্তি হারিয়ে গেছে। অবশ্য সব জায়গায় নয়, মস্তিষ্কের কোনো কোনো অংশে। উত্তেজনা-বিন্দুগুলো অনড় (inert) হয়ে থাকার দরুন মিথ্যা উপলব্ধির সংকেত জাগছে। মস্তিষ্কের স্থানবিশেষে বিকৃত বাস্তব প্রতিফলিত হচ্ছে। ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝাবার চেষ্টা কর। না হলে অলীক-কল্পনা রহস্যাবৃতই থেকে যাবে। মস্তিষ্কে এসেছে সামগ্রিক নিস্তেজনার একটা পর্ব (প্যারাডক্সিক্যাল পর্ব), আবার

বিশেষ কতকগুলো বিন্দুতে ঘটেছে নিস্তেজনার স্বল্পতা। গোলমেলে লাগছে ? একটু ভেবে দেখলে আর লাগবে না। ব্যাপারটা মোটেই অসম্ভব নয়। ঘুমিয়ে যখন স্বপ্ন দেখছ তখন ঠিক এই বৈপরীত্যের ব্যাপারই ঘটছে। সারা মস্তিষ্কে চলেছে নিস্তেজনার শেষ পর্ব, আবার কতকগুলো বিন্দু উত্তেজিত বা অ-নিস্তেজিত। তারা যেন বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে বসেছে। তাদের ক্রিয়াকলাপ থেকেই স্বপ্নের উদ্ভব। এবার বুঝলে ত'!

দু-ক্ষেত্রেই কোষগুলোতে মৃদু উত্তেজনা, কিন্তু 'প্যারাডক্সিক্যাল' পর্বের জন্য প্রতিবিম্ব উপলব্ধির মত উজ্জ্বল আর বর্ণাঢ্য!

অলীক-কল্পনা আর স্বপ্ন অনেকটা একই রকমের মনে হচ্ছে না কি ? তফাতটা এই, জাগ্রত অবস্থায় (আপেক্ষিক অর্থে) অলীক কল্পনার উৎপত্তি আর ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের আবির্ভাব। স্বপ্ন দেখছে যে, তার অন্য কোনো অনুভূতি বা উপলব্ধি থাকে না। অলীক কল্পনাবিলাসীর মস্তিষ্কে প্রায়ই বাস্তব-অবাস্তবের, স্বাভাবিকতা-অস্বাভাবিকতার তীব্র বিরোধ চলে, তাই এই সংঘর্ষে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর স্বপ্ন দেখে সুস্থ অসুস্থ সব মানুষ।

একটু আগেই একটা কথা লিখেছি যার উপর কিছু টিকাটিপ্পনী না কাটলে সত্যের অপলাপ করা হবে। সহজ করে বোঝানোর জন্য অনেক সময় আমি জটিলতা পরিহার করেছি ; তা বলে বিজ্ঞানকে সহজবোধ্য বা পপুলার করার নামে বিকৃত করার ইচ্ছে আমার নেই। তাই কথাটা তুলতে হল। কল্পনার উৎস পরিবেশে নয়, মনোদেশে,—আমার এই উক্তি থেকে ভ্রমাত্মক ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। অলীক-কল্পনা বা স্বপ্নের কারণ মস্তিষ্কের এক বিশেষ অবস্থা হলেও একথা মনে করা ঠিক হবে না যে স্বপ্ন বা অলীক-কল্পনা সব সময় পুরোপুরি অবাস্তব। তা হলেই আমরা ভাববাদীদের খপ্পরে পড়ে যাব। প্রায় সময়েই সংকেত বা উদ্দীপনার অস্তিত্ব কোথাও না কোথাও থাকে ; কিন্তু মস্তিষ্কের বিশেষ অবস্থার দরুন সেটা সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় না, এই মাত্র,—এই উদ্দীপনা বহির্জাতও হতে পারে, আবার অন্তর্জাতও হতে পারে। অর্থাৎ বাইরের পরিবেশ থেকেও আসতে পারে, আবার দেহের মধ্যেকার যন্ত্রাংশ থেকেও উঠতে পারে উদ্দীপনার ঢেউ। অলীক-কল্পনা বা হ্যালুসিনেশনের রোগীর সঙ্গে চিকিৎসক মাত্রেই পরিচিত। আর স্বপ্ন নিয়ে সাম্প্রতিককালে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। তা থেকে ভালভাবেই বোঝা গেছে যে স্বপ্নেরই হোক আর অলীক-কল্পনারই হোক—কোনো না কোনো রকমের উদ্দীপনার উৎস অনেক ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। উৎসটি কোনো সময় সহজেই ধরা পড়ে, সময় সময় আবার উৎস খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন। গোলমালটা প্রধানত প্রতিফলনের। বিশেষ অবস্থার জন্য মস্তিষ্কের সামগ্রিক কার্যকলাপ বিঘ্নিত, এই প্রতিফলন বিকৃত ও অতিরঞ্জিত।

অন্তত একটা রোগীর অলীক-কল্পনার উৎসের সন্ধান যদি তোমাকে দিতে পারি, মনে হয় ব্যাপারটা তোমার কাছে পরিষ্কার হবে। বর্ধমান জেলার ছোট এক শহর থেকে এসেছিলেন ভদ্রমহিলা। শ্রবণেন্দ্রিয়ের হ্যালুসিনেশনে ভুগছেন। বাড়ীর পাশের বাস-স্ট্যাণ্ডে *যতক্ষণ বাস যাতায়াত করত ততক্ষণ তিনি শুনতেন যেন বাসের ড্রাইভার কণ্ডাক্টররা অশ্লীল ভাষায় তাঁকে গালাগালি করছে। রাত্রে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে গালাগালি তাঁর কানে আসতো না। এখানে বাসের শব্দ ছিল অলীক-কল্পনার উৎস। কিছুদিন পরে বাস-স্ট্যাণ্ড ওখান থেকে উঠে গেলে তিনি আর বাস-চালক কণ্ডাক্টরদের গালাগালি শুনতে পেতেন না। এই স্ট্যাণ্ড ওঠানোর ব্যাপারে তাঁর স্বামীর হাত ছিল, তিনি জানতেন। এর জন্যে বর্ধমান কোর্টে মামলা-মোকদ্দমা চলছে তিনি শুনলেন। তাঁর হ্যালুসিনেশন তখন অন্য রূপ নিল। এক অচেনা পুরুষ কণ্ঠস্বর, প্রধানত দুপুরে, তিনি শুনতে লাগলেন। এবার স্বামীকে শাসাচ্ছে। মামলায় তাদের হার হয়েছে, তাই স্বামীকে খুন করে মাটিতে পুঁতে ফেলা হবে। দুপুরে যেদিন স্বামী বাড়ী থাকতেন, অর্থাৎ ছুটির দিনে ভদ্রমহিলা কণ্ঠস্বর শুনতেন না। স্বামী বাড়ীতে থাকার দরুন তাঁর অমঙ্গল-চিন্তা মনে আসত না—এটুকু বেশ বোঝা গেল। কিন্তু হ্যালুসিনেশনের উৎস এক্ষেত্রে কোথায়? আবার, স্বামীর সঙ্গে ট্রেনে করে যখন কোলকাতায় আসতেন, তখন সারা রাস্তা তিনি ঐ কণ্ঠস্বর শুনতে পেতেন। কোলকাতায় আসার পর কিন্তু কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে যেত; কেন? কোলকাতা নিরাপদ, বিশেষত এখানে স্বামীর বন্ধুবান্ধব অনেক আছে, তাঁর চিকিৎসক আছে—এই সব হয়ত কারণ। বিশদ আলোচনার দরকার নেই। শুনে রাখ, এখানে উৎস ছিল বিকৃত-কণ্ঠের এক ভিখারী গায়ক। রোজ দুপুরে তার সঙ্গীতচর্চা ভদ্রমহিলার মনে ভীতি সঞ্চার করত আর সঙ্গে সঙ্গে ঐ অলীক কল্পনা জাগত। স্বামীর ভয়ে ছুটির দিনে পারতপক্ষে ভিখারীটি তাদের বাড়ীর পথ মাড়াতো না। ট্রেনের মধ্যেও ঘটতো সঙ্গীত-পারদর্শী অন্য সব ভিক্ষুকের আবির্ভাব। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি শুনতেন বর্ধমান কোর্টের নকীবের কর্কশ কণ্ঠস্বর। স্বামীকে ভয় দেখাচ্ছে। স্বামী ভয় পেতেন না বটে, তিনি কিন্তু ভয়ে উত্তেজিত হয়ে অদ্ভূত ব্যবহার করতেন। এরকম আরো দু'একটা কেস শোনাতে পারি—কিন্তু তাতে স্বপ্ন-ব্যাখ্যায় পৌছুতে অনর্থক আমাদের দেরী হয়ে যাবে। তোমার পক্ষে ধৈর্যধারণও কঠিন হবে। তা ছাড়া আমার তথ্যপ্রমাণের বিপরীত তথ্য ও মত তোমার পরিচিত বন্ধুবান্ধব হাজির করবেন। তুমি পড়ে যাবে মুস্কিলে! কাজেই এ বিষয়ে এখানেই ইতি। শুধু এইটুকু জানিয়ে রাখি যে, অলীক-কল্পনার উৎস-সন্ধান সকল সময়ই সহজসাধ্য নয়, কোনো কোনো সময়ে দুঃসাধ্যও বটে। বিশেষ করে যখন আন্তরযন্ত্র থেকে

উদ্দীপনার উদ্ভব হয়। তাই এ-নিয়ে অনেক অলীক তত্ত্বের প্রচার এত সহজ হয়েছে।

স্বপ্নেরই হোক আর অলীক কল্পনার ক্ষেত্রেই হোক, স্মৃতিতে সংরক্ষিত ধ্যানধারণার সঙ্গে সুদূর সম্পর্কিত অনুষঙ্গ অনেক সময় উদ্দীপকের কাজ করে বলে উৎস-উদ্দীপকের মূল খুঁজে পাওয়া এত কঠিন। স্বপ্ন উৎস প্রসঙ্গে এবার যে আলোচনার অবতারণা হবে, তার ভেতর দিয়ে আমার বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে আশা করি।

স্বপ্নের পর্যালোচনায় আমাদের নির্ভর করতে হয় তোমার মত স্বপ্ন যে দেখছে তার স্মৃতির উপর। স্বপ্ন দেখার পর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্বপ্নটিকে আবার ভুলে যাও; অন্তত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মনে করতে পার না। সকলেরই ঐ অবস্থা। অবশ্যি ঘুমের মধ্যে তোমার ব্যবহার থেকেও আমি স্বপ্নের প্রকৃতি খানিকটা অনুমান করতে পারি। ধর, ঘুমের মধ্যে তোমার মুখে মিষ্টি হাসি ফুটে উঠেছে, রক্তিমাভ হয়ে উঠেছে গালদুটি। ঘুম ভাঙিয়ে জিজ্ঞাসা করলে তুমি বলবে, স্বপ্নে তুমি লণ্ডনে হাজির হয়েছ। কিম্বা লণ্ডনবাসী বন্ধুটি এসে গেছে ভারতের এক শৈলাবাসে। আর সেই সব কথা তার মুখে শুনছ,—যা শুনতে সব মেয়েই ভালবাসে। তুমি হয়ত তোমার ভাইপো বাচ্চুর মত কেঁদে উঠবে না স্বপ্ন দেখে; কিন্তু নাসিকা ও ওষ্ঠের কুঞ্চন দেখলে বোঝা যাবে তুমি স্বপ্নে ব্যথা পেয়েছো। অঙ্কের দিদি হয়ত তোমার মাথার মধ্যে গোবর পোরা মনে করেছেন, অথবা ভূগোলের দিদি তোমাকে ভারবাহী কোন চতুষ্পদ জন্তু বলে অভিহিত করেছেন। স্বপ্নের মধ্যে কয়েক বছর পেছিয়ে কৈশোরের দিনগুলিতে ফিরে গেছ। অথবা ঘরে চোর ঢুকেছে। তোমার শাড়ীগুলোই বেছে বেছে নিয়ে যাচ্ছে। দরজার ওপারেই রামকিষেণ। চেঁচিয়ে তাকে ডাকবার চেষ্টা করছ, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না। বুকের উপর পাষাণ ভার, গা দিয়ে গলগল করে ঘাম ছুটছে। তোমার অস্ফুট গোঙানি আর ছটফটানির শব্দ শুনে মার ঘুম ভেঙেছে। তিনি ধাক্কাধাক্কি করতে তুমি উঠে বসলে। ওঃ স্বপ্ন! বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পুরো এক গ্লাস জল ঢক ঢক করে পান করলে। একে বলে বিকট স্বপ্ন বা নাইটমেয়ার। তোমার ব্যবহারে স্বপ্নের প্রকৃতি ধরা পড়েছে।

কিন্তু সব সময় এভাবে স্বপ্ন নিয়ে গবেষণা সম্ভব নয়। তাই আধুনিক গবেষকেরা স্বপ্ন তৈরী করিয়ে তার উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। একটু পরেই এ প্রসঙ্গে আসব। তার আগে বলে রাখি ঘুমের গভীরতার সঙ্গে স্বপ্ন দেখা না দেখা নির্ভর করে। আগেই বলেছি বোধ হয়, ঘুম যত গভীর স্বপ্ন তত কম। অগভীর ঘুমের মধ্যেই স্বপ্নের জন্ম। গভীর ঘুম মানে মস্তিষ্কের

সর্বস্তরে নিস্তেজনা, গুরু ও লঘু মস্তিষ্কের সর্বাত্মক নিষ্ক্রিয়তা। মননক্রিয়া, পাভলভের মতে, মস্তিষ্কের উপর বহির্জগতের বা আন্তরযন্ত্রের উদ্দীপনার প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই নয়। মস্তিষ্ক পুরোপুরি ঘুমিয়ে থাকলে মননক্রিয়ার অস্তিত্ব সম্ভব নয়। স্বপ্ন নিঃসন্দেহে মননক্রিয়া; কাজেই স্বপ্ন দেখাও সম্ভব নয়। কতকগুলো জায়গা যখন জেগে থাকে, বা অ-নিস্তেজিত অবস্থায় থাকে, তখনই মাত্র মানুষ স্বপ্ন দেখে। এই সোজা কথাটা বারবার আমি বলছি কেন? কারণ আছে। কিছু দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিকের মতে স্বপ্ন আত্মার ক্রিয়াশীলতার পরিচয়। ঘুম যত গভীর, আত্মা তত সক্রিয়। নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে আত্মার গতি ও ধর্ম। স্বপ্নকে নির্জ্ঞান মনের প্রক্রিয়া যাঁরা মনে করেন, তাঁরাও সময় সময় এই ধরনের কথা বলে থাকেন।

ফ্রয়েডীয় স্বপ্নসমীক্ষা

এইবার আসছি ফ্রয়েডীয় স্বপ্নব্যাখ্যায়।

ফ্রয়েড স্বপ্নের গবাক্ষপথে মনের অন্দরমহলে প্রবেশ করবার চেষ্টা করেছেন আর পাভলভ লালাগ্রন্থির সংকীর্ণ পথে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের হদিস পেতে চেয়েছেন—এ সংক্ষিপ্ত সমাচার তোমাকে আগেই জানানো হয়েছে। আজকের চিঠিতে ফ্রয়েডীয় স্বপ্নব্যাখ্যা ঈষৎ বিস্তারিতভাবে পেশ করবো। সঙ্গে সঙ্গে ইয়ুং-এর (**Jung**) প্রসঙ্গও এসে পড়বে। তাঁর **'archetype'** বা আদিরূপের কল্পনা শিল্পসাহিত্যকে বেশ প্রভাবিত করেছে। কাজেই আলোচনা খুব নীরস লাগবে না।

মননক্রিয়া চোখে ধরা পড়ে না। সম্মোহিত অবস্থায় মানুষ এমন অনেক কথা, ঘটনা বা ইচ্ছা মনে আনতে পারে, যেগুলো হাজার চেষ্টা করেও সজাগ অবস্থায় মনে আনা যায় না। এ ছাড়া বিস্মৃতির গহ্বর থেকে জাগ্রত অবস্থায় এইসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে আনার পথে একটা বাধা, একটা বিরোধিতা সব সময়ে কাজ করে। এইসব থেকে ১৮৯৫ সালেই ফ্রয়েডের ধারণা হয়েছিল মনের গভীরে একটা গোপন স্তর আছে যার কার্যকলাপ সম্পর্কে আমরা অবহিত নই, এবং সাধারণ অবস্থায় জিজ্ঞাসাবাদের পদ্ধতিতে মনের সেই গোপন স্তরের খবর পাওয়া যায় না। এই স্তরের নাম দিলেন তিনি—নির্জ্ঞান (The unconscious)। এই 'নির্জ্ঞান মন'-এর গোপনপুরীতে প্রবেশের পথ হিসেবে স্বপ্নকে আশ্রয় করলেন ফ্রয়েড। স্বপ্ন একদিকে মননক্রিয়া, আবার অন্যদিকে ঘুমের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে চেতনার রাজ্যে এর স্থান হতে পারে না। কাজেই, স্বপ্নের সঠিক

বিশ্লেষণ নির্জ্ঞান মনের কার্যকলাপের সন্ধান দিতে পারে—এ বিষয়ে ফ্রয়েড একেবারে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন।*

স্বপ্নের গুরুত্ব ফ্রয়েডীয়ানদের কাছে কতখানি, এই কথা থেকেই বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই। অবশ্য স্বপ্ন বিশ্লেষণ ছাড়াও নির্জ্ঞানকে জানবার আরও নানারকম পদ্ধতি ফ্রয়েডপন্থীদের আছে, একথা ঠিক। অবাধ-অনুষঙ্গ (free association), পাত্রান্তরণ (transference), নিউরোটিক রোগলক্ষণ ও প্রতিদিনকার ভুল-ত্রুটি ইত্যাদির বিশ্লেষণ সাহায্যেও নির্জ্ঞান মনকে জানা যায়। মোট কথা এই যে, সংজ্ঞানের সতর্ক পাহারা এড়িয়ে নানারকম ছদ্মবেশে আঁকাবাঁকা গলিপথে নির্জ্ঞান নিজেকে প্রকাশ করতে সচেষ্ট। ফ্রয়েডের সব পদ্ধতিই সংজ্ঞানকে এড়িয়ে পরোক্ষভাবে নির্জ্ঞান মনের কামনা বাসনা, স্মৃতিধারণা ও আবেগ প্রক্ষোভকে জানবার চেষ্টা। পাভলভ ও ফ্রয়েড দুজনই মননক্রিয়ার স্বরূপ জানতে চেষ্টা করেছেন ফিশ্চুলার (fistula) সাহায্যে। একজন লালাগ্রন্থির ক্ষরণ থেকে উচ্চতর স্নায়ুক্রিয়ার নির্দেশ করেছেন, আর একজন স্বপ্ন-সমীক্ষার সাহায্যে নির্জ্ঞান মনের ক্রিয়াকাণ্ড অনুমান করেছেন। পাভলভ চৈতন্য ও যুক্তিবাদকে আশ্রয় করেছেন, আর ফ্রয়েড চৈতন্য ও যুক্তিবাদকে মনে করেছেন নির্জ্ঞান রহস্যভেদের অন্তরায়।**

ফ্রয়েডের মতে স্বপ্নমাত্রেই ইচ্ছার অভিব্যক্তি। শিশুদের স্বপ্নে এই ইচ্ছা প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্ত হয়, কিন্তু বেশিরভাগ স্বপ্নেই ইচ্ছা পরোক্ষভাবে ব্যক্ত, অথবা একেবারেই অব্যক্ত। সমীক্ষকের মুন্সীয়ানা বিচক্ষণতা ও অভিজ্ঞতা ছাড়া মূল ইচ্ছার সন্ধান মেলে না।

আমাদের ইচ্ছা বা কামনাবাসনার সবটাই আমাদের জানা নয়। বরং বলা চলে, বেশিরভাগই অজানা। ফ্রয়েডের এসব কথা তোমার খুব নতুন লাগছে না জানি। বার বার শুনে বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে গেছে। তোমার অনেক কামনাবাসনা তোমার জানা ঃ সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে লজ্জা পাও না। তাদের প্রশ্রয় দিয়ে তোমার আনন্দ। আবার কিছু ইচ্ছা বা বাসনা মাঝে মাঝে মনে জাগতে পারে, যেগুলো তোমাকে লজ্জিত করে, তোমার নীতিজ্ঞান বা সামাজিক

* "By means of dream interpretation we are able to glance as through an inspection-hole into the interior of this (unconscious) apparatus".

** "The first condition, then, for a scientific interpretation of dreams is self observation in the form of free or in-voluntary association without critical interference from one's conscious mind!"

চেতনাকে বিচলিত করে। ছোটবেলায় এসব ইচ্ছা প্রকাশ করতে কেউই লজ্জিত হয় না। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গেই নীতিজ্ঞান ও সামাজিক বুদ্ধি বাড়তে থাকে। উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে একটা সুস্থ ধারণা জন্মায়। তিন বছরের তুমি দিদির সুন্দর বরটিকে লাভ করবার জন্য আবদার করতে বা দাবি জানাতে সংকোচ বোধ করনি। আজ তেইশ বছরের তুমি, ঐ ধরনের ইচ্ছা মনে জাগলে শিউরে উঠবে নিশ্চয়ই। তোমার বিবেক-বুদ্ধি ঐ ইচ্ছাকে চেপে রাখবে অথবা চিরতরে নির্বাসনে পাঠাবে নির্জ্ঞানপুরে। ফ্রয়েডীয় পরিভাষায় তোমার বাসনার ঘটবে অবদমন (repression)। এইসব ইচ্ছাগুলো ফ্রয়েডীয় মতে সংজ্ঞান-পূর্ব (preconscious) মানসিক স্তরের ইচ্ছা। অবশ্য পুরোপুরি অবদমিত না করে যদি শুধু চেপে রাখবার চেষ্টা কর, তবে ঐ চেপে রাখা ইচ্ছা মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি মেরে তোমাকে বিব্রত করবেই। আর অবদমনে যদি সফল হও, তবে ইচ্ছাটি আর প্রত্যক্ষভাবে সোজাসুজি সংজ্ঞানের কোঠায় আসতে সাহস পাবে না। স্বর্ণমৃগের ছদ্মবেশে এসে তোমাকে ছলনা করবে। এই দুরকম ছাড়া আর এক ধরনের কামনাবাসনার কথা ফ্রয়েড উল্লেখ করেছেন, যেগুলো গোড়া থেকেই পুরোপুরি নির্জ্ঞানপুরের বাসিন্দা। শৈশবে মাতাপিতার প্রতি কামেচ্ছার অবদমন, অতি-পরিচিত ঈডিপাস্ কম্প্লেক্সের জটিলতা নির্জ্ঞান মনের এইসব গোপন ইচ্ছার জনক। স্বপ্নের মধ্যে এই তিন স্তরের ইচ্ছারই প্রকাশ দেখা যায়। ফ্রয়েডীয় স্বপ্ন-বিশ্লেষণ অবশ্য অবদমিত ইচ্ছাকে কেন্দ্র করেই প্রধানত গড়ে উঠেছে। স্বপ্ন-সুড়ঙ্গপথেই প্রথমে নির্জ্ঞান মনের গোপন কোঠায় ফ্রয়েড অভিযান চালান। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের আদিপর্ব স্বপ্নখণ্ড দিয়ে শুরু। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে 'The Interpretation of Dreams' প্রকাশিত হয়।

অবদমিত প্রবৃত্তি ও ইচ্ছাকে নির্জ্ঞানপুরে নির্বাসিত (মনে রাখা দরকার, ফ্রয়েডীয় সহজাত প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা মাত্রেই কামেচ্ছা বা কামপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা সংক্রান্ত ইচ্ছা) করেও শান্তি নেই ! তারা নানা ফন্দীফিকির খুঁজছে সংজ্ঞান-রাজ্যে ফিরে আসবার জন্য। দিনের আলোতে জাগ্রত অবস্থায় যে সব ইচ্ছা মনের গহনে ঘুমিয়ে থাকে, তারাই স্বপ্নের মধ্য দিয়ে প্রতীকের সাহায্যে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে। সহজাত প্রবৃত্তি আর ঈগোর মধ্যে চলছে দিনরাত লড়াই। 'ঈগো' আবার কি ? জানতে চাইবে নিশ্চয়ই।*

---

* The ego is a group of tendencies which have been strengthened by social, specially ethical, indoctrination, tendencies which are a part of our accepted social life, necessary in the making of a living and the building up of a reputation.

সামাজিক বিধিনিষেধের ও নীতিশাস্ত্রের আওতায় আমাদের মধ্যে যে প্রবণতা গড়ে ওঠে, যে প্রবণতা সমাজবদ্ধ জীবের প্রাণধারণ ও সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জনের পক্ষে অতি-আবশ্যক—তাকেই ঈগো বলা হয়। সহজাত প্রবৃত্তি, বিশেষ করে যৌনতামূলক প্রবৃত্তির অবাধ চরিতার্থতা ঈগোর অভিপ্রেত নয়। অথচ বিপদ এই যে আমরা সবাই সব সময়েই (ফ্রয়েডের মতে) প্রথম রিপুটির তাড়নায় অস্থির। তাই সংজ্ঞান মনের কঠোর অবদমন চেষ্টা। স্বপ্ন, ফ্রয়েডের মতে, ঈগোর সঙ্গে সংগ্রামরত প্রবৃত্তির আত্মপ্রকাশের একটা বিশিষ্ট কায়দা। নিউরোটিক রোগলক্ষণ ও স্বপ্নকে এক করে দেখেছেন ফ্রয়েড।*

জাগ্রত অবস্থায় অবদমিত কামেচ্ছা সাধারণত সংজ্ঞান মনোরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না। স্বপ্ন-পথে প্রতীকের ছদ্মবেশে কামেচ্ছা সংজ্ঞান রাজ্যে হানা দেয়। দিবা-স্বপ্ন দেখা আর ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখায় অনেক তফাত। দিবা-স্বপ্নে তুমি ত' দিনের মধ্যে অনেকবার ক্রয়ডনে নেমে লণ্ডনের তুষার-ঢাকা-পথেঘাটে ঘুরে বেড়িয়েছ। দিবা-স্বপ্নে যে সব ইচ্ছা তোমার মনে জেগেছে তাদের তুমি বুঝতে পেরেছ, তাদের সঙ্গে তুমি পরিচিত। সে-সব অভিলাষের জন্য তোমার মনে বিন্দুমাত্র লজ্জা বা অপরাধের ভাব আসে না। কিন্তু রাতের স্বপ্ন যদি ঠিকমত ফ্রয়েডীয় পদ্ধতিতে বিশ্লেষিত হয়, তোমার নির্জ্জান মনের অভিলাষের খবর পেয়ে তুমি হয়তো আঁতকে উঠবে, নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হবে। তুমি একলা নও, আমরা সবাই। আমাদের নির্জ্জান মনের রূপ স্বপ্ন-দর্শণে প্রতিবিম্বিত দেখলে আমরা সকলেই অবাক হতে বাধ্য। নির্জ্জান অভিলাষকে চেতনার রাজ্যে অনুপ্রবেশে বাধা দিচ্ছে সামাজিক সত্তা বা ঈগো। ঈগোকে কোন সময়ে ফ্রয়েড নাম দিয়েছে সেন্সর। সেন্সর একাধারে সমালোচক ও পাহারাদার। জাগ্রত অবস্থায় এর সতর্ক পাহারা এড়িয়ে অবদমিত কামেচ্ছা চেতনার স্তরে পৌছুতে পারে না। পৌছুতে হলে নানারকম কলাকৌশল ও ছদ্মবেশের আশ্রয় নিতে হয়। দৈনন্দিন ভুলত্রুটি, ঠাট্টাবিদ্রূপকে আশ্রয় করে মাঝে মাঝে প্রবৃত্তি-গুলো আত্মপ্রকাশের চেষ্টা যে না করে এখন নয়। এ-নিয়েও ফ্রয়েড অনেক কথা বলে গেছেন। তবে সে আলোচনা এমন নয়। স্বপ্নের কথাতেই আসা যাক। ঘুমন্ত অবস্থায় এই কড়া পাহারাওয়ালাটিও খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়ে। আমরা ঘুমোলে নির্জ্জান থেকে সংজ্ঞান মনের প্রবেশপথে কঠোর কর্তব্যরত এই সেন্সরটিরও বোধহয় একটু তন্দ্রার আমেজ আনে। কাজেই অবদমিত

---

* "The dream is itself a neurotic symptom and moreover, one which possesses for us the incalculable advantage of occuring in all healthy people."

কামনা-বাসনা বেশ কিছুটা সুবিধে পেয়ে যায়। তা বলে সরাসরি হুট করে অমনি চেতনার কোঠায় আসা চলে না। সেন্সর ত' একেবারে ঘুমিয়ে পড়েনি। খানিকটা ঢিলেঢালা হলেও, পাহারাদার সমালোচকটি নজর রেখে চলেছেন ঠিকই। কাজেই ছদ্মবেশ চাই: symbol বা প্রতীক হল সেই ছদ্মবেশ। চেতনার কোঠায় যে রূপে স্বপ্ন প্রকাশ পায় তাকে ফ্রয়েড বলেছেন manifest dream content বা স্বপ্নের প্রকাশ-রূপ। সেটা ছদ্মবেশ। তা থেকে অবদমিত ইচ্ছার স্বরূপটি সহজেই চেনা যায় না। স্বরূপ নিহিত থাকে স্বপ্নের প্রচ্ছন্ন মর্মের মধ্যে; ফ্রয়েডের ভাষায় 'latent dream content'-এর মধ্যে। সেন্সরের ভয়েই স্বপ্নের প্রচ্ছন্ন মর্মকথা প্রতীক-আশ্রিত ছদ্মবেশ গ্রহণ করে। নিউরোটিক রোগ লক্ষণ আর স্বপ্নের প্রকাশ্য রূপ—দুইই একই ধরনের আপোষের চেষ্টা।

সেন্সরের সতর্কদৃষ্টি এড়াতে গিয়ে প্রচ্ছন্ন অভিলাষ শুধু যে প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাই নয়। আত্মগোপনে আরও অনেক ছলাকলার সাহায্য নিয়ে থাকে। নির্জ্ঞান-বাসনা অবিকৃতভাবে কখনও স্বপ্নের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে না। ইচ্ছা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঘটনার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে।* ঘটনাগুলো আবার কোন সময় অতিসংক্ষিপ্ত, কখনও বা উল্টোপাল্টা সাজানো।** এক আধটা স্বপ্নবৃত্তান্ত শোনালে ব্যাপারটা তোমার কাছে অনেকটা স্পষ্ট হবে। তার আগে বলে নেওয়া উচিত, বদহজম বা ঐরকম সামান্য শারীরিক বিশৃঙ্খলা থেকে যে বড় রকমের স্বপ্ন সৃষ্টি হতে পারে, এই প্রচলিত ধারণা একেবারে অস্বীকার করতে পারেননি ফ্রয়েড। তবে তিনি বলেছেন স্বপ্নের প্রকাশ্য রূপের সেটা তাৎক্ষণিক কারণ হতে পারে, কিন্তু তা দিয়ে স্বপ্নকাণ্ডের বা স্বপ্নের অন্তর চরিত্রের ব্যাখ্যা চলে না। মানে স্বপ্নের latent content, গূঢ়মর্মের মধ্যে সব সময়ই পাওয়া যায় অবদমিত কামেচ্ছা বা ঐ ধরনের কামনাবাসনা: অবশ্য যদি তাঁর প্রতীকার্থ ও অন্যান্য তত্ত্বকথা নির্বিচারে মেনে নেওয়া যায়। ফ্রয়েডীয় স্বপ্নব্যাখ্যার সমালোচনা পরে হবে। এখন ফ্রয়েডীয় স্বপ্নব্যাখ্যা দুটো একটা শোনো।

এক অবিবাহিত তরুণী স্বপ্ন দেখলেন তার ছোট এক ভাইপো কফিনে শুয়ে আছে। ছোট ভাইপোটিকে তরুণীটি খুবই ভালবাসতেন। তিনি বুঝে উঠতে

---

* "The indicative mood appears, so to speak, in place of the optative".

** "Condensation, omission, modification, regrouping of material,—these are the modes of the dream-censorship's activity and the means employed in distortion."

পারলেন না কেন এ স্বপ্ন তিনি দেখলেন। ভাইপোটির মৃত্যু কি তার নির্জ্ঞান মনের কামনা ? কেন ? এই মেয়েটি এক ডাক্তারের সঙ্গে প্রেমে পড়েছিলেন। ভুল বোঝাবুঝির জন্য তাদের মধ্যে ঝগড়া হয় ও ফলে দেখাসাক্ষাত বন্ধ। কিছুদিন আগে আর এক ভাইপোর (যার মৃত্যুস্বপ্ন দেখেছেন, তারই বড় ভাই) অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ডাক্তার প্রেমিকের সঙ্গে সহসা দেখা হয় । এই দেখা তাঁর মনে আনন্দের শিহরণ এনেছিল। ফ্রয়েড এ সব খবর জানতেন। এর থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে স্বপ্নটিতে ডাক্তার-প্রেমিককে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। তরুণীটি আশা করেছেন ছোট ভাইপোটির কফিনের পাশেও প্রেমিককে দেখা যাবে ও তার মনে আনন্দের বান ডাকবে। এই স্বপ্নটির উল্লেখ করে ম্যাকডুগাল যে মন্তব্য করেছেন সেটাও শুনে রাখ। তিনি বলেছেন : হ্যাঁ, ব্যাখ্যা হয়ত সঠিক, কিন্তু ফ্রয়েডীয় ফর্মুলার সঙ্গে মেলে না। স্বপ্নটি একটি ইচ্ছার প্রকাশ, সে ইচ্ছাকে (প্রেমিকের সঙ্গে মিলন) কামেচ্ছাও বলা যেতে পারে। কিন্তু ইচ্ছাটি সম্পূর্ণ সাম্প্রতিক কালের ইচ্ছা—যৌবনের ইচ্ছা। ফ্রয়েডের মতে শৈশবের অবদমিত ইচ্ছা ও আসক্তিই স্বপ্নের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে। দ্বিতীয়ত, ইচ্ছাটিকে অবচেতন মনের ইচ্ছা বলা চলে কি ? তরুণীটি প্রেমিকের সঙ্গে মিলনের ইচ্ছাকে চেপে রেখেছিলেন সত্য, কিন্তু অবদমিত করে নির্জ্ঞান রাজ্যে নির্বাসিত করেননি নিশ্চয়। তা হলে ফ্রয়েডকে অত কথা বলতে পারতেন না। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাকডুগাল আবার বলছেন—কিন্তু খাঁটি ফ্রয়েডিয়ান মাথা নেড়ে নিশ্চয়ই বলবেন—"লোকটা বুঝতে পারছে না যে ভাইপোর মৃত্যুকামনা মানে শৈশবের ছোট ভাইয়ের মৃত্যুকামনার সামিল। সে ইচ্ছাটা এখন পুরোপুরি অবচেতনায়।" তরুণীটির ছোট ভাই ছিল না বলছ ? কিছু আসে যায় না। তার ঊর্ধ্বতন কয়েক পুরুষের মধ্যে কারুর না কারুর ছোট ভাই নিশ্চয়ই ছিল এবং শৈশবে তাদের কেউ না কেউ নিশ্চয়ই ছোট ভাইয়ের মৃত্যু কামনা করেছে। আর ঐ ডাক্তার-প্রেমিকটি ত' মেয়েটির শিশু বয়সের প্রেমিক-পিতার প্রতিচ্ছবি।*

স্বপ্ন নির্জ্ঞান মনের অবদমিত কামেচ্ছার প্রকাশ—এই ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকথা এইভাবেই সপ্রমাণ করা হয়ে থাকে।

ম্যাকডুগাল ফ্রয়েড-শিষ্য ব্রিলের একটি স্বপ্নব্যাখ্যার সমালোচনা প্রসঙ্গেও ঐ রকম মন্তব্য করেছেন। শুনবে সেটা ? এটা আরও একটু জটিল।

একটি মেয়ে স্বপ্ন দেখছে—সে নির্জন পাড়াগাঁয়ে বেড়াতে গিয়ে পথ হারিয়ে

* "And her love for him was but a reanimation of her infantile incestuous desire for the father".

ফেলেছে। বাড়ী যাবার জন্য বিশেষ আগ্রহ। Liconow অথবা Linconar Bay নামে এক জায়গায় যেন মেয়েটির বাড়ী। কিছুতেই সেখানে যেতে পারছে না। যে পথেই যাবার চেষ্টা করছে কিছুদূর গিয়েই দেখছে পথ নেই—উঁচু পাঁচিল (wall)। চারদিকেই পাঁচিল। পা সিসের মত ভারী হয়ে এল, মাথা ঘুরতে লাগল। চলতে আর পারে না। বুড়ো মানুষের মত অতি কষ্টে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে। এমন সময় এক ঝাঁক মোরগছানা,—এটা মনে হল যেন কোনো শহরের রাজপথ—মেয়েটির পিছু পিছু ছুটতে লাগল। ওদের মধ্যে বড়টি এগিয়ে এসে তার সঙ্গে অন্ধকারে যাবার জন্য মেয়েটিকে অনুরোধ জানাল। ব্রিলের নির্দেশে 'মোরগছানা' কথাটিতে বিশেষ মনঃসংযোগ করাতে মেয়েটির মনে হল যেন ঐ রাস্তাটা তার স্কুলে যাবার রাস্তা। মোরগছানাটি ক্রমশ বড় হতে লাগল। লম্বা সরু মোরগছানার কথা ভাবতে গিয়ে মেয়েটি লজ্জার হাসি হাসল। মনে পড়ে গেল স্কুলজীবনের বিস্মৃতপ্রায় প্রণয়কাহিনী। স্কুলের অন্য বিভাগের লম্বা রোগা একটি ছেলের সঙ্গে স্কুলের শেষে রোজ সে বাড়ী ফিরত। বান্ধবীরা ছেলেটিকে তার প্রেমিক বলে জানত। তাকে আসতে দেখলে বলত – লম্বা মোরগছানাটি এসেছে। স্কুলের পড়া শেষ হলে ছেলেটি তিন তিনবার তাকে বিবাহের প্রস্তাব করেছিল। মেয়েটি হ্যাঁ-না--কোন জবাব দ্যায়নি। বর্তমানে ছেলেটি অন্য একটি তরুণীর প্রতি আসক্ত আর মেয়েটির অভিলাষ সে আর একবার বিয়ের কথা তুলুক। আগে সে সরাসরি রাজী হতে পারেনি, তার কারণ ছেলেটি গরীব আর মেয়েটির সমস্ত টাকাকড়ি 'ওয়াল স্ট্রীটে' শেয়ার বণ্ড ইত্যাদিতে লগ্নী ছিল। মেয়েটির আয়ত্তের মধ্যেও ঠিক ছিল না টাকাগুলো। ব্রিল এইভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন। লম্বা মোরগছানাটি মেয়েটির আগেকার প্রণয়ী। তার সঙ্গে অন্ধকারে যাবার অনুরোধের অর্থ বিবাহের প্রস্তাব। 'অন্ধকার' এখানে বিবাহের অজানা রহস্যের প্রতীক। 'নির্জন পাড়াগাঁয়ে' পথ হারানোর অর্থ—একক জীবনে বিতৃষ্ণা। বাড়ী বা Linconar Bay-তে ফিরে যেতে চাওয়ার অর্থ বিবাহিত জীবন চাই। Linconar Bay হচ্ছে like—honour—obey এই তিন শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ বা condensation। কিন্তু যাবার উপায় নেই—চারিদিকে দেওয়াল—wall। তখনও Wall Street আর্থিক বাধা হিসাবে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

অবাধ-অনুষঙ্গ পদ্ধতিতে ব্রিল স্বপ্নটির ব্যাখ্যা করেছেন। ম্যাকডুগাল ব্যাখ্যাটি পুরোপুরি মেনে নিতে রাজী নন। তাঁর বক্তব্য বিশ্লেষণের ব্যাপারে ব্রিল ধ্রুপদী ফ্রয়েডীয় ফর্মুলা মেনে চলেননি। এখানে ইচ্ছাটি যৌনতামূলক হলেও শৈশবের অবদমিত কোনো ইচ্ছা নয়। ইচ্ছাটি নির্জ্জান মনের

বাসিন্দাও নয়।*

ফ্রয়েড, ম্যাকৃডুগাল, ইয়ুং, এ্যাডলার প্রায় সমসাময়িক। ফ্রয়েডের সঙ্গে মূলত এঁদের বিরোধ নেই। কেননা এঁরা সবাই সহজাত-প্রবৃত্তিমূলক মনস্তত্ত্বের (যাকে সোজা কথায় বলে ইন্স্টিংটিউয়াল সাইকোলজি) ধারক ও বাহক ; এঁদের পার্থক্য মূলে নয়, শাখা-প্রশাখায়। ফ্রয়েডের স্বপ্ন-ব্যাখ্যায় বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা যথাসময়ে শুনবে। আমি ফ্রয়েড-অনুরাগী ম্যাকৃডুগালের 'ক্রিটিসিজ্‌ম' তুলে ধরছি এইটুকু সপ্রমাণ করবার জন্য যে ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ত্বের মূল ভিত্তি কংক্রিটের মত শক্ত নয়। স্বপ্নে শুধু নির্জ্ঞান মনের অবদমিত কামেচ্ছার প্রকাশ ও পরিতৃপ্তির চেষ্টা চলে,—ফ্রয়েডের এই বুনিয়াদী মূল বক্তব্য অসার প্রতিপন্ন হলে নির্জ্ঞান মনস্তত্ত্বের গোটা প্রাসাদটাই ভেঙ্গে পড়তে পারে। ভাববাদী বস্তুবাদী দুপক্ষের বক্তব্যই আমি তোমার কাছে তুলে ধরছি। তুমি তোমার জ্ঞানবুদ্ধি বিচার করে গ্রহণ করবে এইটুকু আশা করি।

এবার ফ্রয়েডের স্বপ্ন-প্রতীক (Dream Symbol) নিয়ে দু'চার কথা বলব।

ফ্রয়েডের প্রতীকীবাদ (Symbolism), তোমাকে আগেই লিখেছি, ফ্রয়েডীয় স্বপ্নতত্ত্বের সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ অংশ।** স্বপ্ন-প্রতীক দিয়েই স্বপ্ন-বিশ্লেষণ করেন ফ্রয়েডীয় সমীক্ষক। স্বপ্নের প্রকাশ্য-রূপ অনেক সময়েই এলোমেলো, সামঞ্জস্যহীন ও অদ্ভুত ; কাজেই ফ্রয়েড বললেন, এ একটা ছদ্মবেশ। অবদমিত কামেচ্ছার ছদ্মরূপ। স্বরূপ প্রচ্ছন্ন আছে latent dream content বা অন্তর্নিহিত সারমর্মের মধ্যে। ফ্রয়েডের চিন্তাপদ্ধতি একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে, বিজ্ঞানসম্মত নয়। তিনি প্রথমে তত্ত্ব তৈরী করেছেন, তারপর তার স্বপক্ষে তথ্য ও যুক্তি খুঁজেছেন। তাঁর ধারণা নির্জ্ঞান-তত্ত্ব অভ্রান্ত ও অপরিবর্তনীয়। যে-সব তথ্য তার তত্ত্বকে সমর্থন করে না, সেগুলোকে তিনি সরাসরি বাদ দিয়েছেন। এমন বহু স্বপ্ন প্রত্যেকেই দেখে থাকেন, যে-গুলো সোজাসুজি মানুষের প্রবল আবেগ অনুভূতির সঠিক প্রতিচ্ছবি। প্রতীক বা উদ্ভট কল্পনার কোনো অবকাশ সেই সব স্বপ্নের প্রকাশ্য-রূপের মধ্যে একেবারেই নেই। যেমন ধরো তোমার সেই ছবি আঁকার স্বপ্ন। ছবি আঁকার ব্যাপারে তুমি এমনভাবে

---

* ব্রিলই বলেছেন—"Which had occupied our dreamer's mind for the past months and which, as she quite frankly admitted, she tried hard to forget".

** "Symbolism is perhaps the most remarkable part of our dreams" (Freud).

ডুবে গিয়েছিলে যে ঘুমন্ত অবস্থায় তুমি তোমার সেই ছবিটাকেই নানাভাবে স্বপ্ন দেখতে। পরীক্ষার আগেই পরীক্ষার স্বপ্ন অনেকেই দেখে থাকে। যুদ্ধের সময় সৈনিকরা স্বপ্নের মধ্যে লড়াই করে। উকিলরা বড় মামলার আগে স্বপ্নের মধ্যে অনেক সময়ে সওয়ালজবাব করে। এ সব স্বপ্নে উদ্ভট কল্পনার বা প্রতীকের কোনো বালাই নেই। উপোষী মানুষ স্বপ্নে ভোজসভার স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন যে মস্তিষ্কের পরিবর্তিত বিশেষ অবস্থার প্রক্রিয়া, এ সরল সত্য কথাটি অস্বীকার করার অর্থ মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানকে অস্বীকার করা। আর ফ্রয়েড বরাবরই তাই করেছেন। প্রতীকীবাদ সমর্থন করে না এমন অজস্র স্বপ্ন আছে। সেগুলোকে ফ্রয়েড এড়িয়ে গেছেন। নির্জ্ঞান মনের অবদমিত কামেচ্ছার প্রকাশ যে-স্বপ্নে নেই, সেগুলো বোধহয় স্বপ্নই নয়! আর উদ্ভট স্বপ্নগুলোকে কল্পিত প্রতীকের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে তাঁর স্বপ্নতত্ত্ব তথা সাইকো-এ্যানালিসিস্ তত্ত্বকে একদিকে প্রমাণ করেছেন; আবার অন্যদিকে এই প্রমাণের মধ্য দিয়ে প্রতীকীবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। গোলমেলে লাগছে কথাগুলো—তাই না? আচ্ছা, বুঝিয়ে বলছি। ফ্রয়েডবাদ প্রথম থেকেই (শুধু এই স্বপ্নব্যাপারে নয়) ফ্যালাসি (fallacy) দোষে দুষ্ট। একজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক কি বলছেন শোনো।*

ব্যাপারটা কি রকম জানো?

একটা দৃষ্টান্ত দিলেই পরিষ্কার হবে। শিশুদের আঙুল চোষা ফ্রয়েডের মতে একটি নিউরোটিক প্রলক্ষণ। কেন? ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে নিউরোটিক প্রলক্ষণ (neurotic trait) মাত্রেই অবদমিত ইচ্ছার অভিব্যক্তি; এবং ইচ্ছাটি সব সময়েই গোপন কামেচ্ছা। আঙুল চোষা স্তন্যপানের বিকল্প। যারা অল্প বয়সেই যে-কোনো কারণে মাতৃস্তন থেকে বঞ্চিত, তাদের মধ্যেই এই অভ্যাস বেশি

---

* "Psychoanalysis suffers from an absolute basic error in scientific methodology. The analysts make certain observations from behaviour of neurotic people. They draw a theory from these observations and then mistakenly believe that this theory is proven when they can make other observations of the same type and kind as the first one on which the theory was based What they really do is merely confirm the observations which lead to the theory; they do not confirm the theory itself......Psycho-analysis has been plagued from the beginning to the present time with this fallacious and circular type of reasoning. To be proven, a theory must be verified by objective data which are different from the ones, that lead to its postulation in the first place" (The Neurotic, Hurst. J.B.—1956).

দেখা যায়। স্তন্যপানে শিশু ও মা দুজনেরই নাকি কামেচ্ছা চরিতার্থ হয়। সুতরাং স্তন্যপানের বিকল্প অঙ্গুলি লেহন নিশ্চয়ই অবদমিত বা অচরিতার্থ কামেচ্ছার অভিব্যক্তি। কাজেই নিশ্চয়ই একটা নিউরোটিক ট্রেইট। আঙুল-চোষা এখানে একটি উপাত্ত বা data এবং এর থেকে বিখ্যাত লিবিডো-তত্ত্ব প্রমাণিত হচ্ছে না; ফ্রয়েড তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী অঙ্গুলী লেহনের আরো অনেক দৃষ্টান্ত জড়ো করলে লিবিডোতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা বাড়ে না কিম্বা অঙ্গুলিলেহনের ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যার অনুকূলে মত গড়ে ওঠে না। বিজ্ঞানী পক্ষপাতশূন্য হবেন এবং নিজের সিদ্ধান্ত উপাত্তের উপর উদ্দেশ্যমূলকভাবে আরোপ করবেন না—এই আমরা আশা করব। এ-আশা কিন্তু ফ্রয়েড কোনদিন পূরণ করেননি। তিনি অন্য পথে চলেছেন।

এবার প্রতীকীবাদে ফিরে আসা যাক। সেখানেও দেখবে একই ব্যাপার। স্বপ্ন-বিশ্লেষণের বেলাতে ফ্রয়েড নিজের মনগড়া প্রতীকের সাহায্য নিয়ে নিজের উদ্ভাবিত স্বপ্নতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। স্বপ্ন-প্রতীকের কোন সম্ভাব্য যুক্তি প্রদর্শন তিনি দরকার মনে করেননি। ম্যাকডুগাল মোটামুটি প্রতীকীবাদের সমর্থক হয়েও বলতে বাধ্য হয়েছেন, ফ্রয়েডের স্বপ্ন-প্রতীক এমনভাবে আবিষ্কৃত যে মাত্র তার সাহায্যেই স্বপ্নের ফ্রয়েডানুমোদিত ব্যাখ্যা সম্ভব ও ফ্রয়েডীয় লিবিডোতত্ত্ব সমর্থিত। ফ্রয়েডের বক্তব্য ও যুক্তিতে ম্যাকডুগালও বৃত্ততুল্যতার (circularity) আভাস পেয়েছেন।*

জানি, প্রতীকগুলোর সঙ্গে কিছুটা পরিচয় তোমার আছে। প্রথম যখন ফ্রয়েড পড়েছিলে নতুন কিছু শেখবার নেশায় নির্বিচারে সবকিছু গ্রহণ করেছিলে। এখন একটু বিচার করে দেখলেই এর খামখেয়ালির দিকটা তোমার নজরে পড়বে। সাধারণভাবে স্বপ্নে-দেখা প্রতীকগুলো ফ্রয়েডের মতে, যৌনাঙ্গ বা যৌনকার্যের প্রতীক। দুনিয়ার যা কিছু লম্বা শক্ত জিনিস, যেমন ছাতা, লাঠি, পেন্সিল, কলম—সবই পুরুষাঙ্গের প্রতীক। তীক্ষ্ণ ধারালো জিনিস, যেমন ছুরি, ছোরা, বর্শা, তলোয়ার; আঘাত করবার ক্ষমতা আছে যা কিছুর, যেমন বন্দুক, পিস্তল,—সবই নির্জ্ঞান-প্ররোচিত পুরুষাঙ্গের ছদ্মবেশ। তুমি যদি স্বপ্নে দেখ (দাঙ্গার সময় অনেকেই যে-স্বপ্ন দেখে থাকেন) একজন গুণ্ডা তোমাকে ছোরা বা রিভলবার নিয়ে তাড়া করেছে—তার বিগলিতার্থ কি হবে বুঝতেই পারছ! এরোপ্লেন, জেপলিন, রকেট এগুলো অভিকর্ষকে তুচ্ছ করে আকাশে

* "The reader will note that there is a circularity in his argument which justifies the utmost exercise of critical caution."

উঠতে পারে, সুতরাং এগুলোও ঐ গোত্রে পড়ে। ছুনিয়ার সব মাছ ও সরীসৃপ এই আওতায় পড়ে। আর স্বপ্নে সাপের তাৎপর্য ত' ত্রিভুবনবিদিত। আরো মজা শোনো! বাড়ী—পুংলিঙ্গ; কিন্তু সেই বাড়ীতেই যদি তাক, বারান্দা ইত্যাদি থাকে, তবে সেটা স্ত্রীলিঙ্গ। আবার অন্য দিকে, শিশিবোতল, খানাখন্দ, বাক্স, পেঁটরা, অলিগলি, গুহা, নৌকা, জাহাজ; ফ্রয়েডের ভাষায়* স্ত্রী-যৌনাঙ্গের প্রতীক! আপেল, পীচ, ইত্যাদি বর্তুলাকার ফল, বুঝতেই পারছ—নারীবক্ষের প্রতীক! ল্যাণ্ডস্কেপের দৃশ্য স্বপ্নে স্ত্রী-অঙ্গ নির্দেশক, আবার জটিল যন্ত্রপাতি পুরুষাঙ্গের প্রতীক। প্রতীকগুলো আবার সুবিধামত অদল-বদল করা যেতে পারে। গোড়াতেই বলেছি এসব প্রতীকার্থ সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা নেই। কোনো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রতীকে অর্থ আরোপ করা হয়েছে মনে হয় না। সর্বকামতত্ত্ব, মানে ফ্রয়েডের লিবিডোতত্ত্ব থেকেই প্রতীকের উদ্ভাবন হয়েছে, আবার এই উদ্ভাবিত প্রতীক দিয়েই লিবিডোতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত করা হয়েছে। একেই বলে circularity—ন্যায়শাস্ত্রের বৃত্ততুল্যতা। আদিমযুগের মানুষের মনে যে সব সিম্বল্, ইমেজারির উদয় হতে পারে, ফ্রয়েডীয় প্রতীক কল্পনা তা ছাড়িয়ে বেশি দূর এগোতে পারেনি। স্বপ্ন মানেই অবদমিত ইচ্ছা-অনুভূতির অভিব্যক্তি ও পরিতৃপ্তি এবং মানুষের ইচ্ছা-অনুভূতিমাত্রই কাম-মূলক; এই ছুটি ধারণা বা তত্ত্ব ফ্রয়েডকে আজীবন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। স্বপ্ন বা নিউরোটিক রোগলক্ষণের মধ্যে তাই গূঢ় উদ্দেশ্যের ইংগিত খুঁজতে ব্যস্ত ফ্রয়েডিয়ানরা। শুধু স্বপ্ন নয়, জাগ্রত অবস্থায় মানুষের উদ্দেশ্যমূলক সকল কাজ-কর্মের মধ্যেই এঁরা যৌনতৃপ্তির একটা প্রয়াস ও যৌনপ্রতীকের উপস্থিতি লক্ষ্য করে থাকেন। শুনলে অবাক হবে যে ফ্রয়েডের মতে লাঙল দিয়ে জমিচাষ ও বীজবপনের উদ্দেশ্য মূলত খাদ্য-সংগ্রহ নয়, অবদমিত অজাচার-বৃত্তির তৃপ্তি সাধন।**

স্বপ্ন-বিশ্লেষণ ফ্রয়েডীয় চিকিৎসার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তোমার ত' অবাধ অনুষঙ্গ-পদ্ধতি সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান আছে। এই পদ্ধতিতে স্বপ্নের গোপন

---

* "All such objects as share with them the property of enclosing a space or are capable of acting as receptacles."

** "For, in thrusting his spade into the earth and thus fertilising mother earth, man finds a peculiar pleasure or satisfaction, and this is the satisfaction of the incestuous Oedipus complex, from which springs an unconscious but nevertheless strong desire to penetrate and fertilise his mother" (McDougall).

অর্থটি রোগীর কাছে প্রতিভাত হয়। তার নির্জ্ঞান মনের অভিলাষ সংজ্ঞান স্তরে আসার ফলে রোগী স্বস্তিবোধ করে ও তার রোগ-লক্ষণ দূর হয়ে যায়। এইটেই ফ্রয়েডীয়ানদের দাবী। ফ্রয়েডের অন্য সব দাবীর মত এখানেও আছে সেই শৈশব ও যৌনতার উপর অবাস্তব ঝোঁকের আতিশয্য, মানসিকতার যান্ত্রিক স্তরবিভাগ, (ইগো, সুপারইগো, ইদ্ ইত্যাদি) ও অন্যান্য দূরকল্পনা ও রহস্যময়তা। এ দাবী বিজ্ঞানভিত্তিক কিনা সেটা তোমার বিচার্য। আমার শুধু এইটুকু বক্তব্য যে ফ্রয়েডীয় স্বপ্ন-বিশ্লেষণে সমীক্ষকের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা আছে, যেটা সাধারণত উপাত্ত বিশ্লেষণে বিজ্ঞানীদের থাকে না। এমন কোন যুক্তি তাঁরা দিতে পারেননি, যা থেকে প্রতীকের অর্থ অকাট্য বলে মনে হতে পারে। প্রতীকের দেশ-কাল নিরপেক্ষতা মেনে নেওয়া কঠিন। এ ছাড়া তুমি যদি ফ্রয়েড বা তাঁর শিষ্য-সামন্তদের স্বপ্ন-বিশ্লেষণের বিবরণ খুঁটিয়ে পড়তে যাও, দেখবে তাঁরা খুশিমত ফতোয়া জারী করছেন। কোন সময় স্বপ্নের শেষের দিকটা গোড়ায় আনছেন, নীচুর দিক উপরে তুলছেন, সোজাকে উল্টো করছেন, উল্টোকে সোজা করছেন। কোন সময় লম্বা স্বপ্নকে সংক্ষিপ্ত করছেন, আবার কোনো সময় সংক্ষিপ্ত স্বপ্নকে টেনে লম্বা করছেন! এই Elaboration, Condensation, Distortion, Displacement-এর কোন আইন নেই। একমাত্র আইন সমীক্ষকের মরজি অথবা সুবিধা। এখানে হার্ষ্ট-এর আর একটা কোটেশন তুলে দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। এই ডাক্তার ভদ্রলোক বেশ কয়েকবছর ফ্রয়েডীয় মতে চিকিৎসা করে মনোসমীক্ষা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর কথাগুলো বলেছেন।*

ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ত্বের এই বিচার থেকে এই ধারণা যেন তোমার না জন্মায় যে স্বপ্নে আবেগ-আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি বা যৌন অভিলাষ ব্যক্ত হতে পারে না। কিছু স্বপ্ন আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেগ-অনুভূতির পরিপূরক হিসেবে দেখা দিতে

* "After all, if the meaning of a dream may be displaced or denied by turning it into its opposite, if the meaning may be condensed and attached on to other meanings, if down may be up and end the beginning, to mention but a few of the less absurd possibilities for dream distortion ; and furthermore, if the presence or absence of these mechanisms is decided by the analyst according to his individual judgement, then it is perfectly obvious that the doctor has enormous leeway to interpret any dream, literally in any way that he deems fit. And he will see fit according to his particular brand-psycho-analytic theory."

যে পারে না, এমন নয়। পাভলভীয় তত্ত্বের আলোচনার সময় এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আরো পরিষ্কার করবার চেষ্টা করব। তবে তার আগে ইয়ুং প্রসঙ্গ।

তোমার পত্রে ইয়ুং-প্রীতির পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হইনি। 'মডার্ণ ম্যান ইন্ সার্চ অব এ সোল' আমারও ভাল লেগেছে, তবে মনে রেখাপাত করেনি।

সাধারণের মধ্যে ফ্রয়েডের নাম যতটা প্রচলিত, ইয়ুং-এর নাম ততটা নয়। তোমার মত মিস্টিসিজম্-এর ভক্তদের কাছেই ইয়ুং-এর প্রতিপত্তি বেশি। যদিও জুরিখ্-এর এক বিখ্যাত হাসপাতালের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন, তবুও মনোরোগ-বিশারদদের ও মনোবিজ্ঞানীদের চেয়ে রহস্যবাদী ও তত্ত্বপিপাসুদের কাছেই তিনি বেশি পরিচিত। ইয়ুং সম্বন্ধে বলতে গিয়ে গার্ডনার মার্ফি কি লিখেছেন শুনবে ?* বইটি যে কোন লাইব্রেরীতে পাবে। সেই বইতে এ্যাড্লার ও ইয়ুং সম্বন্ধে একটি বিশেষ অনুচ্ছেদ আছে। পড়ে দেখ।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে জুরিখের ডাঃ সি. জে. ইয়ুং (C. J. Jung) ফ্রয়েডের নির্জ্ঞানতত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন। কয়েক বছর সহযাত্রী থাকার পর ফ্রয়েডের সঙ্গে ইয়ুং-এর মতের অমিল হতে থাকে, এবং কিছুদিন পরে ইয়ুং নিজস্ব একটি তত্ত্ব প্রচার করতে থাকেন। ফ্রয়েডের 'যৌনসর্বস্বমূলক' লিবিডোতত্ত্বকে ইয়ুং মানতে পারলেন না। তাই থেকেই বিরোধ। লিবিডোকে যৌনসর্বস্বতা মুক্ত করে সাধারণ 'লাইফ এনার্জি'রূপে কল্পনা করলেন ইয়ুং। ইয়ুং বললেন, লিবিডো হচ্ছে সাধারণ লাইফ্-এনার্জি; যৌনকামনা লিবিডোর এক ধরনের রূপ মাত্র। তুমিত' জানো ফ্রয়েডের মতে লিবিডো হচ্ছে একান্তভাবে যৌন-কামনা। মানুষের সকল প্রয়াসের মূলে এই লিবিডো। ফ্রয়েডীয় রিগ্রেশন (regression)-এর নতুন ব্যাখ্যা দিলেন ইয়ুং ও আরোপ করলেন নতুন উদ্দেশ্য।** ফ্রয়েডের মতে রিগ্রেশন বা পশ্চাদ্‌গমনের ফলে আমরা অসুস্থ হই,

* However speculative his (Freud's) doctrines might be, they preceded from the nineteenth century monistic conception of the mind-body relation, and regarded mental processes in all their aspects as expressions of evolutionary reality residing in the tissues of living organism. For Jung, however, emphasis on the conception of spiritual forces and spiritual destiny become prominent in the early years, and become more and more prominent as decades went by." গার্ডনার মার্ফির 'A Historical Introduetion to Modern Psychology.'

** "The libido returns to the mother image, in order to find there the memory associations, by which further develop-

নিউরোটিক রোগলক্ষণ প্রকাশ পায়। আর ইয়ুং-এর মতে বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার উদ্দেশ্যে মন অসুস্থ হয়।* কথাটায় বেশ চমক আছে—তাই না? আরো একটু নাটকীয়ভাবে বললে বলা যায় - আমরা বেশি সুস্থ হব বলেই অসুস্থ হই। এ সম্পর্কে এক সমালোচক বেশ সুন্দর একটি মন্তব্য করেছিলেন।** ইয়ুং-এর বচনানুষঙ্গ (word-association) এক সময়ে খুব সমাদৃত হয়ে উঠেছিল, এখন আর এর বেশি প্রচলন নেই। তবে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ধারণা যাদের পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি, আবার ফ্রয়েডের যৌনসর্বস্ববাদতত্ত্ব মেনে নিতেও যাদের আটকায়, তাদের কাছে ইয়ুং-এর সমষ্টি-নির্জ্ঞানতত্ত্ব সমাদর পাবে। কমপ্লেক্স, এক্সট্রোভার্ট (extrovert), ইনট্রোভার্ট (introvert) কথাগুলো তুমি প্রায়ই আউড়ে থাক। নাটক নভেলেও কথাগুলোর ছড়াছড়ি। ইয়ুং-এর সমষ্টিনির্জ্ঞান (collective unconscious) ও আদি-প্রতিমা (archetype) নিয়ে উঁচুদরের বাংলা সাময়িক পত্রে প্রায়ই লেখা বেরুচ্ছে আজকাল। 'ইনটেলেকচুয়ালদের' মুখে মুখে ঘোরে ঐ দুটো শব্দ। কাব্য সাহিত্যে এমন কি ছায়াছবির সমালোচনাতেও ঐ শব্দ দুটো বারবার উচ্চারিত হয়। তাই বোধহয় লিখেছ ঐ দুটো কথার তাৎপর্য জানাতে। কৌশলে আমাকে ফাঁদে ফেলতে চেয়েছ কিনা কে জানে? আমার মত জড়বাদীর অজ্ঞতা আর সূক্ষ্ম রসগ্রহণের অক্ষমতার লিখিত প্রমাণ হয়ত হাতে রাখতে চাও; বিজ্ঞজনের কাছে সময়মত পেশ করে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার মতলবে! তুমি ইয়ুং সাহেবের তত্ত্বানুরাগী যে সব প্রখ্যাত লোকদের নাম উদ্ধৃত করেছ, দুর্ভাগ্যক্রমে আমার সঙ্গে তাঁদের আলাপ নেই। আলাপ থাকলেও তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে তোমাকে 'সমষ্টি-নির্জ্ঞানতত্ত্ব' বোঝাবার চেষ্টা আমি করতাম না। এ সম্পর্কে একজন অখ্যাত লেখিকার মতামত আমাকে খুবই আকৃষ্ট করেছে। তোমারই বয়সী একটি মেয়ে। তার বক্তব্য পরের প্যারায় তোমাকে জানাচ্ছি। মনোমত

---

ment can take place, as for instance from an emotional system into an intellectual system."

* "It is (regression) an attempt on the part of the minds to discover a solution for the difficulties in which it find itself."

** Jung has left the everyday world of medicine where the cause of a fractured skull is a blow on the head, for a more or less metaphysical point of view which is difficult to correlate with medicine. He is suggesting that the patient has become ill in order to become well."

না হলে তুমি ঐসব দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতদের শরণাপন্ন হতে পারো। আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই।

ইয়ুং মনস্তত্ত্বের সঙ্গে ধর্মতত্ত্বের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন এবং ফলে এক উপাদেয় তত্ত্ব তৈরী হয়েছে, যা মনোবিজ্ঞানের আওতায় পড়ে না। ফ্রয়েডের ব্যক্তিনির্জ্ঞানের আরও গভীরে তিনি সমষ্টিনির্জ্ঞানের স্তর আবিষ্কার করেছেন এবং সোজা ভাষায় আমরা যাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী বলি, তা থেকে আরও বেশি বিচ্যুত হয়েছেন। ফ্রয়েডের লিবিডোতত্ত্ব সরাসরি অগ্রাহ্য করে তিনি নতুন কথা বলতে শুরু করলেন। নির্জ্ঞান চিন্তা আর প্রাচীন চিন্তার (archaic thought) মধ্যে মিল খুঁজে পেলেন তিনি। রিগ্রেশনের (পিছুহটার) ফলে যে উদ্ভট কল্পনার উদয় হয় তার সঙ্গে আদিম মানুষের কল্পনার বা ফ্যানটাসির সাদৃশ্য দেখে ইয়ুং চমৎকৃত হলেন। পৌরাণিক ইতিবৃত্তের সঙ্গে উন্মাদের অসংলগ্ন চিন্তা-ধারার যোগাযোগ সম্বন্ধে অনেক গবেষণার পর তিনি লিখলেন* যোগাযোগ হয়ত আছে, কিন্তু ব্যাখ্যা কি অন্যভাবে করা যায় না! উচ্চমস্তিষ্কের, বিশেষ করে দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের, নিস্তেজনার (যা স্কিজোফ্রেনিক রোগীদের ঘটে) দরুন নিম্নমস্তিষ্ক ও প্রাথমিক সাংকেতিক স্তরের প্রাধান্য ঘটে। এই প্রাধান্যের ফলে অসংলগ্ন চিন্তা, ভাবাতিশয্য ও অবাধ কল্পনা দেখা দিতে পারে। পাভলভের স্বপ্নতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আরো বিশদভাবে লিখব। ইয়ুং কিন্তু মস্তিষ্কের ধারে কাছে এলেন না। তাই না? উন্মাদের উদ্ভট কল্পনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি কল্পনারই আশ্রয় নিলেন। ভাবলেন পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান এই সব উদ্ভট খেয়ালীপনার হদিশ দিতে পারে।** বহু দেশের গাথা অতিকথায়— একই ধরনের বৃত্তান্ত আছে। প্রতীকের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে জননীর জঠরে প্রত্যাবর্তন ও পুনর্জন্মের কাহিনী। ইয়ুং-এর এ থেকে বিশ্বাস জন্মালো যে, সব দেশের মানুষ একইভাবে চিন্তা করত ও একই প্রতীক উদ্ভাবন করেছে। প্রতিটি মানুষের মনের গভীরে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্মৃতি ছাড়া সমষ্টিগত অভিজ্ঞতার

---

* "As a matter of fact, patients substitute fantasies for reality, fantasies similar to the actual incorrect mental product of the past, which however were once the view of reality."

** "Man leaves the mother, the source of the libido, and is driven by the eternal thirst to find her again, and to drink renewal from her ; thus he completes his cycle, and returns again into his mother's womb."

স্মৃতিও বিদ্যমান। এলিয়ট স্মিথ ও অন্যান্য অনেক নৃতত্ত্ববিদ মনে করেন যে এক দেশের গাথা ও উপকথা লোকমুখে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।*

ইয়ুং-এর অভিমত সম্বন্ধে আরো দু'চার কথা শোনো।

তিনি বলেছেন, সংজ্ঞানে থাকে সদ্য স্মৃতি; ব্যক্তিনির্জ্ঞানে ব্যক্তির অতীত—যা সে অবদমিত করেছে, যা ভুলে গেছে; আর সমষ্টিনির্জ্ঞানে থাকে জাতিগত স্মৃতি** 'primordial images' হচ্ছে মানব মনের আদিমতম, গভীরতম সর্বজনীন চিন্তা-ভাবনা। এই আদিরূপ, এই আদিম প্রতিমা ইয়ুং-এর মনস্তত্ত্বে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। প্রতীকের সর্বজনীনত্বের ব্যাখ্যায় আর্কিটাইপ বা আদিরূপের আমদানি। আগে যে প্রত্যাবর্তনের কথা বলেছি, সেই প্রত্যাবর্তন বা পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে আদিরূপের প্রকাশ। পরিবারের আদিরূপ খৃষ্টানদের ত্রিনীতির (Trinity) মধ্যে।

ইয়ুং-এর মতে, 'স্বপ্ন অবদমিত কামনার কাল্পনিক প্রকাশ'—এই ফ্রয়েডীয় ধারণা ভ্রমাত্মক।***

ইয়ুঙ্গীয় নির্জ্ঞান-এর গভীরতা ও ব্যাপ্তির তুলনায় ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞান যেন সমুদ্রের কাছে গোষ্পদ। স্বপ্ন-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই নির্জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছেন ইয়ুং। কয়েকটি মাত্র স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে দ্রষ্টার জাতি-নির্ণয়ও নাকি সম্ভব। আদিপ্রতিমার বৈশিষ্ট্য থেকে ব্যক্তির অতীত ও বর্তমান, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মানসিক অবস্থা নির্ণয় করা যায়। ইয়ুং মনে করেন যে, লিবিডো শুধু যৌনশক্তি নয়, আদিম জৈবশক্তি: বার্গশর 'ইলান ভাইটাল' বা সাধারণ প্রাণশক্তি আর ইয়ুং-এর লিবিডো অনেকটা সমজাতিক। স্বপ্ন এবং নিউরোসিসের

---

* ম্যাগডুগাল বলেছেন,—"Jung's doctrine is in opposition to the school Prof. Eliot Smith, which seeks to account for such similarities in remote parts of the earth's surface by the hypothesis of geographical transmission of culture-elements and the wandering of people."

** "The inherited world images generally under the form of primordial images or mythical themes."

***"According to Freud, the dream is in its essence a symbolic veil for repressed desires, which are in conflict with the ideals of personality. I am obliged to regard the dream from a different point of view. The dream for me is, in the first nstance, the subliminal picture of the psychological condition of the individual in his waking state."

যৌনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ইয়ুং-এর মতে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। শৈশবের অজাচার-ইচ্ছাকে ইয়ুং একেবারেই গুরুত্ব দিতে চান না।

নিউরোসিসের কারণ অতীতে নয়, বর্তমানের মধ্যেই নিহিত বলে মনে করেন ইয়ুং। লিবিডোর কাজ অভিযোজন বা মানিয়ে নেওয়া : ইংরাজীতে যাকে বলে adaptation. এই মানিয়ে নেওয়ার পথে যখন কোন বাধা আসে, লিবিডো-স্রোত তখন পুঞ্জিত হতে থাকে। জলস্রোতের পথে বাধা এলে যে রকমটি হয়, অনেকটা সেই রকম। লিবিডো প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চয় করে বাধা ঠেলে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে, প্রতিবন্ধক থাকা সত্ত্বেও নিজেকে মানিয়ে নেবার প্রয়াস পায়। কোনমতেই যদি অভিযোজন সম্ভবপর না হয়, তবেই পুঞ্জিত লিবিডো পিছু হঠতে শুরু করে। বর্তমানের সঙ্গে অভিযোজনের চেষ্টা ছেড়ে অতীতে ফিরে গিয়ে আদিম উপায়ে মানিয়ে নিতে প্রয়াস পায়। ব্যক্তির শৈশব নয়, জাতির শৈশব ইয়ুং-এর আলোচ্য বিষয়। পশ্চাদ্‌গামী লিবিডো বা জীবনীশক্তি সেই শৈশবের দূর কল্পনাকে জাগিয়ে তোলে।

স্বপ্নে নির্জ্জানের স্বতঃবৃত্ত অভিযোজন-প্রয়াস দেখতে পাই। ঘুমন্ত অবস্থায় সংজ্ঞানের প্রভাবমুক্ত নির্জ্জানের পরিচয় পাই। এই পরিচয়ই তার চিন্তা-ভাবনা, ইচ্ছা-অনিচ্ছার সঠিক পরিচয়; ব্যক্তিত্বের প্রবণতার প্রকৃত নিদর্শন। জাগ্রত অবস্থায় কোন সমস্যার সমাধানে আমরা সমস্যাটিকে নানাদিক থেকে বিচার বিবেচনা করে দেখবার চেষ্টা করি। এই চেষ্টা স্বাভাবিকভাবেই ঘুমের মধ্যেও চলতে থাকে। অনেক নতুন সূত্রেরও সন্ধান পাই। জাগ্রত অবস্থায় এগুলো নির্জ্জান মনে সুপ্ত থাকে। এইদিক দিয়ে ইয়ুং-এর কাছে স্বপ্নের একটা বিশেষ মূল্য আছে। অভিযোজন ক্ষমতাকে সাহায্য করে স্বপ্ন। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে ব্যক্তিমানসের সমস্ত রকমের প্রবণতা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া একান্ত দরকার। স্বপ্নের মাধ্যমেই শুধু এই প্রবণতার সন্ধান মেলে; তাই ইয়ুং-এর কাছে স্বপ্নের গুরুত্ব এত বেশি, নির্জ্জান মনের চিত্র এত দামী।

ইয়ুং-এর নির্জ্জান শুধু ব্যক্তিনির্জ্জান নয়। শৈশবের অবদমিত কামেচ্ছা বা অবাঞ্ছনীয় বিস্মৃত ঘটনার ক্যালেণ্ডার শুধু নয় ইয়ুং-এর নির্জ্জান।*

আমরা জানি পরাগিত ডিম্বকোষ ক্রমবিকশিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ মানবশিশুতে রূপান্তরিত হওয়ার পথে বিবর্তনের ধারা রক্ষা করে চলে। মানবদেহে

---

* "Just as the body bears the traces of its phylogenetic development, so also does the human mind. There is nothing surprising in the possibility of the allegories of our dreams being a survival of archaic modes of thought."

প্রজাতির পূর্বপুরুষের অনেক স্বাক্ষর বিদ্যমান। তেমনি, ইয়ুং-এর মতে ব্যক্তিমানস ক্রমবিকাশের পথে পূর্বপুরুষের চিন্তাভাবনা ও প্রবণতার স্বাক্ষর বহন করে চলে। প্রাচীন চিন্তার ছাপ, আদিম মানসিকতার চিহ্ন, সভ্য মানুষের মনের অচেতনে বর্তমান। স্বপ্নে রূপকের মাধ্যমে এই আদিম মানসিকতার আত্মপ্রকাশ ঘটে। গূঢ় অর্থপূর্ণ পৌরাণিক কাহিনীকে সমষ্টির স্বপ্ন বলে অভিহিত করেছেন ইয়ুং। এবার স্বপ্নব্যাখ্যায় আসা যাক।

ইয়ুং তাঁর স্বপ্নব্যাখ্যাপদ্ধতির নাম দিয়েছেন—Synthetic constructure অর্থাৎ সংশ্লেষণ ও সংগঠনমূলক। তাঁর মতে ফ্রয়েডীয় পদ্ধতি causal and reductive—অর্থাৎ তাৎক্ষণিক কার্যকারণ সম্পৃক্ত এক খণ্ডিতকরণের পদ্ধতি। নিঃসন্দেহে তাঁর পদ্ধতি (তাঁর মতে) অনেক উচ্চাঙ্গের পদ্ধতি। ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসাবে ব্যাখ্যা করা যখন আর সম্ভব হয় না তখন ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষ হয়ে যায়। আর ঠিক সেই সময়েই, সমষ্টিনির্জ্ঞানের রূপকের আবির্ভাব ঘটে স্বপ্নের মধ্যে। ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা অনেকটা সাবজেক্টিভ ; সবকিছুকে ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমিত করার চেষ্টা। আর ইয়ুং-এর পদ্ধতি অবজেক্টিভ ; কাজেই বিশ্লেষণমূলক। দু'একটা ব্যাখ্যা শোনো, তাহলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

নির্জ্ঞানস্তরে আদি-প্রতিমাচিন্তার (archetypal thinking) অবস্থিতির প্রমাণ হিসাবে ম্যাকডুগাল যে দুটি স্বপ্নের উল্লেখ করেছেন, সেই দু'টিই আমাদের আলোচ্য। এ-স্বপ্ন দু'টির ব্যাখ্যা ম্যাকডুগালের অনুরোধে ডাঃ ইয়ুং নিজে দিয়েছেন।* তুমি বলতে পারো, ম্যাকডুগাল ত' ইয়ুং-এর তত্ত্বে পুরোপুরি বিশ্বাসী নন। তাঁর মতামত বা উদ্ধৃতি তুমি মেনে নেবে কেন? কোন কিছু নির্বিচারে মেনে নিতে তোমাকে আমি বলছি না। ম্যাকডুগাল, ফ্রয়েড, ইয়ং একই গোষ্ঠীর লোক, ভাববাদী দর্শন-অনুপ্রাণিত ইনস্টিংটুয়াল সাইকোলজিস্ট। ফ্রয়েডের সমালোচনা প্রসঙ্গে তাঁর মতামত তোমাকে জানিয়েছি। কাজেই ইয়ুং-এর সম্বন্ধে তাঁর ধারণা তোমার জানা দরকার। আর লক্ষ্য করে থাকবে যে,

* ম্যাকডুগাল বলেছেন—"During the analysis of my dreams by Dr. Jung, it was natural that I should be interested in any indications of archetypal thinking that might be revealed. I cannot allege that such indications were abundant or convincing to me. The following dream yields perhaps the best instance of thinking that seems to conform to that type."

ফ্রয়েড ও ইয়ুংকে তিনি শ্রদ্ধা করেন। বিরুদ্ধবাদী তাঁকে বলা চলে না। বস্তুবাদী স্কুলের পণ্ডিতেরা ফ্রয়েড বা ইয়ুং-এর মূল সূত্রকেই অস্বীকার করেন ; এবং তাঁদের কথা কিছু কিছু তোমাকে জানিয়েছি। পাভলভপন্থীদের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁদের মতামত আরো বিশদভাবে পেশ করব।

ম্যাকডুগালের স্বপ্নবৃত্তান্ত শোনো এবার। "আধশোয়া অবস্থায় একটি ষাঁড়কে গাড়ীতে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ষাঁড়টিকে গাড়ীর মধ্যে দাঁড় করানো হলে দেখলাম তার শুক্রাশয় দুটি (testicles) ঝুলে পড়ে প্রায় মাটি ছুঁয়েছে। এক লোলচর্ম বৃদ্ধা ষাঁড়টিকে হত্যা করতে চায়। মাটিতে বসে আছে বৃদ্ধা আর তার কোলের ওপর মাথা রেখে তার দিকে তাকিয়ে আছে ষাঁড়টি। বৃদ্ধার হয়ে ষাঁড়টিকে বধ করতে কেউ এগিয়ে আসছে না দেখে, অগত্যা সে নিজেই কাজে লেগে গেল। একটা বড় ছুরি দিয়ে ষাঁড়টির পিছন দিকে সে আঘাত করতে লাগল। আমার তিন ছেলে ষাঁড়টির পাশে একটা সরু দেওয়ালের গায়ে আটকানো একটি বেঞ্চে বসে (অনেকটা জাহাজের বাঙ্কের মত দেখতে) বিশেষ আগ্রহ নিয়ে দৃশ্যটি দেখছে। ষাঁড়টা ক্ষেপে গিয়ে আমার ছেলেদের জখম করতে পারে ভেবে খুব ভয় পেয়ে গেলাম। চেঁচিয়ে তাদের পালিয়ে যেতে বললাম। ষাঁড়টি শান্তভাবে শুয়েই আছে, আর বুড়ী আঘাতের পর আঘাত করছে। জমাট রক্ত আর টুকরো মাংসে সারাদেহ আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়াতে বৃদ্ধাকে বীভৎস দেখাচ্ছে। আমি উদ্বেগ, ঘৃণা আর ভয় নিয়ে জেগে উঠলাম।"

ম্যাকডুগালের নিজস্ব ব্যাখ্যাই বলি। "সন্তানদের বয়ঃসন্ধিকালে সব পিতামাতাই উদ্বিগ্ন থাকেন। আমার বড় ছেলে পনেরো বছরে পড়েছে। স্বপ্নের মধ্যে তার চেহারাটাই স্পষ্টভাবে দেখেছিলাম। এই উদ্বেগ নির্জ্ঞানে মনে চাপা ছিল। ষাঁড় যৌনতার প্রতীক। অতিবৃহৎ শুক্রাশয় এই ইংগিত বহন করছে যে, যৌনভার বহন করা খুবই শক্ত। ষাঁড়টিকে হত্যা করার চেষ্টা মানে ছেলেদের জীবন থেকে যৌনাবেগ রহিত করার ইচ্ছা। অবশ্য এ-ইচ্ছা বা এই পদ্ধতিতে তাদের জীবন নিরাপদ করার যৌক্তিকতা সম্পর্কে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল ; এর ফলে তদের আরো বেশি ক্ষতি ঘটতে পারে—এই আশঙ্কাও প্রকাশ পাচ্ছে স্বপ্নের মধ্যে। সংযতচরিত্র, রাশভারি প্রবীণ স্ত্রীলোকের প্রতীক ঐ বৃদ্ধা। এঁরা যৌন-নীতি শিক্ষা দিয়ে থাকেন, এঁরা সজাগ প্রহরী ও নৈতিক অভিভাবকের কাজ করেন।"

ইয়ুং-এর ব্যাখ্যা (ম্যাকডুগালের মতে) আরো বেশি আনুমানিক ও কৌতূহল উদ্দীপক। তাঁর মতে এই স্বপ্নটি পুরণো এক অতিকথার (myth) বৈশিষ্ট্য-সূচক প্রতিরূপ। ষাঁড় ও বৃদ্ধা এখানে ম্যাকডুগালের সমষ্টিনির্জ্ঞানে অনুপ্রবিষ্ট আর্কিটাইপ্যাল ফিগার—আদিপ্রতিমার প্রতীক। ষাঁড়টি সমষ্টিনির্জ্ঞানে সুপ্ত

যৌনাসক্তি, অবহেলিত হয়ে পাশবপ্রবৃত্তির রূপ নিয়েছে। স্বপ্নে অনুভূত ভয় ও উদ্বেগ নিজের মনের ঐ অবহেলিত দিকটি সম্পর্কে। ষাঁড় ও বৃদ্ধা ম্যাকডুগালের "এ্যানিমা"র (Anima) প্রতীক। এ্যানিমা ও পার্সোনা (Persona)— এই দু'টি শব্দ ইয়ুং বোধ হয়, 'Animal' ও 'Person'—এই অর্থে ব্যবহার করেছেন। অনেক সম্ভাবনা বা সহজাত শক্তির অংকুর নিয়ে মানুষ জন্মায়। এর সবগুলি বিকশিত হতে পারে না। কতকগুলির অনুশীলনের জন্য অন্য কতকগুলি অবহেলিত হয়। অনুশীলিত গুণগুলির পূর্ণ বিকাশের ফলে মানুষের যে রূপ বা ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়, তাই দিয়েই মানুষের পরিচয়। এই রূপ বা 'ব্যক্তিত্বকে' ইয়ুং মুখোসের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আর যে-সম্ভাবনাগুলি বিকশিত হতে পারে না তারা সমষ্টিনির্জ্ঞানে পাশবশক্তি নিয়ে ঘুমিয়ে থাকে। মুখোসচিহ্নিত ব্যক্তিত্বের বিপরীত এই পাশবশক্তি। 'এ্যানিমা' আর 'পার্সোনা' পরস্পরবিরোধী, সদা-যুধ্যমান। ইয়ুং-এর মতে পুরুষালী গুণসম্পন্ন যার 'পার্সোনা', তার 'এ্যানিমা' তত নারীসুলভ। ম্যাকডুগাল বুদ্ধিজীবী, তাঁর 'পার্সোনা' যুক্তিবাদী, কাজেই 'এ্যানিমা' স্বজ্ঞাবাদী (Intuitive)। তাই তাঁর মগ্ন ব্যক্তিত্বের প্রতীক ঐ লোলচর্ম বৃদ্ধা। 'পার্সোনা'র সঙ্গে সমাজচৈতন্যের যে সম্পর্ক, 'এ্যানিমা'-র সঙ্গে সমষ্টিনির্জ্ঞানের সেই সম্পর্ক।

এরপর ম্যাকডুগাল বলেছেন যে, ফ্রয়েডের স্বপ্নব্যাখ্যা শুধুই ব্যাখ্যা। টুকরো টুকরো করে স্বপ্নটাকে ভেঙ্গে—শৈশবের বিভিন্ন অবদমিত কামনার সঙ্গে তার সম্পর্কনির্দেশ। আর ইয়ুং-এর ব্যাখ্যা গঠনমূলক। সমগ্র ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন করে ভবিষ্যতের কর্মপদ্ধতির নির্দেশ পাওয়া যায় নাকি তাঁর ব্যাখ্যায়।

ষাঁড়ের স্বপ্নের তাৎপর্য এই যে, ম্যাকৃডুগালের 'এ্যানিমা' মগ্নচৈতন্যে সুপ্ত থাকলেও, তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করছে এবং তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ম্যাকডুগালের নিজের বক্তব্য যথাযথ তুলে দিয়েছি। ফ্রয়েড ও ইয়ুং-এর স্বপ্নবিচার পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য, আমার চোখে যা ধরা পড়েছে, তা নেহাৎ মামুলি। এই 'পার্সোনা' আর 'এ্যানিমা'—জেমসের বহু বিঘোষিত মনের 'সদর' আর 'অন্দরের' কথা মনে করিয়ে দেয় না কি? খুব বেশি পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। আর বৃদ্ধা কেন ষাঁড়টিকে হত্যা করতে চায় তাও স্পষ্ট নয়। সমষ্টিনির্জ্ঞানের এক অংশের সঙ্গে অপর অংশের এই সংঘাতের কারণ কি? তা ছাড়া ইয়ুং-এর ব্যাখ্যায় ম্যাকডুগালের ছেলে তিনটির কোন উল্লেখ নেই। তোমার কাছেই উত্তর চাই।

আর একটি স্বপ্ন। "তাঁবু ভেঙ্গে ফেরার পর আমি কিছু জিনিসপত্র কেনার জন্য সেখানকার 'সেলে' (sale) উপস্থিত। সমচতুষ্কোণ একটি ক্যানভাসের

তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে দেখছি। তাঁবুর ভেতরকার মেঝে প্রায় তিন ফুট উঁচু। দুদিকে ঝোলানো ক্যানভাসের আলগা টুকরোর একটা পাশ গুটোনো। মেঝের উপর আমার কুকুরটাকে দেখলাম। সে বেরিয়ে আসতে চায় অথচ পারছে না। সে লাফ দিলেই ত' পারে। কেন লাফ দিচ্ছে না? মাঝামাঝি ক্যানভাসের পার্টিশন দিয়ে তাঁবুটাকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। আমি ঘুরে অন্যধারে গিয়ে আল্‌গা ক্যানভাস সরিয়ে কুকুরটাকে ডাকলাম। কুকুরের বদলে একটা বছর দুয়েকের বাচ্চা বেরিয়ে এল। আমার ছেলেরাও ঐ বয়সে প্রায় ঐ রকমটি দেখতে ছিল। সে আমার কোলে উঠতে চাইল। আমি তাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেতেই দেখি আমার স্ত্রী এক বৃদ্ধ জেনারেলের সাথে বেরিয়ে এলেন।"

এই স্বপ্নটির কোন অর্থ খুঁজে না পেয়ে ম্যাকডুগাল ইয়ুং-এর কাছে এটিকে হাজির করেন ব্যাখ্যার জন্য। ঐ সময় ম্যাকডুগাল ইংলণ্ডের বাস তুলে দিয়ে আমেরিকা যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। স্বপ্নটির মধ্যে, ইয়ুং-এর মতে, সেই পরিবেশ বিধৃত। তাঁবু ম্যাকডুগালের ভবঘুরে জীবনযাত্রার প্রতীক। কুকুরটি উদ্দাম স্বাধীনতাপ্রয়াসী সহজাত প্রবৃত্তি। এই সহজাত প্রবৃত্তির চরিতার্থতার পক্ষে ইংলণ্ডের পরিবেশ অনুকূল মনে হচ্ছিল না। ম্যাকডুগাল এই সহজাত প্রবৃত্তিকে চাপা দিয়ে রাখতে চান, কিন্তু পারছেন না। বাচ্চাটি ইয়ুং-এর পরিভাষায় "Kabyr"-এর প্রতীক। যুক্তি আর প্রবৃত্তির মধ্যেকার সংযোগসেতু বোধ হয় এই Kabyr; মনের অপরিণত স্বজ্ঞালব্ধ জ্ঞান, যাকে বলা হয় intuitive knowledge.

আল্‌গা ঝোলানো ক্যানভাসের টুকরো (flap) দিয়ে তাঁবুটিকে দুভাগ করা হয়েছে। এর মানে সহজাত প্রবৃত্তি আর স্বজ্ঞার ঘনিষ্ঠতা খুব বেশি। স্বজ্ঞাবৃত্তি সমীক্ষার ফলে নির্জ্ঞান থেকে সংজ্ঞানে আসতে চেষ্টা করছে। বৃদ্ধ জেনারেল ম্যাকডুগালের মধ্যেকার পিতৃসুলভ বাৎসল্যগুণের প্রতীক। ব্যক্তিত্বের নানাদিক কিভাবে স্বপ্নের মধ্যে প্রতিভাত হয়—এই স্বপ্নটি তারই নিদর্শন।

ম্যাকডুগাল বলছেন, ইয়ুং-প্রদর্শিত স্বপ্নব্যাখ্যা এখানে সম্পূর্ণ মানুষটিকে তুলে ধরেছে। ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ পরিচয় নিহিত আছে সমষ্টিনির্জ্ঞানে। স্বপ্ন সমষ্টি-নির্জ্ঞানের দরজা খুলে অন্তর্লীন 'এ্যানিমা'কে সংজ্ঞানস্তরে আনতে সাহায্য করছে। ম্যাকডুগাল ও ইয়ুং ফ্রয়েডের মতই স্বপ্ন-বিশ্লেষণের সাহায্যে মননক্রিয়ার স্বরূপ জানতে বদ্ধপরিকর। মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া মনকে জানার চেষ্টা গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরপাক খাওয়াতে পর্যবসিত হতে বাধ্য। নির্জ্ঞানের ব্যাপ্তি ও গভীরতা ইয়ুং বাড়িয়েছেন, এতে দূরকল্পনা ও অনুমানের পরিধি বেড়েছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু জ্ঞানের মাত্রা বাড়েনি। এক শ্রেণীর শিল্পী সাহিত্যিকের কাছে 'আদি-প্রতিমার' কল্পনা যতই গভীর তাৎপর্যব্যঞ্জক হোক না কেন,

মনোবিজ্ঞানের কাছে এর বিশেষ কোনো দাম নেই। আজকাল গ্যয়টে বা রবীন্দ্রনাথের কাব্যব্যাখ্যায় ইয়ুংকে টেনে আনছেন অনেক সমালোচক। আমি জানি, তুমি তাঁদের দ্বারাই অভিভাবিত হয়েছ। শিল্পী সাহিত্যিকের কল্পনা-উপমা-প্রতীকের মধ্যে মনোবিজ্ঞানের সূত্র বা সত্য খুঁজতে গেলে ঠকতে হবে।

* * * *

রহস্যবাদ চিরকাল মানুষকে প্রভাবিত করতে থাকবে;—তোমার এই ধারণার সঙ্গে আমি কিন্তু পুরোপুরি একমত নই। বিজ্ঞান সবকিছুর ব্যাখ্যা কোনদিন দিতে পারবে না, একথা ঠিক। কেন না, জ্ঞানের আলো যতই বাড়বে অন্ধকারে ঢাকা নতুন অজানার রাজ্য ততই বিজ্ঞানকে নতুন চ্যালেঞ্জ জানাবে। আলো-অন্ধকার, জানা-অজানা, জ্ঞান-অজ্ঞানতা—এই দুই বিপরীতে ঘেরা থাকবে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড। কিন্তু এমন দিন আসছে—যখন তোমার আমার মত সাধারণ মানুষও অজ্ঞানতা-অন্ধকারের সামনে দাঁড়িয়ে মোহাচ্ছন্ন হবে না, বিভ্রান্ত হবে না, অন্ধকারের চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করবে। অতীন্দ্রিয় বা প্রকৃতিবহির্ভূত কোনো শক্তির আরাধনা করবে না, বিজ্ঞানলোকের সীমারেখার বাইরে রহস্যলোকের কল্পনা করবে না। তারজন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানচেতনার সম্প্রসারণ ও সামাজিক বিন্যাসের পরিবর্তন।

অনুমান বিজ্ঞানী মাত্রেই করেন। সেই অনুমান অনেক সময় হয়ত' সত্য বলে প্রমাণিত হয়। অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এভাবে ঘটেছে মানতেই হবে। কিন্তু তা বলে অনুমানমাত্রকেই বৈজ্ঞানিক সত্যের মর্যাদা দিতে রাজি নই। ইয়ুং-এর অনুমানকেও না। ইয়ুং সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু তোমার মত দুর্বলতা নেই। তুমি লিখেছ, ইয়ুং-এর মতে ঘুমের মধ্যে মানুষ নিজেকে অতিক্রম করে, স্বপ্ন মানুষের সমষ্টিনির্জ্ঞানের ঐশী প্রকৃতির অভিব্যক্তি, মানুষের মহত্ত্বের প্রতীক। আর ফ্রয়েডের মতে ঘুমের মধ্যে মানবসত্তা সংকুচিত হয়ে যায়, স্বপ্নের মাধ্যমে আমরা শৈশবাসক্তি ও জৈব প্রবৃত্তির সন্ধান পাই; স্বপ্ন মানুষের নীচতা হীনতার অভিব্যক্তি। নিঃসন্দেহে ইয়ুং-এর অনুমান মানবজাতির পক্ষে গৌরবজনক আর ফ্রয়েডের অনুমান লজ্জাজনক। কিন্তু বিজ্ঞান তোমার-আমার গৌরব অগৌরবের তোয়াক্কা করে না। একজন মানুষকে দেবশিশুর সঙ্গে তুলনা করে খুশি, আর একজনের মানুষকে ছাগশিশু কল্পনা করে তৃপ্তি। এরিক ফ্রম আবার দুকূল রক্ষা করতে চান। তিনি বলেছেন, স্বপ্ন যুক্তিহীন প্রবৃত্তি আর বুদ্ধিদীপ্ত উচ্চমননবৃত্তি—এই দুয়েরই পরিচায়ক। ভালো মন্দের সমন্বয়ে স্বপ্নজগৎ গঠিত।*

---

* "Dreams show both the best and the worst in ourselves"

আর একজন আধুনিক আমেরিকান চিকিৎসকের মত উদ্ধৃত করছি।* আমার মতে, এঁরা দুজনেই মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপকে প্রাধান্য না দিয়ে নিজেদের অনুমানভিত্তিক তত্ত্বকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বৈজ্ঞানিক দর্শনের আশ্রয় ছেড়ে অন্তর্দর্শনের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়েছেন, কাজেই একজন প্যারা-সাইকোলজি অন্যজনে মেটাসাইকোলজিকে সমৃদ্ধ করেছেন। মনস্তত্ত্বকে অতিকথায় দাঁড় করাতে চেয়েছেন, মনোবিজ্ঞানকে অবহেলা করেছেন। ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যাত্মবিদ্যার সমারোহ যতই তোমাকে আকৃষ্ট করুক না কেন, এই বিদ্যাকে এখনও বিজ্ঞান-সমর্থিত বিদ্যা বলে মানবার উপায় নেই।

ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ত্বে যৌন-প্রতীকের আধিক্য তোমার বয়সী মেয়েদের শালীনতাবোধকে আহত করে বলে তুমি বোধহয় ইয়ুংকে আশ্রয় করতে চেয়েছ। 'পিউরিট্যান্' প্রীতি আর বিজ্ঞানধর্মিতা কিন্তু এক নয়। এই প্রসঙ্গে উড়ন্তচাকী ও গুস্তাভ ইয়ুংকে নিয়ে বছর দশ বারো আগে সংবাদপত্রে যে আলোড়ন উঠেছিল, তার খবর তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি। এ থেকে ইয়ুং-এর জীবনদর্শন বুঝতে পারবে। জানো নিশ্চয়ই যে উড়ন্তচাকীর গালভরা একটা নাম আছে—Unidentified Flying Objects, সংক্ষেপে U. F. O.। এই U. F. O. নিয়ে ইয়োরোপ-আমেরিকায় শোরগোল চলছে। ১৯৫৪ সালে ইয়ুং এ সম্পর্কে একটি সুইস্ পত্রিকার প্রতিনিধির কাছে বলেছিলেন যে কিছু একটা দেখা যায়, কিন্তু ঠিক বস্তুটি কি সেটা সঠিক বোঝা যায় না। চার বছর পরে নিউ মেক্সিকোর U. F. O. কেন্দ্র থেকে একটা সংবাদ প্রকাশিত হয় যে ইয়ুং নাকি সুইস পত্রিকার প্রতিনিধির কাছে বলেছিলেন যে তিনি উড়ন্তচাকীর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। দস্তুর মত হৈ চৈ পড়ে যায়। ইয়ুং-এর প্রতিবাদ যথাসময়ে প্রকাশিত হলেও পাঠকদের যেন দৃষ্টি আকর্ষণ করলো না।** এ থেকে ইয়ুং এই শিক্ষা লাভ করলেন যে সাধারণ মানুষ উড়ন্তচাকীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে চায়, অবিশ্বাসকে প্রশ্রয় দিতে চায় না।*** কারণ কি? উড়ন্তচাকীর অস্তিত্ব

---

* "For most psychiatrists Jung is too mystical. For others Freud is too narrow, restricting dream motives to the expression of infantile sexual drives as the whole range of human emotions"

** ইয়ুং-এর কথায়—"I issued a statement to the United Press and gave a true version of my opinion, but this time the wire went dead. Nobody, so far as I know, took any notice of it."

***"This creates the impression that there is a tendency all over the world to believe in saucers and to want them to be real."

মানুষ মেনে নিতে চায় কেন? কারণ এ বিশ্বাস মানব-প্রজাতির সমষ্টিগত বিশ্বাস। স্মরণাতীতকাল থেকে এই বিশ্বাস তারা ধারণ করে আসছে। প্রাচীনকালের স্বপ্ন-প্রতীক এই উড়ন্তচাকী। স্বপ্ন ইয়ুং-এর মতে সমষ্টি-নির্জ্ঞান-এর বহিপ্র্কাশ। প্রাচীন যুগের প্রজাতিগত চিন্তাভাবনা আধুনিক মানুষের নির্জ্ঞান মনের গোপনে অবস্থান করছে। লোকগাথায়, পৌরাণিক কথায়, এই চিন্তাভাবনা সাধারণের কাছে প্রকাশ পাচ্ছে।

এই চিন্তাভাবনা, এই স্বপ্ন প্রতীক, এই সমষ্টিগত বিশ্বাস কোনো বৈজ্ঞানিক সত্যের আভাস কিনা এ নিয়ে ইয়ুং বিশেষ মাথা ঘামাতে চান নি। তিনি স্বপ্নে ও সমষ্টিগত বিশ্বাসের মধ্যে খণ্ডিত অসম্পূর্ণ ব্যক্তিমানুষের পূর্ণতার ও অখণ্ড আশা-আকাঙ্ক্ষা-অভিলাষের প্রতিফলন দেখেছেন। ধর্মীয় বিশ্বাসের পুনরুজ্জীবন মানবমুক্তির পথ মনে করেছেন ইয়ুং।

উড়ন্তচাকীর প্রসঙ্গে ফ্রয়েড আর ইয়ুং-এর দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যটা বুঝিয়ে বলছি শোনো। উড়ন্তচাকী একটা প্রতীক। ফ্রয়েডের কাছে যৌনাঙ্গের প্রতীক, ইয়ুং-এর কাছে ধর্মাঙ্গের। ফ্রয়েড শুধু একটিমাত্র 'আর্কিটাইপ' (আদি রূপ বা প্রতিমা)— অজাচার-ইচ্ছাকে, কামপ্রবৃত্তিকে অতি গুরুত্ব দিয়েছেন। অন্যপক্ষে ইয়ুং মনে করেছেন যে গুরুত্বপূর্ণ আর্কিটাইপ (আদি প্রতিমা) মাত্রেই ধর্মাশ্রিত। উদাহরণ দিচ্ছি, শোন:

একটি মেয়ে বাসে করে যাচ্ছিল। এয়ার-রেডের সংকেত-সাইরেন বেজে উঠল। সকলে নেমে গেল। মেয়েটিও নেমে একটা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করতে চাইল। দরজা বন্ধ। খোলা গেল না। মেয়েটি দেয়ালে গা মিশিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। পরিচিত বম্বারের বদলে সে এক ধরনের উড়ন্তচাকী দেখল। নীল আকাশের গায়ে বর্তুলাকৃতি ধাতব বিন্দু। তার মনে হলো তাকে যেন কেউ লক্ষ্য করছে। মাসখানেক পরে একরাত্রে মেয়েটি এক শহরের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। এমনি সময়ে আকাশে অন্তগ্রহচারী যান্ত্রিক যানের আবির্ভাব ঘটল। আকার ইস্পাতের তৈরী সিগারের মত। একটা যন্ত্র মেয়েটিকে লক্ষ্য করেই এগিয়ে এল। সাহসের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটি। যন্ত্রটি নীল-সাদায় মেশানো, অনেকটা চোখের মত দেখতে। ...তাকাতেই মেয়েটির মুখ আগুনে ঝলসে গেল। হাসপাতালে নিতে হল তাকে।

সত্যি ঘটনা নয়, তোমার মত একটি সুন্দরীর স্বপ্ন। ইয়ুং-এর এক রোগিণীর।

এই স্বপ্নটি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ফ্রয়েড ও ইয়ুং-এর দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য পরিষ্কারভাবে বিবৃত করা চলে।

ফ্রয়েডের মতে প্রথম স্বপ্নটি উদ্বেগ-স্বপ্ন। এখানে উড়ন্তচাকীটি মাতৃ-জঠরের

প্রতীক। রোগিণী সেই শান্তিময় মাতৃজঠরে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল। দ্বিতীয় স্বপ্নে দৃষ্ট উড়ন্তচাকীর সিগার-আকৃতিই তার যৌন-প্রতীকতার পরিচায়ক। ইয়ুং বলবেন—এহ বাহ্য। ফ্রয়েড স্বপ্নের মর্মরহস্য উদ্ঘাটনে অক্ষম। এই স্বপ্ন আসলে ধর্মভিত্তিক। ইউ. এফ্. ও.—প্রাগৈতিহাসিক যুগের সূর্যচক্র, যাদুচক্র, মিশরীয় দেবতা হোরাসের চোখ। বাইবেলের এলিজা স্বর্গ থেকে পাপ-অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন মর্তের দিকে। উড়ন্তচাকী প্লেটো বর্ণিত বিশ্ব-আত্মা-যীশুর বিশীর্ণ তাপপীড়িত দেহের ভাস্বর দীপ্তি। ইয়ুং-এর মতে—"the traditional circular 'all seeing' eye of God, which searches the hearts of men." এই যন্ত্রবিজ্ঞানের যুগে ঈশ্বর ও ঐশ্বরিক সবকিছু যান্ত্রিক-প্রতীকরূপে প্রকাশমান। উড়ন্তচাকীতে গ্রহান্তরের অতিথির আবির্ভাব ঘটছে কি না—এ প্রশ্ন ইয়ুং-এর কাছে অবান্তর। এই স্বপ্ন রোগিণীর মনে গভীর ধর্মভাবের পরিচায়ক। জীবনের পরিপূর্ণতা অন্যলোকে অবস্থিত অলৌকিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। অসংখ্য মানুষ উড়ন্তচাকীর অস্তিত্বে বিশ্বাসী—এর মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্যই তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। সেই তাৎপর্য কি? ধর্মের তাৎপর্য কি? জীবনের পরিপূর্ণতা, অখণ্ডতা, সম্পূর্ণতা সকল ধর্মের লক্ষ্য। তারই জন্য মানুষের চিরন্তন আকুতি। আমরা স্বর্গের দিকে তাকাই মহাপুরুষের আবির্ভাবের জন্য; বিশেষ করে,—যখন জাগতিক জীবনে জটিলতা বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি পায়। সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মধ্বজীদের 'সিভিল ওয়ারের' সংকটজনক পরিস্থিতিতে ইয়োরোপের মানুষ নাকি হলুদ রঙের চাকতি আকাশপথে উড়তে দেখেছিল। এই উড়ন্তচাকী তাদের কাছে সংকটের আসন্ন সমাধানের ইঙ্গিত বলে প্রতিভাত হয়েছিল। আজও বিশ্বব্যাপী বিচ্ছিন্নতা সংঘর্ষ অরাজকতা। মানুষ এর অবসান চায়। তার অভিলাষের প্রতিফলন তার স্বপ্নে, তার বিশ্বাসে। উড়ন্তচাকী ঈশ্বরের দূত, বার্তা, ইশারা, যাই হোক না কেন; তার অস্তিত্বে বিশ্বাস মানুষের কাছে ইতিবাচক, আশ্বাসব্যঞ্জক। মানবজাতির নিরাপত্তার প্রতীক এই জাতীয় ধর্মবিশ্বাস। ইয়ুং তাই মনে করেন।

কেন ইয়ুং-এর প্রতি তোমার পক্ষপাতিত্ব—এবার বুঝতে পারছ কি? উড়ন্তচাকী তোমার কাছে, ভারতীয়ের কাছে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নয়, ভারতীয় ধর্ম বা দর্শনের কোনো কিছুর প্রতীক নয়; তুমি বলবে। তোমার স্বপ্নে উড়ন্তচাকীর দর্শন মেলে না একথা হয়ত ঠিক। ষাঁড়ে তাড়া করেছে, তুমি ছুটতে ছুটতে পথ হারিয়ে ফেলেছ—এই স্বপ্নটা এক সময় তুমি খুব দেখতে। কোনো এক ফ্রয়েডিয়ানের যৌনমূলক ব্যাখ্যা শোনবার পর তোমাকে আমি ইয়ুং-এর বই পড়তে দিয়েছিলাম। ফ্রয়েডিয়ানের ব্যাখ্যায় তোমার মনে রাগ ও ঘৃণার উদ্রেক হয়েছিল: ইয়ুঙ্গিয়ানের সম্ভাব্য ব্যাখ্যায় তুমি অনেকটা আশ্বস্ত বোধ

করেছিলে। মনে আছে, ষাঁড়টার চোখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছিল। ঈশ্বরের অনুসন্ধানী চোখ কিম্বা উড়ন্তচাকীর গোলাকার নীল সাদা আলোর বৃত্তের সঙ্গে অনেকটা মিলে যায় না কি? বৃষভ মহেশ্বরের বাহন; মহেশ্বর তৃতীয় নয়ন দিয়ে মনের অন্তঃস্থল পর্যবেক্ষণ করেন। আর উড়ন্তচাকীও কি তোমার আমার কাছে পুরোপুরি বিজাতীয়? স্থদর্শন চক্রের সঙ্গে কোন সাদৃশ্য নেই কি? ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় যুগে যুগে চক্রধারীর আবির্ভাব ভারতীয় হিন্দুমাত্রেই কামনা করে না কি? অন্তরীক্ষ থেকে স্থদর্শন চক্র নেমে আস্থক, অত্যাচারী শিশুপালের শিরশ্ছেদ ঘটিয়ে পাপের অবসান ঘটাক—এ স্বপ্ন তুমি জাগ্রত অবস্থাতেই দেখে থাক নিশ্চয়ই। ইয়ুঙ্গীয় শাস্ত্রে পাবে আরো কত সব ভালো ভালো কথা। অসম্পূর্ণতা দূর করা, অখণ্ড সত্তার প্রকাশ, সীমার মাঝে অসীমের সন্ধান ইত্যাদি। ইয়ুঙ্গিয়ানের এই সব ধর্মীয় বাণী ও শুভেচ্ছা ভারতীয় রমণীকে যে আকৃষ্ট করবে এ আর বিচিত্র কি? যতই আধুনিকা হও না কেন; যতই বিজ্ঞানের চর্চা কর না কেন, যতই জোর গলায় অস্বীকার কর না কেন, তোমার মন এখনও পুরণো সংস্কারের আওতা থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি।

আমি অনুমান করতে পারছি তোমার উষ্মার তীব্রতা! আবহাওয়াবিদ না হয়েও ঐ স্থন্দর আননের ভাবান্তর দেখে বলতে পারি—বজ্র বিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। এ যুগের সব থেকে বড় গালাগালি বোধহয় তোমাকে দিয়ে বসেছি। 'পুরণো সংস্কার থেকে মুক্ত হওনি'—একথা শুনলে তোমার বয়সী সব ছেলে-মেয়েরই ক্রোধে জ্বলে ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু কথাটা মিথ্যে নয় মোটেই। আর এতে ক্রুদ্ধ হবার কিছু নেই, লজ্জা পাবারও কারণ নেই। হাজার হাজার বছরের পুরণো সংস্কার, যে সংস্কার লক্ষ লক্ষ নর-নারী প্রতিদিন আচরণের ও রিচুয়াল (ritual)-এর মাধ্যমে সযত্নে লালন পালন করছে; তার রেশ শুধু তোমার কেন, অনেক চরম চার্বাকপন্থী, মোক্ষম মার্কসপন্থীর গোপন মনেও স্পন্দমান।

দুর্বলতা যদি মনে করো, আর যদি তা থেকে মুক্ত হতে চাও, তবে দুর্বলতাকে অস্বীকার কোরো না। শুধু বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক বা প্রায়োগিক দিকের নয়, পুরোপুরি বিজ্ঞানানুগ সামাজিক পরিবেশ তৈরী না হওয়া পর্যন্ত পুরণো ধর্মীয় বিশ্বাস জনসাধারণের একাংশের মনে জেগে থাকবে, আর সেগুলো অংশত তোমার মত অসাধারণকেও প্রচ্ছন্নভাবে হলেও প্রভাবিত করবেই। আর আমার মত self-appointed সমাজসেবীরা তোমার মত তরুণ-তরুণীদের এই প্রভাব থেকে মুক্ত করবার জন্য এমনি ভাবেই জ্ঞান বিতরণ করতে থাকবে।

ফ্রয়েড-ইয়ুংকে নস্যাৎ করার কোনো অভিপ্রায় আমার নেই। আর করতে চাইলেই বা পারবো কেন? সে শক্তি আমার কোথায়? তাঁরা সমাজ-ইতিহাসের

এক অধ্যায়ের সঙ্গে বিশেষভাবে সংযুক্ত হয়েছিলেন। সেই অধ্যায়ের শেষে ভাববাদের প্রাধান্যান্তে তাঁরা হয়ত মনোবিজ্ঞানের ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করবেন না; কিন্তু মনোবিদ্যার ইতিহাসে তাঁরা নিশ্চয়ই অনেকদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তবে অতীন্দ্রিয় জগতের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ কোনদিন বিজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসা উদ্রেক করবে কি না—এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অনেক তথাকথিত অলৌকিক ঘটনা বিজ্ঞানের আলোতে রহস্যময়তা হারিয়ে লৌকিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রামাণ্য সত্যে পরিণত হবে। আবার অনেক অলৌকিক ঘটনা, অবাস্তব অতিকথা, উন্নততর সমাজে অবিশ্বাস্য অপাঙক্তেয় ও পরিত্যজ্য বলে পরিগণিত হবে। মনোবিজ্ঞানের শৈশব এখনও অনতিক্রান্ত, এখনও অনেক কিছু অনায়ত্ত; তা বলে আজকের দুর্বোধ্য কোনো ঘটনাকে আমরা অতীন্দ্রিয় শক্তির বিকাশ ভেবে নার্কোটিক সেবনে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করব না। বৈজ্ঞানিক সত্য, পরীক্ষিত সত্য, প্রায়োগিক সত্যকে আমরা প্রচার করব আর বিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কারের আলোতে দুর্বোধ্য ঘটনা সুবোধ্য ও অন্ধকারাবৃত মনোকন্দরকে রহস্যতামসোত্তীর্ণ করবার চেষ্টা করব।

এইবার তোমার দুরূহতম প্রশ্ন দুটির উত্তর দেবার চেষ্টা করা যাক। প্রথম: কোটি কোটি মানুষ যে বিশ্বাস নিয়ে কুম্ভমেলায় মিলিত হয়, সাগরস্নানের জন্য আগ্রহী হয়, সেই বিশ্বাসকে আমরা কোন্ দৃষ্টিতে দেখব? অনেকদিন ধরে অনেক মানুষের একত্রে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনকে আদিপ্রতিমার প্রতিফলন কল্পনা করে রহস্যমুগ্ধ দৃষ্টিতে অবলোকন করব? না, সংস্কার ও অভ্যাসের অন্ধ ক্রীতদাসদের এই অর্থহীন আচরণকে, এই মূঢ়তা অজ্ঞতাকে অবজ্ঞার চোখে দেখব? দ্বিতীয়: আমাদের কোন সমষ্টিগত আচরণ বা কি স্বপ্ন 'মহামানব'-এর আগমনীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন?

আমার উত্তর তোমাকে তৃপ্তি দেবে কি না জানি না। তবু উত্তর একটা আমাকে দিতেই হবে! আবহমান কাল থেকে অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কোটি কোটি মানুষ যদি কোনো আচরণ পালন করে, তা হলেই সেই আচরণ সত্য বা সুস্থ আচরণ হয়ে ওঠে না। তোমার আদিপ্রতিমার প্রতিফলনের কল্পনায় 'নষ্টালজিয়া' আসতে পারে, আমার আসবে না। অজ্ঞতা মূঢ়তাকে কোন মতেই প্রশ্রয় দেবনা। তা বলে এই আচরণকে, এই সমষ্টিগত ধর্মীয় 'কমপালশন'কে অবহেলা বা সিনিকের দৃষ্টিতে দেখবারও অধিকার আমার নেই। ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'রিচুয়াল' যখন 'কমপালশনে' দাঁড়ায়, তার মস্তিষ্ককোষের দুর্বলতা, তার নিরাপত্তার অভাব, তার উদ্বেগ উৎকণ্ঠার পরিমাণ নিয়ে আমরা বিস্তারিত অনুশীলন করি: সমবেদনায় আকুল হই। তার 'কমপালসিভ' আচরণের

মনস্তাত্ত্বিক অর্থ আবিষ্কার করার চেষ্টা করি। তাকে এই আচরণের নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে প্রয়াস পাই। তাকে সম্বর্ধনা জানাই না, আবার মূঢ় অপদার্থ বলে ভর্ৎসনাও করি না। সমষ্টির ক্ষেত্রেও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যতক্ষণ সমষ্টিআচরণ উন্মাদনার বা অসামাজিকত্বের পর্যায়ে না পড়ে, গণ-হিষ্টিরিয়ার উপসর্গ প্রকাশ না পায়; ততক্ষণ এ আচরণের বিরুদ্ধাচরণ করবার কোনো প্রয়োজন অনুভব করি না। কিন্তু তা বলে, এই আচরণবিধি দ্বারা সমষ্টিকল্যাণ সাধিত হচ্ছে, বা ক্যাথারসিস জাতীয় কিছু সংগঠিত হচ্ছে মনে করে এই আচরণকে সমর্থনের কোনো কারণও দেখি না।

তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর একটু চিন্তা করলে নিজেই দিতে পারতে। আগামী অক্ষয়তৃতীয়ার শুভ প্রভাতে অথবা বৈশাখী পূর্ণিমার পুণ্যরাতে মহামানবের আবির্ভাব ঘটবে—তুমি এই স্বপ্ন দেখেছ বলে যদি রটনা করতে পারো, দেখবে হাজার হাজার মানুষ অনুরূপ স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে অথবা তোমার রটনায় আকৃষ্ট হয়ে ঐ শুভ প্রভাতে, বা পুণ্যরাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। 'নেতাজীর আবির্ভাব ঘটবে'—এই স্বপ্ন দেখার লোকের সংখ্যা অনেক। আবির্ভাবের রটনায় এখনও অনেক বিশ্বাসীর মনে সাড়া জাগে, অনেক হৃদয়ে আশা জাগে। নেতাজীর আবির্ভাব সম্ভাবনা সাধারণ মানুষের কাছে ঐ মহামানবের আগমন সম্ভাবনা। 'নেতাজী' আজ মাত্র একটি নাম নয়। শুধু রাজনৈতিক নেতা নয়,—লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে নেতাজী অলৌকিক শক্তির প্রতীক। 'নেতাজী' ক্রমশ 'লিজেণ্ডারী মিথ' হয়ে উঠছেন, অতিকথায় পর্যবসিত হচ্ছেন। ইতিহাসপূর্বযুগে বাস্তব ধীরে ধীরে এইভাবে রূপান্তরিত হয়েছে। লৌকিক সত্য ক্রমশ অলৌকিকত্ব লাভ করেছে। কিন্তু আজ এর বিরুদ্ধ-শক্তিও সক্রিয়। ভ্রান্তবিশ্বাস, অমূলক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক শক্তি আজ ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে। অলৌকিক ভ্রান্ত বিশ্বাস সাময়িক সান্ত্বনা দিতে পারে কিন্তু বাস্তবকে পরিবর্তিত করতে পারে না। উড়ন্তচাকীর বা নেতাজীর অস্তিত্ব ইয়ুং-এর কাছে বড় কথা নয়—অগণিত মানুষের বিশ্বাস তাঁর কাছে বড় কথা। রহস্যময় ঘটনা, অমূলক বিশ্বাস তাদের মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য সত্ত্বেও, নিশ্চয়ই খণ্ডনযোগ্য। বিশ্বাসীদের ভ্রান্তি-নিরসনের জন্য তথ্যমূলক যুক্তি-নির্ভর প্রচারের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন।

অলৌকিকত্ব ও রহস্যময়তার প্রতি আকর্ষণ বিজ্ঞানের যুগে ক্রমক্ষীয়মান হওয়া সত্ত্বেও কৌশলী প্রচারক ও সংরক্ষণশীল পত্র-পত্রিকার দৌলতে সরলবিশ্বাসীর মন এখনও মোহাচ্ছন্ন। বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যায়ত্ত নয় এইরকম ঘটনার সংস্পর্শে আসতে যেন আমরা উদ্‌গ্রীব। এইরকম অলৌকিক ঘটনার সংস্পর্শে এসে আমরা যেন সত্যিই যুক্তিবুদ্ধি হারাতে ভালবাসি। এইত সেদিনের কথা; ভোলনি নিশ্চয়ই। সর্বভারতীয় সংবাদপত্রে জনৈক যোগীর সম্পর্কে ঢক্কানিনাদ। অত্যাশ্চর্য ব্যাপার…

অলৌকিক কাণ্ড। মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অবহেলা। যীশুর পর এই ঐশী ক্ষমতা প্রদর্শন আর কারুর দ্বারা সম্ভব হয়নি। জলের উপর দিয়ে হেঁটে যাবেন যোগিবর; অথচ পা ভিজবে না। এর আগে এই যোগী সম্পর্কে যে সব প্রশস্তি প্রকাশিত হয়েছিল তার দুটো হেড লাইন মনে করিয়ে দিচ্ছি। "ধনীশ্রেষ্ঠা রমণী যোগিশ্রেষ্ঠের পদমূলে", "যোগী ও মারলিন মনরো", "যোগীর সাক্ষাৎ-প্রার্থী কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক নেতা", "বার্তাজীবীদের আসরে যোগিবর।" অলৌকিক বিশ্বাস মানুষের মনে বেঁচে থাকলে সমাজের একাংশ নিঃসন্দেহে লাভবান হতে পারেন—এই ঢক্কানিনাদ থেকে সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। কাজেই ১০১·০০ থেকে ৫০১·০০ মূল্যের সব কয়খানি দর্শক আসনই যে পূর্ণ হয়ে যাবে, এতো জানা কথা।

অবশেষে সেইদিন—১২ই জুন ১৯৬৬ এসে গেল। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনের রিপোর্টাররা হাজির; চিত্র-তারকা, ধনী ব্যবসায়ী, হোমরা-চোমরা রাজকর্মচারী ও তাদের মত সৌভাগ্যবান কিছুসংখ্যক দর্শক নিঃশ্বাস রোধ করে নিজের নিজের আসনে উপবিষ্ট। স্ফটিক স্বচ্ছ জলরাশি পদস্পর্শে ধন্য হবার জন্য উদ্গ্রীব। যোগিবর প্রবেশ করলেন।...কি দারুণ 'অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্সে' এই অতি নাটকীয় প্রস্তুতির পরিসমাপ্তি ঘটেছিল নিশ্চয়ই মনে আছে। যোগিবর তোমার আমার মত সামান্য মানুষের ন্যায় মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কাছে পরাজিত হলেন। আত্মিক শক্তির কাছে প্রকৃতির নিয়ম হার মানলো না। কিন্তু যোগিবর লজ্জিত হলেন না। তাঁর অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনের তারিখ ক্রমশ পিছিয়ে দিতে লাগলেন। আজও শক্তি প্রদর্শিত হয়নি। দু'তিন বছর ধরে আর এক যোগি সংবাদপত্রের শিরোনামায় স্থান পাচ্ছেন। এঁর সম্বন্ধে 'মানবমন'-এর পাতায় উল্লেখ দেখেছ বোধ হয়। ইনি একাধারে ঋষি এবং যোগি। ইনি একটু বেশি বুদ্ধিমান, অনেক বেশি ব্যবসায়ী। যোগবলে প্রাকৃতিক শক্তিকে পরাভূত করার মত তামাসা প্রদর্শনের চেষ্টা করেন না। 'বিট্‌ল্' ও 'পপ্-সিঙ্গার' তাঁর আরামপ্রদ আশ্রমের প্রতি বিশেষভাবে আসক্ত। তিনি 'অতিপ্রাকৃত meditation' শিক্ষা দিচ্ছেন। ধ্যানযোগে তুরীয় অবস্থা প্রাপ্তি। এ অবস্থায় পৌঁছুনোর জন্য আর তোমাকে কষ্ট করে এল. এস. ডি., মেসকালিন সংগ্রহ করতে হবে না। সামাজিক অসাম্য ঘোচাবার সহজতম পথ! তুরীয়ানন্দ লাভের পথ! এই আবিষ্কার এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। মার্কস, লেনিন, গান্ধী, টলষ্টয়, মাও, মার্কুসের সমপর্যায়ে উঠেছেন এই মহর্ষি। ধন্য সংবাদপত্রের প্রচারকৌশল। ধন্য ডলার-ষ্টার্লিং-মার্কের খেলা!

অলৌকিকত্বের মোহ, আদিপ্রতিমার আকর্ষণ, কতখানি সমষ্টিনির্জ্ঞানের ব্যাপার আর কতখানি ব্যবসায়ী কৌশল, এইবার বোধহয় তোমার বুঝতে কষ্ট

হবে না। কিন্তু যাদের আমরা অশিক্ষিত জনসাধারণ মনে করি, তাদের আকর্ষণ করা এই সব যোগিদের উদ্দেশ্য নয়। তারা তত্ত্ব শিক্ষায় তোমার-আমার থেকে হয়তো পিছিয়ে আছে, কিন্তু সহজবুদ্ধিতে তারা একটুও কম নয়। মহারাজ, যোগিরাজের কর্মস্থল শেঠ-সওদাগরদের শহর নগর এবং এদের দালাল নতুন আলোকপ্রাপ্ত নিওলিটের দল। অলৌকিকত্বে বিশ্বাস, অতিমানবতায় আস্থা শুধু সমষ্টি নির্জ্ঞানাশ্রিত প্রজাতি স্বপ্ন বলে যাঁরা মনে করেন আমি তাঁদের দলে নই। এই বিশ্বাস, এই অবস্থাকে বজায় রাখবার জন্য মোটা ও সূক্ষ্ম দুরকমের প্রচার ব্যবস্থাই বর্তমান। এইটে তোমাকে বুঝিয়ে বলবার জন্যই পুরণো কাহিনী দুটো আবার বলতে হল।

ফ্রয়েডোত্তর স্বপ্নসমীক্ষা

এবার আমেরিকাতে সাম্প্রতিককালে স্বপ্ন নিয়ে যন্ত্রনির্ভর যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার চেষ্টা করব। ওঁরা যাকে বলেন ফ্রয়েডোত্তর স্বপ্ন-সমীক্ষা।

স্বপ্নসমীক্ষার গুরুত্ব যথেষ্ট। ফ্রয়েডোত্তর স্বপ্ন-সমীক্ষা নিয়ে বেশ কিছু বই বেরিয়েছে। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত এডুইন ডায়মণ্ডের লেখা 'দ্য সায়েন্স অফ্ ড্রিমস্' বইটিতে সংক্ষেপে অনেক কিছু বলা হয়েছে। অধ্যাপক ক্যালভিন হালে আমেরিকাতে স্বপ্ন নিয়ে অনেক কাজ করেছেন। প্রায় দশহাজার স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে একটা সর্বস্বীকৃত ব্যাখ্যাক্রম ও প্রতীক নির্ধারণের চেষ্টার মধ্যে যথেষ্ট বাহাদুরি আছে। তাঁদের ব্যাখ্যা গ্রহণে আমার আপত্তি ও অক্ষমতার মধ্যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে কিনা পাঠকরা বিচার করবেন।

আমি প্রধানত এঁদের তথ্যবিবরণই তোমাকে জানাচ্ছি। অবশ্য আমার নিজস্ব মন্তব্য সমেত। আলোচনা প্রসঙ্গে কিছু পুনরুক্তি করতে বাধ্য হচ্ছি। তা না হলে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যাবে না।

স্বপ্নবিজ্ঞানের বয়স খুবই কম। এই শতাব্দীর পঞ্চাশের পর থেকে স্বপ্ন নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষানিরীক্ষার শুরু। অবশ্য, এর পঞ্চাশ বছর আগে সিগমুণ্ড ফ্রয়েড-এর 'দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অফ ড্রিমস' প্রকাশিত হয়, এবং স্বপ্নসমীক্ষা সাধারণের মধ্যে বিশেষ ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করে। শিল্পীসাহিত্যিক, নাট্যচলচ্চিত্র পরিচালকরা ফ্রয়েডীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ফ্রয়েডীয় স্বপ্নপ্রতীকের সাহায্যে অবদমিত ইচ্ছার রূপায়ণে তৎপর হয়ে ওঠেন। সাম্প্রতিককালে ফ্রয়েড-অনুরাগীর সংখ্যা কিছু হয়তো হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু পশ্চিমী সংস্কৃতিতে এখনও ফ্রয়েডের প্রভাব সর্বাধিক। আমি এবং আমার মতো বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী বিজ্ঞান-

কর্মীরা অন্তর্দর্শনভিত্তিক 'সাইকো-এ্যানালিটিক' তত্ত্বকে, এর জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও, বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব মনে করি না। ফ্রয়েড, আমার মতে, মেটাসাইকোলজির প্রবর্তক। কাজেই, বলা চলে, ফ্রয়েডোত্তর কালের স্বপ্ন-গবেষণা থেকেই স্বপ্ন-বিজ্ঞানের সূত্রপাত।

আদিম যুগ থেকে মানুষ স্বপ্ন নিয়ে, বিশেষ করে স্বপ্নব্যাখ্যা নিয়ে, কৌতূহল প্রকাশ করে আসছে। স্বপ্ন নানাভাবে মানুষের চিন্তাভাবনা, জীবনযাত্রাপ্রণালীকে প্রভাবিত করেছে। মানুষ স্বপ্নের মধ্যে ঈশ্বরের আদেশ, ভবিষ্যতের নির্দেশ খুঁজেছে, স্বপ্নব্যাখ্যার জন্য পুরোহিত ধর্মযাজকের শরণাপন্ন হয়েছে, স্বপ্নের মধ্যে গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের ভালোমন্দের ইঙ্গিত পেয়েছে। রোগনির্ণয়ের ও রোগনিরাময়ের উপায় হিসেবে স্বপ্নের ব্যবহার সব দেশেই প্রচলিত ছিল, এখনও আছে। স্বপ্নাদ্য মাদুলি ও ওষুধের চাহিদা অতিসভ্য মানুষের মধ্যে আজও রয়েছে। 'প্রফেটিক ড্রিম' সম্পর্কিত দুর্বলতা মানুষের আজও কাটেনি। এব্রাহাম লিঙ্কন আততায়ীর হাতে নিহত হবার কয়েকদিন আগে যে স্বপ্নটি দেখেছিলেন, তার উল্লেখ বিশ্বাসীরা আজও সগর্বে করে থাকেন (১)। অলোকদৃষ্টি (ক্লেইরোভয়েন্স) আজ পুরোহিত ধর্মযাজকের দপ্তর ছেড়ে প্যারাসাইকোলজিস্টদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের একজন 'ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট' গার্ডনার মারফি কয়েক বছর আগে এক পুস্তকে অনেকগুলো 'প্রফেটিক ড্রিম' এর বিবরণ প্রকাশ করেছেন। চল্লিশ বছর আগে লিণ্ডবার্গের শিশুপুত্র হরণের কাহিনী তোমার হয়তো মনে আছে। সে সময় হার্ভার্ডের সাইকোলজি-কাল ক্লিনিক থেকে সংবাদপত্রে বিবরণ দিয়ে এই অপহরণ-সংক্রান্ত স্বপ্ন সংগ্রহ করা হয়। ১৩০০ স্বপ্নের মধ্যে মাত্র সাতটিতে যে ভাবে শিশুর মৃত দেহটি পাওয়া যায়, সে সম্পর্কে খানিকটা আভাস ছিল (২)। তা সত্ত্বেও, সাইকিক্যাল রিসার্চ বা প্যারা-সাইকোলজির গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়নি। এক হাজারের মধ্যে একটা স্বপ্নও যদি ভবিষ্যতের বার্তা বহন করে আনে, তবে সেই একটাকেই সাধারণ মানুষ মনে রাখে। ভাববাদ রহস্যবাদ প্রভাবিত মানুষের পক্ষে এই মনোভাবই স্বাভাবিক।

স্বপ্ন এক সময় শিল্পীসাহিত্যিকদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। কিছু হিস্টিরিক টাইপের কবি ও শিল্পী স্বপ্নের মধ্যে সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছেন। মাদুলি ওষুধের মতো অত বেশি না হলেও স্বপ্নাদ্য কবিতা-গল্পের সংখ্যা খুব কম নয়। রোমান্টিক যুগের কবিরা নাইট গাউনের উপর স্বপ্নে পাওয়া কবিতার লাইন লিখে রাখতেন ; কবি কোলরিজ তাঁর অতি-পরিচিত কুবলা খাঁ-কে (১৮৯৭) স্বপ্নাদ্য কবিতা বলে দাবি করেছেন। রবার্ট লুই স্টিভেনসনের অধিকাংশ গল্পের প্লটই নাকি স্বপ্নাদিষ্ট। জেকিল হাইড-এর আখ্যানভাগ স্বপ্নে পাওয়া।

স্টিভেনসন মনে করতেন যে, স্বপ্নের 'ছোট মানুষরা' (লিট্‌ল পিপ্‌ল) তাঁর সাহিত্যের জনক।

রোমান্টিক কবিতা অথবা ভুতুড়ে গল্পই শুধু স্বপ্নে পাওয়া গেছে ভাবলে ভুল হবে। কিছু কিছু উঁচুদরের বিজ্ঞানচিন্তাও বৈজ্ঞানিকরা স্বপ্নে পেয়েছেন বলে দাবী করেন (৩)। পুরণো কথা না হয় ছেড়ে দিলাম। ১৯৩৬ সালের একজন নোবেল লরিয়েট তাঁর আত্মজীবনীতে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, তাঁর নোবেল পুরস্কার পাওয়া আবিষ্ক্রিয়ার মূলে ছিল স্বপ্ন (৪)। ১৯২১ সালে তিনি অনুমান করেছিলেন যে নার্ভস্পন্দন-সম্প্রসারণ ঘটে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে। প্রমাণ করার মতো পরীক্ষানিরীক্ষার হদিশ পেলেন অনেক বছর পরে, ঘুমের মধ্যে স্বপ্নেয় মাধ্যমে। বৈজ্ঞানিকরাও সংস্কারমুক্ত নন।

এই সব 'ক্রিয়েটিভ ড্রিম', 'প্রফেটিক ড্রিম'-এর মতোই অনেকদিন ধরে মনস্তাত্ত্বিকদের ধাঁধার মধ্যে রেখেছে, রহস্যবাদকে প্রশ্রয় দিয়েছে। গত কয়েক-বছর ধরে স্বপ্নবিজ্ঞানের যেসব পরীক্ষানিরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার ফলে আমরা এখন স্বপ্ন সম্পর্কে অনেকটা স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করেছি, সৃজনক্রিয়ার স্বরূপ ধরতে পেরেছি! তাছাড়া এখন মস্তিষ্কবিজ্ঞান মনে রাখা, ভুলে যাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারের উপর নতুন আলোকপাত করেছে। মস্তিষ্কভিত্তিক বস্তুবাদসম্মত মনোবিজ্ঞান এখন অনেক রহস্যের সমাধানে সক্ষম। এডুইন ডায়মণ্ড-এর ছোট বইটিতে ফ্রয়েডোত্তর যুগের পরীক্ষানিরীক্ষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে, পরীক্ষকরা যেসব নতুন তথ্য সংগ্রহ করেছেন তার পরিচয় আছে, এবং এই সব তথ্যকে ভিত্তি করে নতুন যে সব তত্ত্ব গড়ে উঠছে তার আলোচনা আছে। আমরা প্রথম তথ্যগুলির উল্লেখ করে তোমার পুরণো ধারণাগুলো দূর করার চেষ্টা করব এবং তারপর নতুন তত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করব। এই প্রসঙ্গে পাভলভ-এর আবিষ্কৃত নিস্তেজনা প্রসঙ্গের অবতারণা এসে পড়বে। দুঃখের বিষয়, আলোচ্য লেখক পাভলভতত্ত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি নীরব থেকেছেন।

স্বপ্ন নিয়ে যন্ত্রনির্ভর পরীক্ষানিরীক্ষার প্রথম উদ্যোক্তা শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবৃত্তের অধ্যাপক নাথানিয়েল ক্লাইটম্যান। ১৯২৯ সালে বার্জার ইলেকট্রো-এনসেফালোগ্রাম সম্পর্কিত প্রথম রিপোর্ট প্রকাশ করেন। পাঁচ বছরের মধ্যেই ক্লাইটম্যান স্বপ্ন-সমীক্ষায় এই যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করেন। যন্ত্রটিকে আরো দু-একটি বাড়তি বন্দোবস্তের সাহায্যে স্বপ্ন-সমীক্ষায় বিশেষ উপযোগী করে গড়ে তোলা হল; যাতে একই চার্টে মস্তিষ্কের বিদ্যুৎতরঙ্গের পাশাপাশি শ্বাস-প্রশ্বাস, ঘুমন্ত দেহের নড়াচড়া, এবং চোখের কাঁপনের গতিবেগ নির্ণয় সম্ভব হতে পারে। ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাম সম্বন্ধে দু-একটি প্রাথমিক তথ্য জানা থাকলে

ক্লাইটম্যানের পরীক্ষানিরীক্ষার তাৎপর্য অনুধাবন সহজ হবে। জার্মানীর এক স্নায়ুতত্ত্বের অধ্যাপক হান্স বারজার উদ্ভাবিত মস্তিষ্কের বিদ্যুৎতরঙ্গ পরিমাপের এই যন্ত্রটির কাজ মস্তিষ্কের বিদ্যুৎতরঙ্গকে প্রায় দশ লক্ষ গুণ শক্তিশালী করা এবং একটি গ্রাফ-পেপারের উপর একটি পেন্সিলের সাহায্যে তার প্রতিলিপি ফুটিয়ে তোলা। জাগ্রত ঘুমন্ত বিশ্রান্ত—ইত্যাদি মস্তিষ্কের বিভিন্ন অবস্থায় কাগজের উপর বিভিন্ন ধরনের লেখা দেখা যাবে। জাগ্রত অবস্থায় চোখ বন্ধ থাকলে যে লেখা পাওয়া যায় (সেকেণ্ডে স্পন্দনসংখ্যা আট থেকে তের) তার নাম এ্যালফা রিদম। গভীর ঘুমে স্পন্দনচক্রগুলো ধীরগতি ও বড় হয়ে দেখা দেবে এবং স্পন্দনসংখ্যা হবে সেকেণ্ডে আধ থেকে দুই। এর নাম ডেলটা রিদম্। কোনো বিষয়ে মনঃসংযোগ করলে বিদ্যুতের স্পন্দন একেবারে থেমে যাবে।

চোখের তারা ঘুমের মধ্যে ধীরে ধীরে এদিক ওদিক ঘোরে, বাচ্চাদের ঘুমন্ত অবস্থায় পর্যবেক্ষণের ফলে এ খবর ক্লাইটম্যানের জানা ছিল। ঘুমন্ত মানুষের চোখের তারার কাঁপনের অন্য একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলেন গবেষক। ঘুমিয়ে পড়ার প্রায় নব্বুই মিনিট পরে চোখের তারা খুব দ্রুত এবং জোরে জোরে নড়তে শুরু করে। দুটো চোখই একই সময়ে একই দিকে ঘোরে, মনে হয় তারা যেন টেনিস খেলা দেখছে। এই দ্রুত চোখের তারার ঘোরা বেশ কিছুক্ষণের জন্য চলে। এই ঘোরার নাম দেওয়া হয়েছে 'র‍্যাপিড আইমুভমেণ্ট', সংক্ষেপে আর-ই-এম। এই সময় জাগিয়ে দিলে প্রায় শতকরা নিরানব্বই জন বলবে তারা স্বপ্ন দেখছে। দেহের অন্যান্য পরিবর্তন এবং বিদ্যুৎ-তরঙ্গলেখা দেখে মনে হবে তারা যেন জেগে রয়েছে। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ও ধমনীর গতিবেগ আর ঘুমন্ত অবস্থার মতো নেই। রক্তচাপ ও আনুষঙ্গিক দৈহিক ক্রিয়াকলাপ নিয়মিতভাবে ওঠা নামা করতে থাকে, প্রক্ষোভতাড়িত হলে বা দৈহিক পরিশ্রমের সময় যেমন হয়। ভেতরে তুলকালাম কাণ্ড চলছে, অথচ বাইরে থেকে সেটা বোঝা যাবে না। নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে ঘুমন্ত মানুষটি। পেশীগুলো নরম তুলতুলে, মাথা ও চিবুককে ঠিক জায়গায় রাখতে পারছে না ঘাড়ের পেশী। এই আর-ই-এম প্রথম দিকে প্রয়ে নয়/দশ মিনিট স্থায়ী হয়। যত রাত গভীর হবে, আর-ই-এম বা স্বপ্নকাল ততই দীর্ঘস্থায়ী হবে। আটঘণ্টা ঘুমের মধ্যে নিয়ম করে আমরা প্রায় বাঁচবার স্বপ্ন দেখি ; মোট স্বপ্ন দেখার সময় প্রায় দেড় ঘণ্টা। বলা বাহুল্য, 'র‍্যাপিড আই মুভমেণ্ট'-এর সময় ছাড়া অন্য সময় ঘুম ভাঙলে কোনো মানুষই স্বপ্নের কথা বলবে না। এই থেকে গবেষকরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে আমাদের স্বপ্ন দেখার সময় ছক কাটা, পূর্বনির্ধারিত। আর-ই-এম পর্বে ঘুম ভাঙানোর পর যারা স্বপ্নবৃত্তান্ত বলতে পারেন,

পুরো ঘুমের পর সকালে উঠে তাঁরাও কিন্তু কোনো স্বপ্নই মনে আনতে পারেন না।

ল্যাবরেটরিতে স্বেচ্ছাসেবক ডেকে অথবা পয়সা দিয়ে মানুষ সংগ্রহ করে, তাদের উপর এইসব জটিল যন্ত্রপাতি-নির্ভর পরীক্ষা চালানো হয়েছে। এই পরীক্ষার ফলে অনেক তথ্য জানা গেছে। স্বপ্নবৃত্তান্ত যথাযথভাবে জানবার বা জানাবার কোনো নিশ্চিত পদ্ধতি এর আগে ছিল না। সমীক্ষাধীন ব্যক্তিকে আর-ই-এম পর্বে ঘুম ভাঙিয়ে শুধু যে স্বপ্নবৃত্তান্ত জানা গেল তাই নয়, ঘুম ও স্বপ্নের আরো অনেক ব্যাপারে আলোকপাত সম্ভব হল। কতবার স্বপ্ন দেখি, কতক্ষণ ধরে স্বপ্ন দেখি, স্বপ্ন দেখার সময়কার শারীরবৃত্তের খুঁটিনাটি ইত্যাদি অনেক প্রশ্নের উত্তর মিলল। যাঁরা কোনো স্বপ্ন দেখেন না বলে মেরীর নামে শপথ করতে রাজি ছিলেন, তাঁরাও আর-ই-এম পর্বে ঘুম ভাঙানোর পর স্বপ্ন-বিবরণী শুনিয়ে চমক লাগালেন, নিজেরাও চমকে গেলেন।

ক্লাইটম্যানরা দাবি করেন যে ই-ই-জি ও আর-ই-এম সহযোগে ঘুম ও স্বপ্ন সম্বন্ধে সর্বজনীন এক নৈশ প্যাটার্নের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই প্যাটার্ন পূর্বনির্দিষ্ট, এই পূর্বনির্ধারিত পথে ঘুম ও স্বপ্নকে ভ্রমণ করতেই হবে।

তুমি যদি ক্লাইটম্যানদের সমীক্ষাধীন হয়ে গায়ে মাথায় ইলেকট্রোড আর তার লাগিয়ে ওঁদের একটা বিছানায় শুয়ে পড়ো, তা হলে প্রথমটার তোমার চোখের সামনে ভেসে উঠবে আবছা মূর্তি, অস্পষ্ট নানারকমের আলোকরশ্মি। মনে হবে নিরালম্ব নিরাশ্রয় হয়ে তুমি শূন্যে ভাসমান। এই সময় জাগিয়ে দিলে স্বপ্ন দেখছিলে মনে হতে পারে, কিন্তু স্বপ্নবৃত্তান্ত কিছুই বলতে পারবে না। এই সময় সেকেণ্ডে দশ ঢেউয়ের এ্যালফাছন্দ অঙ্কিত হতে থাকবে বিদ্যুৎলেখ গ্রাফকাগজে। এরপর দ্বিতীয় পর্ব। ঘুম গভীর হয়ে আসছে, ই-ই-জির লেখা-গুলোও বদলে যাচ্ছে। টেকো থেকে জড়ানো সুতো ছাড়িয়ে নিলে যে রকম দেখতে হয়, ঠিক সেই রকম দেখতে হচ্ছে; পরিভাষায় যার নাম 'স্লিপ-স্পিণ্ডল'। ঢেউগুলো টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, বিস্তার বাড়ছে কমছে। স্থায়িত্ব পনেরো মিনিট। ক্রমশ তৃতীয় পর্বে তুমি গভীর ঘুমে তলিয়ে যাবে। বিদ্যুৎতরঙ্গচিত্রে দেখা যাবে শ্লথগতির বড় বড় ঢেউ। ছবিটা যেন পাহাড় ও উপত্যকার। এখন সেকেণ্ডে একটা কি দুটো ঢেউ দেখা যাচ্ছে গ্রাফকাগজে, যাকে বলা হয় ডেলটা-ওয়েভ। তিরিশ মিনিটের মতো স্থায়ী এই পর্ব। তারপর আবার দ্বিতীয় পর্ব হয়ে প্রথমে প্রত্যাবর্তন।

ঘুমিয়ে পড়ার নব্বই মিনিটের মধ্যে স্বপ্নপর্বের শুরু হবে। চোখের তারার কাঁপন দ্রুততর হচ্ছে। র‍্যাপিড আই মুভমেণ্ট দেখা যাচ্ছে। ই-ই-জি প্যাটার্ন বদলে গেছে। আগেই সে কথা বলা হয়েছে। দশ মিনিট ধরে প্রথম স্বপ্ননাট্য

অভিনীত হল। স্বপ্ন শেষে তুমি আবার প্রথম পর্বে চলে যাবে। সেখান থেকে দ্বিতীয়, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয়। আবার আসবে ডেলটা-ওয়েভ। এবার ঘুম তত গভীর নয়। দ্বিতীয় পর্ব হতে প্রথম পর্বে প্রত্যাবর্তন এবং পরে দ্বিতীয় স্বপ্ন দেখা আরম্ভ হবে। সময় সবশুদ্ধ নব্বই মিনিট। প্রথম ঘুমের পর তিন ঘণ্টা বাদে স্বপ্নের দ্বিতীয় অধ্যায়। স্থায়িত্ব গড়ে উনিশ মিনিট। এইভাবে চলবে বৃত্তের পুনরাবৃত্তি। তৃতীয় স্বপ্ন দেখা চলবে প্রায় চব্বিশ মিনিট ধরে। শেষ স্বপ্ন দেখবে ভোররাত্রে, স্থায়ী হবে আরো বেশিক্ষণ।

আর-ই-এম নিয়ে নানারকমের গবেষণা হয়েছে। শুধু শিকাগো নয়, আরো অনেক কেন্দ্রে হাজার হাজার ফুট গ্রাফকাগজের উপর বিদ্যুৎতরঙ্গলেখ-পেন্সিলের দাগ পড়েছে। গবেষকরা একবাক্যে বলেছেন যে, এই অক্ষিগোলকের ঘন ঘন ঘূর্ণন ; উল্লম্ব বা আনুভূমিক যে রকমই হোক না কেন—স্বপ্ননায়কের স্বপ্নদর্শনের চেষ্টা। নিজের অভিনয় নিজে দেখছেন সামনে পিছনে উঁচুতে নিচুতে চোখ ঘুরিয়ে। অবশ্য এঁরা এ কথাও বলেছেন যে, স্বপ্নে নিষ্ক্রিয় ভূমিকাও গ্রহণ করা যায়। তাকিয়ে আছি কিন্তু দেখছি না, কথা কানে যাচ্ছে কিন্তু শুনছি না— এরকম অবস্থার সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। এই অবস্থায়, গবেষকরা অস্বীকার করেছেন, চক্ষুগোলকের ঘূর্ণন দ্রুত হবে না। অর্থাৎ আর-ই-এম ছাড়াও স্বপ্ন আছে, অমোঘ নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে।

স্বপ্নসমীক্ষকদের দৌলতে স্বপ্ন-ঘুম সম্পর্কে আরো অনেক তথ্য জানা গেছে। স্বপ্ন দেখার সময় ও স্বপ্নের স্থায়িত্বকাল অপরিবর্তনীয় ; টাকা পয়সায় লোভ দেখিয়ে, ওষুধ বা মদ খাইয়ে সাধারণত এর পরিবর্তন ঘটানো যায় না (৫)। অবশ্য এ সম্পর্কে সকলে একমত নন (৬)। ডেমেণ্ট, ফিশার প্রমুখ মনস্তাত্ত্বিক এ্যামফিটামিন জাতীয় ওষুধ খাইয়ে স্বপ্নবৃত্ত পরিবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। সফল হননি। ঘুম ও স্বপ্ন দেখা থেকে নিবৃত্ত করার ফল খুবই বিপজ্জনক হতে পারে। সাধারণত এই অবস্থায় মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং স্বপ্নের পরিবর্তে স্বেচ্ছাসেবকরা অমূলপ্রত্যক্ষ দর্শন (হ্যালুসিনেশন) করেন। অনেকে স্বেচ্ছায় নিজের উপর দীর্ঘকাল জেগে থাকার পরীক্ষা চালিয়েছেন এবং নিজেদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন (৭)। ঘুম ছাড়া মানুষ বাঁচে না, এ ধারণা সকলেই পোষণ করেন। কিন্তু স্বপ্ন থেকে বঞ্চিত হলেও মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, স্বপ্নও আহারনিদ্রার মতোই প্রয়োজনীয়, এই সম্পূর্ণ নতুন তথ্য আবিষ্কারের জন্য ফ্রয়েডোত্তর সমীক্ষকদের ধন্যবাদ দেওয়া যেতে পারে। উইলিয়ামস ডেমেণ্টের পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে (৮) জানা গেছে যে স্বপ্ন থেকে বঞ্চিত মানুষ যেনতেন-প্রকারেণ বেশি স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করে অভাব পুষিয়ে নিতে চায়। স্বপ্ন থেকে যত বঞ্চিত হয়, ততই অসুস্থ হতে থাকে এবং 'হ্যালুসিনেশন' দেখতে থাকে। কয়েক

রাত স্বপ্ন দেখা থেকে আংশিক বঞ্চিত রেখে পরে অবাধে ঘুমোবার সুযোগ দিয়ে দেখা গেছে যে বঞ্চিত ব্যক্তিরা স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ সময় স্বপ্ন দেখছে।

স্বপ্ন দেখার অপরিহার্যতা নিয়ে কোনো মতভেদ না থাকলেও স্বপ্নের কারণ ব্যাখ্যা ও এই অপরিহার্যতার প্রকৃতি নিয়ে যথেষ্ট বিতণ্ডা চলেছে। তিনটি প্রশ্নই পরস্পর-সম্পৃক্ত একসঙ্গেই আলোচনা চলতে পারে। এই আলোচনা আরম্ভ করার আগে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার।

স্বপ্ন পূর্বনির্ধারিত নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা সূচী মেনে চলে, এই যান্ত্রিক ধারণা সম্বন্ধে কিছু বিজ্ঞানী এখনও সন্দিগ্ধ। তাঁরা মনে করেন, ল্যাবরেটরির পরিবেশে পরীক্ষকের নিয়ন্ত্রণাধীনে স্বপ্ন দেখার ফলে স্বপ্ন দেখার সময় ও স্বপ্নের স্থায়িত্বকাল এই ধরনের অস্বাভাবিক গতিপ্রকৃতি লাভ করে থাকতে পারে। যতদিন না কোনো গবেষক এই তথাকথিত যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ উপস্থিত করছেন, ততদিন এই প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করা চলে। ঘুম-জাগরণের যদি একটা নির্দিষ্ট সম্পর্ক থাকতে পারে, পৃথিবীর আহ্নিক ছন্দ যদি আমরা মেনে নিতে পারি, তবে স্বপ্ন-ঘুমের এই নির্দিষ্ট ছন্দকেই বা অস্বাভাবিক বলব কেন? প্রকৃতির বহু ব্যাপারই তো এই ধরনের নিয়মশৃঙ্খলার অধীন, বলা চলে স্বাভাবিক। ক্লাইট-ম্যানরা এই রকম বলবেন।

স্বপ্ন দেখি কেন? শারীরবৃত্তিক প্রয়োজনে না মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনে? না, স্বপ্নের মধ্য দিয়ে শরীরমন দুয়েরই প্রয়োজন মেটাই?

ডঃ চার্লস ফিশার মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ফিশার সাইকো-এ্যানালিটিক অর্থাৎ ফ্রয়েডীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁর মতে স্বপ্নের কাজ শৈশবের যৌন ও অন্যান্য অবদমিত প্রেষণাকে মুক্ত করা। অবদমিত কামনার তৃপ্তি সাধন। সেই ক্লাসিকাল ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব-কথা। প্রমাণ? প্রথম প্রমাণ, মিঃ এক্স ও অন্যান্য কয়েকজন স্বপ্নবঞ্চিত লোকের অতিরিক্ত ক্ষুধা ও খাবার ইচ্ছা। দ্বিতীয়, এঁরা নিজেদের বাচ্চাদের পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন যে তিন থেকে ছ-মাসের মধ্যে তাদের 'র‍্যাপিড-আই-মুভমেণ্ট' আরম্ভ হয়, এবং দর্শনেন্দ্রিয় অনেকটা পরিণতি প্রাপ্ত হয়। এই সময় থেকে তারা রাতে ঘুমোয়, স্বপ্ন দেখে এবং আঙ্গুল চুষতে থাকে। এই সময় মায়ের দুধ বা বোতল আর রাতে বড় বেশি দরকার পড়ে না। আঙ্গুল চুষে এবং খাবার স্বপ্ন দেখে নাকি তারা তৃপ্তি পায়, তাদের 'ওরাল ড্রাইভ'-এর তাগিদ মেটে (৯)। ফ্রয়েডীয় মৌখিক তৃপ্তির প্রেরণা বা ইচ্ছা যৌন-জীবনের প্রথম পর্ব। বড়রাও স্বপ্নের সাহায্যে এই আনন্দ পায়, এই আনন্দ তাদের দরকার। ঘুম বা স্বপ্ন থেকে বঞ্চিত হলে এই আনন্দলাভ স্থগিত থাকে। বেশিদিন স্থগিত রাখা যায় না।

একটা সময় 'ওরাল লিবিডো'র বাসনা সংজ্ঞানের রাজ্যে বিনা ছদ্মবেশে বেরিয়ে আসে। তখন ঐ অতিরিক্ত ক্ষুধা ও খাবার ইচ্ছা প্রকাশ পায়। স্বপ্নবঞ্চিত মিঃ এক্স-এর অতিভোজন স্পৃহা নাকি একটা সর্বজনীন ব্যাপার। স্বপ্নবঞ্চিতদের মানসিক অসুস্থতার মূলে আছে এই লিবিডোতৃপ্তির অভাবজনিত আঘাত (১০)। স্বপ্নে আমরা প্রতিরাতে সাময়িকভাবে উন্মত্ত হয়ে দিনেরবেলায় উন্মাদ হবার সম্ভাবনাকে এড়িয়ে চলি।

আমেরিকার সব স্বপ্নগবেষক ফিশারের মতাবলম্বী নন। বাচ্চাদের আঙ্গুল চোষা, রাতে ঘুমোনো ও স্বপ্ন দেখা তাদের মৌখিক লিবিডোর তৃপ্তি সাধন করে না বলে, অনায়াসে বলা যায়, ছ'মাসে মস্তিষ্কের ও স্নায়ুর ক্রম-পরিণতি এবং বাস্তব পরিবেশ রাতে ঘুমোনো অভ্যাসের সৃষ্টি করে, তার ফলে শিশুর 'র‍্যাপিড আই মুভমেণ্ট' দেখা যায় ; আঙ্গুল চোষা শিশুর একটি ভৌতিক প্রয়োজন মেটায়। সাইকোঅ্যানালিটিক তত্ত্ব প্রমাণিত হয় না বটে, তবে এই শারীর-বৃত্তিক সোজা কথা অনেকটা বাস্তবানুগ হয়, নিঃসন্দেহে। সব স্বপ্নবঞ্চিত মানুষই কি মিঃ এক্স-এর মতো অতিভোজনে আসক্ত হয় ?

না। অপরপক্ষে, অন্যদল ঠিক উল্টো কথা বলছেন। রাতের স্বপ্ন উন্মত্ততার লক্ষণ নয়, বরং নৈশ উন্মত্ততার প্রতিষেধক। এটা শুধু তত্ত্বকথা নয়। সংবেদন (সেনসেশন) থেকে বঞ্চিত করে তাঁরা মানুষের উপর যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন এবং জেট প্লেনের পাইলট, দূরপাল্লার ট্রাক-ড্রাইভারদের যেসব অভিজ্ঞতার বিবরণ সংগৃহীত হয়েছে - তা থেকে এই পক্ষের তত্ত্বটি অনেক বেশি বাস্তবঘেঁষা ও তথ্যনির্ভর বলে মনে হয়।

কানাডার একজন বৈজ্ঞানিক প্রথম (১৯৫০-এ) সংবেদন-বঞ্চনা (সেন্সরি-ডিপ্রাইভেশন) নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। অবশ্য এর অনেক আগে, ইভান পেত্রভিচ পাভলভ কুকুরের উপর এই ধরনের পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। মস্তিষ্কের উপর একসঙ্গে দর্শন শ্রবণ স্পর্শন ইত্যাদি ইন্দ্রিয় মারফৎ যদি অনেক উদ্দীপক আসতে থাকে, (কমপিউটারের ক্ষেত্রে যাকে বলা হয় 'ইনপুট ওভারলোড') তাহলে মানসিক অস্থিরতা, চিন্তার বিশৃংখলা ইত্যাদি দেখা দিয়ে থাকে। এ ব্যাপারটা তোমার জানা। এর উল্টোটা যদি ঘটে, অর্থাৎ মস্তিষ্কে যদি ইন্দ্রিয় কোনোরকম উদ্দীপনা না পাঠায়, ইন্দ্রিয়গুলোকে যদি উদ্দীপ্ত হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়, তাহলে ব্যাপারটা কি ঘটে ? এই অবস্থাতেও (কম্পিউটার পরিভাষায়—'ল্যাক্ অফ ইনপুট') মানসিক রোগের লক্ষণ দেখা দেবে। একটা ন্যূনতম উদ্দীপনা ছাড়া 'মস্তিষ্কের-টোন' বজায় থাকে না, এ আবিষ্কার পাভলভ এঁদের অনেক অগে করেছেন। তবে মানুষ নিয়ে পরীক্ষা ও অনেক পরিমাণে তথ্য সংগ্রহ করে এই সংবেদনের অভাব-জনিত অবস্থার

একটা সর্বাঙ্গীন সঠিক চিত্র স্বপ্নগবেষকরা কল্পনা করতে পেরেছেন। প্রথমে ইংলণ্ডের রয়্যাল এয়ারফোর্সের নিঃসঙ্গ পাইলটদের কাছে এই 'সেন্সরি-ডিপ্রাইভেশন'-এর অসুবিধার কথা শোনা যায় (১১)। পাইলটদের চোখের সামনে দৃশ্য-পরিবর্তন ঘটে না, কানে অনবরত একঘেয়ে শব্দ, স্পর্শনেন্দ্রিয়ের একঘেয়েমি দূর করারও উপায় নেই। এরা পুরোপুরি ইন্দ্রিয়-উদ্দীপনা বঞ্চিত না হলেও আংশিকভাবে বঞ্চিত। গুহাবাসী সাধুসন্তদের কাহিনী (১২) থেকেও 'সেন্সরি-ডিপ্রাইভেশন'-এর অনেক তথ্য পাওয়া যায়। চতুর্থ শতকের সেইণ্ট অ্যাণ্টনির জীবনীতে অনেক অদ্ভুত কথার উল্লেখ আছে। মরুগুহায় একলা থাকতেন তিনি। সপ্তাহে দু-একদিন মাত্র সামান্য কিছু খাদ্য গ্রহণ করতেন। ইন্দ্রিয় উদ্দীপ্ত হত তাঁর কমই। তাঁর তপস্যা ভাঙবার অভিপ্রায়ে শয়তান নানা চেষ্টা করত: প্রলুব্ধ করার জন্য সুন্দরী তরুণী, ভয় দেখাবার জন্য বিকটাকার নিগ্রো ইত্যাদি তাঁর কাছে পাঠানো হত। বিজ্ঞানীদের মতে তিনি হ্যালুসিনেশন দেখতেন। আমাদের পুরাণের কাহিনীতে এরকম অনেক গল্প আছে। অধ্যাপক হেব ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা চালালেন। কৃত্রিমভাবে ইন্দ্রিয় উদ্দীপনার সব ব্যবস্থা করলেন, টাকা দিয়ে পরীক্ষার জন্য লোক সংগ্রহ করলেন। এই ধরনের পরীক্ষা আরো অনেক গবেষক করেছেন। দেখা গেল, পরীক্ষাধীন ব্যক্তিরা সবাই কিছুকাল পরেই নানারকম অদ্ভুত দৃশ্য দেখছে, নানারকমের শব্দ শুনছে, উদ্ভট উদ্ভট কল্পনা তাদের মনে আসছে (১৩)। যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ এইভাবে সংগৃহীত হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে সংবেদনবঞ্চিত অবস্থা অনেকাংশে স্বাভাবিক ঘুমের অবস্থা। দুই অবস্থাতেই ন্যূনতম সংবেদন মস্তিষ্কে পৌঁছচ্ছে। ঘুম আসার পূর্ব অবস্থায় আর সংবেদনরহিতদের প্রাথমিক অবস্থায় ঠিক একই ধরনের অনুভূতি-চিন্তা মনে আসে। ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে সংবেদনরহিতদের যে ই. ই. জি. চিত্র পাওয়া গেছে, তা ঠিক স্বপ্ন দেখার সময়কার চিত্রের অনুরূপ। নানা তথ্য-প্রমাণ থেকে বোঝা গেছে যে নৈশস্বপ্ন আর সংবেদন-রহিতদের অমূলপ্রত্যক্ষ (হ্যালুসিনেশন) একই ধরনের ব্যাপার।

এ-থেকে এই অনুমান করা হয়েছে যে রাতের স্বপ্ন মস্তিষ্কের সংবেদনরহিত অবস্থায় উদ্দীপনা জুগিয়ে মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। এই উদ্দীপনা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক। সংবেদনরহিতদের হ্যালুসিনেশন ঐ একই উদ্দেশ্য সাধিত করে। গবেষকরা মনে (১৪) করেন, জাগ্রত মস্তিষ্কের মতোই ইন্দ্রিয়-উদ্দীপনা ঘুমন্ত মস্তিষ্কেরও দরকার।

মস্তিষ্কবিজ্ঞানের অন্যান্য অধুনালব্ধ তথ্যের সঙ্গে এই অনুমানের সামঞ্জস্য আছে। উচ্চতর মননক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে মস্তিষ্কবল্কলের মতোই অধুনা আবিষ্কৃত সূক্ষ্মজালতন্ত্র (রেটিকুলার ফরমেশন) বিশেষভাবে জড়িত। মেরুদণ্ড

যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে এটি অবস্থিত। এই জালতন্ত্র বাইরের খবরাখবর সেন্সর করে উপরতলায় কর্টেক্সের (বল্কল) কাছে পাঠায়, কর্টেক্সের খবরও এই জালতন্ত্রের মাধ্যমে আবার মগজের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। যখন বাইরের জগৎ থেকে সংবেদনমাত্রা কমে আসতে থাকে, তখন এই জালতন্ত্র কর্টেক্স খবর পাঠাতে পারে না, চিন্তাভাবনার জটিল ব্যবস্থা সাময়িকভাবে অকেজো হয়ে পড়ে। সেই অবস্থায়, ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন উদ্দীপনা পাঠিয়ে গোটা মস্তিষ্ককে সক্রিয় রাখে। বাইরের থেকে উদ্দীপনা না এলেও, পুরণো যেসব সংবেদন, স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা মস্তিষ্কে জমা আছে, তা থেকেই স্বপ্ন উদ্দীপনা সংগ্রহ করে (১৫)। অন্যভাবে বলা যায় যে, বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ফলে, কর্টেক্সের নিয়ন্ত্রণ কমে যাবার দরুন, মস্তিষ্কের নিচুর অংশ ও স্মৃতির (যা সেই দিনকার ঘটনা ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও অনুষঙ্গিত) আধার,—বিচ্ছিন্ন কোষগুলো, উদ্দীপ্ত হয়ে স্বপ্ন সৃষ্টি করে। স্বপ্ন রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী হয়, আমরা জেনেছি। এর কারণ, যত রাত গভীর হয় তত বেশিক্ষণ ঘুমন্ত মানুষটি বাইরের সংবেদন থেকে বঞ্চিত হয় ; ফলে দীর্ঘস্থায়ী উদ্দীপনার দরকার হয়। ঘুমন্ত মানুষ সাধারণত এপাশ ওপাশ করে, কিন্তু স্বপ্ন দেখার সময়টা একেবারে নিশ্চল হয়ে থাকে। স্বপ্ন উদ্দীপনা পায় বলে, বোধ হয়, স্পর্শন-ঘর্ষণের উদ্দীপনার প্রয়োজন হয় না। এইসব গবেষকদের মতে বিকট নিশাস্বপ্ন, যাকে নাইটমেয়ার বলা হয়, সংবেদন-আধিক্যের ফল।

কেন স্বপ্ন ? এ সম্পর্কে দু দলের অভিমত ব্যক্ত করা হল। আর একটা অভিমতের কথাও বলা উচিত। স্বপ্নগবেষকদের অগ্রণী ক্লাইটম্যান মনে করেন, স্বপ্নের কোনো 'কেন' নেই। ঘুমের মতো এও একটা অভ্যাস, যা আমরা আয়ত্ত করেছি। নিত্য আভ্যাসিক এ প্রক্রিয়া কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করে না।

এবার এ সম্পর্কে পাভলভিয়ানদের দু-একটা কথা বলে ছেদ টানব।

স্বপ্নকে হ্যালুসিনেশনের সঙ্গে তুলনা করে আমেরিকান গবেষকরা পাভলভিয়াননের ধারণাকেই সমর্থন করেছেন। অথচ এঁরা পাভলভ অথবা তাঁর অনুবর্তী বিজ্ঞানকর্মীদের সম্পর্কে একেবারে নীরব।

ইন্দ্রিয়োপলব্ধির মূলে আছে উৎসের অস্তিত্ব। শব্দতরঙ্গই হোক আর আলোর তরঙ্গই হোক, পরিবেশের কোনো মূর্ত বস্তু থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে ইন্দ্রিয়পথে মস্তিষ্ককোষে উপলব্ধি ঘটায়। উপলব্ধি থেকে ধারণা বা কল্পনা (পারসেপশন বা কন্‌সেপ্ট) গড়ে ওঠে। ধারণা-কল্পনার জন্য বস্তুর উপস্থিতি নিষ্প্রয়োজন। এই কল্পনা-ধারণার উৎস মনোদেশ, সঠিকভাবে বলা উচিত মস্তিষ্ক। উপলব্ধির পরও ইন্দ্রিয়প্রান্তের বিশ্লেষণী কোষে উত্তেজনার জের বজায় থাকে। অবশ্য প্রত্যক্ষ

উপলব্ধির ঔজ্জ্বল্য ও তীব্রতা কল্পনার মধ্যে থাকে না। বহির্বাস্তব উপলব্ধির স্তর থেকে এইভাবে 'পারসেপশন', 'কন্সেপ্ট'-এর স্তরে পৌছুচ্ছে। 'হ্যালুসিনেশনে'ও বাইরের উৎস অনুপস্থিত, কিন্তু এই কল্পনা বা ধারণা প্রায় প্রত্যক্ষদর্শন বা শ্রবণের মতোই উজ্জ্বল ও তীব্র। কাজেই একে কল্পনা না বলে বাঙলায় অমূলপ্রত্যক্ষ বলা হয়। মস্তিষ্কের এমন একটা অবস্থা আছে, (এ নিয়ে পাভলভ অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন) যখন দুর্বল উদ্দীপক প্রবল উত্তেজনা জাগাতে পারে। এই অবস্থার নাম প্যারাডক্সিক্যাল বা আপাত-স্ববিরোধী অবস্থা—এ কথাতো তোমার জানা। এই সময় মস্তিষ্ককোষগুলো স্তিমিত বা শ্রান্ত থাকে। বেশি-মাত্রায় সংবেদন অথবা সংবেদনার স্বল্পতা, দুইই এই প্যারাডক্সিক্যাল অবস্থা আনতে পারে। এই সময় কল্পনার উৎস, মস্তিষ্কের মৃদু উত্তেজনার কেন্দ্রগুলো তীব্রভাবে আলোড়িত হয় ; কল্পনাস্মৃতি প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মতো স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে ওঠে। যার মস্তিষ্ক এরকমটি ঘটবে, তার স্বভাবতই মনে হবে উৎসটি বাইরের জগতেই আছে।

স্বপ্ন, পাভলভের মতে, এক ধরনের মননক্রিয়া, হ্যালুসিনেশনের সমগোত্র। ঘুমের মধ্যে আমরা একেবারে অচেতন হই না। মস্তিষ্কের কিছু জায়গা স্বপ্নের মধ্যেও জেগে থাকে। জৈবপ্রক্রিয়ার কেন্দ্রগুলি শুধু নয়, যে সব জায়গা দিনের কার্য উপলক্ষে খুব বেশি উত্তেজিত বা নিস্তেজিত হয়েছে, সেগুলো জেগে থাকতে পারে। এইসব কেন্দ্র ও কোষসমষ্টির উদ্দীপনার ফলে স্বপ্নদৃশ্যের অভিনয় ঘটে। যুদ্ধোত্তর গবেষকদের মূল্যবান আলোচনা পাভলভের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করবে।

স্বপ্নব্যাখ্যা নিয়ে ডায়মণ্ড ফ্রয়েড-ইয়ুং-এর মতামত ও পদ্ধতি নিয়ে সামান্য কিছু লিখেছেন। সবই পুরণো কথা, মন্তব্য করার মত কিছু নেই। 'প্রফেটিক ড্রিম' ও ভবিষ্যৎবাণী নিয়ে সুন্দর বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেছেন এবং রহস্য-বাদীদের অলৌকিক তত্ত্বকথা খণ্ডন করেছেন। সৃজনক্রিয়া (ক্রিয়েশন অব আর্ট) সম্পর্কে তাঁর সমর্থিত স্বতঃস্ফূর্ততা-তত্ত্বের সঙ্গে আমার মতো অনেকেই একমত হতে পারবেন না (১৬)।

স্বপ্নবিজ্ঞান এখনও সুনির্দিষ্ট কোনো স্বপ্নতত্ত্ব অথবা স্বপ্নের কোনো বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেবার মতো অবস্থায় আসেনি বটে, কিন্তু গবেষকদের অগ্রগতি দেখে মনে হয় যে খুব শীঘ্রই জানা যাবে স্বপ্নের আদৌ কোনো বাস্তবসম্পর্কিত অর্থ আছে, না স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই।

শিশিরবিন্দু যেমন রোদ উঠতে না উঠতেই মিলিয়ে যায়, বেশির ভাগ স্বপ্ন তেমনি ঘুম ভেঙ্গে চোখ মেলে নড়াচড়া করার সঙ্গে সঙ্গেই বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে যায়। কেন? 'কেন'র জবাব দিতে গিয়ে শুধু ক্লাইটম্যানের শারীরবৃত্তিক

ব্যাখ্যা নয়, অন্যান্য সমীক্ষকদের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও প্রাসঙ্গিকভাবে এসে পড়বে। সেই সূত্রে জৈব মস্তিষ্ক ও উচ্চ মস্তিষ্কের পারস্পরিক সম্পর্কের অতি আধুনিক গবেষণার কিছু কিছু তথ্য পেশ করব। হয়ত পূর্বেকার চিঠিতে বা অন্যান্য সূত্রে তথ্যগুলো তোমাকে আগেও শুনিয়েছি; তবুও খুব খারাপ লাগবে না।

ক্লাইটম্যানের শারীরবৃত্তিক তত্ত্বের সারকথা এই যে গুরু-মস্তিষ্ক-বল্কল (cerebral cortex) চিন্তা-ভাবনা-স্মৃতির আধার ; এবং ঘুমন্ত অবস্থায় যখন আমরা স্বপ্ন দেখি, এই গুরুমস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে ; কাজেই স্বপ্নবৃত্তান্ত মনে রাখা সম্ভব হয় না। গুরুমস্তিষ্ক জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়বাহিত উদ্দীপনাগুলোকে, অর্থাৎ তার কাছে আসা খবরাখবরগুলোকে বিশ্লেষণ করে, বিমূর্ত করে, স্মৃতির ভাঁড়ার থেকে টেনে আনে অন্যান্য খবর, জমানো অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করে, মূল্য নির্ধারণ করে, তারপর সেগুলোকে নির্দিষ্ট ভাণ্ডারে জমিয়ে রাখে। ঘুমন্ত অবস্থায় ইন্দ্রিয় সংকেত বহন করে না, কাজেই গুরুমস্তিষ্কের গুরুত্বও থাকে না। বিশ্লেষণী ক্ষমতা হ্রাস পায়, কোনো খবর বা ঘটনা উদ্ভট, অসম্ভব বলে বর্জিত হয় না। গুরুমস্তিষ্কের এই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় স্বপ্নরাজ্যের দরজা খুলে যায়। স্বপ্ন দেখাকে ক্লাইটম্যান শিশু, বৃদ্ধ ও মাতালের চিন্তাধারার সঙ্গে তুলনা করেছেন। শিশু খেলার পুতুলকে সজীব কল্পনা করে, অনুপস্থিত সঙ্গীর সঙ্গে খেলা করে ; তোমার দিদিমণি মৃত শিশুর শয্যায় হাত বুলিয়ে ঘুমপাড়ানি গান গাইতেন, ভুলে গিয়ে একই গল্প বারবার শোনাতেন, অনেক মাতাল তিন নম্বর পেগের পর কি ঘটেছিল মনে করতে পারে না। এই সময় গুরুমস্তিষ্ক কোনো কাজই করছে না, বলা চলে। 'স্বপ্ন ভুলে যাই কেন'—এর থেকে ক্লাইটম্যানের কাছে 'স্বপ্ন জাগার পরও মনে থাকে কেন', এইটেই বড় প্রশ্ন। উত্তরে তিনি বলেছেন ; অনেক বছরের অর্জিত অভ্যাসের ফলে কেউ কেউ ভোরের দিকটার শেষ স্বপ্নটার মাঝখানে জেগে ওঠে। নাটকের শেষ দৃশ্যটাই শুধু মনে পড়ে। আবার নানা কারণে মাঝরাত্রে কখনও দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্বপ্নের মাঝে যদি ঘুম ভাঙে, তবে ঐ স্বপ্নের অংশবিশেষ মনে আসতে পারে।

এইবার দুজন মনস্তাত্ত্বিকের স্বপ্ন-সমীক্ষার উল্লেখ করব। এঁরা হলেন নিউইয়র্কের স্যাপিরো ও গুডেনফ। যারা স্বপ্ন দেখার কথা স্বীকার করে আর যারা স্বীকার করে না এই দুই গ্রুপের স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এঁরা কি সিদ্ধান্তে এসেছেন জানো ? যারা বলে স্বপ্ন দেখি না—তারাও আসলে স্বপ্ন দেখে, কিন্তু অনেক সময় বুঝতে পারে না স্বপ্ন দেখছে, না চিন্তা করছে। আর-ই-এম্ পর্বে ঘুম ভাঙালে তারা বুঝতেই পারে না তারা ঘুমোচ্ছিল না জেগেছিল। এরা ঠিক জানেই না স্বপ্ন দেখা ব্যাপারটা কি ? অনেক সময়

স্বপ্ন-বৃত্তান্তের অসম্ভাব্যতা থেকে বিচার করে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়ে তারা ঘুমিয়েছিল এবং স্বপ্ন দেখছিল। যারা 'নন্-ড্রিমার্স' বা স্বপ্নবিরোধী, তারা, এঁদের মতে, স্বপ্ন মনে করতে চায় না। তাদের ঘুম ভাঙানো খুবই কঠিন ব্যাপার। অনেক ধাক্কাধাক্কির পর যখন ঘুম থেকে ওঠে, তখন অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। অর্থাৎ স্বপ্নবৃত্তান্তটি বেমালুম ভুলে গেছে। এদের আকস্মিকভাবে অবিলম্বে ঘুম ভাঙানোর বিশেষ বন্দোবস্ত করার পর এদের কাছ থেকে স্বপ্নবিবরণী আদায় করতে পেরেছেন সমীক্ষক। ঘুরে ফিরে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা পুরণো ফ্রয়েডীয় বিস্মরণতত্ত্বকেই পুনরুজ্জীবিত করেছেন। স্বপ্ন দেখার পর ঘুম ভাঙতে যত দেরী হবে, স্বপ্নীয় ঘটনা ততই বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে যাবে। নির্জ্ঞান আর সংজ্ঞান মনের মধ্যবর্তী দ্বাররক্ষক বা সেন্সর একটু সময় পেলেই স্বপ্নের অবাঞ্ছিত অসামাজিক ইচ্ছাকে নির্জ্ঞানকক্ষে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবে। মানসিক বাধা বা resistance থেকেই স্বপ্নদৃষ্ট সব কিছু স্মৃতি বিলুপ্ত হয়। কেন না, স্বপ্নের মাধ্যমে আমরা অসামাজিক ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করি। এসম্বন্ধে অনেক কিছু লিখেছি আগের চিঠিগুলোতে। নতুন করে ঝগড়া করতে চাই না। হারিয়ে ফেলে থাক যদি, কিছু বলব না। অন্তত, ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা করে হারিয়ে ফেলাকে নির্জ্ঞান-প্রেষণা বলে তোমার বিরুদ্ধে নালিশও জানাব না।

এবার মনোরোগ চিকিৎসকদের ব্যাখ্যা দিয়ে বক্তব্য শেষ করা যাক। ক্লাইট-ম্যান স্বপ্নদ্রষ্টাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ও হৃৎপিণ্ডের গতিবেগ পরিমাপক কৌশল সন্নিবিষ্ট করেছিলেন তাঁর ই-ই-জি যন্ত্রে, বলেছি আগেই। স্বপ্নদ্রষ্টার হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকুনি ও নিঃশ্বাসের বেগ দুই-ই বেড়ে যায়, এটা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। এর মানে স্বপ্ন দেখার সময় প্রক্ষোভে (emotion) আকুল হই আমরা। মনোরোগবিদ স্নাইডার স্বপ্নকালীন প্রক্ষোভবৃদ্ধি নিয়ে গবেষণা চালিয়ে স্বপ্নতত্ত্বকে সমৃদ্ধ করেছেন। স্নাইডার তাঁর ল্যাবরেটরীর যন্ত্রে প্রক্ষোভ মাত্রা নির্ধারণের জন্য আরো কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা করেন। হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, রক্তপ্রবাহের গতি ও দেহের তাপ নির্ণয়ের বন্দোবস্ত করার পর তিনি দেখলেন যে স্বপ্নের মধ্যে প্রক্ষোভ মাত্রা অনেকটা বাড়ছে। এ বৃদ্ধির আবার একটা বিশেষ নিয়মও তিনি আবিষ্কার করলেন। প্রথম স্বপ্ন থেকে তৃতীয় স্বপ্ন অবধি ক্রমশ বেড়ে আবার ভোরের দিকে কমতে থাকে। এই প্রক্ষোভ পুরণো মস্তিষ্ক বা নিম্ন মস্তিষ্কের ক্রিয়া। ডাক্তারীতে একে জৈব-মস্তিষ্ক বা visceral brain বলে। বহুদিন ধরে শারীরবৃত্তবিদ্দের ধারণা ছিল যে অটোনমাস্ নার্ভাস সিষ্টেম জৈবক্রিয়া—যথা হৃদযন্ত্র, পরিপাক, বিপাক, শ্বাসপ্রশ্বাস ইত্যাদির ক্রিয়া চালায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে। সত্যসত্যই অটোনমাস বা স্বচালিত। সে ধারণা গত পঞ্চাশ বছরে বদলে গেছে। New brain বা কেন্দ্রীয় স্নায়ু-সংস্থা, যার পূর্ণ পরিণত রূপ মানব মস্তিষ্কে

সংগঠিত, যার সংচালন তথা চিন্তাভাবনা বিবেচনা বিশ্লেষণ সংশ্লেষণ ইত্যাদির সমন্বিত কর্তৃত্ব গুরুমস্তিষ্ক বল্কলে সংরক্ষিত ; সেই কেন্দ্রীয় সংস্থা বা সেণ্ট্রাল নার্ভাস্ সিষ্টেমের নিয়ন্ত্রণ-নিরপেক্ষ নয় জৈব মস্তিষ্ক বা visceral brain। এসব কথা তোমার কাছে খুবই পুরণো, তবুও স্বপ্নস্মরণ বিস্মরণ প্রসঙ্গে প্রক্ষোভের বিশেষ তাৎপর্যের কথা বিবেচনা করে আবার তোমাকে এ সম্পর্কে দু'এক কথা শুনতে হবে। Emotion আর Intellect,—মস্তিষ্কের পুরণো আর নতুন অংশের দ্বন্দ্বসমন্বয় নিয়ে মনস্তাত্ত্বিক মহলে, চিকিৎসক মহলে অনেক অনেক তর্ক বিতর্ক আলাপ আলোচনার ঝড় বয়ে গেছে। ভয় নেই, পুরণো কাসুন্দি ঘাঁটবো না। ফ্রয়েডোত্তর সমীক্ষকদের ধারণা অতি সংক্ষেপে পরিবেশন করব। মাত্র সেইটুকু, স্বপ্ন ব্যাখ্যায় যেটুকু অপরিহার্য।

মস্তিষ্কের দুই অংশ, প্রক্ষোভ-অংশ ও বুদ্ধি-অংশ প্রকৃতি পরিকল্পিত দুটি টেলিভিশনের পর্দার সঙ্গে তুলনীয়। এই পর্দায় প্রতিফলিত হচ্ছে পরিবেশের চিত্র। প্রক্ষোভ-অংশ যেন প্রকৃতির কাঁচাহাতের তৈরী ; সেই প্রথম যুগের নয় ইঞ্চি টেলিভিশন পর্দার মত, কলাকৌশলের দিক থেকে নীচু স্তরের। প্রতিফলিত ছবিগুলো অস্পষ্ট ধোঁয়াটে। যুক্তি বুদ্ধির ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ভাষায় ব্যক্ত করা চলে না এর আদিম আরণ্যক প্রকৃতি। রূপক প্রতীক এ ছবির আত্মপ্রকাশের একমাত্র মাধ্যম। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের ছবিগুলোর কথা মনে করতে পারো।*

একজন সমীক্ষকের কথাগুলোই তুলে দিলাম। ধারণাটা অনেকখানি পরিষ্কার হবে। তোমরা যারা অতি আধুনিক কবিতা পড়, উদ্ভট নাটক দেখ, নিশ্চয়ই আদিমস্তকের এই অনুভূতির তাৎপর্য ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। অনুভূতি আদিম, প্রকাশভঙ্গী অন্ত্র-কেন্দ্রিক ; ইংরেজিতে একে বলে gut-feelings। শ্রবণ-দরশন-পরশন সব মিলে মিশে আন্তরযান্ত্রিক হরষণে অভিব্যক্ত। এই অবস্থায় পাতার স্বাদ সবুজ লাগে, গান শুনে বমি আসে, মনে চোট লাগলে পেট ব্যথা করে।

অন্যদিকে নয়া অংশের টেলিভিশন পর্দাটিতে প্রতিফলিত পরিবেশ চিত্র যুক্তি-গ্রাহ্য, অঙ্গাঙ্গীসম্পৃক্ত। ভাষায় ব্যক্ত সম্ভব এর প্রতিটি লাইন, আলোছায়ার

---

* "One might imagine that though the visceral brain could never aspire to conceive of the colour 'red' in terms of a three letter word or as specific wave length of light, it could associate the colour symbolically with such diverse things as blood, fainting, fighting, flowers etc."

প্রতিটি দ্যোতনা। এখানে পর্দায় পরিবেশ সুস্পষ্ট এবং বিশদভাবে বিশেষভাবে চিত্রিত, যার ফলে পরিবেশ-পরিবর্তন ও পরিবেশের সঙ্গে সমন্বয় সাধন সম্ভব। মানুষের সব সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড এই নতুন মস্তিষ্কের (কেন্দ্রীয় সংস্থা) নিয়ন্ত্রণাধীন; তা বলে পুরণো মস্তিষ্ক মানুষকে প্রভাবিত করে না এমন নয়। অর্থাৎ সময় বিশেষে মানুষ কেবলমাত্র অনুভূতি বা প্রক্ষোভতাড়িত হতে পারে। গুরুমস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়তে পারে। ঘুম এমনি এক অবস্থা। এই সময় visceral brain বা আন্ত্রিক মস্তিষ্ক স্বাধীনভাবে কাজকর্ম চালাতে থাকে, ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তার নাম স্বপ্নকাণ্ড। এই কাণ্ডে যা কিছু ঘটে সবই যুক্তিবিহীন ও অন্ত্রধর্মী। স্বপ্নের সবকিছুই অত্যুজ্জ্বল, অত্যধিক প্রক্ষোভপীড়িত ও প্রতীকধর্মী অনুভূতিসঞ্চারক।

স্নাইডারের স্বপ্ন মনে না থাকার ব্যাখ্যা শারীরবৃত্তবিদ ও মনস্তত্ত্ববিদদের ব্যাখ্যা থেকে স্বতন্ত্র। ইনি মনে করেন, যে স্বপ্ন কেবলমাত্র অনুভূতি জাগায়, যে সব স্বপ্ন প্রক্ষোভ উদ্দীপক, সে-স্বপ্ন স্বভাবত আন্ত্রিক মস্তিষ্কের ক্রিয়াফল, বাচনিক স্তরের প্রভাবরহিত। লাল এদের কাছে রক্তের প্রতীক, ল, আ এবং ল শব্দের সমন্বয়ে গঠিত অর্থব্যঞ্জক কোনো বাক্য নয়। জাগ্রত অবস্থায় অর্থব্যঞ্জক ভাষার সাহায্যে এই স্বপ্ন স্মৃতিপথে আনা সম্ভব নয়। যে স্বপ্ন মনে থাকে, সেগুলোকে এরা নাম দিয়েছেন 'থট-ড্রিম' বা চিন্তা-স্বপ্ন। এ স্বপ্ন দেখা মস্তিষ্কের নয়া-বিভাগের অর্থাৎ গুরুমস্তিষ্কের ধর্ম। এদের উত্তাপ কম, কিন্তু এরা ভাষায় প্রকাশযোগ্য, কাজেই স্মৃতিমন্দিরে অধিষ্ঠান করতে পারে। স্বপ্নের এই দ্বি-জাতিত্ব আবার অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে গরমিল। কাজেই তিনি অনুমান করলেন স্বপ্নবৃত্ত মনের বিভিন্ন স্তরকে আলোড়িত করে। তার ফলে কোনো স্বপ্ন মনে থাকে, কোনো স্বপ্ন মনে থাকে না। মনের বিভিন্ন স্তর আছে যে তার প্রমাণ কি? স্মৃতি সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান ধারণা থেকে অনায়াসে স্তরের অস্তিত্ব অনুমান করা যায় —এটা হল স্নাইডারের দৃঢ় বিশ্বাস। স্বপ্নের আবেগ-অনুভূতি স্বপ্নদ্রষ্টার অতীত অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত। এই অভিজ্ঞতা মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বা স্তরে সন্নিবিষ্ট। এই অভিজ্ঞতার প্রকৃতিও স্তরবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সমীক্ষকদের অভিমত শুনলে খুব খুসী হবে তুমি। কেননা তিনি প্রথমেই সেই অভিজ্ঞতার উল্লেখ করেছেন, যাকে ইয়ুং-এর ভাষায় বলা হয় যৌথ-নির্জ্ঞান। (Collective Unconscious)। এই স্মৃতি বিবর্তনের ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে রক্ষিত হয়ে আসছে হাজার হাজার বছর ধরে। মানবপ্রজাতি শুধু নয়, স্তন্যপায়ী জীব মাত্রেই এই আদিম স্মৃতির অধিকারী। এর অধিষ্ঠান সেই পুরণো আন্ত্রিক মগজে। এ-ছাড়া আরো দুটি স্মৃতিস্তরের উল্লেখ করা হয়। এ-দুটি স্মৃতিস্তরের নাম দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে পূর্বাভিজ্ঞ স্মৃতি বা experiental memory এবং

ব্যাখ্যামূলক স্মৃতি বা interpretative memory। নাম দুটি কানাডার বিশ্ববিখ্যাত নিউরো-সার্জন পেনফিল্ড চালু করেন। মৃগীরোগীর মস্তিষ্কে অপারেশন করতে গিয়ে পেনফিল্ড গুরুমস্তিষ্কের বল্কলে সূচের মত ইলেকট্রোড্ প্রবিষ্ট করিয়ে এইসব স্মৃতিস্তরের সন্ধান পান। এক ভদ্রলোকের ঠিক কপালের নিচেতে একই জায়গায় ইলেকট্রোড ঢুকিয়ে তাঁর মুখে মজার মজার অভিজ্ঞতার কথা শোনা গেল। প্রথমবার বললেন, কাছাকাছি কেউ পিয়ানো বাজাচ্ছে শুনতে পাচ্ছি। দ্বিতীয় দিন বললেন, দুজনে কথা বলছে, একজন একটা নাম বলল, আমি বুঝতে পারলাম না। ঠিক যেন একটা স্বপ্ন। তৃতীয় দিন বললেন, কেউ একটা গান গাইছে। চতুর্থ দিনে সেই একই গান শুনতে পেলেন এবং বললেন এটা একটা রেডিও প্রোগ্রামের বিষয়বস্তু। পেনফিল্ডের অভিমতটা এইরকম: যখন ইলেকট্রোড্ ঢুকিয়ে মস্তিষ্কের কোনো জায়গায় মৃদু আকস্মিক আঘাত দেওয়া হয় তখন অতীতের কোনো স্মৃতি-অভিজ্ঞতা এলোমেলোভাবে আবার নতুন করে চৈতন্যপ্রবাহ রূপে জেগে ওঠে এবং নতুন করে বইতে থাকে। অতীতের গুহা-ভাণ্ডার থেকে স্বতঃউৎসারিত এই অসম্বদ্ধ স্মৃতিস্রোত পরবর্তীকালের অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ। এর নামই experiental memory; বাংলায় বলা চলে পূর্বাভিজ্ঞ-স্মৃতি। অন্য ধরনের ইলেক্ট্রোড্-প্রতিক্রিয়ায় রোগী বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠে এবং বর্তমানকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। অবশ্য এই প্রচেষ্টার মধ্যে চিন্তাবিবেচনার কোনো ব্যাপার নেই। এটা অনেকটা ঐ আকস্মিক আঘাতের স্বতস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া। স্বপ্নবৃত্তান্ত মনে আসা বা ভুলে যাওয়া কোনো স্বেচ্ছাকৃত ব্যাপার নয়, এইরকম স্বতস্ফূর্ততা ও আকস্মিকতার নিদর্শন।

স্মৃতি ও স্মৃতিতত্ত্ব

এখন স্মৃতি-তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা যাক।

স্মৃতির ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা এখনও পেলবখণ্ড সংগ্রহ করছেন। সামনে পড়ে রয়েছে অসীম সাগর। প্রাচীনদের থেকে জ্ঞানের পরিধি খুব বেশি বেড়েছে বলে মনে হয় না। স্মৃতি-ভাণ্ডার কথাটি খুবই চালু, তবে ভাণ্ডারটির সঠিক অবস্থান বোধ হয় এখনও অনির্দিষ্ট। তোমার জটিল প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারব না; তবু যতটা জানা আছে, তোমার বোধগম্য করে এই পত্রে প্রকাশ করার চেষ্টা করছি।

স্মৃতিতত্ত্ব নিয়ে ঔৎসুক্য শুধু তোমার মত ও তোমার থেকেও ছোট ছাত্র-ছাত্রীদেরই আছে তা মনে কর না। আমার মত বৃদ্ধ, দীর্ঘায়ু হবার দরুন যারা শোকতাপে জর্জরিত এবং বেদনা উদ্রেককারী ঘটনা ভুলতে চায়—অর্থাৎ

বিস্মৃতি যাদের কাম্য—তাদেরও স্মৃতিবিষয়ক ঔৎসুক্য কম নয়। তারাও জানতে চায় কিভাবে বস্তু বা ঘটনাবিশেষের স্মৃতি গঠিত হয়, সংরক্ষিত হয় এবং কিভাবে প্রয়োজনমত স্মৃতি উজ্জীবিত হয়।

আমি পাভলভের শর্তাধীন পরাবর্ত দিয়েই শুরু করছি। সহজ করে বলবার তাগিদে দুই সাংকেতিক তন্ত্রের কথা আপাতত তুলছি না। শর্তাধীন পরাবর্ত চিরস্থায়ী নয়, শর্তহীন উদ্দীপক দ্বারা মাঝে মাঝে উদ্দীপ্ত না হলে শর্তাধীন পরাবর্ত লোপ পায়, একথা তোমার জানা। কিন্তু শর্তাধীন পরাবর্ত চিরস্থায়ী নয় বটে, কিন্তু বিদ্যুৎ ঝলকের মত ক্ষণস্থায়ীও নয়। পরাবর্ত ক্ষণস্থায়ী হলে পরাবর্তভিত্তিক মনোবিদ্যার সাহায্যে স্মৃতিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা যেত না। মস্তিষ্কে কোনো বস্তু বা ঘটনার ছাপ পড়ার ব্যাখ্যাও পরাবর্তের সাহায্যে সম্ভব হত না। এ নিয়ে পাভলভের ল্যাবরেটরীতে যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে, তার ফলাফলের ভিত্তিতে অনায়াসে বলা চলে যে সুসংগঠিত শর্তাধীন পরাবর্ত শর্তহীন উদ্দীপকের সাহায্য ছাড়াই বেশ কিছুকাল সক্রিয় থাকে। "New connections well elaborated are retained for a long time." (Pavlov-Gantt, Vol. I, p. 354)। মনোবিজ্ঞানের বিচারে কোনো কিছু মনে রাখার পরস্পর সম্পৃক্ত দুটো বিষয় আছে: যে বস্তু বা ঘটনা মনে রাখতে হয় তার ছাপ আর সেই ছাপের অনুষঙ্গিত অন্য কিছু ব্যক্তি, বস্তু বা ক্রিয়া। ছোটবেলায় ম্যাপ দেখে যখন ভূগোল পড়তে, তখন সিংহল দ্বীপের অবয়বটির ছায়া তোমার মস্তিষ্কে দাগ কাটত আর সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তরে ক্রমশ সরু হয়ে নেমে আসা ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশের অবয়বের ছবি। 'সিংহল' কথাটি উচ্চারিত হলে ঐ ছবিটি তোমার মনে ভেসে উঠত, অথবা ঐ ছবিটি দেখলে সিংহল কথাটি মনে পড়ত। স্মৃতি সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রথমেই মনে আসবে তিনটি প্রশ্ন: (১) কি করে তোমার মস্তিষ্কে ম্যাপের রেখাগুলো ছাপ ফেলল? (২) সিংহল নামটি কি ভাবে তোমার মনে মুদ্রিত হয়ে গেল? আর (৩) কেমন করে নামটি আর ম্যাপের ছবিটি অনুষঙ্গিত হল? তৃতীয় প্রশ্নটির উত্তরে পাভলভপন্থীরা কি বলেছেন মনে আছে কি?*

---

* It should be remembered that for a conditioned reflex to be formed, it is necessary that the excitatory process that has appeared in the cortex as a result of the action of an indifferant stimulus, shall be drawn to the seat of intensive activity existing at the given moment in the central nervous system (Psychology in the Soviet Union, London, 1957, p. 153).

পাভলভ লিখেছেন, যখন মস্তিষ্কের দুটি উত্তেজিত কেন্দ্রের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়, তখন স্নায়ুতরঙ্গ দু-দিকেই প্রবাহিত হয়।* প্রথম দুটি প্রশ্নের উত্তরও পাভলভের ও তার সহকর্মীদের পরীক্ষানিরীক্ষা থেকে পাওয়া যায়। শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে ওঠার পথচিহ্ন (trace) বেশ কিছুকাল বিদ্যমান থাকে।** এ ছাড়া একজন সহকর্মীর পরীক্ষাতেও প্রমাণিত হয়েছে যে পরাবর্তের পথচিহ্ন (trace) কয়েকদিন পর্যন্ত বর্তমান থাকতে পারে।***

এই পথচিহ্নকেই এক বিশেষ ধরনের পরাবর্ত বলে পাভলভ চিহ্নিত করেছেন। এই সম্পর্কিত একটি পরীক্ষার কথা তোমাকে শোনাচ্ছি। আধ মিনিট ধরে একটা শব্দ কুকুরকে শোনানো হল; এক থেকে তিন মিনিট পরে কুকুরটিকে কিছু খাদ্য দেওয়া হল। কয়েকবার এ-রকম করার পর দেখা গেল যে শব্দটি করা হোক আর নাই হোক; কিছুক্ষণ পরে (এক থেকে তিন মিনিট) খাদ্য পরাবর্তটি ঘটছে দেখা গেল। এই বিষয়ের উল্লেখ তুমি পাবে জি. ভি. আনরেপ অনূদিত সম্পাদিত "Conditioned Reflexes : An Investigation of the Physiological Activity of the Cerebral Cortex নামের বইটিতে (London 1927, 39ff)। এই সব পরীক্ষার ফলাফল থেকে তুমি বোধ হয় স্মৃতিতত্ত্বের প্রাথমিক পর্যায়ের কিছুটা জ্ঞান লাভ করতে পারবে। পথচিহ্ন পরাবর্তই ইন্দ্রিয়লব্ধ সংবাদ বা সংকেতকে মস্তিষ্কে সংরক্ষিত করে।

আরো একটা কথা এখানে বলা দরকার। সব কিছুই কি আমরা মনে রাখতে পারি? না। পথচিহ্ন পরাবর্ত (trace reflex) গড়ে ওঠে বিশেষ

---

* Where two nervous centres are connected, joined, the nervous processes move from one to the other in both direction—(Pavlov-Gantt, Vol. II, p 142).

** The physiology of conditioned reflexes has brought to light data indicating that stimulations in the form of its trace, makes itself felt in the central nervous system long after the cause that produced this stimulation is removed and its visible effect has come to an end (Pavlov-quoted by Zankov in Psychology in the Soviet Union, Routledge & Kegan Paul, London, 1957 pp. 153-54).

***In Dr. Egorov's experiment the trace proved to be a very lasting one making itself felt not only for hours, but even for days. This may be supported by certain facts from every day life, as for example, when some taste, particularly an unpleasant one ; is remembered for a long time. (Pavlov-Gantt, Vol. I, p. 190)

অবস্থার সন্নিবেশে। কোনো বস্তু বা ঘটনা দেখার সময় বা কোনো কিছু শোনার সময় যদি মস্তিষ্কের অন্য জায়গার কিছু কোষে জোরালো উদ্দীপনা ঘটে তবেই ট্রেস্‌ রিফ্লেক্সটি গড়ে ওঠে ও বেশ কিছুকাল টি঳কে থাকে। তুমি রাস্তায় দুটো ষাঁড়ের লড়াই অনেকবার নিশ্চয়ই দেখেছ; কিন্তু সবগুলো কি মনে আছে? নিশ্চয়ই না। কিন্তু যে লড়াইটি দেখার সময় তোমার লণ্ডনের বন্ধুটির টেলিগ্রাম তার স্বদেশ যাত্রার খবর বহন করে এনেছিল, সেই লড়াইটির কথা মনে থাকবে। এই রকম ভাবে অনুষঙ্গিত না হলে খুব কম ঘটনাই স্মৃতি মন্দিরে সঞ্চিত হতে পারে। যে তিনটি প্রশ্ন দিয়ে এই স্মৃতিতত্ত্ব শুরু করেছিলাম, তার সব কটার উত্তরই বোধ হয় পেয়ে গেছো। এবার বিষয়ান্তরে যাওয়া যাক।

মনে রাখার সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্রের বিশ্লেষণী ধর্মের বিশেষ যোগাযোগ আছে। কোনো বস্তু বা তার গুণ যদি আমরা অন্য বস্তুর গুণাগুণ থেকে আলাদা করে দেখতে পারি, তবেই সেই বস্তুটি মনে রাখার সুবিধা হয়। কোনো কিছুর সঠিক ধারণা করতে গেলেই বিশ্লেষণী ক্রিয়ার প্রয়োগের প্রয়োজন। প্রথম পর্বে, এ বিষয়ে আলোচনা আছে। তবুও স্মৃতি প্রসঙ্গে আর একবার বলছি—তার সংক্ষিপ্তসার। কোনো বস্তুর প্রত্যক্ষণের কাজে স্নায়ুসংস্থার বিশ্লেষণী ধর্ম প্রথমে প্রযুক্ত হয় অন্তর্মুখীন (afferent) নার্ভগুলির প্রান্তস্থিত বিশ্লেষকের (peripheral analysers) সাহায্যে। সেখানে বিশ্লেষিত হবার পর আবার নার্ভটির মস্তিষ্ক সংযোগস্থলে আর একবার বিশ্লেষণ ঘটে। পাভলভীয় পরিভাষায় বলা হয় brain terminal analyser। এই জায়গাতেই বিশেষ করে, বিশ্লেষকের মস্তিষ্ক প্রান্তে পথচিহ্নের (trace) অবস্থিতি। প্রসঙ্গত ল্যাসলের সঙ্গে পাভলভের মতবিরোধের কথা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।*

* Pavlov particularly stressed this print in his refutation of the thesis, advanced by the American Physiologist Lashley. From experiments in training rats to acquire habits as a result of visual excitation, Lashley drew the conclusion that the training process had no connection whatsoever with the site of the lesion in the hemispheres, whereas the mnemonic trace or engram had a specific localization. Pavlov pointed out that the visual fibres do not lie only in the occipital lobe but are spread considerably beyond it, probably over the entire mass of the hemispheres...If Lashley instead of using the elementary stimulus of an intensive-light, had used a more complex stimulus (e. g., a particular object) the habit would not only have vanished after the removal of the visual lobe

পাভলভের পরীক্ষানিরীক্ষা থেকে এইটেই প্রমাণিত হচ্ছে যে স্মৃতি গঠন ও সংরক্ষণের ব্যাপারে মস্তিষ্কবল্কলের সর্বাংশেরই ভূমিকা আছে। পশ্চিমী পণ্ডিতরা কিন্তু সে আমলে মনে করতেন মস্তিষ্কে স্মৃতি সংরক্ষণের বিশেষ বিশেষ ভাণ্ডার আছে। সংবেদন, প্রত্যক্ষ ধারণা ইত্যাদি মস্তিষ্ক ধর্মের থেকে স্মৃতিকে স্বতন্ত্র করে দেখার উদ্দেশ্য ভাববাদী ধ্যানধারণাকে পুষ্ট করা, বস্তুবাদকে নস্যাৎ করা।

পাভলভের স্মৃতিতত্ত্ব দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রতিফলন তত্ত্বের সমর্থক ; বহির্বাস্তব ও চেতনার সম্পর্কের সঠিক নির্ধারক।*

'মনে রাখা' সম্পর্কে পাভলভের ধারণার কিছুটা বলা হল। এইবার স্মৃতিতে সঞ্চিত তথ্য কি করে মনে করি (recall)-এ সম্পর্কে দুচার কথা শোনো। বিভিন্ন সময়ে তৈরী পরাবর্তগুলোর কিভাবে মস্তিষ্ক নিয়মাবদ্ধ থাকে সে সম্পর্কে পাভলভের বক্তব্য খুবই স্পষ্ট ও তাৎপর্যপূর্ণ। মস্তিষ্কের ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার এই পরাবর্তগুলোর নিয়ম-শৃঙ্খলার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কিত। মনে রাখা ও মনে আনার সঙ্গে এই শৃঙ্খলাবদ্ধতার সম্পর্ক কি—নিশ্চয়ই তোমার জানতে ইচ্ছে করছে। পাভলভ বলেছেন, বাইরের জগৎ ও দেহের ভেতরকার যন্ত্রপাতি থেকে নিয়ত অজস্র উদ্দীপক মস্তিষ্ক ত্বকের কোষগুলোর ওপর আঘাত করছে। মস্তিষ্কে পৌঁছে উদ্দীপকগুলো পরস্পরের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে ব্যক্তির প্রয়োজন অনুযায়ী একটা বিশেষ শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপ ধারণ করে। চলমান এই বাঁধাধরা রূপ প্রতিটি মস্তিষ্কের বৈশিষ্ট্য ; পাভলভের ভাষায়, 'dynamic stereotype'—

---

but could not have been fromed again afterwards. In this case, Pavlov concluded ; no difference would have been found between the site of the formation of the habit and that of the mnemonic trace.

(Pavlov-Gantt, Vol. II, pp. 137).

* This is significant not only for a materialist interpretation of the process of impression and retention ; but also from a philosophical point of view. By disclosing the physiological mechanism of impression by showing that it is rooted in sensation, Pavlov brings a scientific finding to the support of one of the major thesis of the dialectical materialist theory of reflection ; viz. that perception, as a peculiar stage of cognition of reality ; is based on sensation, i.e., on the direct linkage of consciousness with the outer world ; with objective reality (Psychology in the Soviet Union, op. cit., p 157) :

চলমান ছাঁচ। পর পর কয়েকটি বিভিন্ন ধরনের পরাবর্ত গঠনের পর, সেগুলোর কয়েকদিন ঠিক একইভাবে পুনরাবৃত্তি করলে, চলমান ছাঁচ (dynamic stereotype) তৈরী হয়। এর পর, এর মধ্যেকার যে কোনো একটি উদ্দীপক বেছে নিয়ে অন্যান্যগুলি যে সময়ে প্রযুক্ত হত, ঠিক সেই সময়ে যদি প্রয়োগ করি, তাহলে ঐ একটি উদ্দীপকের ফলেই বিভিন্ন উদ্দীপকের দরুন ভিন্ন ধারার পরাবর্ত নির্দিষ্ট সময়ে উদ্ভূত হবে। একটি উদ্দীপক প্রয়োগ করে অন্য উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাচ্ছে।* অর্থাৎ পথচিহ্ন এককভাবে অবস্থিত নেই, তারা শৃঙ্খলাবদ্ধ ও পরস্পরনির্ভর হয়ে একটি চলমান ছাঁচ তৈরী করছে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন পরাবর্তের সময় ও প্রতিক্রিয়াজনিত ফল নির্দিষ্ট ও অটুট থাকছে। এখন আর isolated trace নয়, 'system of traces' গঠিত হয়েছে এবং যে কোনো একটি উদ্দীপকের ছোঁয়ায় সবকটি পরাবর্ত পর্যায়ক্রমে গঠিত গচ্ছে। মনে আনা বা মনে করবার (recall) শারীরবৃত্তিক এই ব্যাখ্যা তোমার মনের মতন না হলেও, বিজ্ঞানসম্মত—একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবে।

সময় পেলে, প্রথম ও দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্রের সমন্বয়ে কিভাবে স্মৃতি সংরক্ষিত হয় সে কথা জানাবো।

পেনফিল্ড মস্তিষ্ক-বল্কলে সূচ ফোটানোর পর থেকে স্মৃতিতত্ত্ব নিয়ে বিজ্ঞানীরা উঠে পড়ে লাগলেন। কি হয়েছিল মনে আছে নিশ্চয়ই। খুব অল্প পরিমাণ বিদ্যুৎবাহী সূচী-ইলেক্‌ট্রোডের প্রবেশ-উদ্দীপনায় রোগী মজার মজার কথা শুনতে পেলেন। একদিন পরিচিত একটা গানও শুনলেন। ইলেক্‌ট্রোডটা কানের কাছাকাছি অবস্থিত মস্তিষ্ক-ত্বকে প্রবিষ্ট হয়েছিল। জায়গাটার নাম 'টেম্পোরাল লোব'। মস্তিষ্কের ছবি এবং চার্ট নিশ্চয়ই অনেক দেখেছ। আর একবার মিলিয়ে নাও। 'সিলভিয়ান ফিশার' এর ঠিক নীচের অংশটিকে ঐ নাম দেওয়া হয়েছে। কানের পাশে যে অস্থিখণ্ডটি ঐ অংশকে ঢেকে আছে তার নাম 'টেম্পোরাল' অস্থি।

---

* All this throws light on the foundations recollection and retention of complex wholes (entities) composed of multiform parts. The production (elaboration) and retention of the subtlest interrelations between excitatory and inhibitive processes explains physiologically the formation and retention of motor habits : Pavlov explicitly stated that the manifold states of the nerve cells are retained in the form of traces into the compositions of specifie systems (Ibid p. 158)

এরপর পেনফিল্ড সাঙ্কনের দিকে মানে কপালের দিকে চার সেন্টিমিটার সরিয়ে বসালেন ইলেক্‌ট্রোডটি। এবার রোগীর মনে পড়ল একটা রুটির দোকানের বিজ্ঞাপনের কথা। এ বিজ্ঞাপনটা তার পূর্ব-পরিচিত। এটা যে রোগীর স্বাভি-ভাবনপ্রসূত নয় তার প্রমাণ কি? পেনফিল্ডের মনেও সেই সন্দেহ এসেছিল। তিনি তাই বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করলেন (ইলেক্‌ট্রোডটি ঠিকই রাখলেন)—এবার কি দেখলেন? উত্তর হল—কিছু না। এর থেকে স্থিরনিশ্চয় হলেন যে ইলেক্‌ট্রোডের খোঁচায় মস্তিষ্কের এই অংশের উদ্দীপনা থেকেই স্মৃতি জাগরিত হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষানিরীক্ষার পাত্রপাত্রী ত' বিশ্বাসই করতে চায় না যে এটা পূর্ব-স্মৃতির জাগরণ। একটি ভদ্রমহিলার টেম্পোরাল লোবের একই জায়গায় বারবার ইলেক্‌ট্রোড প্রবেশ করানোতে একই গান বারবার তাঁর কানে বাজতে লাগল। তিনি মনে করলেন নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও ঐ গানের রেকর্ডটা বাজানো হচ্ছে। আর একজন তাঁর ভাই-এর সঙ্গে কথাবার্তার নিখুঁত রেকর্ডিং শুনলেন; সে ভাই তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভ্রমণ করছেন। মস্তিষ্কের ঐ অংশটির বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন কালের স্মৃতি সঞ্চিত রয়েছে বলে মনে হয়। স্মৃতি যতই পুরণো হয় ততই যেন উঁচুতলায় উঠতে থাকে। সমকালীন স্মৃতি জমা আছে যেন টেম্পোরাল লোবের নীচুর তলায়। উপরের অংশটি কেটে বাদ দিলেও সমকালীন স্মৃতির ইতরবিশেষ ঘটে না, কিন্তু পুরণো স্মৃতি লোপ পায়। আবার নীচের তলার ক্ষয়ক্ষতিতে কাছাকাছি সময়ের কোনো কিছুই আর মনে পড়ে না। ব্যাপারটা কিন্তু অত সরল নয়। পেনফিল্ডের মতে স্মৃতির ভাণ্ডার মস্তিষ্কের নানা অংশে ছড়িয়ে আছে। টেম্পোরাল লোবের সঙ্গে সেই সব অংশের সম্পর্ক নিবিড়। টেম্পোরাল লোবের অংশবিশেষ বিদ্যুতবাহিত হয়ে অনুষঙ্গের ফলে একটা নির্দিষ্ট পূর্বস্মৃতি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। স্মৃতিভাণ্ডার নয় এ জায়গাটি, বরং একে বলা চলে স্মৃতিভাণ্ডারের চাবি। ইলেকট্রনিক যন্ত্রের মত মস্তিষ্কের কোনো বিশেষ অংশে শুধুমাত্র স্মৃতি জমা আছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন না। স্মৃতিকেন্দ্র বলে কোনো কেন্দ্র এখনও বোধ হয় আবিষ্কৃত হয় নি।

কেন্দ্রীয় স্মৃতি-আগার নেই; তবে স্থানীয় স্মৃতিসংরক্ষণ ব্যবস্থা আছে অজস্র। কেন্দ্রীয় খাদ্য-ভাণ্ডার না থাকলে মজুতদার ও চোরাকারবারীদের কিছুটা সুবিধা হয় নিঃসন্দেহ। অলীক দর্শন, অলীক শ্রবণ (hallucinations) আমাদের অনেকসময় পীড়িত করে। কিন্তু স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের সুবিধাও অনেক। একজায়গায় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হলে, একটি কেন্দ্রীয় স্মৃতিভাণ্ডার থাকলে, দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, ইন্দ্রিয়জাত বিভিন্ন ধরনের স্মৃতির জটপাকিয়ে যাবার সম্ভাবনা হত বেশি। বিশৃঙ্খলা আরো বাড়ত। বর্তমানে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন আমাদের স্মৃতি অনেকটা ইন্দ্রিয়-কেন্দ্রিক। দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ ও পেশী-সঞ্চালনের

সংবেদন থেকে স্মৃতি গড়ে ওঠে ও স্থানীয় কেন্দ্রে সঞ্চিত থাকে। তাই কেউ চেহারা মনে করতে পারে, নাম মনে করতে পারে না ; কেউবা বন্ধুবান্ধবের টেলিফোনের নম্বর অনায়াসে মনে রাখতে পারে, কিন্তু সহজে ভাষা শিখতে পারে না। কেউ শোনা জিনিস ভোলে না, কারুর বা দৃশ্যপট বেশি মনে থাকে। ঠিক কি ভাবে স্মৃতি সঞ্চিত থাকে, সে সম্বন্ধে ধারণা এখনও অপরিণত। সংবেদন থেকে স্মৃতি মুদ্রণের ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত। ব্যাপারটা ঠিক কি ভাবে ঘটছে দেখা যাক। দোতলার বারান্দায়-এসে তোমাদের গেটের পাশের কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে তাকালে, লাল ফুলের সমারোহ তোমাকে সম্বর্ধনা জানাল। দর্শন-ইন্দ্রিয়ের স্নায়ু উদ্দীপ্ত, সেই উদ্দীপনার ঢেউ পৌঁছুলো মস্তিষ্কের এক বিশেষ গ্রাহী-কেন্দ্রে। গাছ পাতা ফুলে ভরা বাইরের দৃশ্যপট মস্তিষ্কে অনুরূপ সংবেদন জাগালো, ছবিটি চোখের সামনে ফুটে উঠলো। তুমি চোখ ফিরিয়ে নিলে দৃশ্যান্তরে। কৃষ্ণচূড়ার ছবি মিলিয়ে গেল, কিন্তু একেবারে মুছে গেল না। মুদ্রিত হয়ে রইল স্মৃতিপটে। চেষ্টা করলে বা অনুষঙ্গের প্রভাবে দৃশ্যটি যে কোনো সময় তোমার মনে আসতে পারে। মস্তিষ্কের কোষগুলো একসময় উদ্দীপ্ত হয়েছিল, উদ্দীপনা থেমে গেছে, কিন্তু ছাপ রয়ে গেছে। কী ভাবে? স্নায়ুবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, আধুনিক কালের সিবারনেটিকস—কোনো বিজ্ঞানই এ পর্যন্ত এর সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। এ নিয়ে অনুমানভিত্তিক আলোচনা অনেক হয়েছে এবং হচ্ছে। তত্ত্বকথা আলোচনার আগে স্মৃতিবিষয়ক আরো কিছু তথ্য পরিবেশন করছি। জানি না, এবিংহোসের (Hermann Ebbinghaus) 'মেমরি স্প্যান' সম্বন্ধে তোমার এত আগ্রহ কেন? তাঁর গবেষণার বিষয় এবং পদ্ধতি সহজ করে লিখে বোঝাতে পারব কি?

গত শতকের শেষ দিকে মনস্তত্ত্বের অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে স্মৃতি বিষয়ক পরীক্ষা-নিরীক্ষাও সুরু হয়। এবিংহোস্ এই স্মৃতি গবেষণার পথিকৃৎ। স্মৃতি ও বিস্মৃতি নিয়ে মাত্রাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন ১৮৭৯-৮০ সালে। তাঁর আগে গ্যালটন উন্দ একটি মাত্র শব্দ-উদ্দীপকের সাহায্যে অনুষঙ্গ প্রক্রিয়ার সময়-সম্পর্ক নির্ণয়ের পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। এবিংহোস্ অনেকগুলো সংযোগ শব্দের সাহায্যে সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন। কী ভাবে ধাপে ধাপে অনুষঙ্গ গড়ে ওঠে, দৃষ্ট বা শ্রুত কোনো কিছু কী ভাবে স্মৃতি-পটে অঙ্কিত হয়ে যায়, এই নিয়ে বিশদ অনুসন্ধান চালাবেন তিনি। শ্রুতিলিখন, শ্রুতিপঠন কাকে বলে জানো? আগেকার দিনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গুরুমশায়ের কাছে যারা পড়েছে, তারা কথাগুলো মর্মে মর্মে জানে। গুরুমশাই হাঁকলেন—লেখ। পড়ুয়ারা শ্লেট-পেন্সিল নিয়ে তৈরী হল। গুরুমশাই বললেন—অনন্তর নবজলধর পটলে শাল্মলী বৃক্ষের শীর্ষদেশ আচ্ছাদিত হইল। পড়ুয়াদের

শ্লেট-পেন্সিলের ঘর্ষণে ঠকাঠক শব্দ হতে লাগল। তারা সমস্বরে শেষ কথাটি উচ্চারণ করল—"দিত হইল"। গুরু অন্য পংক্তি হাঁকলেন। এই হল শ্রুতিলিখন। শ্রুতিপঠন আরো মজার। সর্দার পড়ুয়া একদিকে দাঁড়াল, অন্যান্যেরা অন্যদিকে। সর্দার হাঁকল—এক কড়ায় পোয়া গণ্ডা। ছেলেরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো—পোয়া গণ্ডা। দুষ্টু ফাঁকিবাজ যারা, তারা শুধু—'ণ্ডা' উচ্চারণ করে ঐকতান বজায় রাখল। গণ্ডায় আণ্ডা মেশালো। এর নাম শ্রুতিপঠন। এবিংহোসের পরীক্ষা-নিরীক্ষা পদ্ধতিটা অনেকটা এই রকমের ছিল। এই শ্রুতিলিখন, শ্রুতিপঠনের সাহায্যে বাক্য বা নামতা কতটা সময়ের মধ্যে মুখস্থ করা যায়—সেইটে নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে তিনি গবেষণা চালিয়েছিলেন। মুখস্থ করবার বিষয়বস্তু যত দীর্ঘ হয় মুখস্থ করার সময় তত বাড়ে। নিজের উপর পরীক্ষা চালিয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন যে অর্থহীন বাক্য মুখস্থ করতে অর্থপূর্ণের তুলনায় বেশি সময় লাগে। দৃষ্টিপঠন নিয়েও পরীক্ষা চালানো যায়। দৃষ্টিপঠন শ্রুতিপঠনেরই অনুরূপ। শোনার বদলে পড়ে মুখস্থ করা; যে ভাবে পড়তে আমরা সকলেই অভ্যস্ত। এবিংহোস্ দেখলেন একবার পড়ে তিনি সাতটা/আটটা অবধি 'ননসেন্স সিলেবল্' মনে রাখতে পারেন। বাড়িয়ে ন'টা করতেই মুখস্থর সময় অনেকখানি বেড়ে গেল। অর্থাৎ অনেকবার পড়তে হল। আনুপাতিক হারে মুখস্থর সময় বাড়ে না। বারোটা কথা মুখস্থ করতে যত সময় লাগে, পনেরোটা মুখস্থ করতে তার প্রায় দ্বিগুণ সময় লাগে। তিনটে কথা বাড়ার দরুণ অঙ্কের হিসেবে কিন্তু চার ভাগের এক ভাগ সময় বাড়া উচিত ছিল। একবার পড়ে বা শুনে যতগুলো বাক্যাংশ বা syllable মনে রাখা যায়, সেইটেই সে ব্যক্তির মুখস্থ-শক্তির পরিমাপক একক। স্মৃতির পরিমাপ বা **memory span** বের করবার এই হচ্ছে প্রথম প্রচেষ্টা। এর জন্যেই এবিংহোসের এত নাম। এ ছাড়াও ভূরি ভূরি তথ্য সরবরাহ করে গেছেন ভদ্রলোক। লিখতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। তার আর একটির উল্লেখ করে এই নীরস আলোচনায় ছেদ টানব। জানি, তোমার অনুসন্ধিৎসা আর জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা হয়ত অসীম, কিন্তু আমার জ্ঞানদানের বাসনা ও ক্ষমতা দুই-ই সীমিত। পড়তে পড়তে তোমার সুন্দর ভ্রূ কুঞ্চিত হোক, চোখে বিরক্তির ছায়া নামুক, এ আমি চাই না।

মুখস্থ করার সব থেকে কার্যকর পদ্ধতি কি? ধর, তোমাকে কাল আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় একটা কবিতা আবৃত্তি করতে হবে। আজকের মধ্যেই মুখস্থ করা দরকার। একটানা ঘণ্টাখানেক ধরে বার বার কবিতাটি পড়বে, না আধঘণ্টা অথবা পনেরো মিনিট করে পড়ে খানিকটা সময় বিরতি দেবে? কি ভাবে তাড়াতাড়ি মুখস্থ হবে? এবিংহোসের পরীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা

গেল যে "spaced repetition was better than continuous and unspaced repetition।" একটানা পড়ার থেকে পড়া—থামা—পড়া,—এই পদ্ধতিই শ্রেয়। পরবর্তীকালের এই পদ্ধতির গবেষকরা অনেক কিছু নতুন তথ্য সরবরাহ করেছেন।

মনে রাখা শুধু বাক্য-অনুষঙ্গ অথবা বার বার পড়া বা শোনার উপরই নির্ভর করে না। বাক্য-অর্থের তাৎপর্যেরও স্মৃতির ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আছে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীর মনোভাব ও উদ্দেশ্যের সঙ্গেও মনে রাখা না রাখার নিগূঢ় সম্পর্ক। মুখস্থ করা বা মনে রাখার ব্যাপারে আমরা সকলেই বিভিন্ন রকমের, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত পদ্ধতির প্রয়োগ করে ফললাভ করে থাকি। সে পদ্ধতি অন্যের পক্ষে অচল। ইতিহাস পড়ার সময় তোমার ছোট বোন সারা দেহ আন্দোলিত করে ছন্দের হিল্লোল তোলে। জীবনানন্দের কবিতা আবৃত্তি করার সময় তুমি ঘাড়টি বাঁ পাশে বেঁকিয়ে অল্প অল্প দোলাতে থাক; নিশ্চয়ই ঐ ভাবে মুখস্থ করেছিলে। কেউ-বা নিজস্ব উদ্ভাবিত অনুষঙ্গ আরোপ করে প্রয়োজনীয় তথ্য মনে রাখবার চেষ্টা করে। বাড়ীর ও টেলিফোনের নম্বর মনে রাখার অনেকেরই নিজস্ব পদ্ধতি আছে। নিজস্ব পদ্ধতি প্রয়োগ করে অনেক সময় শ্রুতিধর বলে অন্যকে হকচকিয়ে দিয়ে থাকে। একজন সোভিয়েত লেখক এইরকম একজন শ্রুতিধরের আশ্চর্য ক্ষমতার গোপন রহস্য উদ্ঘাটন করে দেখিয়েছেন, নিজের উদ্ভাবিত অনুষঙ্গের সাহায্যে কিভাবে স্মৃতিশক্তির অদ্ভুত পরিচয় দেওয়া যায়। ঘটনাটা বলছি, শোনো। শ্রুতিধর উঁচু চেয়ারে বসে আছেন। একটু দূরে দর্শকমণ্ডলী। তাদের প্রত্যেককে ধীরে ধীরে একটা করে যা খুসী শব্দ উচ্চারণ করতে বলা হ'ল। অবশ্য শব্দটি অর্থবহ হওয়া চাই। শ্রুতিধর প্রত্যেকটি কথককে একটি করে সংখ্যা দিয়ে সূচিত করলেন। তাদের ঐ সংখ্যাটি লিখে রাখতে বলা হ'ল। এইরকম আটচল্লিশ জন ব্যক্তি আটচল্লিশটি কথা উচ্চারণ করলেন; শ্রুতিধর তাদের আটচল্লিশটি ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যায় সূচিত করলেন। তারপর তারা (কোনো নির্দিষ্ট নিয়মে নয়, যখন যার খুশী) নিজেদের শব্দগুলো আবার আউড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতিধর আউড়ে গেলেন তাদের সূচক-সংখ্যাগুলি। তারপর দর্শক অষ্টাচত্বারিংশত একে একে তাদের সূচক-সংখ্যা জানালো, আর শ্রুতিধর বললেন সংখ্যা-অনুগত যথাযথ শব্দগুলো। সাতচল্লিশটি নির্ভুল হল। কীভাবে এটা সম্ভব হ'ল? শৈশবে ভদ্রলোক পঞ্চাশটি অতি প্রচলিত শব্দ এবং পঞ্চাশটি সংখ্যা পরস্পর সম্পর্কিত করে কণ্ঠস্থ করেছিলেন। দৃষ্টান্ত বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধরো, চেয়ারসূচক সংখ্যা ১, টেবিল সূচক সংখ্যা ২, রাস্তা সূচক সংখ্যা ৩, ইত্যাদি। যখনই শ্রোতারা একটি শব্দ উচ্চারণ করলো তখনই শ্রুতিধর ঐ শব্দ এবং নিজের সংখ্যা-সূচিত শব্দটি দিয়ে বাক্য রচনা করে

ছটি শব্দ অনুষঙ্গতি করলেন। যেমন যেই একজন বলল—পিয়ানো, তিনি অমনি মনে করলেন চেয়ারে না বসে পিয়ানো বাজানো যায় না। চেয়ারের সূচিত সংখ্যা ১। পিয়ানো→চেয়ার→১ ; এইভাবে নতুন অনুষঙ্গ-শৃঙ্খল তৈরি হল। একজন দর্শকের 'ট্রাউজার' শব্দটিকে রাস্তা, তথা সংখ্যা ৩-এর সঙ্গে সংযুক্ত করলেন। ট্রাউজার পরে ছাড়া রাস্তায় বের হওয়া চলে না—এইভাবে ট্রাউজারের অনুষঙ্গে 'রাস্তা' শব্দটি তার মনে এল। পিয়ানো থেকে চেয়ার, চেয়ার থেকে ১ ; ট্রাউজার থেকে রাস্তা ; রাস্তা থেকে ৩ ; আবার উল্টোদিকে ১ থেকে চেয়ার, চেয়ার থেকে পিয়ানো…ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন উঠবে শ্রুতিধরের দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষঙ্গ চেয়ার-পিয়ানো সম্পর্ক তিনি ঠিক রেখেছিলেন কি ভাবে? পিয়ানো বললে চেয়ার মনে হওয়া যতটা সোজা, চেয়ার থেকে পিয়ানো মনে আসা ততটা সোজা কি ? ব্যাপারটা সম্বন্ধে তোমার মতামত জানতে চাই।

অনুষঙ্গের সাহায্যে মনে রাখার আর এক ধরনের দৃষ্টান্ত শোনো। তুমি জানো নিশ্চয়ই, বারোটি নার্ভ মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়ে দেহযন্ত্রকে সংচালিত করছে। এদের নাম যথাক্রমে Olfactory, Optic, Oculomotor, Trochlea, Trigeminal, Abducens, Facial, Acoustic, Glossopharyngeal, Vagus, Accessory এবং Hypoglossus। এইগুলোকে পর্যায়ক্রমে মনে রাখবার জন্য আমেরিকার ছাত্ররা একটা ছড়ার দুটো পংক্তির সাহায্য নিয়ে থাকে : One One Olympus Tiny Top A Finn And German Viewed a Hop. হবু ডাক্তাররা সব দেশেই ভেষজবিদ্যার এক একটি মৌলিক দ্রব্য থেকে প্রস্তুত বিভিন্ন ওষুধের নাম (Aqua, Extract, Tincture ইত্যাদি) মাত্রা সমেত মনে রাখবার জন্য ঐ রকম ছড়া-অনুষঙ্গের সাহায্য নিয়ে থাকে।

শ্রুতিধর কিন্তু আছে। হরিনাথ দে'র স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য গল্প পরিচালিত আছে। নানা ভাষার ক্লাসিক অনবরত মুখস্থ বলে যেতে পারতেন। শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক থেকে যে কোনো লাইন বললে, তিনি নাকি পরবর্তী লাইনগুলো গড়গড় করে আউড়ে যেতে পারতেন। কিছুদিন আগে একটা পত্রিকায় তাঁর আরো আশ্চর্য এক ক্ষমতার কথা পড়েছি! কোনো লাইনের পরবর্তী লাইনগুলো শুধু নয়, পূর্ববর্তী পংক্তিগুলোও তিনি উল্টোদিক থেকে বলে যেতে পারতেন। পূর্বানুবৃত্তি নয়, উত্তরানুবৃত্তি। পাতার নিচ থেকে তিনি ক্রমশ উঁচুতে উঠতে থাকেন। খুবই আশ্চর্য ! তাই নয় কি ?

প্রায় তিরিশ-বত্রিশ বছর আগে বারাণসীতে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তিনি অনেকদিন আগে পড়া ইতিহাস গড়গড় করে মুখস্থ বলে যেতেন। সবুজপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রবন্ধের বেশ কিছু

লাইন তাঁর মুখে শুনেছি। আর একজন বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি ঐতিহাসিক ঘটনার সন, তারিখ নির্ভুলভাবে অনর্গল বলে যেতে পারেন। হরিনাথ দে'র মতো না হলেও এঁদের স্মৃতিশক্তিও বিস্ময়কর।

'সংখ্যার মানবযন্ত্র' বলে খ্যাত হয়েছেন যাঁরা, তাঁদেরও খ্যাতির মূলে মনে রাখবার আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে। ষোলটি সংখ্যা দিয়ে ষোলটি সংখ্যার গুণফল, কুড়িটি সংখ্যার কোনো রাশির বর্গমূল ইত্যাদি অল্প সময়ের মধ্যে সঠিকভাবে বলতে পারার দৃষ্টান্ত একেবারে বিরল নয়। সংখ্যা-স্মৃতি এদের অত্যদ্ভূত।

স্মৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বিস্মৃতি, যেমন আলোর সঙ্গে যুক্ত অন্ধকার। স্মৃতি-বিস্মৃতি মস্তিষ্কের পরিপূরক গুন। স্মৃতি-বিস্মৃতি দুই-ই জীবনধারণের পক্ষে অতি আবশ্যিক ধর্ম। জীবনের দুঃখ-বেদনার ইতিহাস ভুলতে না পারলে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। প্রসবের কষ্ট ভুলে গিয়ে সন্তানের হাসিটি মনে রাখার ফলেই সৃষ্টিধারা অব্যাহত। অনেকের মতে আমরা কিছুই ভুলি না, সময় বিশেষে, উপযুক্ত অনুষঙ্গ সমাবেশে অনেক ভুলে যাওয়া ঘটনা এসে মনে পড়ে। আমরা আসলে বাছাই করে মনে রাখি, বাছাই করে ভুলে যাই। বলা চলে, প্রক্ষোভ-উদ্রেককারী ঘটনা মনে করার ব্যাপারে আমরা বিশেষভাবে পক্ষপাতমূলক। সাধারণভাবে আমাদের ধারণা, সাম্প্রতিক ঘটনা অতীতের থেকে বেশি মনে থাকে। আমার মতো বৃদ্ধদের বেলায় এ নিয়ম খাটে না। বৃদ্ধদের মস্তিষ্ক ও মানসিকতার বৈশিষ্ট্যের ফলে সাম্প্রতিক কোনো কিছু তাদের স্মৃতিপটে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হয় না। যান্ত্রিক স্মৃতি, নতুন ভাষা শেখবার ক্ষমতা বৃদ্ধ বয়সে থাকে না। ধরণী যখন আমাদের চোখে তরুণী ছিল তখনকার, আমাদের শৈশব কৈশোরের, স্বর্ণময় (?) দিনগুলির অনেক কিছু আমাদের স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে! চল্লিশ বছর আগে দেখা কৈশোরের সহপাঠি শ্মশ্রুগুম্ফ আচ্ছন্ন মকসুদ আলিকে ফকির-হাটের এক দোকানে দেখেই চিনতে পারি; আর সাতদিন আগে দেখা রোগীদের নাম মনে আসে না। কিন্তু তাদের রোগ ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনে পড়ে যায়। আসলে মনে রাখার সঙ্গে শুধু বয়স নয়, প্রয়োজন এবং মনোযোগও জড়িত।

বৃদ্ধ বয়সের স্মৃতি-চর্চা প্রসঙ্গে এক মনস্তাত্ত্বিক-উল্লেখিত একটি ঘটনার কথা মনে পড়ল। এক বৃদ্ধ নিউইয়র্কের এক হাসপাতালে শুয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন। তাঁর শৈশব কেটেছে জন্মভূমি ইতালীতে, কৈশোর কেটেছে ফরাসী দেশে, তারপর থেকে সারাজীবন আমেরিকায়। প্রথমে তিনি কথা বলছিলেন ইংরাজিতে, অবস্থার অবনতি হতে তিনি ফরাসী ভাষায় কথা বলতে সুরু করলেন, মৃত্যুর দিনে তাঁর মুখে শোনা গেল ইতালির ভাষা।

ফ্রয়েডের নির্জ্ঞানতত্ত্বে যে আদিম স্মৃতি-ভাণ্ডারের উল্লেখ আছে, সে সম্বন্ধে তুমি আরো কিছু জানতে চেয়েছ। বেশ, অবহিত হও—জানাচ্ছি।

আদিম মানবের যৌন প্রকৃতি ও ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তির স্মৃতি আমাদের নির্জ্ঞান আধারে সঞ্চিত ;—এই হ'ল ফ্রয়েডের অভিমত। স্মৃতি-ভাণ্ডারে একদিকে আছে সমকামেচ্ছা, অসমকামেচ্ছা, অজাচার প্রবণতা, আত্মরতিপ্রবৃত্তি (যার মূলে আবার স্বমেহইচ্ছা), আর অন্য দিকে আছে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী ইত্যাদিকে হনন-ইচ্ছা। এই ইচ্ছা বা প্রবণতা সম্পর্কে আমরা অবহিত নই, কেননা এগুলো বিশেষভাবে বিস্মৃত ও নির্জ্ঞান-আশ্রয়ী। এরা দুর্দম মানসিক শক্তির বাহক, সর্বদা নির্জ্ঞানের কারাগার ভেঙে স্মৃতিপথে উদিত হবার জন্য উন্মুখ। পারছে না, কেননা নির্জ্ঞানের আর এক প্রকোষ্ঠে রয়েছে সুপার-ইগোর নিষেধকারী প্রবণতা,—'টাবু'। 'টাবু'র স্মৃতিও আপাত-বিস্মৃত হলেও কম শক্তিশালী নয়। এই নির্জ্ঞানস্মৃতি জাতিজনিসম্ভূত,—ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'ফাইলোজেনেটিক'। এই দুই অন্ধশক্তির সংগ্রামে 'ইগো' বা অহং—যার অধিষ্ঠান সংজ্ঞান মনে, অনেকটা মধ্যস্থের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। আবার এই জাতীয় স্মৃতি বা অভিজ্ঞতাকে আমরা শৈশব থেকে, এক থেকে তিন বছরের মধ্যে, নিজের অজ্ঞাতে অবদমিত করে যাচ্ছি ; অসামাজিক প্রবৃত্তিজাত কাম ও ধ্বংসাত্মক প্রবণতাকে নির্জ্ঞান প্রকোষ্ঠে নির্বাসিত করে সমাজ সভ্যতার সঙ্গে নিজেদের অভিযোজিত করছি। এই স্মৃতি ব্যক্তি-জনিকেন্দ্রিক, যাকে বলা হয় 'অনটোজেনেটিক'। এই লিবিডো-তত্ত্ব অন্য প্রসঙ্গে তোমাকে জানিয়েছি ; স্মৃতিপ্রসঙ্গে আরো একবার বললাম।

এর সঙ্গে অবশ্য আধুনিক গবেষকদের স্মৃতি-তাত্ত্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। আধুনিক নাট্যকার ঔপন্যাসিকদের উদ্বুদ্ধ করলেও, মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানী বা বস্তুবাদী মনস্তাত্ত্বিকদের কাছে এই তত্ত্বকথার ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়া অন্য কোনো মূল্য নেই।

স্মৃতি নিয়ে সব দেশেই নতুন নতুন গবেষণা চলছে। 'সাইবারনেটিক্‌স', আণবিক জীববিদ্যা, জৈবরসায়নশাস্ত্র, ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে। এই সব ল্যাবরেটরীতে স্মৃতি নিয়ে যে সব কাজকর্ম হচ্ছে, তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি।

সংবাদের প্রতিলিপি গ্রহণ ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়া না জানলে স্মৃতিতত্ত্ব বোঝা যাবে না। মস্তিষ্ক কতগুলো খণ্ড-সংবাদ প্রতি সেকেণ্ডে গ্রহণ করতে পারে ? একজন বৃটিশ মনস্তাত্ত্বিক হিক্‌ বললেন,—অবশ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর, আমাদের মস্তিষ্ক সেকেণ্ডে গড়ে মাত্র পাঁচটি সংবাদ গ্রহণ করতে পারে। তিনি মাত্র বারোটি রুটিন-সংকেত নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন ; তাছাড়া, সংকেত গ্রহণের

সাড়া হিসেবে তিনি বাচনিক ও অঙ্গসঞ্চালক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছিলেন। সাড়া দিতে কতটা সময় লেগেছে সেটা হিসেব করেননি আর সংকেতের তাৎপর্য নিয়েও মাথা ঘামাননি। সাধারণ রুটিন-মাফিক সংকেতে সাড়া দেওয়া এক জিনিষ, আর গুরুত্বপূর্ণ বিপদের সংকেতে সাড়া দেওয়া অন্য জিনিষ। মস্কো ইউনিভারসিটির গবেষকরা দেখেছেন যে বিপদের সংকেতে মস্তিষ্ক অনেক তাড়াতাড়ি সাড়া দিয়ে থাকে। সংকেতের তাৎপর্য ও গুরুত্বটাই আসল। মস্কোর গবেষকদের পরীক্ষার ফলাফলে জানা গেল যে মস্তিষ্ক সজ্ঞানে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় পঁচিশ খণ্ড সংবাদে সাড়া দিতে পারে। অবশ্য সংকেতগুলো এমন হওয়া চাই যাতে তোমার বিচার-বিবেচনা পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার থাকে।

একটা খবর আমাদের মস্তিষ্কে পৌঁছে দশ সেকেণ্ড মাত্র সংজ্ঞান-রাজ্যে অবস্থান করে। জার্মান মনস্তাত্ত্বিক হেলমার এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ঢং ঢং করে ঘড়িতে দশটা বাজছে। তুমি তখন হয়তো ফিতে খুলে কেশদাম এলায়িত করতে ব্যস্ত, স্নানের সময় হয়েছে। ঘড়িতে পাঁচবার ঢং ঢং শব্দ হবার পর তোমার খেয়াল হলে তুমি কটা বাজল ঠিকমতো শুনতে পারবে; আটবার, নবার শব্দ হবার পর সঠিকভাবে ধরতে পারবে না কটা বেজেছে। তাঁর মতে স্মৃতি-ভাণ্ডার দুটো; একটা স্বল্পমেয়াদী অন্যটা দীর্ঘমেয়াদী। স্বল্পমেয়াদী ভাণ্ডারে তাৎক্ষণিক ক্রিয়াকর্মে লাগতে পারে এমনি সব প্রতিলিপির প্রতিধ্বনি (যা ইন্দ্রিয়সংকেতে তুমি জানতে পারছ) সঞ্চিত। এই স্বল্পমেয়াদী ভাণ্ডারকে সক্রিয় স্মৃতি-ভাণ্ডারও বলতে পারো। অবিলম্বে কাজে লাগবে না, এমনি সব প্রতিলিপি প্রতিধ্বনি অন্য ভাবে দীর্ঘমেয়াদী ভাণ্ডারে, তোমার অজ্ঞাতসারেই জমা হতে থাকে। প্রয়োজনমত চিত্তপটে উদিত হয়ে তোমার চিন্তাভাবনা কাজকর্মকে প্রভাবিত করে।

স্বল্পমেয়াদী স্মৃতির পরিমাপের একটা মোটামুটি হিসেবও দিয়েছেন হেলমার। ১৬০ টুকরো খবর নাকি তুমি তাৎক্ষণিক কাজের জন্য মনে রাখতে পারো। কিভাবে এই হিসেবে পৌছুলেন—একটা পরদার ওপর এক সেকেণ্ডের দশ ভাগ অন্তর কতকগুলো অক্ষর নিয়মিত ভাবে দেখানো হলে তুমি প্রতি সেকেণ্ডে ১৬টার বেশি অক্ষর দেখে মনে রাখতে পারবে না। দেখানোর সময় যদি বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলে কি বেশি সংখ্যক মনে রাখতে পারবে? না। মোটকথা, মস্তিষ্কের গ্রাহীক্ষমতা ঐ ষোলোর বেশি নয়। এটা অবশ্য হেলমারের মতে, 'lower threshhold'। প্রতি সেকেণ্ডে ১৬ টুকরো সংবাদ বা অক্ষর মস্তিষ্কে পৌছে দশ সেকেণ্ড করে থাকছে। কাজেই ১৬×১০=১৬০ হচ্ছে তোমার short term memory capacity। এর মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক খবর দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতি তহবিলে জমা পড়ছে; আর প্রায় সেই সংখ্যক খবর এক

সেকেণ্ডে মগজ থেকে বেরিয়ে গিয়ে নতুনের জায়গা করে দিচ্ছে। কী খবর এলো, পুরণো স্মৃতির সঙ্গে মিলিয়ে তার অর্থ অনুধাবন করতেই অর্ধেক সংবাদ-উদ্দীপককে কাজে লাগাতে হয়। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ধর, সিনেমা দেখতে গেছ। যে-ছবিটি দেখানো হবে প্রথমে পর্দার উপর তার শিরোনামাটি উজ্জ্বল হয়ে ভেসে উঠল। "কল্মাসপাদ নাটক—কুইক্সট বিরচিত"। ২৬টি অক্ষরের অর্ধেক, মানে ৮টি তোমার প্রত্যক্ষ গোচর হবে; আর ৮টি মস্তিষ্ককে উদ্দীপ্ত করে স্মৃতিভাণ্ডার থেকে অর্থবহ উপাত্ত খুঁজতে লেগে যাবে। এই হ'ল মোটামুটি মস্তিষ্কের গ্রাহী এবং সংরক্ষণক্ষমতা সম্পর্কিত সামান্য কিছু তথ্য।

* * * *

মস্তিষ্কে স্মৃতি সংরক্ষিত হয় কিভাবে? এই 'মেমারি মেকানিজম' বোঝবার চেষ্টায় আজ বিজ্ঞানীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন: একটা কথা বা দৃশ্য বা গন্ধ কি ভাবে মস্তিষ্ককোষে ছাপ তৈরি করে, এবং কি ভাবে ভবিষ্যতের দরকারে সেই ছাপ থেকে মূর্ত স্মৃতি ফুটে ওঠে? কয়েক বছর আগে পর্যন্ত এ সম্পর্কে আমাদের কোনো জ্ঞানই ছিল না। বিগত ২০।২৫ বছরে আমরা অনেকটা এগিয়েছি। তোমার মুখচন্দ্রিমা একদিন আমার অপটিক নার্ভকে উদ্দীপ্ত করে মস্তিষ্কের পেছনদিকের কোষগুলোতে কিছু বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন এনেছিল। তার ফলে, চোখের ক্যামেরায় ধরা পড়া তোমার মুখচ্ছবি কোষগুলোতে পাকাপাকিভাবে মুদ্রিত হয়ে গেল। যখন খুশী তোমার মুখখানির ছায়া মনের আয়নায় ফেলে তোমাকে দেখার সাধ অন্তত আংশিক মেটাতে পারি। এমনি হাজার হাজার দৃশ্য, শব্দ, ঘটনা, গন্ধ, স্পর্শ, স্মৃতি-ভাণ্ডারে তাদের বৈশিষ্ট্য স্বাতন্ত্র্য নিয়ে জমা হয়ে রয়েছে। মস্তিষ্কে তাদের স্থায়ী ছাপ পড়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা এই ছাপের নাম দিয়েছেন 'engram'। এই 'এনগ্রামে'র সঠিক প্রকৃতি হয়তো জানতে এখনও দেরি হবে, কিন্তু জানবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং অনুসন্ধানের ঔৎসুক্য ও তীব্রতা বেড়েছে। স্মৃতি-ভাণ্ডার এবং এনগ্রাম সম্পর্কিত গবেষণায় পাভলভের শর্তাধীন পরাবর্তক্রিয়ার পরীক্ষা-পদ্ধতি ও বার্জারের ইলেকট্রো-এনসেফালোগ্রাম যথেষ্ট কাজে লাগছে। আর প্রজননবিদ্যার নবতম আবিষ্ক্রিয়া—জিন সম্পর্কিত জ্ঞান স্মৃতি-গবেষণাকে বিশেষ সাহায্য করছে।

তুমি যা দেখছ বা শুনছ, সেটা মস্তিষ্কে স্মৃতি হয়ে সংরক্ষিত হচ্ছে সংকেত-লিপির সাহায্যে। স্মৃতিভাণ্ডার অভিজ্ঞতার 'coded representation'-এ ভরতি। জিনের মাধ্যমে বংশগতির ধারা সংক্রমিত হয়। জিনের মধ্যে প্রজাতির দেহ-সংগঠনের সংবাদ ও পদ্ধতি সাংকেতিক ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। ডি-এন-এ-তে সেই সংকেতলিপি বা প্রজাতি-স্মৃতি সংরক্ষিত আর দূত আর-এন-এ সেই সংকেত অনুযায়ী সংবাদ ও রূপকল্প বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। ভ্রূণ থেকে

পূর্ণাবয়ব শিশু, শিশু থেকে পূর্ণ-বয়স্ক মানুষ গড়ে উঠছে জিনের মধ্যে সংরক্ষিত স্মৃতির সংকেত-লিপির ইংগিতে। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন 'ফাইলোজেনেটিক মেমরি'র বেলায় যে রকমটি ঘটেছে, 'অণ্টোজেনেটিক মেমরি"র বেলায়ও হয়তো সেই রকমটি ঘটছে।

জানো বোধ হয়, জীববিজ্ঞান এখন আর কোষভিত্তিক নয়। কোষের অণু-গুলোর ক্রিয়াকলাপ ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের দৌলতে এখন বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে রাইবোনিউক্লিক এ্যাসিডের (আর এন এ) অণুর সঙ্গে স্মৃতি সংরক্ষণ বিশেষভাবে সম্পর্কিত। খুব অবাক লাগছে নিশ্চয়ই। প্রথম শুনলে অবাক লাগবারই কথা। ডি-এন-এ, আর-এন-এ—এই কথাদুটো এ যুগের সব শিক্ষিত ছেলে-মেয়েদেরই জানা। অনেকবার সাময়িক পত্রের পাতায় কথাদুটো নিশ্চয়ই তোমার চোখে পড়েছে। তবে কোথায় প্রজনন সংশ্লিষ্ট আর-এন-এ, আর কোথায় স্মৃতিসংরক্ষণ ! আমারও প্রথম শুনে অবাক লেগেছে।

স্মৃতি ও আর-এন-এর সম্পর্ক সংক্ষেপে বিবৃত করছি। মস্তিক নিউরণের আর-এন এর পরিমাণ একটা শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে উঠবার পরই বেড়ে যায়। কোন নতুন কিছু শেখা মানেই নতুন শর্তাধীন পরাবর্তে গড়ে তোলা। আর শেখা মানেই মনে রাখা। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে আরও জানা গেছে যে, পরীক্ষাধীন প্রাণীর মস্তিষ্ককোষের আর-এন-এ গুণগতভাবে, পরীক্ষাধীন নয় এমন প্রাণীর (অর্থাৎ যাকে নতুন কিছু শেখানো হচ্ছে না) মস্তিষ্ককোষের আর-এন-এ থেকে আলাদা। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে নতুন শিক্ষাটির স্মৃতির 'কোডমেসেজ' আর-এন-এ অণু ধারণ করার ফলেই তার মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে। শর্তাধীন পরাবর্ত (কণ্ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স) গড়ে ওঠা মানেই সংশ্লিষ্ট মস্তিষ্ককোষের আর-এন-এ'র গুণগত পরিবর্তন।

এবার একটা মজার পরীক্ষার কথা বলছি। কতকগুলো পোকাকে তাদের দেহে আলোকরশ্মিপাতের সঙ্গে সঙ্গে দেহ সঙ্কুচিত করতে শেখানো হল। সঙ্কুচিত না করলে যন্ত্রণাদায়ক বৈদ্যুতিক শক লাগবার সম্ভাবনা। এই নতুন কণ্ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স তৈরী হবার পর পোকাগুলোকে টুকরো টুকরো করে কেটে খলনুড়ীতে পিষে ফেলা হল। এবার ঐ জাতের অন্য পোকাদের খাবারের সঙ্গে এই পেষা মাংস মিশিয়ে তাদের ভূরিভোজে আপ্যায়িত করার পর, তাদের মধ্যে আলোক-জাত দেহ-সঙ্কুচন রিফ্লেক্স গড়ে তোলা হল। দেখা গেল নতুন রিফ্লেক্স গড়ে তুলতে অনেক কম সময় লাগছে, অর্ধেকেরও কম। প্রথম ব্যাচের শিক্ষিত ভ্রাতাদের মাংসপুষ্ট দ্বিতীয় ব্যাচের কম সময় লাগার কারণ দ্বিতীয় ব্যাচের উপর প্রথম ব্যাচের স্মৃতিসংরক্ষক আর-এন-এ অণুর প্রভাব। ইঁদুর নিয়েও এরকম

পরীক্ষা করা হয়েছে। কণ্ডিশন্‌ড ইঁদুরের (শিক্ষিত) মস্তিষ্ককোষের আর-এন-এ ইনজেকশন দেবার ফলে অশিক্ষিত ইঁদুরের প্রশিক্ষণ সময় অনেকখানি কমে গেছে। অন্য জাতের প্রাণীর উপর ইনজেকশনে কোন ফল পাওয়া যায়নি।

পরীক্ষাগুলোর ফলাফল যাই হোক না কেন, ব্যাপারটা হজম করা খুবই কঠিন। আর-এন-এর মধ্যে নতুন শিক্ষার স্মৃতির ছাপ পড়ে স্বীকার করে নিলেও, একথা বিশ্বাস করা বেশ কষ্টকর যে ঐ স্মৃতিসংরক্ষক অণুগুলো নতুন প্রাণীর দেহের সব বাধাগণ্ডী পেরিয়ে সরাসরি তার মস্তিষ্ককোষে অক্ষত অবস্থায় অনুপ্রবেশ করে তাদের নতুন শিক্ষাগ্রহণ সহজতর করে তোলে। তবে একথা আর অস্বীকার করা চলে না যে, স্মৃতির ব্যাপারে মস্তিষ্ককোষের আর এন-এ অণুর বিশেষ অবদান আছে। অন্যান্য নানা ধরনের তথ্য প্রমাণ থেকে এই ধারণা আজ সুপ্রতিষ্ঠিত।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিশক্তি কমতে থাকে, সবাই জানে। সঠিক কারণ এখনও জানা যায় নি। কিছুদিন আগে এক ভদ্রলোক আমার কাছে স্মৃতিবিভ্রমের চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন। বয়স ৬৫, কয়েকমাস আগে তাঁর 'প্রসটেট' অপারেশন হয়েছে। 'প্রস্টেট', গ্ল্যাণ্ড যৌন-প্রজনন-ব্যাপারের সঙ্গে সম্পর্কিত। কয়েকবছর আগে আরো দুটি এই ধরনের রোগী দেখেছিলাম। এ থেকে কিছু অনুমান বা সিদ্ধান্ত তোমাকে করতে বলছি না। ব্যাপারটা জানিয়ে রাখলাম।

স্মৃতি সম্বন্ধে দুচার কথা একটু বিস্তারিত করে তোমাকে জানাচ্ছি। মস্তিষ্কে তথ্য সংরক্ষণ—যাকে স্মৃতি বলা হয়, গুণগতভাবে দু' রকমের হয়ে থাকে। সদ্য বা নতুন স্মৃতি এবং দূরের বা পুরণো স্মৃতি। সদ্য স্মৃতি মানে সেই সব তথ্য যা সদ্য মস্তিষ্ক-কোষে পৌঁছেছে, অস্থির, অপ্রতিষ্ঠ, এখনও স্থিতিশীল হয়নি ; যে-কোনো উদ্দীপকের দরুন মস্তিষ্ককোষের আলোড়ন স্মৃতিভাণ্ডারে সঞ্চিত হতে সময় নিয়ে থাকে। একটা পরীক্ষার কথা এখানে বলা যেতে পারে। একটা ইঁদুরকে বদ্ধ গোলক ধাঁধা থেকে আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে বেরিয়ে আসার কৌশল শেখানোর চার ঘণ্টা পরে যদি তাকে বৈদ্যুতিক শক্‌ দেওয়া হয়, তা হলে সে কৌশল ভোলে না, এক ঘণ্টা পরে দিলে কিছুটা স্মৃতিবিভ্রম দেখা যায়। পনেরো মিনিটের মাথায় শক্‌ দিলে আরো অনেকটা এবং শেখানোর অব্যবহিত পরে দিলে কিছুই মনে রাখতে পারে না। বাস্তব জীবনে মানুষের ক্ষেত্রেও তাই মনে করা যেতে পারে যে, কোনো কিছু তথ্য মস্তিষ্কে পৌঁছবার কিছুক্ষণের মধ্যে যদি কোনো গুরুতর ঘটনা ঘটে, তাহলে কিছুক্ষণ আগে পৌঁছনো তথ্য মস্তিষ্কে স্থিতি লাভ করতে পারে না। এই গুরুতর ঘটনা নানা প্রকারের হতে পারে : দুঃসংবাদ, আনন্দের সংবাদ, বড়দরের অসুখ কিম্বা কোনো রকমের শারীরিক আঘাত বা দুর্ঘটনা জাতীয় কিছু।

মস্তিষ্কের উদ্দীপনা মস্তিষ্কের বিদ্যুৎতরঙ্গের হেরফের ঘটায়, তা থেকে মোরেল* মনে করেন, প্রাথমিক স্তরে তথ্য সংরক্ষণ বা স্মৃতিলিপি-রেখার প্রকৃতি তড়িৎ-লিখনেরই মত। এছাড়া, মৃগীরোগী তার রোগ আক্রমণের কিছু আগের ও পরের কোনো ঘটনাই মনে রাখতে পারে না। কিন্তু পুরণো স্মৃতির এই আক্রমণের ফলে একটুও হেরফের হয় না। সদ্য স্মৃতি মস্তিষ্কে প্রতিষ্ঠিত হতে বেশ কিছু সময় লাগে। এই সময় মস্তিষ্ক বিশেষে কমবেশি হতে পারে। কোনো কোনো তথ্য একবার মস্তিষ্কে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে স্থিতি লাভ করতে পারে। আমাদের ছোটবেলার একটা ঘটনা হয়তো আজো মনে আছে আবার সমকালীন ঘটনা একে রে ভুলে গেছি ; এমনও হয়ে থাকে। কেন এমন হয় ? যে তথ্য বা ঘটনাটি মনে রয়েছে, তার সঙ্গে বিশেষ প্রক্ষোভ জড়িত ছিল বলেই মস্তিষ্কে সেটি স্থায়ী আস্তানা করে নিতে পেরেছে। একবার কোনো কথা বা দেখা দৃশ্য যখন স্মৃতিপটে চিরতরে মুদ্রিত হয়ে যায়, তখন বুঝতে হবে উদ্দীপনা শেষ হবার পরও বেশ কিছুক্ষণ ধরে আশেপাশের কোষে প্রতিক্ষিপ্ত বা প্রতিবিম্বিত হয়ে স্মৃতি-সংরক্ষক নিউরোণগুচ্ছে ফিরে এসে ঘটনাটি ঘটে যাবার পর অনেকক্ষণ ধরে নিউরোণগুলোকে উদ্দীপ্ত করেছে।**

মস্তিষ্ক কোষের কিছু বিশেষত্ব আগেও বলেছি, আবার বলছি। কঠিন করোটি দিয়ে ঢাকা এই দেড় কিলোগ্রাম ওজনের কোষসমষ্টি ৫০ থেকে একশো কোটি বছরের অভিব্যক্তির ফল। এই অভিব্যক্তির ফল এতই চমকপ্রদ, মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ এতই জটিল যে দু'একজন পণ্ডিত মনে করেন যে আমাদের মহাকাশের ছায়াপথ দিয়ে অতি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো বিশেষ তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রবাহ কোনো এক সময় বোধ হয় প্রবাহিত হয়েছিল; তারই ফলে এই বিশেষ কোষ সমষ্টিতে অদ্ভুত ও আশ্চর্য সব গুণের সমাবেশ ঘটেছে, যে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আজও অতি সীমিত ও অসম্পূর্ণ। তাই মানব প্রকৃতি ও মানসিকতার আলোচনা বিশ্লেষণে ধর্মীয় সংস্কার, রহস্যময়তা, অলৌকিকতা, ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি ইত্যাদি অবৈজ্ঞানিক প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা আজও প্রচলিত। ১৯৭৭ সালের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী Roger Guillemin (রজার গুইলেমিন) মনে করছেন, নতুন উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতির (উদাহরণ স্বরূপ সাম্প্রতিককালে উদ্ভাবিত 'Positron Emission Transaxial Tomography'

* Morrel F. Information Storage in Nerve cells in W. S. Fields and W. Abbot (eds), Information Stange and Neural Control 1263, pp.

** Hebb, The Otganization of Behavior, 1949

Scanner—সংক্ষেপে PETT-এর উল্লেখ করা যেতে পারে) সাহায্যে আগামী বিশ বছরের মধ্যে আমরা মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের অতি দুরূহ ও জটিল ব্যাপারের অনেক কিছু জানতে পারব। আপাতত যেটুকু জানা গেছে তারই দু'এক কথা তোমাকে শোনাচ্ছি, বিশেষ করে স্মৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু তথ্য। তুমি তো জানো, এ ব্যাপারে আমার বিশেষ দুর্বলতা আছে।

মস্তিষ্কে দুরকমের কোষ আছে। এক ধরনের কোষ থাকে যাকে 'নিউরোণ' বলা হয় (আমরা মস্তিষ্ক কোষ বলতে এই পুস্তকে সাধারণত 'নিউরোণ'কেই বুঝাবো)। তবে এদের, এই নিউরোণদের ঘিরে থাকা সাহায্যকারী বা সংরক্ষক কোষ 'গ্লায়া কোষ' (glia cells)-এর বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ ও তাদের সম্বন্ধেও দু চার কথা তোমাকে না জানালে অন্যায় করা হবে। সংখ্যায় এরা নিউরোণের দশগুণ এবং এরা বিভাজনের ফলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়—যা নিউরোণের ক্ষেত্রে ঘটে না। এই 'গ্লায়া' ও 'নিউরোণ'-এর সম্পর্কটা বেশ নিবিড়। নিউরোণের থেকে তথ্য-তড়িৎবাহী 'এ্যাক্সন'কে সুরক্ষিত করে রাখে 'শোয়ান' (Schwann) কোষ নামে এক ধরনের 'গ্লায়া' কোষ।

দেহের সব কোষেই, তুমি জানো R.N.A থাকে। তবে নিউরোণ কোষের বৈশিষ্ট্য R.N.A-এর অতি-আধিক্য। R.N.A ও নিউরোণ কোষের উদ্ভূত প্রোটিন কোনো কিছু শেখার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। স্মৃতি সংরক্ষণ ও উজ্জীবন—মনে রাখা ও মনে করার ব্যাপারে R.N.A-এর সঙ্গে D.N.A-এর ভূমিকার কথাও মনে রাখতে হবে। জন্মসূত্রে পাওয়া স্মৃতি বা শিক্ষণ ক্ষমতা ও পরিবেশগত শিক্ষার মধ্যে জৈব রাসায়নিক সংযোগের কথা মনে রাখা দরকার।

স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট কোন কেন্দ্রের প্রয়োজন হয় না। একই নিউরোণ কোষ অন্যান্যদের সঙ্গে হাজার হাজার সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। একই নিউরোণ কোষে বহুবিধ তথ্য ও স্মৃতির আধার বা অনুষঙ্গরূপে কাজ করতে পারে।

'গ্লায়া কোষের' কাজটা কি? এই প্রশ্ন নিশ্চয়ই তোমার মনে আসছে। 'গ্লায়া' 'নিউরোণকে' শক্তি যোগায় ও কিছুটা নিয়ন্ত্রিতও করে। তোমার পক্ষে এইটুকু জানাই যথেষ্ট। আর একটা কথা: মস্তিষ্কের শেখার ক্ষমতা সীমাহীন না হলেও যথেষ্ট। শিক্ষণপদ্ধতির ওপর শেখাটা বিশেষভাবে নির্ভর করে। মস্তিষ্কের টাইপের বিভিন্নতার ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ পদ্ধতির বিভিন্নতা সম্পর্কিত। আধুনিক শিক্ষককে স্নায়ুবিদ্যার প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত। দুঃখের বিষয়, স্মৃতিশক্তি শিক্ষাক্ষমতার তুলনায় কিন্তু অনেকটা সীমিত।

এইবার সম্মোহন পর্ব। এই সম্মোহন তত্ত্ব উপস্থাপিত করার জন্য বিরাট

ভূমিকা তোমাকে শুনিয়েছি। ঘুম স্বপ্ন স্মৃতি ইত্যাদির শারীরবৃত্তিক মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তোমাকে শুনতে হয়েছে। এতদিনে বহু-প্রতীক্ষিত সম্মোহন পর্বের অবতারণা করার সুযোগ পেলাম। ঘুমের কথা দিয়েই সুরু করছি।

শিশুকে ঘুম পাড়ানোর কৌশল নিশ্চয়ই জানো। একটানা একঘেয়ে মৃদুকণ্ঠে গাওয়া ঘুমপাড়ানি গান সব দেশের শিশুদের ঘুম আনবার চিরন্তন পদ্ধতি। 'ছেলে ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো'-র সুর ও ছন্দ সব ভাষাতে একই রকম। বৈচিত্র্যহীন একটানা কণ্ঠের বক্তৃতা শুনতে শুনতে পেছনের সারির অনেক শ্রোতাই ঝিমোতে থাকে। সংবেশকের কণ্ঠের একই লাইনের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি রোগীর সংবেশন নিদ্রা নিয়ে আসে। শিশুকে ঘুমপাড়ানো আর রোগীকে ঘুম পাড়ানোর প্রণালীর মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ নেই। তাছাড়া চিকিৎসক-সংবেশক বারবার রোগীকে অভ্যস্ত ঘুমের পরিবেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ঘুম আনতে সাহায্য করেন। অভ্যস্ত পরিবেশে সহজেই ঘুম আসে, নতুন জায়গায় নতুন পরিবেশে ঘুম আসতে চায় না।

স্বাভাবিক ঘুম আর 'হিপনটিক' ঘুমের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য থাকলেও, দুই ঘুম পুরোপুরি এক ধরনের নয়। স্বাভাবিক ঘুমে মস্তিষ্কের নিস্তেজনা-নিদ্রাতরঙ্গ বিনা বাধায় সারা মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু হিপনটিক ঘুমে মস্তিষ্কের অংশবিশেষ, যে অংশ সংবেশকের কণ্ঠস্বর ও নির্দেশে উদ্দীপিত হচ্ছে, জেগে থাকে। এই অংশ সম্মোহিত রোগীর বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র পথ। পথরক্ষী মাত্র একজন—সংবেশক-চিকিৎসক। তাঁর নির্দেশ ছাড়া অন্য কারুর নির্দেশ রোগীর উপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম নয়। হিপনটিক ঘুম এক বিশেষ ধরনের ঘুম; নির্দিষ্ট কতকগুলো শর্তের উপর নির্ভরশীল। শর্তাধীন প্রতিক্রিয়ার এক সুন্দর দৃষ্টান্ত। পাভলভ আবিষ্কৃত শর্তাধীন পরাবর্ত (কণ্ডিশন্ড রিফ্লেক্স) সম্বন্ধে যাঁদের ধারণা আছে তাঁরা এই ঘুমের বৈশিষ্ট্য সহজেই বুঝতে পারবেন।

এই হল হিপনটিক। পাভলভের মতে ঘুম ও 'র‍্যাপোর্টের' (সম্মোহক-সম্মোহিতের সম্পর্ক) শারীরবৃত্তিক ব্যাখ্যা।

চিকিৎসকের নির্দেশ যথাযথ প্রতিপালিত করার বিরোধী কোন ইচ্ছা বা শক্তি রোগীর থাকে না। অভিভাবনের ফলে ব্যথা চলে যায়, ঠাণ্ডা কোনো জিনিষ রোগীর দেহে ছুঁইয়ে ফোস্কা পড়ানো যায়—এসব অতি-পরিচিত তথ্যের শারীরবৃত্তিক ব্যাখ্যা আজ আমরা কিছুটা অন্তত জানি। সম্মোহিত অবস্থায় মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ক্রিয়াক্ষমতা কমে যায়, কেন না, একটি জায়গা ছাড়া আর সব জায়গাই এ সময় নিস্তেজিত। এই অবস্থায় মস্তিষ্কের উপর মৃদু উদ্দীপক-জোরালো প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে,—এটা পরীক্ষিত সত্য। মৃদু উদ্দীপক,—অভিভাবিত নির্দেশ-বাক্য মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট স্থানকে উত্তেজিত করার সঙ্গে সঙ্গে

কাছাকাছি অংশগুলো নিস্তেজিত হয়ে পড়ে। এই নিস্তেজনা-আরোহ (induced inhibition) মস্তিষ্কের অন্য একটি ধর্ম এবং পরীক্ষিত সত্য। চিকিৎসকের অভিভাবিত নির্দেশবাক্যটিই এখন মস্তিষ্কের একমাত্র পরিচালক, একচ্ছত্র সম্রাট। অন্য অংশ নিদ্রাচ্ছন্ন, কাজেই নিষ্ক্রিয়। মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্থানের সংযোগ ব্যবস্থা এখন এই পরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীন। বেদনাবাহী স্নায়ুপ্রবাহ পরিচালকের ইঙ্গিতে থেমে পড়তে বাধ্য। একেবারেই গরম নয় এমন কোন জিনিষ গায়ে ছুঁইয়ে চিকিৎসক উষ্ণতার নির্দেশ দিলে ফোস্কাও পড়বে। ফোস্কাপড়ার মত জটিল স্নায়ুপ্রক্রিয়াও এখন পরিচালকের অধীনে।

এই সম্পর্কে পাভলভের সহকর্মী ইভানভ স্মলেনস্কি বই থেকে একটি উদ্ধৃতি তুলে দিলে বোধ হয় সম্মোহন ও অভিভাবন সম্পর্কে পাভলভের নিজস্ব বক্তব্য* সম্পর্কে তোমার আরো স্পষ্ট ধারণা জন্মাবে।

---

* "What are suggestions and autosuggestions"—asked Pavlov, and he gave the following answer : "They are a concentrated excitation of a definite point or region of the cerebral hemispheres in the form of a definite excitation, sensation, or its trace—an idea now called forth by emotions, that is, excited from the subcortex, now produced abruptly from the outside, now by means of internal connections, associations, an excitation which acquires a predominant, undue and irrestible significance. It exists and acts, i, e., passes over into movement, into one or another motor act, not because it is maintained by various associations, that is, connections with many present and past stimuli, sensations and ideas—this would produce resolute and sensible action, such as is usual with a normal strong cortex but because in a weak cortex with a low, weak tone this concentrated excitation is accompanied by a strong negative induction which detaches and isolates it from all indispensable extraneous influences. This is the mechanism of hypnotic and post hypnotic suggestion. During hypnosis we observe in a normal and strong cortex a lowered positive tone owing to irradiated inhibition. When the word or the command of the hypnotist is directed to a definite point of such a cortex as a stimulus, the latter concentrates the excitory process in a corresponding point and is immediately followed by negative induction, which meeting little resistance on its ways, spreads over the entire cortex : thanks to this, the word

অনেকে নিজেকে সম্মোহিত করতে পারেন। তাঁদের ক্ষেত্রে স্ব-অভিভাবনও কার্যকরী হয়। ফরাসী দেশের এক মহাপুরুষের, ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মত, হাত-পা দিয়ে রক্ত পড়তে দেখা গেছে। আমাদের দেশে এক মহাপুরুষের পিঠে অন্য একজনের পৃষ্ঠদেশের আঘাতচিহ্ন অঙ্কিত হতে শোনা গেছে। এ-সবই স্বাভিভাবনের ফল, এর মধ্যে কোন বিকৃতি বা অলৌকিকত্বের মহিমা নেই। মানসিক আঘাত পেয়ে রাতারাতি সব চুল পেকে গেল বা উঠে গেল,—এরকম ঘটনা খুব বিরল নয়। এই ঘটনাগুলো আর আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে না।

মনে রাখা দরকার, সম্মোহিত ব্যক্তিকে দিয়ে সব রকমের কাজ করানো যায় না। দুর্নীতির প্রবণতা যার নেই, তাকে দিয়ে নৈতিক অপরাধ অনুষ্ঠিত করা অসম্ভব। চুরি ডাকাতি ব্যাভিচার ইত্যাদি সম্মোহকের নির্দেশে যদি কেউ করে, বুঝতে হবে তার এই জাতীয় কাজের প্রতি বেশ খানিকটা আকর্ষণ ছিল। রাসপুটিনকে নিয়ে অনেক গল্প চালু আছে, তার সবগুলো সত্যি বলে মনে হয় না।

এক্ষেত্রে অভিভাবন নির্দেশকে বাধা দিচ্ছে কে? বাধা দুদিক থেকে আসতে পারে। পরীক্ষা-নিরীক্ষাকালীন এ ধরনের ঘটনার সঙ্গে আমরা প্রধানত পরিচিত। পরীক্ষাকালীন অভিভাবন নির্দেশে হয়ত চিকিৎসক সংবেশকের আন্তরিক ইচ্ছার অভাব থাকে; অর্থাৎ তিনি হয়ত চান না সম্মোহিত ব্যক্তি দুর্নীতিমূলক কাজটি করুক। তাঁর কণ্ঠস্বরে হয়ত দৃঢ়তার অভাব থাকে, অথবা এমন কোন সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য থাকে যা শুধু সম্মোহিত ব্যক্তির কানেই ধরা পড়ে। কাজেই নির্দেশ প্রতিপালিত হয় না। অন্যদিক থেকে, অর্থাৎ সম্মোহিত ব্যক্তির সত্তা সংরক্ষণের প্রচেষ্টা থেকেও বাধা আসতে পারে। কিছু কিছু সামাজিক বৃত্তি ও কোন কোন নীতিবোধ আমাদের মস্তিষ্কের স্বভাবধর্মে পরিণত হয়ে যায়, সহজাত প্রবৃত্তির মত,—শর্তহীন প্রতিক্রিয়ার মত দৃঢ় ও অনড় হয়ে পড়ে। অভিভাবন-বাক্য এই ধারার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফলতা লাভে অক্ষম। মানুষ মূলত সামাজিক প্রবৃত্তি

---

or command is completely isolated from all influences and becomes an absolute irrestible stimulus, continuing to operate even subsequently, when the individual returns to an alert state."

In this way suggestions and autosuggestions change not only external behaviour, but evoke, more or less easily, changes in the vegetative functions; in the work of the internal organs and the metabolic processes. (Essays on the Pathophysiology of the Higher Nervous Activity, Moscow, 1952, pp. 247-48).

পরিচালিত এবং সামাজিক ধর্ম অনেক সময় আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিকেও হার মানায়।

সব মানুষকে সম্মোহিত করা যায় না। সম্মোহনের গভীরতাও সকলের সমান হয় না।

'সম্মোহন' কথাটিতে তুমি আপত্তি তুলেছ। তোমার আপত্তি যুক্তিসঙ্গত। গ্রীক 'হিপ্নসিস'-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'সংবেশন'ই হওয়া উচিত। কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন ম্যাঞ্চেষ্টারের শল্য চিকিৎসক জেমস্ ব্রেইড্। 'সংবেশন' মানে শয়ন, নিদ্রা; আর আমার মতে 'হিপনসিস'ও এক ধরনের নিদ্রা। তবে সম্মোহন কথাটি ব্যুৎপত্তিগত অর্থে 'হিপনসিস' না বোঝালেও, পাঠক-সাধারণের কাছে বিশেষ তাৎপর্যব্যঞ্জক ও 'হিপনসিস'-এর সমার্থসূচক। যাদুবিদ্যার সঙ্গে বিজ্ঞানের আদিম সম্পর্ক তর্কাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত না হলেও, একথা সর্বজনস্বীকৃত যে হিপনসিস জাদুতন্ত্র-পুরোহিততন্ত্র-কুহকীবিদ্যা-ভেলকিবাজির সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত ছিল এবং এখনও আছে। উচাটন-বশীকরণ-সম্মোহন ইত্যাদি অভিচার ক্রিয়ার সঙ্গে হিপনসিসকে এক করে দেখার প্রবণতা অনেকের মধ্যেই রয়েছে। তাছাড়া, তুমিও 'সম্মোহন' শব্দটি তোমার পত্রে ব্যবহার করেছিলে, তাই আমি এ যাবত শিরোনাম পরিবর্তনের কথা চিন্তা করিনি। আরো একটা দিক আছে। 'হিপনসিস' কথাটির মানে নিদ্রা হলেও, এখন আবার অনেক পণ্ডিত 'হিপনসিস'কে নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থা বলতে রাজি নন। নিদ্রার বহু লক্ষণই হিপনসিসে পাওয়া যায় না। এই সব কূটতর্কের প্রয়োজন বর্তমানে আমাদের নেই। প্রয়োজন হলে পরে তর্কের আসরে নামা যাবে। আমরা কিন্তু হিপনসিসকে ঘুমেরই রকমফের, নিদ্রা জাগরণের একটা অন্তর্বর্তী অবস্থা বলে মনে করি। পাভলভ শিষ্য ইভানভ স্মলেনস্কী এ বিষয়ে অনেক তথ্য প্রমাণ হাজির করেছেন। মনোবিদ্যার অনেক সময় লেগেছে জাদুবিদ্যা অধ্যাত্মবিদ্যা থেকে বেরিয়ে আসতে। অনেক আজেবাজে অর্থহীন অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, অনেক অপ্রয়োজনীয় তথ্য মনোবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করার পথের বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হিপনসিসের বেলায় তো কথাই নেই। এখানে বাধা আরো বেশি, কুসংস্কার আরো দৃঢ়মূল। 'সংবেশন', কথাটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় এখনও নিবিড় হয়নি, 'সম্মোহন' কথাটির মধ্যে যে মোহ আছে তার সঙ্গে সাধারণের মনে 'হিপনসিস'-এর সংযোগ রয়েছে। আমার মতে, এই পর্যায়ের আলোচনায় শিরোনাম পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। এ্যানিমল ম্যাগনেটিজম্, মেসমেরিজম্, ইত্যাদির সমার্থক হিসেবে সম্মোহন কথাটি আমি ব্যবহার করছি না, বাংলা ভাষায় অনেকদিন ধরে কথাটি চালু বলেই ওটাকে বেছে নিয়েছি।

'হিপনসিস' সম্পর্কে নানারকম অদ্ভুত উদ্ভট ধারণা চালু আছে সত্যি, কিন্তু আবার এই বিষয়ে তথ্যসমৃদ্ধ বিজ্ঞানঘেঁসা আলোচনা-পুস্তকেরও অভাব নেই। এক হাজারের বেশি বই, আট হাজারের বেশি প্রবন্ধ তুমি পেতে পার—যে গুলোকে মোটামুটি বিজ্ঞানভিত্তিক আখ্যা দেওয়া চলে। সবরকম মিলিয়ে প্রায় দশ হাজারে ওপর পুঁথিপত্তর এ নিয়ে লেখা হয়েছে। সব বই অবশ্য তোমার বোধগম্য ভাষাতে লেখা নয়, কিছু কিছু বই বর্তমানে দুর্লভ বা একেবারেই পাওয়া যায় না।

খুব অল্পকথায় সম্মোহনবিদ্যার পুরণো ইতিহাসটা বলে নেওয়া যাক। সব বইতে তুমি এসব কথা পড়তে পারো, আর আমিও পুরাতাত্ত্বিক বা ইতিহাসবেত্তা নই। নতুন কথা কিছু বলতে পারবো না। তবুও মনে হয় আলোচনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে গেলে পুরণো ইতিহাস চোখের সামনে থাকা দরকার। তোমার সঙ্গে পত্রালাপের প্রথম দিকে পুরণো কথা কিছু তুলেছিলাম, হয়তো তোমার মনে নেই। থাকলেও ক্ষতি নেই। পুনরুক্তি সব সময় বিরক্তি উৎপাদন করে না।

গ্রীস মিশর চীন ভারত সব পুরণো সভ্যতার আদিপর্বে ধর্মীয় ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে সম্মোহনের প্রয়োগ ও প্রচলন ছিল। খৃস্টপূর্ব চারের শতকে গ্রীসে সম্মোহনচিকিৎসাবিধি চালু ছিল। অথর্ববেদে সম্মোহনের বিশেষ উল্লেখ আছে। গ্রীসদেশে উনিশ শতকের কিছু প্রস্তরে ক্ষোদিত লেখন আবিষ্কৃত হয়েছে। যা থেকে মনে হয় আরো অনেক প্রাচীনকালে চিকিৎসাক্ষেত্রে সম্মোহনের প্রয়োগ ছিল। এই সব লেখনে আছে দুরারোগ্য ব্যাধিমুক্তির সংবাদ এবং ব্যাধিমুক্তির জন্য পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। খৃস্টপূর্ব চারের শতকে এস্কুলিপিয়াসের যুগে চিকিৎসায় যে অভিভাবনের প্রচলন ছিল, এ বিষয়ে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ সংগৃহীত হয়েছে।

মহাভারতে শুধু সম্মোহন বাণই নয়, সম্মোহনের অন্যান্য প্রয়োগের উল্লেখ আছে।

সেই প্রাচীন কালে দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত রোগী অনেক মেহনত করে, কোনো কোনো সময় কয়েকশত মাইল পথ পায়ে হেঁটে, কোনো নামকরা আরোগ্য-নিকেতনের দ্বারপ্রান্তে এসে হাজির হতো, অনেক আশা নিয়ে; এই সব আরোগ্যনিকেতন ছিল ভগবানের বিচরণ বা লীলাক্ষেত্র। আরোগ্যমন্দিরে প্রবেশের আগে রোগীর পক্ষে অনেক কিছু আচার অনুষ্ঠান পালন অপরিহার্য ছিল। আরোগ্যমন্দিরের লোকজনের হাবভাব ব্যবহারে এবং তার আগেই লোকমুখে প্রচারিত অলৌকিক কাহিনী শুনে রোগীর মনে বিশ্বাস ও নিরাময়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। স্বপ্নে সে ঈশ্বরের দেখা পাবে এবং আরোগ্যের ব্যবস্থাপত্র জানতে

পারবে। এই প্রত্যাশা নিয়ে সে সাময়িকভাবে আরোগ্যশালার বাসিন্দা হয়ে দিন কাটাতো। তারপর একরাত্রে রোগের দেবতা দেখা দিতেন এবং রোগ উপশমের ব্যবস্থা হয়ে যেত। প্রাচীনকালের কাহিনী আমাদের সঠিক জানা নেই। জানা নেই, দেবতাদের প্রতিনিধি আরোগ্যশালার পরিচালক দেবতা সেজে এসে অভিভাবনের সাহায্যে রোগ সারাতেন, না রোগী নিজেকে নিজে অভিভাবন দিয়ে রোগমুক্ত হ'ত। দুরকমই ঘটতে পারে। আমাদের দেশে বহু পীঠস্থানে এখনও হাজার হাজার রোগী রোগনিরাময়ের অভিলাষ নিয়ে বিশেষ বিশেষ দিনে সমবেত হয়ে থাকেন। তিরুপতি, তারকেশ্বর ছাড়াও বহুস্থানে জাগ্রত দেবতারা অধিষ্ঠিত। এর ওপর আছেন অনেক যোগী, বাবা, মহারাজ। শিষ্যদের আর্থিক পরমার্থিক সব ব্যাপারের নিয়ন্তা। ইয়োরোপেও এই রকম আরোগ্যনিকেতন যে নেই তা নয়। 'মিরাকল্ অফ্ লুর্ডস'-এর খবর তো তুমি জানো। এসব জায়গায় ঠিক কিভাবে অসুখ সারানো হয়, কি ধরনের রোগী ভাল হয়, আরোগ্যের হার কি রকম, আরোগ্য সাময়িক না স্থায়ী, এসম্পর্কে সঠিক তথ্যপ্রমাণাদির অভাব আছে। 'বিশ্বাসে মিলায়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর',—এই সূত্র প্রয়োগ করলে প্রশ্নের মীমাংসা হবে না। হ্যামলেটের মতো 'দেয়ার আর মেনি থিংগস' -ইত্যাদি আওড়ালেও ব্যাপারটা বোধগম্য হবে না। আমার ধারণা অভিভাবনের প্রভাব ছাড়া এইসব রোগ নিরাময়ের আর কোনো সম্ভাব্য ব্যাখ্যা বর্তমানে খুঁজে পাওয়া যায় না। অভিভাবন কখনও জাগ্রত অবস্থাতে দেওয়া হয়ে থাকে, কখনও বা প্রসাদ-চরণামৃতের সঙ্গে মাদকদ্রব্য খাইয়ে ভক্ত-রোগীদের ঘুম পাড়িয়ে অভিভাবন শোনানো হয়। স্বাভিভাবনের ফলেও কিছু কিছু রোগী আরোগ্যবিধির সন্ধান পেয়ে থাকেন। ভক্ত-রোগীরা অবশ্য বুঝতে পারবেন না যে তাঁরা অভিভাবিত হয়েছেন বা সম্মোহিত হয়েছেন। তাঁরা মনে করেন দেবস্থানের মহিমা এবং পুরোহিত মোহান্তের অসামান্য ঐশী শক্তির প্রভাবে রোগমুক্ত হয়েছেন।

মধ্যযুগে হিপনসিস বা সম্মোহন ডাকিনীযোগিনী বিদ্যার সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে প্রাচীন যুগের মর্যাদা হারিয়ে 'ব্ল্যাক ম্যাজিক' আখ্যা পায়। সম্মোহককে সাধারণ মানুষ ভীতির চোখে দেখতে থাকে। ভাল কিছু হোক না হোক, এদের নজরে পড়লে ক্ষতি হবেই, এই ধারণা মানুষকে পেয়ে বসে। তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্যে দূর থেকেও শত্রুতা সাধন করা যায়, এই বিশ্বাস এখনও অনেকের মনে বিদ্যমান। 'তুক করেছে', 'বাণ মেরেছে',—রোগীদের মুখে এই সব কথা শুনতে আমরা অভ্যস্ত। ইংরিজী শিক্ষিত সমাজে কুচক্রী—স্ভনগেলির তীব্র দৃষ্টিপাত, রুশ কূট-নীতিবিশারদ রাসপুটিনের কর্তৃত্বব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর,—সম্মোহনের সমার্থসূচক। তান্ত্রিক কাপালিক অলৌকিক ক্ষমতা ধারণ করেন ও তাঁদের ক্ষমতার উৎস তাঁদের সম্মোহন শক্তি—এ বিশ্বাস অনেকের মনে আজও বদ্ধমূল।

আধুনিক যুগের আরম্ভ মেসমারের সময় থেকে। আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে (১৭৮৪) মেসমার প্যারির বিজ্ঞানমণ্ডলীর কাছে তাঁর জৈব-চুম্বকতত্ত্ব পেশ করেন। অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি সারানোর ফলে তাঁকে নিয়ে খুব হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। প্রথমে রোগীর গায়ে চুম্বক বসিয়ে, তারপর চুম্বকদণ্ড ছুঁইয়ে তিনি রোগীদের ঘুম পাড়াতেন ও ব্যাধি দূর করতেন। তিনি মনে করেছিলেন যাঁরা গ্রহ উপগ্রহের চৌম্বকশক্তি নিজের মধ্যে গ্রহণ করে বিশেষ আত্মিক বলে বলীয়ান হয়ে ওঠে তারাই জৈব চুম্বকশক্তির প্রভাবে রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা লাভ করে। তাঁর এই জৈব-চুম্বকতত্ত্ব বিজ্ঞানমণ্ডলীর কাছে গ্রাহ্য হয়নি। মেসমারের তত্ত্ব টিকলো না, কিন্তু মেসমেরিজম্-এর রহস্য ও প্রভাব বেড়েই চলল। আঠারশো শতকের মাঝামাঝি সময়ে মেসমার প্রথম চিকিৎসাক্ষেত্রে সম্মোহনের প্রয়োগ করেন। প্রয়োগে নিপুণ হলেও তত্ত্বের দিক থেকে দৈন্যের ফলে প্যারিতে তাঁর প্রতিপত্তি নষ্ট হয় এবং সম্মোহনচিকিৎসার অগ্রগতি ব্যাহত হয়। অবশ্য, অনুভূতি বিলোপের ওষুধ আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত মাঝে মাঝে অস্ত্রোপচারে অবেদন সৃষ্টির জন্যে সম্মোহনের ব্যবহার চলতে থাকে। এরপর একেবারে উনিশ শতকের মাঝামাঝি (১৮৪৩) জেম্‌স্ ব্রেইডের গবেষণার ফলে সম্মোহন আবার চিকিৎসকমহলে আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। স্কটল্যাণ্ডের ডাক্তার জেমস্ ব্রেইড মেসমেরিজমকে আংশিকভাবে রহস্য-যবনিকার বাইরে নিয়ে এলেন। তিনি বললেন—মেসমার প্রভাবিত ঘুমের কারণ চোখের স্নায়ুতন্তুর ক্লান্তি। একদৃষ্টে উজ্জ্বল কোন বস্তুর দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখ আপনা থেকে বন্ধ হয়ে আসে এবং নিদ্রার সঞ্চার হয়। তিনি এই অবস্থার নতুন নামকরণ করলেন—হিপনসিস। 'হিপনস' কথাটির মানেই ঘুম। ঘুমের ব্যাখ্যা দিলেন, কিন্তু সংবেশক ও সংবেশিতের মধ্যে যে বিশেষ সম্পর্কটি গড়ে ওঠে তার সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। আর এই সম্পর্ক নিয়েই ত' যত কিছু রহস্যময় ও অলৌকিক কাহিনীর প্রচার। সংবেশক (যে সম্মোহিত করছে—চিকিৎসক) সংবেশিতকে (যাকে সম্মোহিত করা হয়েছে) কিভাবে প্রভাবিত করে ? সংবেশিত সংবেশকের নির্দেশ মত চলা-ফেরা, কাজকর্ম করে কেন ? সংবেশিতের দেহে নানারকমের পরিবর্তন ঘটে কেন ? সংবেশকের অভিভাবনের ফলে তার বেদনাবোধ চলে যায়, আরও অনেক ধরনের রোগ উপসর্গের উপশম ঘটে। এর কারণ কি ? সংবেশক হাসালে সে হাসে, কাঁদালে সে কাঁদে ; ভুলতে বললে ভোলে, মনে করতে বললে মনে করে। দুজনের মধ্যে এক নতুন ধরনের আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে মনে হয়। একে বলা হয় rapport। ঘুম থেকে জেগে ওঠবার পর সংবেশিত অবস্থার সব কিছুই ভুলে যায়। কি করে এসব ঘটে ? র‍্যাপোর্টের ব্যাখ্যা বা সংবেশিতের রোগ উপসর্গ উপশমের কোন হদিশ গত শতকে পাওয়া গেল না।

এবার চলে আসতে হবে উনিশ শতকের শেষ দশকের ফ্রান্সে। প্যারীতে শার্কো আর ন্যান্সীতে বার্ণহাইমের নেতৃত্বে হিপনসিস নিয়ে তখন চলছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, চিকিৎসা, প্রদর্শনী। তুমুল উত্তেজনাময় বাদপ্রতিবাদ। হিষ্টিরিয়ার উপসর্গের সঙ্গে সম্মোহিতের আপাতসাদৃশ্য দেখে শার্কো বললেন—সম্মোহন মানে তৈরি করা নকল হিষ্টিরিয়া ; যারা সম্মোহিত হয় তারা সবাই নিউরোটিক। (ফেনোমেনা অফ্ হিপনটিজ্ম্ আর এ্যান্ আরটিফিশিয়ালি প্রোডিউস্ড হিষ্টি-রিকাল নিউরোসিস)। অভিভাবনের ব্যাপারটাকে তিনি আমলই দিলেন না। আবার ওদিকে ন্যানসীর বার্ণহাইম বললেন, সম্মোহন অভিভাবনেরই ফলশ্রুতি। সব মানুষই কমবেশী অভিভাবনপ্রবণ এবং সব মানুষকেই সম্মোহিত করা যায়, অবশ্য সম্মোহনঘুমের গভীরতা সকলের সমান নয়। তিনি আরও বললেন, সম্মোহনের পরেও অভিভাবনের ক্রিয়া (পোস্টহিপনটিক সাজেশন) চলতে থাকে। এই দু'জনের শিষ্যসামন্তরা অনেকদিন অবধি তর্কবিতর্ক চালিয়ে গেলেন ; তত্ত্ব বা তথ্য, কোনোদিকেই এঁদের মতৈক্য ঘটলো না। বিশ শতকের প্রথম দিকে সম্মোহন নিয়ে তর্কবিতর্কের স্রোতে কিছুটা ভাঁটা পড়লো। বার্ণহাইমের অভিভাবনতত্ত্ব, শার্কোর হিষ্টিরিয়াতত্ত্বের কোনোটাই প্রতিষ্ঠিত হলো না। আরো অনেক নতুন নতুন থিওরি : যেমন গুরুমস্তিষ্কের অতিউত্তেজনা, অতি-নিস্তেজনা—এই দুটি বিপরীত থিওরি হাজির করলেন যথাক্রমে মেতেল ও জিমসেন। ভেরওর্ন বললেন—সম্মোহন অতি জাগ্রত অবস্থা, আবার বেকটেরেফ (১৯১১) বললেন—স্বাভাবিক ঘুমেরই এক বিচিত্র রকমফের সম্মোহন।

এখনও বাজারে আরো হরেকরকম থিওরি চালু আছে। সবগুলো বিবৃত করে তোমাকে ঘাবড়ে দিতে চাই না। তবে দু'একটার উল্লেখ প্রয়োজন মনে করছি। ফরাসীদেশের মনোবিদ জ্যানেটের বিযঙ্গ বা ডিসোসিয়েশনতত্ত্ব শার্কো-তত্ত্বেরই উন্নত সংস্করণ। মনের অংশ বিশেষ গোটা মন থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে অথবা সক্রিয় হয়ে ব্যক্তিকে পরিচালিত করতে পারে। সম্মোহিত অবস্থার ক্রিয়াকলাপ সামগ্রিক চেতনাস্তর থেকে বিচ্ছিন্ন খণ্ডিত চেতনার নিষ্ক্রিয়তা বা সক্রিয়তার ফল। হিষ্টিরিয়া রোগীর ইন্দ্রিয়বিশেষের নিষ্ক্রিয়তা (যেমন হিষ্টিরিয়া রোগীর অন্ধত্ব) খণ্ডিত চেতনার নিষ্ক্রিয়তার ফল আর স্বপ্নচারিতা (ঘুমের মধ্যে চলাফেরা, কাজকর্ম করা—সোমনামবুলিজম) খণ্ডিত চেতনার সক্রিয়তার নিদর্শন। কি করে ব্যাপারটা ঘটে তার ব্যাখ্যা অবশ্য এ তত্ত্বে নেই, তবুও মনোরোগ চিকিৎসকদের মধ্যে এই তত্ত্ব বেশি চালু। শুধু তাই নয়, গল্প উপন্যাস চলচ্চিত্রে তুমি এই ধরনের বিযঙ্গিত অবস্থার অনেক কাহিনী দেখতে পাবে। এর পরেই উল্লেখ্য ফ্রয়েডীয় সাইকো-এ্যানালিটিক থিওরি। ফ্রয়েড মনে করতেন সম্মোহক-সম্মোহিতের বিশেষ সম্পর্ক, র‍্যাপোর্ট

গড়ে ওঠে পারস্পরিক প্রেমের ফলে। প্রেমে পড়া আর সম্মোহিত হওয়া এক ধরনের ব্যাপার। সম্মোহিত ব্যক্তি শৈশবে ফিরে গিয়ে পিতামাতার উপর বিদ্বেষ ভালবাসা প্রকাশ করতে চায়—তাই সে সম্মোহিত হতে চায়। এদিক দিয়ে সম্মোহন একধরনের রিগ্রেশন বা পেছুহটা। সম্মোহিত অবস্থার বিবরণ এ-তত্ত্বে পাওয়া যায়, সম্মোহিতের সঙ্গে র‍্যাপোর্ট (rapport) সৃষ্টির ব্যাখ্যা মেলে, কিন্তু সম্মোহনের কারণ বা সম্মোহিতের স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়াকলাপের কথা এতে নেই। এই সব তাত্ত্বিকরা মস্তিষ্কবিজ্ঞানের ধার দিয়েও গেলেন না।

এইবার প্রথমে উল্লিখিত পাভলভের ধারণা একটু বিস্তারিত করছি। পাভলভের মতে হিপনসিস আংশিক ঘুম (পারশিয়াল স্লিপ); ঘুম ও জাগরণের পরিবৃত্তিকালীন এক অবস্থা। এই অবস্থায় গুরুমস্তিষ্কের বল্কলকোষগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে, উত্তেজনার মাত্রা হয় সীমিত। ঘুম-জাগরণের এক বিশেষ পর্বে, প্যারাডক্সিক্যাল (স্ববিরোধী) পর্বে, অভিভাবনের শক্তি অনেক গুণ বেড়ে যায়। পশুদের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এই পর্বে এক মাত্রার উদ্দীপক অনেক সময় দশ মাত্রার মত কাজ করে। সাধারণত উদ্দীপকের মাত্রা যে পরিমাণে বাড়ে, পরাবর্তক্রিয়া ঠিক সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। দশ মাত্রার উদ্দীপকে যদি দশ ফোঁটা লালা পড়ে, কুড়ি মাত্রা উদ্দীপকে কুড়ি ফোঁটা, চল্লিশ মাত্রায় চল্লিশ ফোঁটা ইত্যাদি। স্ববিরোধী অবস্থায় দশমাত্রা উদ্দীপকে দেখা যাবে হয়তো একশো ফোঁটা লালা পড়ছে।

চিকিৎসায় আমরা রোগীকে ঘুমের অভিভাবন দিয়ে থাকি, এই অভিভাবিত ঘুম এক ধরনের শর্তাধীন পরাবর্তধর্মী ঘুম। আমরা রোগীর দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্র অর্থাৎ বাক্‌যন্ত্রকে উদ্দীপ্ত করে সম্মোহন-ঘুম আনি; অনেকে প্রথম সাংকেতিক তন্ত্র অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়ের কোনো একটিকে বা একাধিক ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপ্ত করে সম্মোহিত করেন। জাগরণ, সম্মোহন-ঘুম ও স্বাভাবিক ঘুমের মধ্যে মাত্রাগত পার্থক্য এদের গুণগত পার্থক্য নিয়ে আসে। স্বাভাবিক ঘুমের শারীরবৃত্তিক পরিবর্তন সব সময়ে সম্মোহন-ঘুমে পাওয়া যায় না; তাই একদল বৈজ্ঞানিক পাভলভীয় ব্যাখ্যা মানলেও তাঁর সম্মোহনের থিওরী মানতে চান না। তাঁরা পাভলভীয় তত্ত্বের সঙ্গে সম্যক পরিচিতির শ্রমস্বীকারে কুণ্ঠিত। নিস্তেজনার (ইনহিবিশন) বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কিত পাভলভীয়ানদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা খুবই কমসংখ্যক পশ্চিমী গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্রের বিশেষ তাৎপর্য সম্পর্কে মাফির মত জগদ্বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিকও অনীহ। তুমি নিশ্চয়ই কারণ জানতে চাইবে। কারণ একটা নয়, অনেক। প্রথম কারণ বোধহয় গবেষকদের জীবন দর্শন। ‘কার্টেজিয়ান’ ধ্যানধারণা পশ্চিমী সমাজবিজ্ঞানী

মনোবিজ্ঞানীদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। দ্বয়বাদী দার্শনিক তত্ত্ব দ্বারা তাঁরা সকলেই কমবেশি আচ্ছন্ন। উদ্দেশ্যমূলক প্রচারের জোরে 'মেটিরিয়ালিজম্ মনিজম ও বৈজ্ঞানিক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে সমীকৃত করা হয়েছে। বিজ্ঞান অধিকাংশ গবেষকের কাছে শুধুমাত্র গবেষণার বস্তু। অন্তরের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দর্শনকে তাঁরা অনেকেই গ্রহণ করতে পারেননি। রহস্যবাদ, অজ্ঞেয়বাদ, অবচেতনবাদ মনস্তত্ত্বকে, আগেই বলেছি, বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হবার পথে বাধা দিচ্ছে। শেরিংটনের মত সোজাসুজি কেউ আজ আর বলছেন না বটে যে পাভলভের কণ্ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স সাইকোলজিতে বস্তু-বাদের বদ্ গন্ধ আছে, সুতরাং পাভলভীয় মনস্তত্ত্ব অপাঙ্ক্তেয়। তাঁরা অনেক কণ্ডিশন্‌ড রিফ্লেক্সভিত্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালাচ্ছেন, অনেক তথ্য সংগ্রহ করছেন, কিন্তু মস্তিষ্কাশ্রিত মনোবিজ্ঞানের প্রতিফলনতত্ত্বকে এড়িয়ে যাচ্ছেন। এ নিয়ে অনেক লিখেছি, এখানে আবার সেই পুরণো কচকচি তুলে তোমার ধৈর্যের পরীক্ষা নেবার ইচ্ছে নেই। আগেই বলেছি, হাজার হাজার পেপার তৈরী হচ্ছে, হিপনসিসের নানা দিকের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, কিন্তু খুব কম সংখ্যক গবেষণাতেই তুমি মস্তিষ্কভিত্তিক তথ্য বা সামগ্রিক তত্ত্ব অনুসন্ধানের চেষ্টা দেখতে পাবে। আমেরিকার ইণ্টারন্যাশনাল হিপনটিক সোসাইটির মুখপত্রের গ্যাজেটভিত্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলোর খবর পড়লেই আমার কথার তাৎপর্য বুঝতে পারবে।

তুমি তো জানো, ঘুমের ব্যাপ্তি ও গভীরতার রকমফের আছে। গভীর ঘুমের দরুন যে সব শারীরবৃত্তিক পরিবর্তন ঘটে, সেগুলো সম্মোহিত অবস্থায় মেলে না বলে পাভলভের তত্ত্বকে নাকচ করা চলে না। আগেই বলেছি, মনে আছে বোধ হয়,—আর. ই. এম. ঘুম আর জাগ্রত অবস্থার মধ্যে অনেকটা মিল আছে। তাছাড়া পাভলভীয়ানরা এমন অনেক তথ্য পেশ করেছেন যা থেকে বোঝা যায় সম্মোহিত অবস্থাতে অনেকক্ষেত্রে নিদ্রাকালীন শারীরবৃত্তিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। দু একটার কথা উল্লেখ করছি।

ৎসিনকিন (১৯৩০) পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে সম্মোহন-ঘুমের মধ্যে রক্তচাপ আট থেকে পঁচিশ মিলিমিটার পর্যন্ত হ্রাস পায়। তিনি এবং কে. প্লাটানফ স্বাভাবিক ঘুমের মধ্যেও রক্তচাপ কমে—এটাও লক্ষ্য করেছেন। আমরাও এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হয়েছি আমাদের রোগীদের সম্মোহিত অবস্থার অব্যবহিত পরে রক্তচাপ পরীক্ষা করে। প্লাটানফের এবং ৎসিনকিনের উপাত্তসমূহ থেকে আরো জানা যায় যে সম্মোহিত অবস্থায় ধমনী (পাল্‌স্) মিনিটে আট থেকে দশবার কম স্পন্দিত হয়। এটা অবশ্য গভীর সম্মোহন অবস্থার কথা। পাতলা সম্মোহন ঘুমের মধ্যে স্পন্দনের গতিবেগ

কমে, তবে অতটা নয়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের বেলাতেও এঁরা দেখেছেন, ঘুম আর সম্মোহন-ঘুমের মধ্যে একই ধরনের পরিবর্তন ঘটে।*

মজার কথা কি জানো? বিরোধীপক্ষের উপাত্ত উদ্ধৃত করে তোমাকে বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব যে সম্মোহন আদৌ নিদ্রাজাতীয় কোনো ব্যাপারই নয়। এক ডব্লিউ. আর. ওয়েলসেরই 'ওয়েকিং হিপনোসিস'-এর উপর খান তিরিশেক পেপার আছে। লেসলী কুন, স্যালভাটোর রুশো, এরিকসন প্রমুখ মহারথীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিপরীত সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসেবে হাজির করা যায়। স্বভাবতই তোমার মনে প্রশ্ন জাগবে—কাদের তথ্যপ্রমাণ বিশ্বাসযোগ্য? অনেকের মনেই জাগে। ঘুমের অভিভাবন না দিয়ে, অর্থাৎ কেবলমাত্র পঞ্চেন্দ্রিয়ের যে কোনো একটি বা দুটি ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপ্ত করে সম্মোহিত করা যায়। এ থেকে প্রমাণ হয় না যে সম্মোহন মস্তিষ্কের অংশবিশেষের নিস্তেজনাসঞ্জাত অবস্থা নয়। বাচ্চাদের দোল দিয়ে বা পিঠ থাবড়ে মায়েরা ঘুম পাড়িয়ে থাকেন তুমি জানো, সকলেই জানে। লেসলী কুন কিন্তু একজায়গায় এই কথাই লিখেছেন যে ঘুমের কথা না বলেও যেহেতু ব্যক্তিকে সম্মোহিত করা যায়, সেহেতু ঘুম আর সম্মোহন সম্পূর্ণ আলাদা অবস্থা। এই বক্তব্যে যুক্তি নেই। উপাত্তগুলোর বৈসাদৃশ্য নিয়ে চিন্তা করে আমি এই ধারণায় এসেছি যে, হিপনসিসের গভীরতার কমবেশীর সঙ্গে রক্তচাপ, নাড়ীর গতি, শ্বাসপ্রশ্বাসের হ্রাসবৃদ্ধি সম্পর্কিত। বিভিন্ন অবস্থায় উপাত্ত সংগ্রহের ফল বোধ হয় এই বৈসাদৃশ্য। তাছাড়া আর একটা কথাও চিন্তা করবার আছে। ঘুমের অভিভাবনের দ্বারা সম্মোহিত করার ফলে ঘুমের মধ্যেকার শারীরবৃত্তিক পরিবর্তন পাভলভীয়ানদের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বেশী পাওয়া যাচ্ছে—এ অনুমান করা যায় কি? কিন্তু ঘুমের মধ্যে কি কি পরিবর্তন ঘটে তা সব সম্মোহিত ব্যক্তি জানেন কি? তোমার রক্তচাপ কমবে, নাড়ীর গতি শ্লথ হবে; —এই রকম অভিভাবন না দিয়েও তো দেখা গেছে রক্তচাপ, নাড়ীর গতি ইত্যাদি হ্রাস পেয়েছে। ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে, তাই না? থাক, তাত্ত্বিক

---

* প্লাটানফ লিখেছেন: 'Thus, on the basis of rather large number of observations, conducted by us in association with A. Tsinkin, we can assume that in suggested sleep (hypnosis)—the pulse rate and respiration, as a rule, slow down; moreover, in most cases respiration not only grows weaker but also more rythmic, i. e., it evens out, while the blood pressure under these conditions, as a rule, drops' (Platanov; The Word as a Physiological and Therapeutic Factor: 1959, Moscow; p. 59)

আলোচনা বর্তমানে স্থগিত রেখে রোগচিকিৎসায় হিপনসিসের প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করা যাক। শুধু মনে রেখো যে, ঘুমের রকমফের, গভীরতার হ্রাসবৃদ্ধি সর্বজনস্বীকৃত। একই রাতের ঘুমের মধ্যে কয়েকটি পর্ব আছে। তেমনি আবার জাগ্রত থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় অতিক্রমণের কয়েকটি পর্ব আছে। 'ইনহিবিশন', মানে নিস্তেজনার, বিশেষ করে transmarginal inhibition-এর স্বরূপ বুঝতে না চাওয়ার জন্যই পাভলভের হিপনসিসতত্ত্ব বিরোধীরা গ্রহণ করতে পারছেন না। জাগ্রত অবস্থায় যেমন মস্তিষ্কের সব জায়গাগুলো জাগ্রত থাকে না, ঘুমন্ত অবস্থাতেও তেমনি সব জায়গাগুলো ঘুমিয়ে পড়ে না। হিপনসিস এমনি ধরনের একটা আংশিক ঘুমন্ত অবস্থা : নিদ্রাজাগরণের অন্তর্বর্তী একটা পরিবৃত্তিকালীন অবস্থা।

চিকিৎসায় সম্মোহনের প্রয়োগের অভিজ্ঞতা আমাদের কম দিনের নয়। তুমি জানো ১৯৫০ থেকে আমরা নানাধরনের রোগে সম্মোহনের প্রয়োগ করে আসছি। তখন সম্মোহন এদেশে অপাঙ্‌ক্তেয়, বৃটিশ ও আমেরিকান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন কর্তৃক অবাঞ্ছিত। এ যাবৎ অন্তত ৩০/৩৫ হাজার বার রোগীদের ঘুমে অভিভাবন দিয়ে আমরা সম্মোহিত করেছি। তারপর দিয়েছি আরোগ্যের অভিভাবন। আরোগ্যের অভিভাবনের বেলায়, রোগের উপসর্গ দূর করার থেকে রোগের মূল কারণ দূর করার দিকে নজর দিয়েছি বেশী। নিউরোসিসের ক্ষেত্রে সামাজিক দ্বন্দ্ব বিরোধের প্রতিফলন দেখেছি রোগীর মনে। অস্বাস্থ্যকর সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে উচ্চমস্তিষ্কের কার্মিক বিশৃংখলার এবং উচ্চ ও নিম্নমস্তিষ্কের সম্পর্কের বিচ্যুতি ঘটে। কিন্তু হায়! পরিবেশ পরিবর্তন করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমরা সমাজের নিয়ন্ত্রক নই।

রোগের মূল কারণ যদি সামাজিক দ্বন্দ্ববিরোধ, অসাম্য, শোষণ, বঞ্চনা, বিষম প্রতিযোগিতা হয়; তবে মূল কারণ দূর করার চেষ্টা করি কিভাবে? এ প্রশ্ন তুমি নিশ্চয়ই করতে পারো। সম্মোহন অভিভাবনের সাহায্যে সমাজকে তো বদলানো যায় না। তুমি আরও অনেক প্রশ্ন তুলেছ। আমরা কি তবে ব্যক্তিকে বদলে তাকে যেমন তেমন করে এই সমাজের ছকে বাঁধা নিয়মকানুনের দাস করতে চাই? অথবা বিকৃত সমাজের প্রতিটি বিকারগ্রস্তকে সুস্থ করে তুলে এই সমাজের পরিবর্তন ঘটাতে চাই? না, এর কোনোটাই আমাদের অভিপ্রেত নয়। তবে কি আমরা আমূল সামাজিক পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবো, নতুন সমাজের জন্মের আশায় দিন গুণতে থাকবো? আমরা কি আশা করবো যে শোষণহীন, বিষম প্রতিযোগিতাহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলেই মনের রোগ, বিশেষ করে নিউরোসিসের আর সম্ভাবনা থাকবে না এবং আজকে যারা অসুস্থ আছে, তারা আপনা থেকে ভালো হয়ে যাবে। তোমার এই সব প্রশ্ন সম্মোহন প্রসঙ্গে অবান্তর

হলেও, এদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। না, এধরনের উদ্ভট ইউটোপীয় কল্পনা আমরা পোষণ করি না। অবাস্তব মনে হলেও, তোমার প্রশ্নগুলোকে এড়িয়ে যেতে পারছি না। দু'এক কথায় উত্তর দিচ্ছি, বারান্তরে বিশদভাবে বলবার চেষ্টা করব।

সম্মোহন চিকিৎসায় অঘটন ঘটানো যায় না। সমাজে পরিবর্তন তো দূরের কথা, রোগীর মস্তিষ্কের টাইপও আমরা বদলাতে পারি না। পাভলভ-অনুগামীদের মতে মস্তিষ্কের টাইপ (কোলেরিক, স্যানগুইনাস, ফ্লেগম্যাটিক মেলানকলিক) অনুযায়ী নিউরোসিসের টাইপ মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট। প্রত্যেকটি ব্যক্তি-মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের গঠন স্বতন্ত্র ও তার সহ্যক্ষমতা সাধারণভাবে সীমিত। বাইরের জগৎ বা অন্তরজগৎ থেকে আসা শর্তাধীন বা শর্তহীন উদ্দীপকের শক্তির মাত্রা যদি ব্যক্তির সহ্যসীমার থেকে বেশী হয় তবেই ব্যক্তি রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। গুরুমস্তিষ্কের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সংহতি থাকে না, গুরুমস্তিষ্ক-লঘুমস্তিষ্কের প্রভাব-প্রতিপ্রভাবের মধ্যে অসঙ্গতি ঘটে। মানুষের বেলায় তার দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্র ও প্রথম সাংকেতিকতন্ত্রের সম্পর্কেও বিশৃংখলা দেখা যায়। খুব সংক্ষেপে বলা চলে যে, মস্তিষ্ককোষের মৌলিক তিনটি ধর্মের যে কোনো একটির অতিপীড়ন ঘটলেই নিউরোসিস হতে পারে। এই তিনটি ধর্ম কি—তা তুমি নিশ্চয়ই জানো। তবুও আর একবার মনে করিয়ে দিতে চাই। উত্তেজনা, নিস্তেজনা আর গতিময়তা (excitation, inhibition and mobility) সব মস্তিষ্ক কোষেরই স্বাভাবিক মৌলিক ধর্ম।

সম্মোহন চিকিৎসায় কিভাবে রোগের উপশম বা নিরাময় ঘটে? নিউরোসিসে মস্তিষ্কের পরিবর্তন ঘটে অতিপীড়নের ফলে। এই অতিপীড়নের উৎস মূলত রোগীর সামাজিক পরিবেশে। একই ক্ষতিকর পরিবেশে একজন রোগগ্রস্ত হয়, একজন হয় না। স্নায়ুতন্ত্রে সহ্যশক্তির, (যার কিছুটা অন্তত জন্মগত) তারতম্যের উপর সুস্থ-অসুস্থতা নির্ভরশীল। সম্মোহন-অভিভাবনের ফলে সহ্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কিভাবে? পাভলভের মতে অতিনমনীয়তা ও পরিবর্তনশীলতা ও উচ্চমস্তিষ্ক প্রক্রিয়ার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।*

---

* "Most important, strongest and constant impression from the study of higher nervous activity is the extra-ordinary plasticity of this activity, its enormous potentialities: nothing remains immovable, everything can be attained and changed for the best, provided the corresponding conditions are on hand." [I. P. Pavlov : Twenty Years of Objective Study, (Rus) 1951 ; p. 364]

অসুস্থ ও ক্ষতিকর পরাবর্তের পরিবর্তে সুস্থ পরাবর্ত অতি সহজেই সম্মোহন-অভিভাবনের সাহায্যে গঠন করা সম্ভব। সুস্থ সংগঠিত পরাবর্ত মস্তিষ্ক-কোষের দৃঢ়তা বাড়িয়ে অতিপীড়নকে অনেকাংশে সহনীয় করে তুলতে পারে। আমরা জানি, গুরুমস্তিষ্ক ও তন্তুজালের (cerebral cortex and reticular formation) অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের ওপর প্রাণীর জৈবিকক্রিয়া থেকে শুরু করে সবরকম কার্যকলাপ নির্ভরশীল। গুরুমস্তিষ্ক, এককথায় বলতে গেলে, প্রাণীর সবরকম ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রক। আবার মানুষের বেলায় বাকতন্ত্র (দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্র), তার চিন্তাভাবনা ধ্যানধারণা—তার অন্তরজগতের স্রষ্টা এবং স্নায়ুতন্ত্রের এই মানবিক এবং বিশিষ্ট সংযোজন গোটা মস্তিষ্ক এবং মনোজগতের নিয়ামক। কথা দিয়ে মানুষকে হাসানো যায়, কাঁদানো যায়! উৎসাহিত বা বিষাদগ্রস্ত করার ব্যাপারে কথার প্রভাব অপরিসীম। রোগ সারানোর ব্যাপারে কথার ভূমিকা নগণ্য নয়। এই কথা যখন বিশ্বস্ত কোনো ব্যক্তির মুখ থেকে আশার বাণী হিসেবে বেরিয়ে আসে, তখন হতাশাগ্রস্ত রোগীর মনে সদর্থক প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সদর্থক প্রক্ষোভ অন্তরগ্রন্থিকে উদ্দীপ্ত করে শুধু মনের কেন, দেহের রোগকেও অনেক সময় আরোগ্যের পথে নিয়ে যেতে পারে। সুযোগ্য চিকিৎসকের অভিভাবনে সম্মোহন ছাড়াই আরোগ্যের পথ প্রশস্ত হয়। সম্মোহন-অভিভাবন এই রোগনিরাময়ের প্রক্রিয়াকে আরো দ্রুত, আরো শক্তিশালী, আরো সুসংগঠিত করে তোলে। সম্মোহন-ঘুমে মস্তিষ্কের বেশির ভাগ অংশ থাকে নিস্তেজিত, কেবলমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ কেন্দ্রের একটি অংশ বেশি সজাগ থাকার ফলে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষিত হয়। এই বেশি সজাগ অংশটিকে বলা হয় Rapport Zone। চিকিৎসকের সঙ্গে এই যোগসূত্র স্থাপিত ও সংরক্ষিত না হলে, সম্মোহন-অভিভাবনে অভীষ্ট ফললাভ করা যায় না। এই সময় মস্তিষ্ক দুটো অংশে ভাগ হয়ে যায়। একটি অতি-জাগ্রত অংশ, যা অভিভাবন গ্রহণ করতে সমুৎসুক ; অন্যটি নিস্তেজিত অংশ, যার ফলে হাত-পা ভারী, সর্বাঙ্গ শিথিল, শ্বাসপ্রশ্বাস শ্লথ। অভিভাবন জাগ্রত অংশটিকে উত্তেজিত করে, মস্তিষ্কের নিজস্ব ধর্মানুযায়ী আশেপাশের অংশে ঘটে আরো নিস্তেজনা, ফলে সেই অংশ হয়ে পড়ে আরো নিষ্ক্রিয় (induced inhibition); এবং বিরোধী কোনো চিন্তাভাবনা ধারণা তখন আর ক্রিয়া করে না। ফলে অভিভাবনের ক্রিয়া অপ্রতিহতভাবে চলতে থাকে। এছাড়া ঘুম-জাগরণের অন্তর্বর্তী স্ববিরোধী (paradoxical phase) পর্বে অভিভাবনের মত দুর্বল উদ্দীপক সব থেকে জোরালো মাত্রার পরাবর্ত বা effect সৃষ্টি করতে সক্ষম। পাভলভ-অনুগামীদের বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলে গৃহীত। এই হোলো সম্মোহন-অভিভাবনের রোগ উপশম বা রোগনিরাময়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। রহস্যবাদ, চুম্বকবাদ বা অবচেতনবাদ

আমদানি না করেই ব্যাখ্যা করা যায়। সম্মোহন সম্পর্কে অনেক মনস্তাত্ত্বিক এখনও ধোঁয়াটে ধারণা পোষণ করেন, ফ্রয়েডের মেটাসাইকোলজি দ্বারা তাঁরা প্রভাবিত। অবচেতন মনকে নাকি সম্মোহন প্রভাবিত করে। কিভাবে করে ও অবচেতন মনের অধিষ্ঠান ঠিক কোন জায়গায়—তা কিন্তু স্পষ্টভাবে তাঁরা বলেন না।

চিকিৎসা দ্বারা আমরা সমাজ বদলাচ্ছি না, কিন্তু রোগীর সহ্যক্ষমতা, মনোবল, সাহস ইত্যাদি বাড়িয়ে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে তাকে সংগ্রাম করে টিকে থাকতে এবং সম্ভব হলে সমাজ পরিবর্তনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করি।

চিকিৎসায় সম্মোহন-অভিভাবনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে নিশ্চয়ই কিন্তু আমরা কম গুরুত্ব আরোপ করি না 'এডুকেটিভ্ থেরাপি' বা রোগ দেহ মন ইত্যাদি সম্পর্কিত পাভলভীয় শিক্ষার ওপর। রোগীর জানা দরকার তার রোগের কারণ, তার উপসর্গের তাৎপর্য। উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ভয়ের ফলে শারীরবৃত্তিক পরিবর্তনের ও উদ্বেগ ভয়ের উৎস জানতে পারলে রোগীর মস্তিষ্কের পীড়ন অনেকটা কমে। স্নায়ুতন্ত্রের গঠনবিন্যাস, গুরুমস্তিষ্কের ভূমিকা ও দৈহিক ক্রিয়াকলাপের ওপর তার প্রভাব বুঝিয়ে দেওয়ার ফলে নিজের উপসর্গ সম্পর্কিত আজগুবি ধারণা বদলায় এবং আনুষঙ্গিক ভীতিও কমতে থাকে। তারপর প্রয়োজন হয় রোগীর নিজস্ব পারিবারিক ও কর্মস্থানিক পরিবেশের আলোচনা। এই আলোচনা প্রসঙ্গে সমাজের স্তরবিন্যাস, শ্রেণীসংস্থান, আন্তর্মানবিক সম্পর্ক ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় এসে পড়ে। বিশেষ ধরনের কাজে নিযুক্ত রোগীর সঙ্গে তার পেশা বা কাজের সামাজিক মূল্যবিচারেরও প্রয়োজন হয়। ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কের বিশ্লেষণে চিকিৎসক বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। বিষম প্রতিযোগিতার ও বঞ্চনাভিত্তিক অবক্ষয়ী সমাজব্যবস্থার ইতিবাচক দিকগুলোর উপর আলোকপাত করে অনেক বিষাদগ্রস্ত, সিনিক, সন্দেহ-প্রবণ রোগীর মানসিকতার পরিবর্তন আনা যায়।

এই বিশ্লেষণ-আলোচনার সারমর্ম সম্মোহন অভিভাবনের সাহায্যে রোগীর মস্তিষ্কে ঠিকমত পৌঁছে দিতে না পারলে পরিবেশের নঞর্থক উদ্দীপকগুলো আবার তাকে অসুস্থ করে তুলতে পারে। ব্যাপারটি সময়সাপেক্ষ। সব রোগী চিকিৎসার জন্য অতটা সময়ক্ষেপ করতে পারে না, অথবা চায় না।

নিউরোসিস ছাড়াও নানা ধরনের রোগের ওপর সম্মোহন-অভিভাবনের ফলাফল পরীক্ষা করা হয়েছে। আপাতত জেনে রাখো, এ্যাজমা, কোলাইটিস, স্ট্যামারিং, ইম্‌পোটেন্সি, ফ্রিজিডিটি ও হাইপোকনড্রিয়া,—মস্তিষ্ক-আন্তর্যান্ত্রিক পরাবর্ত বিশৃংখলায় (যাকে সাইকোসোমাটিক বলা হয়) ভাল ফল পাওয়া গেছে।

উন্মাদরোগের মধ্যে প্যারানইয়া, স্কিজোফ্রিনিয়াতে সম্মোহন-অভিভাবনের প্রয়োগ করা হচ্ছে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ওষুধও দিতে হয়েছে। বেদনারহিত সন্তানপ্রসবেও এর প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়। সাহায্যকারী চিকিৎসা হিসাবে সব রোগেই সম্মোহন-অভিভাবনের প্রয়োগ করা চলতে পারে। সম্মোহককে কোনো বিশেষ ধরনের মানসিক বা আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হতে হয় না। কয়েক মাসের প্রশিক্ষণের ফলে যে কোনো চিকিৎসক সম্মোহন পদ্ধতি আয়ত্ত করতে পারেন।

তোমার সম্মোহন-সম্পর্কিত অতি-উৎসাহে আমি কিন্তু চিন্তিত। আজকাল নানাদেশে ভূতপ্রেত জাতিস্মরতা নিয়ে সম্মোহন সাহায্যে নতুন করে গবেষণার ধুম পড়ে গেছে। অনেকবছর পরে 'স্পিরিচুয়ালিজম' 'প্যারাসাইকোলজি' নাম নিয়ে বিজ্ঞানের জগতে পুনঃপ্রবেশের চেষ্টা করছে। তুমি ঐ ধরনের কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিবরণ ছাপিয়ে রাতারাতি বিখ্যাত হতে চাও নাকি ?

* * *

তোমার ঔৎসুক্য মেটাতে গিয়ে আমরা যে ক্রমশ দেউলে হয়ে যাচ্ছি। ঘুম স্বপ্ন স্মৃতিতত্ত্ব থেকে সম্মোহনে পৌঁছুতে আমাদের যে সময় লেগেছে, সেই সময়ের মধ্যে পায়ে হেঁটে গোটা ভারত টহল দিতে পারতাম। ভেবেছিলাম সম্মোহন-প্রসঙ্গে সব কথাই বুঝি বলা হয়েছে। এখন কয়েক সপ্তাহ অন্তত বিশ্রাম নিতে পারবো। কিন্তু তোমার নতুন প্রশ্নপত্র পেয়ে আবার কলম নিয়ে বসতে হলো। দেখি, এই চিঠিতে সব কিছু বলে 'সম্মোহন প্রসঙ্গে'র ইতি টানতে পারি কি না !

'গণ-মাধ্যম' সম্পর্কে তোমার কৌতূহল আমি স্বাভাবিক বলেই ধরে নিয়েছি। এ নিয়ে অনেক কিছু লেখা হয়েছে। তাঁদের বইগুলো উলটেপালটে দেখলাম। ঐ প্রসঙ্গে গণ-সম্মোহনের গণ-হিষ্টিরিয়ার পরোক্ষ উল্লেখ থাকলেও, বিশদ আলোচনা কোথাও খুঁজে পেলাম না। তোমার কৌতূহল ঐসব লেখক মেটাতে পারবেন বলে মনে হল না। কাজেই অনেকটা বাধ্য হয়ে, বেশ খানিকটা ভাবনাচিন্তা করে, তোমার প্রশ্নপত্রের উত্তর দিতে বসেছি। তোমার সব প্রশ্নের উত্তর হয়তো দিতে পারবো না, তবে চেষ্টা করবো। শুরু করছি এবার গণহিষ্টিরিয়ার ইতিবৃত্ত থেকে।

প্রাচীনকালের পুঁথিপত্রে হিষ্টিরিয়ার উল্লেখ প্রচুর পাবে। হিপোক্রেটিসের অনেক আগেই হিষ্টিরিয়া ও মৃগী রোগের বৈশিষ্ট্য মানুষের জানা ছিল। অবশ্য সাধারণের কাছে এ দুটি রোগের মধ্যে কোন তফাৎ ছিল না। মৃগী ও হিষ্টিরিয়ার

তাড়ানো বা ঈশ্বরের স্তবস্তুতি নাচগান •হৈ-হুল্লোড়ের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না।

গণহিষ্টিরিয়ার আদি ইতিবৃত্তের সঙ্গে গণসম্মোহন ও গণমাধ্যমের দু'চার কথা শুনলে। গণহিষ্টিরিয়ার কথা মহাভারতের মৌষলপর্বে যাদবদের আত্মহননের বৃত্তান্তে বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে। অন্ধক, ভোজ, বৃষ্ণি ও কুকুর—এই চারিটি কৌমগোষ্ঠী বৃষ্ণিবংশের কৃষ্ণের নেতৃত্বে নতুনভাবে ধর্মসম্প্রদায়রূপে সংগঠিত হয়েছিল। 'কৃষ্ণ-কাল্টের' শেষ পর্বেও কৌমবন্ধন পুরোপুরি শিথিল হয়নি। প্রভাসতীর্থে প্রচুর মদ্যপান করে যাদবগণ উন্মাদ হয়ে উঠলেন, কৌমপ্রীতি জেগে উঠলো, ধর্মভ্রাতাদের মধ্যে হত্যালীলা অনুষ্ঠিত হলো। এর আগেও যাদবগণ প্রভাসতীর্থে নিশ্চয় এসেছেন, সুরাপান করে হিষ্টিরিক আচরণও করেছেন, তখন হয়তো কৃষ্ণ গণ-সম্মোহনের সাহায্যে তাদের হিষ্টিরিয়া আরোগ্য করে ধর্মসাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃত্ববোধ দৃঢ় করার প্রয়াস পেয়েছেন। কৃষ্ণের যে সম্মোহনের ক্ষমতা ছিল তার নিদর্শন অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখানোর মধ্যে পাওয়া যায়। গণসম্মোহনের সাহায্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি সূর্যাস্তের আগেই দুপক্ষের হাজার হাজার যোদ্ধাকে অভিভূত করে, সূর্যাস্ত হয়েছে এই ধারণার দ্বারা অভিভাবিত করেছিলেন। ফলে অর্জুন জয়দ্রথ বধ করে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন ও পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিতে পেরেছিলেন। মহাভারতের যুগে কৌমসমাজ ভেঙ্গে ধর্মীয় সমাজ গড়ে উঠেছিলো। তার দ্বন্দ্ব সংঘাত নিঃসন্দেহে সমসাময়িক মানুষকে প্রভাবিত করেছিলো। 'করিবাণ্টেস'দের মত তখন গুপ্ত ধর্মসম্প্রদায়ও ছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ যদিও দুর্লভ। গণহিষ্টিরিয়ার উপযুক্ত পরিবেশ তখন বিদ্যমান ছিল,—একথা অবশ্য অনুমানের উপর নির্ভর করে বলতে হয়। তবে একথা বোধ হয় ইতিহাসসম্মত যে গণহিষ্টিরিয়ার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের সময়। বৌদ্ধধর্মের প্রকাশ্য প্রভাব লোপ পেয়েছে, কিন্তু গোপনে গোপনে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম, নাথধর্ম, কৌলধর্ম, তন্ত্রাচার রীতিমত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তন্ত্রমতাবলম্বী কুলাচারী হিন্দু ও সহজিয়া বৌদ্ধগণ নানাস্থানে দল বেঁধে যে ধরনের ধর্মানুষ্ঠান করতেন তার সঙ্গে গ্রীস দেশের 'ম্যাজিকো-মেডিক্যাল' গুপ্ত সমিতির আচার অনুষ্ঠানের অনেকাংশে মিল ছিল। সমাজের উচ্চবর্ণ রঘুনন্দনের স্মৃতি ও নব্যন্যায় নিয়ে মেতে থাকতেন, নিম্নবর্ণের মধ্যে প্রচলিত ছিল 'orgiastic' (উন্মাদনাময়) ক্রিয়াকর্ম। এদের ধর্ম, রাজধর্ম ইসলাম ও উচ্চবর্ণের হিন্দুধর্মের মধ্যে সংঘাত লেগেই ছিলো। ধর্মান্তরণও ঘটছিলো। এই ধর্মান্তরণ নিঃসন্দেহে জনসাধারণের মধ্যে তীব্র মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিলো। এ সবই গণহিষ্টিরিয়ার উপযোগী পরিবেশ। এই সময়ে শ্রীচৈতন্যের প্রবর্তিত প্রেমধর্ম নিম্নশ্রেণীর অধিকাংশের মধ্যে নিয়ে আসে মানসিক প্লাবন। গোপনে যাঁরা

নানাভাবে ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উন্মাদনার আনন্দ পাচ্ছিলেন, তাঁরা প্রকাশ্যে বেরিয়ে এসে নামসংকীর্তনের সাহায্যে নিরুদ্ধ ভাবাবেগ, বিশেষ করে তাঁদের ভয় ও বৈরীভাবের নিরসন করার ফলে নিরাপত্তা বোধ ফিরে পেলেন। নামসংকীর্তন করতে করতে অশ্রুবিগলিত হওয়া, ভাবাবেগে চেতনা হারানো—হিষ্টিরিয়ারই অভিব্যক্তি। এই প্রেমধর্ম একদিকে গণহিষ্টিরিয়া সৃষ্টি করে ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলিকে এক বৃহৎ ধর্মসম্প্রদায়ের অঙ্গীভূত করে একভাব একাচরণ গ্রহণে প্রবৃত্ত করেছিল; অন্যদিকে তাদের গোপনীয়, অনেকক্ষেত্রে অসামাজিক হিষ্টিরিয়াধর্মী অনুষ্ঠান বন্ধ করেছিল। 'ডায়োনিসিয়ান কাণ্ট'-এর সঙ্গে এই 'ambivalence'-এর তুলনা করা চলে।*

গণহিষ্টিরিয়া কি এক ধরনের সামাজিক রোগ না এক পরিবৃত্তিকালীন পরিস্থিতি, যার প্রভাবে আবিষ্ট জনতার আত্মপ্রকাশ ঘটে বিদ্রোহ-প্রচেষ্টায়? ব্যক্তি-হিষ্টিরিয়ার আধিক্য দেখা যায় সাধারণত অশিক্ষিত ও আদিমসভ্যতার আওতায় বেড়ে ওঠা মানুষের মধ্যে। তার কারণ কিন্তু এ নয় যে, পরিবেশের সঙ্গে তাদের বিরোধ সভ্য মানুষের থেকে বেশি। তাদের মস্তিষ্কের কোষের 'ইলাসটিসিটি' (elasticity) কম এবং তাদের আবেগপ্রবণতা বেশি। যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে তারা কোনো ব্যাপারকে তলিয়ে দেখে না, পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে সব কিছুকে গ্রহণ করে। আজকের সভ্য মানুষের মধ্যে ব্যক্তি-হিষ্টিরিয়ার প্রকোপ কমেছে, গণহিষ্টিরিয়ার প্রকোপ, কিন্তু বিশেষ বিশেষ সামাজিক পরিবেশে, আগের মতই আছে। অনেকগুলো মানুষ, (বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্ত্রীলোক) আপনা থেকে এক সঙ্গে হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে উন্মাদের মত আচরণ করছে—আজকাল হয়তো এ রকমটি ঘটে না। প্রাচীন গ্রীসে এ ধরনের ঘটনা হামেশাই ঘটতো। এমনকি পঞ্চাশ ষাট বছর আগেও মালয় দেশে গণহিষ্টিরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে দলে দলে মেয়েরা নিজেদের ঘর ছেড়ে গান গাইতে গাইতে বনে জঙ্গলে গিয়ে কয়েক রাত কাটিয়ে আসতো। প্রথমে একজন এই রোগে আক্রান্ত হতো, তারপর দল বেঁধে সকলে তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতো। এখন ঠিক এ-ধরনের ঘটনার কথা শোনা যায় না। তবে স্বতঃউৎসারিত গণহিষ্টিরিয়ার এক-আধটা ক্ষুদ্র সংস্করণ একালেও মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। কয়েক বছর আগে এই কোলকাতা শহরে

---

* "As Dionysos Bakcheios, he induced hysteria in his worshippers, who, being possessed by him, called themselves by his name, becoming ba´kchoi or la´kchai; as Dionysos Lysios, he withdrew from them and so restored them to their right mind." (ibid, p. 354)

'ঝিনঝিনিয়া' নামে এক ব্যাধির আবির্ভাবের কথা অনেকের হয়তো মনে আছে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক লোক এই হঠাৎ-কাঁপুনি রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। চারদিকে হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল। হাসপাতালের নামজাদা চিকিৎসকরা সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েছিলেন এই মর্মে যে, এটা কোনো মারাত্মক রোগ নয়, এতে মানুষ মরে না, রোগাক্রান্তকে হাসপাতালে পাঠাবার দরকার নেই। কয়েক বালতি জল মাথায় ঢাললেই রোগ ছেড়ে যাবে। দু'চারদিনের মধ্যেই 'ঝিনঝিনিয়া'র কথা আর শোনা যায়নি। এই 'ঝিনঝিনিয়া' হিষ্টিরিয়া ছাড়া আর কি হতে পারে? কিছুদিন আগে মুর্শিদাবাদ জেলার অনেকটা এলাকা জুড়ে এই ধরনের রোগের কথা শোনা গিয়েছিল।

গণহিষ্টিরিয়া সৃষ্টি এখনও করা যায়, করা হয়ে থাকে। গণহিষ্টিরিয়ার সৃষ্টির কয়েকটি প্রয়োজনীয় শর্ত আছে। প্রাথমিক এবং অতি-আবশ্যক সামাজিক শর্তের কথা আগেই বলেছি। দ্বিতীয় শর্ত গণসম্মোহন সৃষ্টি করার মত শক্তিশালী 'জাদু-চিকিৎসক' বা দলনেতা। তৃতীয় শর্ত উপযুক্ত মাধ্যম। তিরিশের দশকের জার্মানীর কথা একবার স্মরণ কর। জাদু-চিকিৎসক হিটলারের নামে জনসমাবেশ ঘটেছে। জনতার কাছে হিটলারের বাণী বা সমাবেশের আহ্বান পাঠাবার প্রধান মাধ্যম সংবাদপত্র, রেডিও; সাহায্যকারী মাধ্যম 'ব্রাউনসার্ট' বা স্কাউটদের স্কোয়াড। মহতী সভায় মহান নেতার ডাকে কয়েক হাজার মানুষ এক জায়গায় জমায়েত হয়েছে। দেশের সমস্যা সমাধানের অমোঘ নির্দেশ আসবে ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন নেতার মুখ থেকে। অধ্যাপক, লেখক, কেরানী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, স্বল্পবুদ্ধি ইত্যাদি সব রকমের মানুষের ভিড়। ঠিক যেন গ্রীসের ডেলফি বা ভারতের ভবানীমন্দিরের চত্বরে জমায়েত হয়েছে পুরণো দিনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সরলবুদ্ধি মানুষ দৈববাণী বা প্রত্যাদেশ শুনতে। শ্রোতারা আগে থেকেই আংশিকভাবে সম্মোহিত। তাদের অভিভাবনের সাহায্যে হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত করে তখনকার মত যে কোনো হঠকারী কাজে প্রবৃত্ত করানো যায়। অথবা ভবিষ্যতের কোনো বৃহত্তর নাটকের অভিনয়ের জন্য এই হাজার হাজার অভিনেতাকে মহড়া দিয়ে প্রস্তুত রাখা চলে।

তুমি নিশ্চয়ই প্রশ্ন তুলবে—ইহুদী বিতাড়ন ও আর্যশোণিতের বিশুদ্ধতা রক্ষা করলে জাতির মুক্তি ও উন্নতি ঘটবে—এ ধরনের ধোঁকাবাজিতে অশিক্ষিত অর্বাচীন না হয় প্রভাবিত হতে পারে, কিন্তু উচ্চশিক্ষিত বৈজ্ঞানিক দার্শনিক চিন্তাবিদরা কেন নাৎসী প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে অযৌক্তিক তত্ত্বকে মেনে নেবে? বর্বরের মত আচরণ করবে?

তোমার প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে, তোমাকে crowd-psychology বা গণমনস্তত্ত্ব বুঝতে হবে, group ও crowd-এর পার্থক্য জানতে হবে। এই

সম্পর্কে প্রথমে এ্যালডু হাক্‌সলীর মতামত শোনো।*

এ্যালডু হাক্‌সলীর এই বক্তব্য অবশ্য অংশত সত্য। কোনো উঁচু দরের আদর্শ-অনুপ্রাণিত না হয়ে যদি অনেক লোক কেবলমাত্র আতঙ্ক বা নিরাপত্তা-হীনতার তাড়নায় একত্র মিলিত হয়, তবে নিঃসন্দেহে তাদের বুদ্ধ্যঙ্কের গড় নিম্নতম মাত্রায় গিয়ে দাঁড়ায়। কূটতার্কিক বিজ্ঞানী, যুক্তিবাদী দার্শনিক, মানবদরদী চিন্তাবিদ্-এর যুক্তিবুদ্ধি অশিক্ষিত অমার্জিত অসামাজিক লুম্পেনদের সমমাত্রিক হয়ে যায়। সব মানুষ মাঝে মাঝে যুক্তিবুদ্ধির হাত থেকে মুক্তি পেয়ে প্রক্ষোভস্রোতে গা ভাসিয়ে কিছুটা সময়ের জন্য ছুটি পেতে চায়। সীমিত ব্যক্তিত্ব ও ক্ষুদ্র অহং-এর বন্ধন মুক্ত হয়ে লক্ষ মানুষের আসুরিক শক্তির সঙ্গে একাত্মীভূত ক্ষমতার মদ পান করবার আকাঙ্ক্ষা তাদের মধ্যে জেগে ওঠে। আজকের দিনের শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বুদ্ধিমান, নির্বুদ্ধি সকলের মধ্যেই তাই মাদক দ্রব্য আর সুরা সেবনের আকণ্ঠ পিপাসা; আর বিরাট বিশাল জনতার মধ্যে মিশে গিয়ে সাইক্লোন-টর্ণাডোর মত দুর্বার হবার আকুল বাসনা। আজকের মানুষ আত্মোন্নয়নের পথের সন্ধান হারিয়ে ফেলেছে, ঊর্ধ্বলোকে যাবার উপায় খুঁজে পাচ্ছে না; তাই নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে ঢালু পিচ্ছিল পঙ্কিল নরকের নিম্নগামী পথে। সে পথ তাদের নিয়ে চলেছে "to the darkness of sub-human emotionalism and panic animality" (ibid)। তাই হিটলারের মত ডিক্টেটর অতি সহজেই এদের পরিচালিত করে।

হাক্‌সলীর সব কথা মানা চলে না। আশাহত মিশনারীর দৃষ্টি নিয়ে তিনি জগৎকে দেখেছিলেন। নিজের মর্মপীড়া দূর করতে 'মেসকালিনের' আশ্রয় নিয়েছিলেন। তবে একথা সত্যি যে, আজকের পুঁজিবাদী সমাজের অনেক বুদ্ধিজীবী, অনেক তরুণ-তরুণীই হাক্‌সলীর মত মর্মপীড়ায় ভুগছেন এবং সম্মোহিত

---

* "Quantitatively, a group differs from a crowd in size; qualitatively, in the kind and intensity of the mental life of the constituent individuals. A crowd is a lot of people; a group is a few. A crowd has a mental life inferior in intellectual quality and emotionally less under voluntary control than the mental life of each of its members in isolation. The mental life of a group is not inferior, either intellectually or emotionally, to the mental life of the individuals composing it and may, in favourable circumstances, actually be superior. The tone of crowd-emotion is essentially orgiastic and dynosiac." (The World of Aldous Huxley : New-York, 1947, p. 513).

হয়ে কোনো জাদুকরের জাদুদণ্ডের নির্দেশে 'Orgiastic emotion' উপভোগের জন্য হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত হতে প্রস্তুত।

জনসমাবেশের ও গণহিষ্টিরিয়ার সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ নির্ণয়ের বেলায় এ্যালডু হাক্সলী নিরপেক্ষ সমাজ বিশ্লেষণের পরিচয় দিতে পারেননি। তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবিলাসী মানসিকতার ফলে তিনি স্বভাবতই জনসমাবেশ বা ক্রাউড্-বিরোধী। প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যে গণচেতনার স্তর উন্নততর হতে পারে, এ বিশ্বাস তিনি পোষণ করতেন না। গণহিষ্টিরিয়ার প্রকোপ বা প্রাদুর্ভাব কোনো দেশে কোনো সময় বাড়লে বুঝতে হবে সমাজের রূপান্তরণের প্রয়োজন হয়েছে। হিষ্টিরিয়ার প্রধান উপসর্গ দেহাঙ্গের মাসংপেশীর আক্ষেপের মাধ্যমে মনের তলায় জমে ওঠা পাপবোধ, বিবেকদংশন, ভয়, বিক্ষোভ ইত্যাদির সাময়িক উপশম ঘটে। তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, কেবলমাত্র জৈব-প্রবৃত্তি চরিতার্থের তাড়নায় আদর্শবিহীন জনসমাবেশ আত্মোন্নয়নের পরিবর্তে নিজেদের অবনয়নের দিকে নিয়ে যাবে এবং হাক্সলী সঠিক মন্তব্যই করেছেন যে, তাদের মধ্যে 'sub-human stupidity and emotionality' প্রকাশ পাবে। গণদেবতার পরিবর্তে গণদানবের অভ্যুত্থান ঘটবে, গণহিষ্টিরিয়ায় আত্মপ্রকাশ করবে সেই দানব।

এখন বোধহয় তোমার কাছে গণহিষ্টিরিয়া ব্যাপারটা অনেকখানি স্পষ্ট হয়েছে। গণসম্মোহন গণহিষ্টিরিয়া সৃষ্টি ও গণহিষ্টিরিয়া আরোগ্য দুই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হতে পারে আগেই বলেছি।

প্রাচীনকালে উন্মাদনা সৃষ্টি করার প্রধান ভূমিকা ছিল ধর্মের, বর্তমানে সেই ভূমিকা রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক পার্টিগুলি গ্রহণ করেছে। আগের দিনের মত ছোট ছোট গুপ্ত সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব, কম বেশি, সব দেশেই বিদ্যমান। মধ্যযুগের পর থেকে এই সব গুপ্ত সম্প্রদায় বা সমিতি আর প্রধানত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে উন্মাদনা সৃষ্টি করে না ; রাজনৈতিক শ্লোগান মন্ত্রতন্ত্রের স্থান নিয়েছে। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের পরিবর্তে অথবা তার সঙ্গে, এদের কাজ আলোচনা, আত্মসমালোচনা, প্রকাশ্য কুচকাওয়াজ অথবা গোপনে গেরিলা যুদ্ধের কৌশল শিক্ষা। তারা বিচ্ছিন্ন ও বিপ্লবী চেতনায় আচ্ছন্ন। প্রতিটি ছোট দল মনে করছে তাদের শ্লোগানই একমাত্র সঠিক শ্লোগান, তাদের পদ্ধতি ও কৌশলই একমাত্র সঠিক কৌশল। তারা সম্মোহিত। 'ম্যাজিকো-মেডিক্যাল ম্যান' নয়, 'ম্যাজিকো-পলিটিক্যাল ম্যান' তাদের সম্মোহক। মাধ্যম—রেডিও টেলিভিশন মাইক্রোফোন নয়, প্রকাশ্য বক্তৃতামঞ্চও নয় ;—গোপনে মুদ্রিত ও পরিবেশিত পার্টিপত্রিকা। সম্মোহন-অভিভাবনের ক্ষমতা তা বলে, এতটুকুও কম নয়। অন্যদিকে নড়বড়ে পুরনো সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টায় শাসকশ্রেণীর

হাতে রয়েছে ব্যাপকভাবে গণসম্মোহন ও গণঅভিভাবনের ব্যবস্থা। অভিভাবনের প্রধান মাধ্যমগুলি কোনো দেশে একচ্ছত্র পুঁজির করায়ত্ত, কোথাও বা সবই প্রায় রাষ্ট্রায়ত্ত। নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা ও সর্বাত্মক মুক্তির উদ্দেশ্যে বিরোধী পক্ষ জনগণকে অসন্তোষ ও হিষ্টিরিয়ার অভিভাবন দিচ্ছেন; আর রাষ্ট্র-অধিকর্তারা জনসাধারণকে সম্মোহিত করে ধৈর্য অবলম্বনের নির্দেশ দিচ্ছেন। এছাড়া আছে সংসদীয় বিরোধীপক্ষ। তাঁরাও জনসাধারণকে সম্মোহিত অভিভাবিত করে চলেছেন, কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া তাঁরা গণহিষ্টিরিয়া সৃষ্টি করতে চান না। কারণ, এই রাষ্ট্রযন্ত্রই একদিন শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাঁরা করায়ত্ত করতে পারবেন—এই আশা তাঁরা পোষণ করেন। কাজেই বিক্ষোভ বিশৃঙ্খলা এড়িয়ে চলা, অথবা নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে রাখতে চাওয়াটাই তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। তাছাড়া পুলিশ-মিলিটারী ইত্যাদি রাষ্ট্রশাসকের আজ্ঞাবহ—এটাও তাঁরা জানেন। এঁদের মাধ্যম রাষ্ট্রপ্রভুদের মত অপর্যাপ্ত না হলেও, সুসংগঠিত ও শক্তিশালী। এক ডাকে মাঠে ময়দানে লক্ষ লোক জড়ো করার ক্ষমতা এঁরা রাখেন। সামাজিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন যতই তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে, ততই গণহিষ্টিরিয়ার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। জমি থেকে উৎখাত অশিক্ষিত প্রাচীন ভাবধারায় আচ্ছন্ন চাষীরা এসে শহর নগরে ভিড় জমাচ্ছে। মজুরেরা ক্রমশ আধুনিক সভ্যতার পণ্যপূজায় দীক্ষিত হচ্ছে। পুরনো দিনের পারম্পরিক সংযোগের মাধ্যমগুলো লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বেকারের ভিড় বেড়েই চলেছে। অসন্তোষের আগুন সর্বস্তরে ধূমায়িত হচ্ছে। আবার পরিবহনব্যবস্থার উন্নতি নানাধরনের মানুষের মেশামেশি সহজ করে তুলছে। বুঝতেই পারছো, আমি উন্নয়নকামী দেশের ছবি তুলে ধরছি। এসব দেশে গণহিষ্টিরিয়া সৃষ্টির উপযুক্ত পরিবেশ, কাজেই সম্মোহনবাণ তুণ শূন্য করে নিক্ষেপ করা সত্ত্বেও হিষ্টিরিয়ার প্রকোপ ও প্রকাশকে রোধ করা যাচ্ছে না। উন্নত দেশের ছবিও খুব উজ্জ্বল বলে মনে হয় না। গ্রীক পুরাণের সুরা দেবতা তো ছিলেনই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভারতীয় পুরাণের গঞ্জিকা দেবতা। শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়, সব ক্ষেত্রেই মানুষ, একই রকম আচরণ করছে। হাটে-বাজারে-ঘাটে-খেলার মাঠে, রেলষ্টেশনে,' ক্ষেতে-খামারে, অতি তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা হৈ-হুজ্জত লেগেই আছে। ধর্ম এবং ভাষা-উন্মাদনার পাশব রূপের সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। তার সঙ্গে আরো অনেক তুচ্ছ উপসর্গও যুক্ত হতে পারে। আসলে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রীতির সম্পর্ক যতই শিথিল হচ্ছে, মানুষ যতই নিঃসঙ্গ হচ্ছে, ততই ব্যক্তি অনেকের সঙ্গে মিলে দৈন্যবোধ ও নিঃসঙ্গতা দূর করে নিরাপত্তা লাভের চেষ্টা করছে। কোনো সময় ধর্ম, কোনো সময় ভাষা, কোনো সময় অন্য ধরনের দাবীদাওয়ার ভিত্তিতে মিলিত

হতে চাইছে। আসল উদ্দেশ্য নিরাপত্তা লাভ। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই সেই মিলন সহজ স্বাভাবিক আদর্শভিত্তিক আত্মীয়তা না হয়ে, উন্মাদনাকারী হিষ্টিরিয়াতে পর্যবসিত হচ্ছে।

গণমাধ্যম

এইবার 'ম্যাস মিডিয়া' অর্থাৎ গণমাধ্যমের আলোচনার সূত্রপাত করছি। সেই সঙ্গে ম্যাকলুহানের 'মাধ্যম বিপ্লব' সংক্রান্ত তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। মার্শাল ম্যাকলুহানের মাধ্যম-বিপ্লবের (রিভোলিউশন ইন মিডিয়া) তাৎপর্য বুঝতে হলে গণমাধ্যমের গোড়ার কথা দিয়ে শুরু করতে হবে। তার আগে ম্যাকলুহানের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া দরকার। গত কয়েক বছর ধরে তাঁর লেখার বিশেষ ভঙ্গী ও বিশিষ্ট মতবাদের জন্য ম্যাকলুহান আমেরিকার সংস্কৃতি জগতে আলোড়ন এনেছেন। কিছুদিন আগে মারকিউসকে নিয়ে যে হৈচৈ হচ্ছিল ছাত্র-তরুণ মহলে, সেই রকম বা তার থেকেও বেশি চাঞ্চল্য উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে এই মার্শাল ম্যাকলুহানকে নিয়ে। আজকাল নাকি ওদেশে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক এমন পত্র-পত্রিকা খুব কমই প্রকাশ পাচ্ছে, যার মধ্যে তাঁর উদ্ধৃতি থাকে না অথবা তাঁর সম্বন্ধে দু'চার কথা লেখা হয় না। তাঁকে বলা হয়—এই যুগের সব থেকে প্রতিভাশালী ব্যক্তি ও দুঃসাহসী ভবিষ্যদ্বক্তা। কী এমন তাঁর বক্তব্য যার জন্য তাঁর এত নাম, এত প্রতিপত্তি? আমাদের চোখের সামনে বিরাট বিপ্লব ঘটতে চলেছে অথচ আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি না। রেডিও, টেলিভিশন, ইলেক্ট্রনিকস, অটোমেশনের প্রসারের ফলে দুনিয়াব্যাপী যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিয়েছে: ম্যাকলুহান তাঁর বিশিষ্ট ভঙ্গীতে সেই বিপ্লবের কথা লিখে ও বলে চলেছেন। শুধু বক্তব্যই যে নতুন তা নয়, অনেক নতুন নতুন কথাও তিনি আবিষ্কার করেছেন। মিডিয়াকে তিনি ঠাণ্ডা গরম দুভাগে ভাগ করেছেন। মিডিয়াই সংবাদ—(দি মিডিয়াম ইজ দি মেসেজ), তাঁর এই তত্ত্ব সাংবাদিক মহলে শোরগোল তুলেছে। কয়েক বছর আগেও কানাডার এই অধ্যাপককে বেশি লোকে চিনতো না; আজ তিনি ফোর্ডহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত এবং বিশ্ববিখ্যাত। আজকাল বিপ্লবের কথা, বিশেষ করে নতুন ধরনের কোনো বিপ্লবের কথা বললেই রাতারাতি বিখ্যাত হওয়া যায়। এ থেকে অনায়াসেই অনুমান করা চলে যে, সামাজিক আর্থনীতিক রাজ-নীতিক ক্ষেত্রে আমূল একটা পরিবর্তন প্রায় বেশির ভাগ মানুষই চাইছে এবং তার প্রয়োজন খুব তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। শুধু অভাব অনটনের দেশ এশিয়া আফ্রিকা নয়, প্রাচুর্যের দেশ আমেরিকাতেও বর্তমান অবস্থা অনেকের কাছে দুঃসহ

হয়ে উঠেছে। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, মাত্র কিছুদিন আগে 'উইদাউট মার্কস অর জেসাস্'-এর লেখক ফরাসী দেশের রেভেল বিদ্বজ্জন মহলে প্রধান আলোচ্য হয়ে উঠেছিলেন। তিনিও লিখেছিলেন বিপ্লবের কথা। এশিয়া, আফ্রিকা, পূর্ব ইউরোপ নয়, বিপ্লব হবে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার পীঠস্থান আমেরিকায়। কম্‌পিউটার-বিপ্লবের কথা তিনিও বলেছিলেন। 'প্রযুক্তি-বিপ্লব'-এর উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু কথাটি বহু ব্যবহৃত তাই জৌলুস নেই। ম্যাকলুহান জোর দিয়েছিলেন 'মিডিয়া-বিপ্লবের' উপর। একেবারে আনকোরা না হলেও অনেক বেশি চমক আছে কথাটিতে। মারকিউস ও রেভেল-এর 'বিপ্লবতত্ত্ব' নিয়ে অনেক আলোচনা আমাদের দেশে হয়েছে। পত্র-পত্রিকার পাতায় তুমি নিশ্চয়ই অনেকবার তাঁদের নাম দেখেছ। সেই তুলনায় বলা চলে, ম্যাকলুহান অবহেলিত। তোমার তাগিদে ম্যাকলুহানের নাম পত্রিকার পাতায় ঠাঁই পাচ্ছে।

এবার গণমাধ্যমের গোড়ার কথায় যাওয়া যাক। তোমার ফরমায়েস মত আদিমাধ্যম—নাটক সম্বন্ধে দু'চার কথা বলেই সোজা একেবারে অন্তমাধ্যম টি-ভিতে চলে যাব। অ্যারিস্টটল থেকে একলাফে ম্যাকলুহান।

গণহিরিষ্টিয়া সৃষ্টি ও নিরসনের জন্য গণমাধ্যমের প্রয়োজন। আগেই এ সম্পর্কে কিছু বলেছি। প্রাচীন কালে জাদুবিদ্যার সাহায্যে ব্যক্তিহিষ্টিরিয়া সারানো হত। কোনো দেশে জাদু চিকিৎসক স্তোত্রপাঠ করে বা গান শুনিয়ে রোগীর শারীরিক আক্ষেপ বাড়িয়ে দিতেন। এর ফলে, মনে হয়, তার অন্তরের চাপা ভয় ভাবনা ক্রোধ বিদ্বেষ সাময়িকভাবে দূর হত, সে ভাল হয়ে উঠতো। কোথাও বা রোজা এসে মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়ফুঁকের সাহায্যে অথবা দেহের উপর উৎপীড়ন চালিয়ে ভর-হওয়া আত্মাকে তাড়িয়ে দিয়ে রোগীকে সুস্থ করে তুলতেন। গণহিষ্টিরিয়া প্রকাশ পেত সম্মিলিত নাচগান হৈ-হুল্লোড়ের মাধ্যমে, আবার গণহিষ্টিরিয়া দূর করতেও ব্যবহৃত হত ঐ একই মাধ্যম। ঐশী বা দৈবশক্তির অধিকারী বলে স্বীকৃত কোনো ব্যক্তি হতেন এই হিষ্টিরিয়া যজ্ঞের হোতা। সাধারণ মানুষের উপর এঁদের প্রভাব ছিল অসাধারণ। এঁরা নিজেরাও বোধ হয় ছিলেন হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত, অতি সহজেই এঁদের মনে বিষণ্ণিত অবস্থা দেখা দিত। সেই অবস্থায় এঁদের মুখ দিয়ে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দৈববাণী বেরিয়ে আসতো। অনেক সময় ভর করা প্রেতাত্মা বা দেবাত্মা রোগীর দেহ ছেড়ে যাবার আগে গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় সম্পর্কে কিছু কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করে যেত। এখনো, জানো বোধ হয়, স্পিরিচুয়ালিষ্টরা মিডিয়াম হিসেবে হিষ্টিরিক টাইপের ব্যক্তিকে ব্যবহার করে থাকেন। যাক সে কথা। প্রাচীন কালের ঐ সব 'প্রফেট' বা ভবিষ্যদ্বক্তারাই পরবর্তী কালের চারণকবি, লোকগায়ক। প্রাচীনতম গণমাধ্যম বোধ হয় নাচের সঙ্গে গান এবং কবিতা আবৃত্তি—নাটকের প্রাথমিক অবস্থা। গ্রীসে এবং আমাদের দেশে

অসন্তোষ ঘৃণাকে বাড়িয়ে বিস্ফোরণ ঘটাতে চান, গণহিস্টিরিয়াকে গণবিপ্লবে রূপান্তরিত করতে চান! অনেক সময় সত্যিকারের বৈপ্লবিক পরিস্থিতি না থাকা সত্ত্বেও অনেক ছোটোখাটো দল বা সম্প্রদায় বিশেষ শক্তিসম্পন্ন নেতার জাদুবাক্যের মিডিয়ামের সাহায্যে গণহিস্টিরিয়া সৃষ্টি করে নিজেদের মনে জমানো ক্রোধ, ঘৃণার বহিঃপ্রকাশের পথ খুঁজতে চান, নিজেদের সমাজ-বিচ্ছিন্নতার নিরসন চান। সব সমাজে মাঝে মাঝে সর্বাত্মক পরিবর্তনের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হয়, আংশিক পরিবর্তন বা উন্নয়নের প্রয়োজন সব সময়েই থেকে যায়। কাজেই গণহিস্টিরিয়ার অনুকূল পরিবেশ না থাকলেও গ্রুপহিস্টিরিয়ার অনুকূল অবস্থা সব সময়েই থাকবে। সেই দিক থেকে, তুমি যে প্রশ্ন তুলেছ, তার গুরুত্ব অপরিসীম।

এবার সোজাসুজি একেবারে ম্যাক্‌লুহানের কথায় আসা যাক। সংবাদপত্র সিনেমা রেডিও টেলিভিশন ইত্যাদি সব রকমের মাধ্যম এই প্রসঙ্গে এসে পড়বে একসঙ্গে। মিডিয়াবিপ্লব বলতে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন? অতি-আধুনিক ইলেকট্রনিক মিডিয়া, বিশেষ করে টেলিভিশন তাঁর আলোচ্য বিষয়। "আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং মিডিয়া: দি এক্‌সটেনশনস অফ্ ম্যান" বইটি (১৯৬৪) প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। 'ইলেক্‌ট্রনিক মিডিয়া' মানুষকে বদলে দিয়ে নতুনভাবে তার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত করতে চলেছে—এই হল ম্যাকলুহানের বক্তব্য। এই হল এক কথায়—'মিডিয়া বিপ্লব'। এই নতুন মাধ্যমটি শুধু চিত্তবিনোদনের আর একটি উপকরণ নয়, এর আকর্ষণ গভীর ও সুদূরপ্রসারী। আমেরিকার জনজীবনে এর অসীম গুরুত্ব ম্যাক্‌লুহানের আগে অনেকেই বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু তাঁর আগে আর কেউ বোধ হয় ভাবেননি যে মানসিকতার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাবার ক্ষমতা আছে 'টি-ভি'র। টেলিভিশন শিল্পীরা ক্রমশ খুব অল্প কথায় সংবাদ (ম্যাক্‌লুহানের কাছে পণ্য-পূজার. বিজ্ঞাপনই আসল সংবাদ) পরিবেশনের নতুন নতুন কৌশল আয়ত্ত করছেন। এর ফলে ভাষার বাঁধন ভেঙ্গে ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে অন্তরের যোগাযোগ স্থাপিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এ হল একটা দিক। অন্য দিকটির গুরুত্ব আরো বেশি। আমেরিকা ও অন্যান্য প্রযুক্তিকুশল শিল্পোন্নত দেশগুলির মানুষ ক্রমশ নিজেদের অসহায়ত্ব ও যন্ত্রনির্ভরতার জন্যে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। প্রযুক্তিবিজ্ঞান ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মত ক্রমশ স্রষ্টার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে, মানুষ ক্রমশ যন্ত্রের দাস হয়ে পড়ছে—এই দুশ্চিন্তায় ওদেশের চিন্তাবিদদের অনেকের আহারনিদ্রা প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। এই সময় ম্যাক্‌লুহান মাভৈ বাণী শোনালেন। না, মানুষ মিথ্যে ভয় পাচ্ছে। ট্রানজিসটর কমপিউটার, বিশেষ করে টেলিভিশন খণ্ডিতসত্তা অসম্পূর্ণ মানুষকে সম্পূর্ণ অখণ্ড মানুষে পরিণত করতে চলেছে। এই নতুন মিডিয়া মানুষের সবকটি প্রধান

ইন্দ্রিয়কে একসঙ্গে উদ্দীপ্ত করে তাকে এক নতুন জগতের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম মানুষের ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়কে আলাদা আলাদা ভাবে উত্তেজিত করে তার সর্বাঙ্গীণ পরিণতিকে ব্যাহত করছিল। আজ এই ইলেক্‌ট্রনিক যুগ টেলিভিশনের দৌলতে সব কটি ইন্দ্রিয়ের পরিণতি ঘটিয়ে, কল্পনা ও পঞ্চেন্দ্রিয়কে সমন্বিত করে তার সত্তাকে বিকশিত করছে। এই সমন্বয়ের নাম দিয়েছেন তিনি—'সাইনেস্থেশিয়া' (Unified sense and imaginative life)। আমরা এতদিন অসুস্থ অসম্পূর্ণ ছিলাম, কমপিউটার সিবারনেটিক্‌স্-এর দৌলতে সুস্থ ও সম্পূর্ণ হতে চলেছি। এই অসুস্থতা সম্পর্কে আমরা ছিলাম অজ্ঞ, কেননা আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি এতদিন একপেশে হয়ে অসংবদ্ধ ভাবে বেড়ে উঠেছে। তাঁর মতে ইলেক্‌ট্রনিক যন্ত্রদানবকে বশে আনার প্রয়োজন নেই, তাকে ভয় করার দরকার নেই, তার হাতে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণই আমাদের মুক্তি এনে দেবে। এই ইলেক্‌ট্রনিক যুগের আগে খণ্ডিত মানুষ বিশেষজ্ঞ ও যন্ত্রজ্ঞ হয়ে পড়ছিল; বিশেষ জ্ঞান লাভ করার প্রয়োজন ছিল বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি চালাতে। নতুন যুগে বিশেষজ্ঞ শ্রেণী থাকবে না, সবাই যন্ত্রবিদ্যায় সমান বিশেষজ্ঞ হবে। কাজেই মানুষ খণ্ডিত বা একপেশে হয়ে বেড়ে উঠবে না। হ্যাঁ, প্রযুক্তি বিপ্লবের ফলে কিছু লোক বাড়তি হবে, বেকার হবে। কিন্তু তার পরিবর্তে তারা পাবে অবাধ মুক্তি ও নিজেদের পছন্দমত কাজ করার স্বাধীনতা। পারমাণবিক যুদ্ধ নিয়ে মাথা ঘামাতে তিনি নারাজ। কেননা তিনি মনে করেন, যুদ্ধ ছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন অসম্ভব। পশ্চাৎপদ দেশগুলোর উপর হামলা না চালালে তাদের ঘুম ভাঙবে না, তারা তাছাড়া শিল্পায়নের চেষ্টা করবে না, স্বনির্ভর হবে না। অবশ্য, এসবই সাময়িক এবং ভবিষ্যৎ শান্তির মহড়া ছাড়া কিছুই নয়। সব থেকে বড় কথা, মানুষকে চিন্তাভাবনা পরিকল্পনা কিছুই করতে হবে না; কমপিউটারই তার সব কাজের ভার নেবে। কমপিউটার মানবসমাজকে ঠেলে নিয়ে এগিয়ে যাবে। এর জন্যে সামাজিক সম্পর্কের অদলবদল করতে হবে না, কোনো আদর্শের বুলি আওড়াতে হবে না। শেষ পর্যন্ত স্থাপিত হবে শান্তির রাজ্য, সাম্যের রাজ্য, প্রাচুর্যের রাজ্য। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ লোপ পাবে। মানুষ মাত্রেই হবে মানুষের friend, philosopher and guide. যদি ইতিমধ্যে ম্যাক্‌লুহানের লেখা না পড়ে থাকো, তা হলে নিশ্চয়ই তুমি এইসব পড়ে অবাক হয়ে যাবে। ভাববে আমি বোধ হয় তোমার সঙ্গে সস্তা রসিকতা করার চেষ্টা করছি। না, ঠাট্টা নয়। সত্যিই এইসব তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে, নতুন ভঙ্গীতে, অনেক কিছু নতুন নতুন শব্দ তৈরী করে লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রযুক্তিবিদ্যার ও যন্ত্রের খামখেয়ালীপনাকে বশে আনা যাবে না ভেবে হতাশ হয়ে

প্রস্তরযুগে ফিরে যাওয়া শ্রেয় মনে করছিল যারা, তারা এসব আশার বাণী শুনলে বক্তাকে ভয়ত্রাতা মুক্তিদাতা মনে করবেই। ম্যাক্‌লুহানকে তাই আমেরিকার অনেক বিভ্রান্ত মানুষ আদিমকালের 'ম্যাজিকো মেডিক্যাল ম্যানের' আসনে বসিয়ে তাঁর সব কথা, সে যত অসম্ভবই হোক না কেন,—নতশিরে মেনে নিয়েছে।

ম্যাক্‌লুহানের মতে নতুন মাধ্যম নতুন পরিবেশ তৈরী করে মানুষের ইন্দ্রিয় উপলব্ধির ক্ষেত্রে নতুনত্ব নিয়ে আসে। এর ফলে মানুষ পরিবর্তিত হয়, ঐতিহাসিক বিস্ফোরণ ঘটে এবং নতুন সমাজ গড়ে ওঠে। চিত্রলেখন থেকে ধ্বনিনির্দেশক বর্ণমালার আবির্ভাব মাধ্যমবিপ্লবের প্রাথমিক ধাপ। ফলে একই সঙ্গে উদ্ভূত মানুষের ইন্দ্রিয়ের বৈপ্লবিক পরিবর্তন এবং ইউক্লিডের জ্যামিতি। ইতিহাসে কিন্তু লেখে যে, এই দুই ঘটনা (ধ্বনিনির্দেশক বর্ণমালা এবং ইউক্লিডের আবির্ভাবের মধ্যে সাতশো বছরের ব্যবধান) পরস্পর-বিচ্ছিন্ন, অসম্পর্কিত। এর পর এই বর্ণমালা যখন প্যাপিরাসের পাতায় লেখা হল তখন ঘটলো আর এক বিপ্লব। ফলে রোমসাম্রাজ্য গঠিত হল। এর পরের ইতিহাস—জোহান গুটেনবার্গের টাইপে ছাপা বাইবেল। এটা ঘটেছিল ১৪৩৭ খ্রীস্টাব্দে। ছাপার টাইপ জন্ম দিল সংবাদপত্র ও সংবাদ পরিবেশনের। ফলে নাকি ঘটলো ব্যক্তিবাদ ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ। গুটেনবার্গের অনেক আগে চীনে ছাপার হরফ আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং গুটেনবার্গের বাইবেলের অনেক পরে (১৫৮৮) প্রথম সংবাদপত্র ছাপা হয়ে পাঠকের হাতে আসে। এবং এরও একশ বছর বাদে সংবাদপত্র নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে, এবং উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা ছিল নগণ্য। নিয়মিতভাবে সংবাদপত্রকে গণমাধ্যম হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে। তাঁর সমালোচকরা এই সব ত্রুটি অসঙ্গতি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও ম্যাক্‌লুহান এবং তাঁর ভক্তদল অবিচলিত। থিয়েটার-মাধ্যম, সিনেমা মাধ্যম, রেডিও মাধ্যম নিয়েও অনেক মজার মজার কথা বলেছেন তিনি। প্রত্যেকটি মাধ্যম সমাজকে আমূল পরিবর্তিত করেছে। কীভাবে জানো? পুরনো মিডিয়ার সঙ্গে নতুন মিডিয়ার দ্বন্দ্ব বিরোধ থেকে নতুন সমাজের জন্ম হয়েছে। তিনি লিখেছেন, "The history of all hitherto existing society is the history of Media Struggle". এখন মিডিয়া-যুদ্ধের বিবরণ কিছু শুনতে হবে। তাঁর কথাতেই বলছি :*

* "When the press opened up the "human interest" key board after telegraph had reconstructed the press medium, the newspaper killed the theatre, just as T V hit the movies and the night club very hard." ('Understanding Media').

ছাপাখানা থিয়েটারকে ধ্বংস করলো, টেলিভিশনের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে সিনেমা প্রচণ্ড মার খেলো। কিন্তু আমরা জানি থিয়েটার সিনেমা দুইই ম্যাক্লুহানের দেশে এবং অন্যান্য জায়গায় বেশ ভালরকমই চালু আছে। ধনকুবেররা অবশ্য এখন নতুন মিডিয়াতে বেশি লাভের সম্ভাবনা দেখে সেটার পৃষ্ঠপোষকতার দিকে বেশি মন দিয়েছেন। ম্যাক্লুহান বিভিন্ন মিডিয়ার মধ্যে যে প্রতিযোগিতা দ্বন্দ্ববিরোধ দেখেছেন, সেটা প্রধানত মুনাফার প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

এইবার মিডিয়া-দ্বন্দ্বের তাৎপর্য ও সামাজিক পরিবর্তনে ম্যাক্লুহানী তত্ত্বকথার বিবরণ। প্রথমে ছাপাখানার কথা। আদিম কৌমসমাজে ছাপার হরফ ছিল না, পড়াশোনারও বালাই ছিল না। শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে চলতো ভাববিনিময় ও পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ। আদিম মানুষ শুধু শব্দময় জাদুর জগতে বাস করত। বর্ণমালা আবিষ্কারের ফলে লেখাপড়ার প্রচলন ঘটলো। দর্শনেন্দ্রিয় মানুষকে শ্রবণেন্দ্রিয়ের জগৎ থেকে অপসারিত করলো। জাদুর জগত থেকে নির্বাসিত, কৌমগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পশ্চিমী সভ্য জাতির সেবা করা ছাড়া তাদের আর কোনো পথ রইলো না। তারা নতুন সমাজ গড়ে তুললো নতুন মিডিয়ার সংস্পর্শে এসে। এই তত্ত্বে তথাকথিত সভ্যজাতির বঞ্চনা শোষণের কোনো ইংগিত পর্যন্ত নেই। শুধু এই নয়। ছাপাখানার দৌলতে সারা দুনিয়ায় যে সভ্যতা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তার প্রতি ম্যাক্লুহান খুবই নিষ্করুণ। এই সভ্যতা সংস্কৃতি মানুষকে উন্নত করেনি, বরং তার একটি ইন্দ্রিয়কে বিশেষ ভাবে পীড়িত করে, তার একরৈখিক বৃদ্ধি ঘটিয়ে তাকে অসম্পূর্ণ খণ্ডিত অসুস্থ করে তুলেছে - এই তাঁর অভিমত। ছাপাখানা মানুষকে জ্ঞান যুক্তি বিচার বুদ্ধি দিয়েছে মনে করে গুটেনবার্গের কাছে ঋণ স্বীকারের কোনো প্রয়োজন নেই। বিচার বুদ্ধি, র‍্যাশনালিটি, মানুষের সব চেয়ে বড় অভিশাপ। বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক, অসামাজিক, প্রজাতিবৈরী। ঘাবড়ে যাচ্ছো ? এসবই ম্যাক্লুহানের কথা। আমার নয়। তিনি বলেছেন, চেতনার স্তরে বিচরণ করে মানুষ কোনোদিনই মুক্তি পাবে না।

ম্যাকলুহানের মতে গণমাধ্যম হিসেবে সিনেমার স্থান সংবাদপত্রের চেয়ে খানিকটা উঁচুতে। একযোগে দুটি ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপ্ত করে—শ্রবণ ও দর্শন। চোখ কান কেউই বঞ্চিত হচ্ছে না। কিন্তু এখানে আমরা কেতাবী বুলি অর্থাৎ বর্ণমালাসৃষ্ট অর্থপূর্ণ শব্দঝঙ্কারই শুনছি, কাজেই আদিম শব্দের জাদুরাজ্য সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া সিনেমার মধ্যে থাকে গোটা একটা সঙ্গতিপূর্ণ বক্তব্য, যা আমাদের চেতনার রাজ্যে একটা যুক্তিপূর্ণ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ভাবানুষঙ্গ সৃষ্টি করে। মানুষের কাছে ভাষার মাধ্যমে এই 'র‍্যাশনাল এ্যাপ্রোচ' ম্যাকলুহান পছন্দ করেন না। তিনি চান অবচেতনার স্তরের উদ্দীপনা, রঙ্ রেখা শব্দযোগে কল্পনা ও

ইন্দ্রিয় উপলব্ধির সমন্বয়। রেডিও যদিও ইলেকট্রনিকসের দৌলতে একই সঙ্গে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে একই সংবাদ পাঠাতে পারে, তবুও সেটা উন্নত বা সঠিক মিডিয়া নয়। কেননা তাকে নির্ভর করতে হয় সেই ভাষার ওপর আর তার আবেদন কেবলমাত্র একটি ইন্দ্রিয়ের কাছে এবং সেই ইন্দ্রিয়ের মারফত চেতনার স্তরে। টেলিভিশনের ক্ষেত্রে যে সব নতুন নতুন পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে তার সাফল্য থেকে মনে হয় রেখা রঙ শব্দ অনুভূতির এক নতুন জগৎ গড়ে উঠছে; যেখানে সর্বস্তরের সর্বভাষার সর্বদেশের মানুষ একই ভাবানুভূতিতে বাঁধা পড়তে চলেছে।

মিডিয়াই সংবাদ (মিডিয়া ইজ মেসেজ)। সমাজ বদলায় মিডিয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে, মিডিয়ার লড়াই সমাজের গতি পরিবর্তন সূচিত করে। ছাপাখানার দৌলতে পাওয়া জ্ঞান বিচারবুদ্ধি মানুষকে অসম্পূর্ণ খণ্ডিত করেছে, তাকে একরৈখিক বৃদ্ধির পথে নিয়ে গেছে। আর আজ ইলেকট্রনিক যুগে আমাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুসংস্থার অবচেতনার স্তর সম্প্রসারিত হচ্ছে—এই হল মোটামুটি প্রফেট ম্যাকলুহানের বাণী। এর সঙ্গে অবশ্য যোগ করতে হবে আর একটি মূল্যবান কথা। টেলিভিশন মিডিয়ার দৌলতে ছাপার অক্ষর ও পুঁথিপত্রের দরকার কমে আসছে। এমন দিন আসবে যখন নতুন ইলেকট্রনিক মিডিয়া অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে বাড়িয়ে দেবে; ভাষার, এমনকি কথা বলার, প্রয়োজনীয়তা আর থাকবে না। তখন ঘটবে সত্যিকারের মিডিয়া বিপ্লব, যার ফলে নতুন মানুষের ভেদাভেদহীন নতুন পৃথিবী গড়ে উঠবে।

অন্য সব বিপ্লবী চিন্তানায়কদের মত ম্যাকলুহানও বিপ্লব চান। তবে তাঁর বিপ্লবের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে মানুষের কোনো ভূমিকা থাকবে না। তাঁর মতে, বিপ্লব আরম্ভ হয়ে গেছে। আমেরিকা থেকে ইয়োরোপ হয়ে এশিয়া আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়তে খুব দেরী নেই। এই বিপ্লবের জন্য সামাজিক দ্বন্দ্ব-বিরোধ, বণ্টন-উৎপাদন, প্রতিযোগিতা বৈরিতা নিয়ে চিন্তার প্রয়োজন নেই। শুধু প্রয়োজন ঘরে ঘরে টেলিভিশন সেট। মার্কস সম্পর্কে অনুকম্পা প্রকাশ করে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন যে, ভদ্রলোক মিছিমিছি পণ্য উৎপাদন, পণ্যবণ্টন নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। তিনি বুঝতে পারেননি যে, ইতিহাস তৈরী করছে মিডিয়া—জনগণ নয়। একটা জায়গায় কিন্তু মার্কস আর ম্যাকলুহানের দৃষ্টিভঙ্গীর মিল আছে। দুজনেই মনে করেন, সরল সহজ কৌমজীবন, যা সমাজের পরিবর্তনের জটিলতার মধ্যে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে—আবার বিবর্তিত হয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু কিভাবে সেটা ঘটবে, তা নিয়ে দুজনের ধারণায় আশমান-জমিন ফারাক। মার্কস-এর ধারণা তোমার জানা আর ম্যাকলুহানের ধারণার কিছুটা আভাস অন্তত ইতিমধ্যে পেয়েছো। আরো একটু বিস্তার করে বলা যাক।

সমানাধিকারভিত্তিক কৌমসমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতার ফলে, আমরা জানি প্রথম গণহিষ্টিরিয়ার উপযোগী পরিবেশ তৈরী হয়। আজ একচ্ছত্র পুঁজির কেন্দ্রীভূত শক্তির দাপটে এবং উৎপাদনশিল্পে অটোমেশন প্রয়োগের ক্রমবৃদ্ধির ফলে বিচ্ছিন্নতার ব্যাপকতা ও গভীরতা ·বেড়েই চলেছে। সাম্প্রতিক কালের শিল্পসাহিত্য মনস্তত্ত্ব সমাজতত্ত্বে তার নিদর্শন প্রচুর দেখতে পাবে। বুঝতে পারবে, আজকের খণ্ডিত সত্তা যন্ত্রাঙ্গ মানুষ কত বেশি অস্থির, চঞ্চল, ভয়ার্ত, বিদ্বিষ্ট। মনে হবে আজকের পরিবেশ গণহিষ্টিরিয়ার পক্ষে আরো বেশি উপযোগী। প্রযুক্তিবিপ্লব উৎপাদনে যে সামাজিকীকরণ নিয়ে আসছে, একচ্ছত্র মালিকানার পরিবর্তে সেই সামাজিকীকরণ ত্বরান্বিত করা বিচ্ছিন্নতা বিলোপের আবশ্যিক প্রাথমিক শর্ত। পরবর্তী শর্ত আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং পরিকল্পনা থেকে উৎপাদন পরিবেশনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। ব্যক্তিসম্পত্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত সম্প্রদায়, গিল্ড, উপজাতি, জাতি, রাষ্ট্র এযাবত বিচ্ছিন্নতা-বোধকে প্রতিরোধ করে এসেছে এবং আংশিক সাফল্যলাভও করেছে। এ ব্যাপারে আমাদের দেশে বর্ণাশ্রম প্রথার সাফল্যের কথাও স্মরণীয়। বিচ্ছিন্নতাপ্রসূত নঙর্থক ধ্বংসাত্মক মানসিকতাকে সাময়িকভাবে অবরুদ্ধ করলেও, উচ্চতর সদর্থক স্তরে নিয়ে যেতে পারেনি। সমানাধিকারভিত্তিক কমিউনিষ্ট সমাজব্যবস্থা ছাড়া, যার সঙ্গে আদিম কৌমসমাজের খানিকটা মিল আছে, অন্য কোনো পরিবেশেই বিচ্ছিন্নতাবিলোপে সক্ষম নয়। মানুষের মুক্তি, জৈব স্বভাব অতিক্রমণ, 'ট্রানসেনডেনটাল' অবস্থায় উত্তরণ, কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা ছাড়া সম্ভব নয়। কিন্তু তার আগে সমাজব্যবস্থার কয়েকটি স্তর পার হতে হয়। বর্ণ ধর্ম জাতি দেশ রাষ্ট্রের গণ্ডী ক্রমশ অতিক্রম করে মানুষ আজ প্রজাতির একজন বলে পরিচয় দেবার মত অবস্থায় এসে পৌঁছেচে, আবার অন্যদিকে এর বিপরীত আত্মক্ষয়ী সংগ্রামে প্রজাতিবিলুপ্তির সম্ভাবনাও আজ প্রায় সমানভাবে বিদ্যমান। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে প্রত্যেকের লড়াই অথবা সকলের জন্যে সকলের লড়াই—কোনটি মানুষ বেছে নেবে? শেষেরটি বেছে নেবে,—এই আশা আমরা নিশ্চয়ই পোষণ করব। এই হল মার্কসবাদীদের ধারণা।

ম্যাকলুহানও আদিম কৌমসমাজে প্রত্যাবর্তন করতে চান। তার জন্যে উৎপাদন সম্পর্কের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেন না। তাঁর ধারণা, মিডিয়া বিপ্লব মানুষকে স্বর্গরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে। টেলিভিশনের মাধ্যমে একই ধরনের অভিভাবন দিয়ে ধর্ম-জাতি-রাষ্ট্র-ভাষাকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্নতা নিরসন করে তিনি মানুষের প্রজাতিত্ব ও একত্ববোধকে জাগাতে চান। মার্কস চেয়েছিলেন গণচেতনাকে উন্নততর স্তরে নিয়ে গিয়ে সৌভ্রাত্রবোধ ও নতুন মানবিক সম্পর্ক স্থাপন করতে আর ম্যাকলুহান চেয়েছেন মানুষের অবচেতনাকে সম্প্রসারিত

করে তার সামাজিক চেতনা, ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা, বিবেকের তাড়না, বিচার-বুদ্ধির অবলুপ্তি ঘটাতে। জনশিক্ষার বিস্তার ও গণচেতনার বৃদ্ধির ফলে আজ মানুষ নিজের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ নিয়ে করতে চায়। ম্যাকলুহানের মতে এর ফলে বিচ্ছিন্নতা, আক্রমণমুখিনতা, হিংস্রতা, এককথায় গণহিষ্টিরিয়ার ব্যাপকতা বাড়বে, মানুষের স্বর্গরাজ্যে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হবে না। তিনি চান অনুগামিতা, নির্ভরতা, নিঃমানুবর্তিতা।*

তিনি চান অভিভাবনের সাহায্যে মানুষের প্রগতিপ্রবণতাকে রুদ্ধ করতে, মানুষকে সম্মোহিত রাখতে। মিডিয়ার মালিক ও পরিচালকদের ওপর পৃথিবীর রক্ষণাবেক্ষণের সব ভার তুলে দিয়ে দুনিয়ার অন্য সকলে শান্ত মনে প্রসন্নচিত্তে টেলিভিশনের পর্দার দিকে তাকিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধের আনন্দে আপ্লুত হয়ে গেলে ম্যাকলুহান নিশ্চিন্ত বোধ করেন। এরিক ফ্রমের মত তিনিও বোধ হয় মনে করেন, মানুষের মধ্যে বুদ্ধিযুক্তিনির্ভর প্রগতিপ্রবণতা নেই। শুধু অস্তিত্বের সমস্যা সমাধানের বাধ্যকারী অন্ধ-শক্তির তাড়নায় সে-কাজ করে চলে।**

এরিক ফ্রমের মতো তিনিও বোধ হয় মনে করেন, আজকের হোমো-কনসিউমেন্স (Homo-consumens)-এর মানসিকতা সমাজব্যবস্থা ও উপাদানসম্পর্ক-নির্ভর নয়, তার সত্তার বিকাশের একটি পর্ব। ম্যাকলুহান বোধহয় মনে করেন, আজকের সমাজ-বিচ্ছিন্নতার জন্য দায়ী বর্ণমালাভিত্তিক শিক্ষাসংস্কৃতির ফলে মনের একরৈখিক বৃদ্ধি।***

নতুন মিডিয়া টেলিভিশন সর্বাত্মক বৃদ্ধি ও সমন্বয়ের পথ দেখিয়েছে। সেই পথেই মহামানবের মিলন ক্ষেত্র গড়ে উঠবে, মানুষ মুক্তির সন্ধান পাবে। মারকিউসের একমাত্রিক (one dimensional) মানুষ আর ম্যাকলুহানের একরৈখিক

---

* "Electromagnetic technology requires utter human docility and quiescence of meditation such as befits an organism that now wears its brain outside the skull and its nerves outside its hide."

** "Man has no innate 'drive progress', but he is driven by the need to solve his existential contradiction" ......(E. Fromm : The Application of Humanist Psycho-analysis to Marx's Theory, Socialist Humanism, New York, 1966, p. 233)

***"Homoconsumens is the man whose main goal is not primarily to own things, but to consume more and more, and thus to compensate for his inner vacuity passivity, loneliness and anxiety"...(p. 236—Ibid).

মানসিকতার মধ্যে খুব তফাৎ আছে কি ? আছে। মারকিউস মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে লুম্পেন-বিপ্লবকে প্রাধান্য দিয়েছেন, আর ম্যাকলুহান প্রাধান্য দিয়েছেন মিডিয়া-বিপ্লবকে। একজন বিপ্লবকে গণহিষ্টিরিয়ার পর্যায়ে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন ; অন্যজন অভিভাবন-সম্মোহনের সাহায্যে হিষ্টিরিয়াকে প্রশমিত করতে চেয়েছেন। আর এক জায়গায়—মার্কসবিরোধিতায়, এঁদের তিনজনেই (ফ্রম, মারকিউস্ ও ম্যাকলুহান) একমত।

মার্কস উন্নত ধরনের কমিউনিষ্ট সমাজ গড়তে চান। ম্যাকলুহান আদিম কমিউনিজমে ফিরে যেতে চান : যেখানে সমানাধিকার বড় কথা নয়, সমধর্মী জাদু-প্রভাবিত মানসিকতা আসল কথা। যেখানে মানুষ পদে পদে প্রকৃতির নিষ্ঠুর শক্তির কাছে পরাভূত, যেখানে খাদ্যস্বল্পতার দরুন একদল অন্য দলের শিকার ও খাদ্য, যেখানে চেতনা অর্ধস্ফুট, বিচারবুদ্ধি অপরিণত—সেখানে ফিরিয়ে নিতে চান তিনি মানুষকে। তাঁর বক্তব্য একটু গভীরভাবে অনুধাবন করলেই বুঝতে পারবে, আসলে তিনি 'স্ট্যাটাস কো' বজায় রাখতে চান। নিজেদের, অর্থাৎ শিল্পোন্নত দেশের মানুষদের, তিনি আদিম স্তরে নিতে চান না নিশ্চয়ই, কেননা তাহলে তাঁর বিচ্ছিন্নতাবিলোপের বিশল্যকরণী টেলিভিশনকে ফেলে যেতে হবে। তিনি চান আফ্রিকা এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলোকে জাদুমন্ত্রে আচ্ছন্ন রাখতে। তাঁর কাছে সবচেয়ে অভীপ্সিত অবস্থাতে তিনি তাদের রেখে দিতে চান, যাতে তারা 'live happily in the tribal trance of resonating word magic and the web of kinship'. কিন্তু আমার মনে হয়, আফ্রিকা এশিয়ার মানুষ বিশশতকের এই অরফিউসের বাণী শুনে মোহিত হবে না। জাতিগত বর্ণগত বিচ্ছিন্নতা, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার দরুন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পশ্চাৎগামিতা, তারা অন্যভাবে দূর করতে বদ্ধপরিকর। তারা জাদুর যুগের আদিম সমাজে ফিরে যেতে চায়না, মিডিয়া বিপ্লব তাদের বিচ্ছিন্নতাবোধ দূর করতে পারবে না।*

থিয়েটার, সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশন যে কোনো ধরনের গণমাধ্যমই আজকের সমাজ ব্যবস্থায় খুব কম ক্ষেত্রেই জনগণের হাতে, ক্ষমতাচক্রই এ-সবের পরিচালক। জনগণকে পোষ মানানোর কাজেই গণমাধ্যমের ব্যবহার।

---

* "This Humanity cannot do otherwise than define a new humanism both for itself and for other......We, however, consider that the mistake, which may have very serious consequences, lies in wishing to skip the national period" (Franz Fannon : The Wretched Of the Earth : Penguin Books, 1967, p. 198).

তা সত্ত্বেও নৈরাশ্যের কারণ দেখছি না। সবদেশের মানুষ আজ নিজেদের সার্বিক বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে সচেতন। তাদের সংযুক্তির আকুতি ও ব্যাকুলতা গণহিষ্টিরিয়াকে সুস্থ গণ-আন্দোলনের পথে নিয়ে যাবে, প্রজাতিকে টিঁকিয়ে রাখার সহজাত প্রবৃত্তি শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে, নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক স্তর অতিক্রম করে (আক্রমণের গতিবেগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার দৌলতে ক্রমবর্ধমান) সব মানুষ মিলে সত্যিকারের মানবসমাজ গড়ে তুলবে।

পরিশিষ্ট (ক)

পৃষ্ঠা ৯১ থেকে ১০০ পর্যন্ত স্বপ্নবিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনায় এডুইন ডায়মণ্ড কৃত The Science of Dreams (New York) থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতির উল্লেখ আছে। সেগুলি এখানে দেওয়া হ'ল।

১. Abraham Lincoln allegedly reported (this dream) to his friend Ward Hill Lamon a few days before he was assassinated. In the dream Lincoln saw a soldier standing guard over a corpse in the East Room of the White House, asked who was dead and was told, "The President, he was killed by an assassin". (p. 166)

২. Seven of the 1300 dreams involved a combination of the three critical elements (dead, naked, ditch), not enough statistical evidence to support the contention that distant events and dreams are casually related. (p. 168)

৩. Two examples of scientific dream activity are reported in Wood's The World of Dreams. One is the dream of Friedrich A. Kekule', professor of Organic Chemistry at Ghent University. Chemists, Kekule' included, had long been puzzled over the particular arrangement of atoms within a molecule of benzene. One night in 1885, Kekule' dreamt of a snake with its tail in its month—an image he interpreted (when awakened) to signify the closed carbon ring of the benzene molecule. A similar experience involved Dr. Herman U. Hilprecht, a professor of Assyriology at the University of Pennysilvania. (p. 156)

৪. "It occurred to me at six o'clock in the morning that during the night I had written down something most important, but I was unable to decipher the scrawl. The next night, at three o'clock, the idea returned. It was the design of an experiment to determine whether

or not the hypothesis of chemical transmission that I had uttered seventeen years ago was correct." (p. 156)

৫. The dreaming cycle is independent of deliberate, wakeful control... The cycle cannot be affected by external physical factor. (p. 106)

৬. The idea that external stimuli produce dreams persist despite these elegant experiments. It was found recently in the feature called "That's a good question" in June 1960 issue of 'Today's Health', a publication of the American Medical Association.

৭. Even tough-minded volunteers, who made the sleepless experiments a competition of "guts" experienced strange moments—some dreamlike, some terrifying. After being up after sixty five hours one man while washing up at a basin in the ward "saw" cobwebs clinging to his hands and face and tried—unsuccessfully, he said—to wash them off. (p. 110)

৮. In the recovery nights following the dream deprivation nights, A and others (the volunteers of Demont) were allowed to sleep undisturbed with uninterrupted opportunities for dreaming. On his first recovery night A slept 8 hrs. and 2 mts. Of this 2 hrs. 45 mts. or about 1/3rd of the night was dreamtime -almost twice A's normal amount. (p. 115)

৯. Fisher returns to the classic Freudian idea of the dream as a means of discharging sexual and other infantile drives, pre-eminently the oral drive. In infancy, so the theory goes, the baby is able to sleep through the night without bottle or breast because of the substitute gratification of thumb sucking, enhanced and made more pleasurable by an accompanying dream of the real thing. (p. 123)

১০. "The dream, by permitting", in Fisher's words, "each and everyone of us to go quietly and safely insane every

night of our lives" helps preserve the mind and ensure day time safety. (p. 123)

১১. One R. A. F. pilot, returning to his base in straight and level fight at 20,000 feet after an uneventful training sortie, reported : The feeling, I had, is difficult to explain. I felt as though I were dreaming and could not understand that I was in an aircraft". (p. 125)

১২. 'Saints of Lives', Butler : referred by Edwin Diamond. (p. 124)

১৩. "The subjects had little control over the content of the hallucinations. Some kept seeing the same type of picture no matter how hard they tried to change it. One man could see nothing but dogs, another nothing but eyeglasses of various types, and so on. The hallucinations were not confined to vision. Occasionally a subject heard people in the scene talking, and one man heard a music box playing……" (p. 127)

১৪. In that profoundly stimulus-impoverished state known as sleep, this need for stimulation may be met by the recurrent dream cycle throughout the night ; the four to six dreams at regular intervals would be night-time substitutes for the normal day's "sensory bombardment" from the outside world. (p. 130)

১৫. During sleep, the needed variety of stimulus would be provided by dream. Sleep comes as the reticular formation shuts out from the higher brain centers the sensations streaming in from the outside world. But there are internal sources to draw from the other sensations and previous experiences of the visceral brain and of the memory. From this store-house comes the stimulation to keep the rest of the brain in working order. (p. 131)

১৬. Creativity and spontaneity according to Bonner, are closely allied, perhaps indentical ; when the "nay saying"

faculty is eased, as in half sleep, the creative solution is more likely to emerge. Lowel's Nobel Prize winning haunch is a good example of this dream spontaneity. (p. 168)

এই প্রসঙ্গে অন্য একজন লেখকের বক্তব্য তুলে ধরছি। অনেকে স্বপ্নচারিতার মধ্যে অনেক কিছু করে থাকেন। সেটা অন্য একটা স্বপ্নাবস্থা নয়। 'সোমনামবুলিজম' একটা রোগলক্ষণ।

One can only speculate that some gifted people are so intensely motivated to solve their unsolved problem that they are attuned to relevant thoughts during sleep so that they can transcribe them, or actually awaken for a long period. The cues they employ may indeed be discovered in the laboratory, and even taught by a feedback technique (Sleep ; Gay C Luce and Julius Segal, New York, 1967, p. 282).

পরিশিষ্ট (খ)

আজকের মনোবিদ্যা

এখনও মনোরোগ-চিকিৎসক ও মনস্তাত্ত্বিকদের বলতে শোনা যায় যে : মানুষ বহির্বিশ্ব ও পরমাণুকণা সম্বন্ধে অমিত জ্ঞানের অধিকারী হয়েছে, চন্দ্রপৃষ্ঠে পদার্পণ করেছে, যন্ত্রের সাহায্যে পেশী, ইন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কের শক্তিকে শতসহস্রগুণ বর্ধিত করেছে, কিন্তু নিজের মনকে, ব্যবহারকে সঠিকভাবে জানার ও নিয়ন্ত্রিত করার বিজ্ঞানসম্মত কোনো পদ্ধতি এখনও আবিষ্কার করতে পারেনি।*

'বিহেভিয়ার মড্'-এর লেখক স্কিনার-প্রবর্তিত ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁর পুস্তকের মুখবন্ধে ঐ উক্তি করেছেন।

মনোবিদ্যাকে আজ বোধহয়, আর অবহেলিতা 'সিনডেরেলা' বলা চলে না। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সঙ্গে সমানতালে পা ফেলে অগ্রসর হতে না পারলেও মনোবিদ্যা গত দু'দশকে জীববিদ্যা, জৈবরসায়ন, ভেষজবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান ইত্যাদির সাহায্যপুষ্ট হয়ে রহস্যবাদের আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু মানসিক ধর্ম, প্রক্ষোভের সংজ্ঞার্থ, মনোরোগের কারণ, স্নায়ুতন্ত্র ও স্নায়বিক শারীরবৃত্তের বহু সমস্যা এবং চিকিৎসাপদ্ধতি, ইত্যাদি অনেক ব্যাপারে মনস্তাত্ত্বিকদের পরস্পরবিরোধী অভিমতে সাধারণ মানুষ আজও বিভ্রান্ত। মনোবিদ্যার দুটি প্রধান ধারা আজ পশ্চিম ইয়োরোপ ও আমেরিকায় প্রচলিত ও সমাদৃত। একটি ফ্রয়েড প্রবর্তিত ত্রি-স্তর ভিত্তিক মনঃসমীক্ষণবাদ, অন্যটি ওয়াটসন প্রবর্তিত ব্যবহারবাদ। প্রথম তত্ত্ব দেহ-মন সমান্তরালবাদ দর্শন-প্রভাবিত, দ্বিতীয়টি যান্ত্রিক জড়বাদী দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমটিতে মস্তিষ্ক-বিজ্ঞান অবহেলিত, প্রধানত অবাধ-অনুষঙ্গ ও স্বপ্নসমীক্ষা এঁদের মনোরাজ্য পরিক্রমার পদ্ধতি, দূরকল্পনা ও অন্তর্দর্শন এঁদের তত্ত্বের মূল ভিত্তি। 'অন্তর্দর্শন পদ্ধতি' সম্পর্কে টেপলভ (*Psychology in the Soviet Union*,

---

* "We have become huge by our technology......But there is one sacred area, one blind spot, in which we have made no tools more effective than those used by Plato two thousand years ago......Some marvellous mythic treatments of man have emerged, like the Freudian three-tiered personality. But these designs have been of no help when we have tried to change or control behavior." (Philip J. Hilts ; Behavior Mod, Harper's, U. S. A. 1974)

Routledge Kegan Paul, London, 1957, pp. 256-258) মন্তব্য করেছেন যে নিজেকে জানার চেষ্টার মধ্যে পরোক্ষ পদ্ধতি, অন্যকে দেখে ও জেনে নিজেকে বোঝার চেষ্টা ও অনেক সময় 'self-observation' হয়তো প্রয়োজন। অন্তর্দর্শন বা introspection পদ্ধতির উপযোগিতা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী মনস্তাত্ত্বিকরা স্বীকার করেন না। 'Self-observation' ও 'Introspection' এক নয়। দ্বিতীয়টিতে মানুষকে 'soulless machine' রূপে কল্পনা করা হয়ে থাকে। উচ্চতর মননক্রিয়া যথা, যুক্তিবুদ্ধি, বিবেক-বিবেচনা, আদর্শনিষ্ঠা, ইচ্ছাশক্তি ইত্যাদিকে কোনোরকম মূল্য না দিয়ে যান্ত্রিক উপায়ে তার ব্যবহার-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়। সম্প্রতি স্কিনারের 'অপারেণ্ট' বা 'ইনস্ট্রুমেণ্টাল কণ্ডিশনিং' পদ্ধতি প্রয়োগে জেল, স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদিতে ব্যবহার-নিয়ন্ত্রণের বিরাট পরিকল্পনা রূপায়ণের চেষ্টা চলেছে। এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সোচ্চার-প্রতিবাদ শোনা যাচ্ছে। মানুষকে জড়বস্তু বা যন্ত্রের সামিল মনে করার বিরুদ্ধেই প্রধানত এই প্রতিবাদ। কিছু বিজ্ঞানী এই পদ্ধতির সাফল্য সম্পর্কেও যথেষ্ট সন্দিহান। ফিলিপ জে হিণ্টস ; যাঁর লেখা থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করেছি—তাঁর পুস্তকের শেষ অনুচ্ছেদে পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে বা জোরজবরদস্তি করে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের অভীষ্ট ফলাফল সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে।

স্কিনার তাঁর পদ্ধতির সমর্থনে পাভলভের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পাভলভকে ব্যবহারবাদীদের সমগোত্র মনে করা মারাত্মক ভুল। পাভলভ কখনও মানুষকে কুকুর জাতীয় জীব মনে করেননি। কুকুরের লালানিঃসরণ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে পশু-মস্তিষ্ক ও মানবমস্তিষ্কের কতকগুলি সাধারণ ধর্ম তিনি আবিষ্কার করেন। পরে ক্লিনিকে মনের রোগ নিয়ে গবেষণা করে তিনি পশু-মস্তিষ্ক ও মানবমস্তিষ্কের গুণগত পার্থক্য সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেন। বাক্‌শক্তির বিকাশ পশু থেকে মানুষে উত্তরণের এক বৈপ্লবিক পর্ব। অভিব্যক্তির এই স্তর পেরোতে, 'হোমিনিড' থেকে 'হোমো-স্যাপিয়েনস্' হতে হয়ত লক্ষ লক্ষ বছর লেগেছে। এই পর্বে অঙ্গসংস্থান ও শারীরবৃত্তে নানাবিধ পরিবর্তন ঘটেছে। বাক্‌শক্তির ফলে অভিযোজনের ক্ষমতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, চিন্তাভাবনা ও ভাবের আদানপ্রদানে নতুন অধ্যায় সূচিত হয়েছে, মানবসমাজ গঠিত হয়েছে। জৈব ধর্ম ক্রমশ নতুন নতুন সামাজিক শর্তাধীন মানবিক ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে। বিবর্তনের ফলে পশুর অলভ্য বহু গুণের অধিকারী হয়েছে মানুষ। নির্জ্ঞানে অবস্থিত মৃত্যুরতিবাদ প্রবৃত্তি মানুষের স্বভাবচরিত্রের প্রধান নিয়ন্ত্রক—ফ্রয়েডের এ তত্ত্ব যেমন ভ্রমাত্মক, ঠিক তেমনি ভ্রান্তিপূর্ণ ব্যবহারবাদী তত্ত্ব, যার প্রবক্তা যান্ত্রিকভাবে মানুষকে

নিয়ন্ত্রকের খেয়ালখুশিমত পরিবর্তিত করতে চান। পাভলভের শর্তাধীন-পরাবর্তভিত্তিক মনস্তত্ত্বের সঙ্গে ওয়াটসন-স্কিনারের-ব্যবহারবাদের সম্পর্ক মাত্র প্রাথমিক পর্বের প্রাণীর ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সামগ্রিকভাবে পাভলভের মতবাদ ও ব্যবহারবাদের মধ্যে তত্ত্বগত কোনো সম্পর্ক নেই বললেই চলে। পাভলভের মস্তিষ্কবিজ্ঞানের সূত্র, বিশেষ করে তাঁর দুই সাংকেতিক তন্ত্রের আবিষ্কার মনোবিদ্যাকে প্রাকৃতবিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত করার ভিত্তিস্বরূপ বলে গণ্য। পাভলভের আবিষ্ক্রিয়া দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রতিফলনতত্ত্বকে সপ্রমাণ ও সমৃদ্ধ করেছে। সিবারনেটিক্সের প্রয়োগকৌশল ও ক্রমোন্নয়নের মূলে পাভলভের মননক্রিয়ার শারীরবৃত্তিক ব্যাখ্যা। বর্তমানের জৈবরসায়ন, জৈবপদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞানের ও শারীরবিজ্ঞানের অন্যান্য দিকের অগ্রগতি পাভলভের শর্তাধীন পরাবর্তভিত্তিক মনস্তত্ত্বকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করছে। অথচ পূর্ব-ইয়োরোপ ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের বাইরে শর্তাধীন পরাবর্ত নিয়ে শুধু ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে, তথ্য সংগৃহীত হয়, শারীরবিদ্যার নতুন নতুন আবিষ্কার ঘটে, (যেমন সাম্প্রতিককালে স্বীকৃত হয়েছে যে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুসংস্থা পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয় নয়, অনেকাংশে কেন্দ্রীয় স্নায়ুসংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন : এই সত্য পাভলভের সহকর্মী বিকফ্ বহুদিন আগে তথ্যপ্রমাণযোগে সপ্রমাণ করেছেন); কিন্তু সামগ্রিকভাবে মস্তিষ্কভিত্তিক মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মনোবিদ্যার রাজ্যে অধ্যাত্মবাদ রহস্যবাদের প্রভাব হ্রাস পেলেও দ্বয়বাদী ও যান্ত্রিক জড়বাদীদের প্রভাব এখনও অপ্রতিহত। মনোবিদ্যার পুস্তকে পাভলভের নাম যদি আদৌ উল্লেখিত হয়, তবে দেখা যায়, তিনি স্থান পেয়েছেন থর্নডাইক ওয়াটসন স্কিনার প্রমুখ ব্যবহারবাদীদের দলে। ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত, যে ভাবেই এটা ঘটুক না কেন, এ একটি মারাত্মক ভ্রান্তি।

মানবপ্রকৃতি, চৈতন্য, ইচ্ছাশক্তি ইত্যাদি সম্পর্কে পাভলভ ও তাঁর অনুগামীদের ধারণা এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করা যেতে পারে। মানুষ প্রাকৃতিক বিবর্তনের শ্রেষ্ঠ ফল। মৃত্যুর ৬ বছর পূর্বে পাভলভ বলেছিলেন।*

---

* "Is not man the pinnacle of nature, the highest embodiment of the resources of infinite nature, the incarnation of her mighty and still unexplored laws? Is this not rather calculated to enhance man's dignity, to afford him the deepest satisfaction? And everything vital is retained that is implied in the idea of free will, with its personal social and governmental responsibility." : A Physiologists Reply to Phychologists. (In complete works, vol. III p. 454)

সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা যতই পরিবেশনির্ভর ও সীমিত হোক না কেন, পরিবেশকে বিশ্লেষণ করার স্বাধীনতা ও স্বপ্রয়োজনে পরিবেশকে শর্তসাপেক্ষে পরিবর্তিত করার ক্ষমতা মানুষের আছে। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা, চেতনা, বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা অপার্থিব বা ঐশ্বরিক ইচ্ছার অভিব্যক্তি বলে মনে করেন না পাভলভ-অনুগামীরা। পাভলভের মতে মানবচৈতন্য, তার চিন্তা-ভাবনা, ধর্মীয় বা অন্যান্য উচ্চমার্গের ধ্যানধারণা, আদর্শবাদ ইত্যাদি সবই পার্থিব ও প্রকৃতিসঞ্জাত।*

এর মধ্যে অতীন্দ্রিয় রহস্যময়তার স্থান নেই। বিমূর্ত চিন্তার অধিকারী মানুষ লক্ষ লক্ষ বছরের অভিযোজন ও ক্রমবিকাশের ফলে একান্ত মানব-সুলভ বুদ্ধিবৃত্তি, মানসিকতা আয়ত্ত করেছে। মানুষের চিন্তাভাবনা সমাজজাত ও সক্রিয়, পশুদের মত অক্রিয় বা passive নয়। পশু শুধু নিজেকে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে, মানুষ নিজের পরিকল্পনানুযায়ী পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাতে ও স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম। অবশ্য এই পরিবর্তন সব সময়েই শর্তসাপেক্ষ, সমকালীন প্রযুক্তিবিদ্যার অবদানের সঙ্গে সম্পর্কিত। পশুর মত শুধু তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে মানুষ কাজ করে না, প্রয়োজন মিটে গেলে থেমে থাকে না। আবার তার মধ্যে নতুন প্রয়োজনবোধ জাগে এবং সেই প্রয়োজন মেটাতে আবার বুদ্ধিভিত্তিক ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান করে। এইখানেই তার বৈশিষ্ট্য, পশুদের সঙ্গে পার্থক্য। মানবচৈতন্যকে কেবলমাত্র স্নায়ু-প্রক্রিয়া মনে করে না দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী পাভলভ-অনুগামী বিজ্ঞানী। এ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার কিছু পাদটীকায় উদ্ধৃত করছি।**

চৈতন্য শুধুমাত্র মস্তিষ্কের দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্রের (বাক্‌শক্তি) প্রক্রিয়া নয়। চেতনার উন্মেষও অভিব্যক্তি-পরিণতিতে সামাজিক প্রভাব বিশেষভাবে অনুভূত।

---

* "Are not the movement of plants towards light and the search for the truth by mathematical analysis phenomena of the same order ? Are they not the last links in the almost endless chains of adaptations proceeding throughout the living world ?" (Twenty Years of the Experience in the Objective Study of Higher Nervous Activity of Animals ; Moscow 1951. p. 22).

** "The evidence of natural science is insufficient (as yet—D. G.) to fully define the essence of consciousness, because it is more than a physiological phenomenon and is not equivalent to mere nerve-processes". (G. Kursanov, Fundamentals of Dialectical Materialism, Moscow, 1967, p. 103).

"Consciousness is therefore, from the very beginning a social product and remains so as long as men exist at all". —এই অভিমত প্রকাশ করেছেন মার্কস ও এঙ্গলস তাঁদের লেখা 'দ্য জার্মান ইডিওলজি' পুস্তকে। পাভলভীয় মনোবিজ্ঞানীরা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী। তাঁরা ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞানতত্ত্ব ও যান্ত্রিক ব্যবহারবাদী তত্ত্বের সমান বিরোধী। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে 'পাভলভ-পরিচিতি' প্রথম পর্বের দ্বিতীয় অংশে। বিকফের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে পাভলভ প্রসঙ্গ আপাতত শেষ করছি :

> "The Pavlov school has a different conception of the human organism : the organism is not a machine but an integral whole."

পরিশিষ্ট— গ)
পরামনোবিদ্যা : অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি

আমেরিকান সোসাইটি ফর দ্য এ্যাডভান্স্‌মেণ্ট অব্ সায়েন্স ১৯৭৪ সালে পরামনোবিদ্যার সংস্থা বিশেষকে সভ্য হবার অনুমতি প্রদান করার ফলে পরামনোবিদ্যা প্রকৃতিবিজ্ঞানের মর্যাদা পায়নি যদিও, তবু মনোবিদ্যার পুস্তকে পরামনোবিদ্যা সম্পর্কে অন্তত প্রাথমিক পর্যায়ের দু'চার কথা আমাদের লিখতে হচ্ছে। এই সেদিন দিল্লীতে পরামনোবিদদের এক মহাসম্মেলন হয়ে গেল। এ সম্পর্কে অনেক কৌতুক-কাহিনী কোলকাতার দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে।

গত ১০ বছর বিজ্ঞানে নানা রকমের নতুন নতুন আবিষ্কার ঘটেছে। পরা-মনোবিদ্যা বিষয়ক অনেক নতুন বই এই দশ বছরে প্রকাশিত হয়েছে। আমার সব কটি বই পড়বার সুযোগ হয় নি। দু'চার খানা যা পড়েছি তাতে নতুন তথ্যের সমাবেশ খুব বেশি না থাকলেও পুরণো তথ্যগুলিকে বিজ্ঞানগ্রাহ্য করার চেষ্টা আছে। প্রকৃতিবিজ্ঞানের মেথডলজি (methodology) অনুসরণ করে টেলিপ্যাথির দু'একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার সংবাদ আমরা পেয়েছি। অন্যত্র অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির পরীক্ষাপদ্ধতি স্বতন্ত্র হবার দরুন আমাদের মতামত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্যপ্রমাণে গুরুত্বপ্রদানকারীদের কাছে অর্থবহ মনে হয়নি। পরামনোবিদ্যা ও জন্মান্তরবাদ নিয়ে যে আলোচনা করেছিলাম তার মূল্য আজও হ্রাস পায়নি বলে মনে হয়েছে; তাই পুরণো লেখার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি। তার আগে সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত পরামনোবিদ্যার দু' একখানি নামীদামী লেখকের পুস্তকে যে বিশেষ এবং নতুন প্রবণতা লক্ষ্য করেছি, সেই সম্পর্কে দু'চার কথা বলা দরকার। প্রসঙ্গত ১৯৬৯ ও ১৯৭৫ সালে মানবমন পত্রিকায় প্রকাশিত 'বিজ্ঞান ও জন্মান্তরবাদ' এবং 'সাইকোট্রলিসম প্রসঙ্গে'—শীর্ষক আমার দুটি লেখা পাঠকরা পড়ে দেখতে পারেন।

পরামনোবিদ্যাকে এবং অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি (Parapsychology and ESP) সম্পর্কে সোভিয়েট-পণ্ডিতদের অনুসন্ধিৎসা ও আগ্রহের দৃষ্টান্তকে বিশেষ করে পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছেন কিছু লেখক। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে দীক্ষিত দেশের পণ্ডিতদের অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে আগ্রহ আছে—এই কথা প্রমাণ করতে পারলে পশ্চিমী অতি বড় অবিশ্বাসীর মনেও বোধহয় পরামনোবিদ্যার যথার্থতা

সম্পর্কে বিশ্বাস উৎপাদন করা চলে। Wolman সম্পাদিত বইটিতে* 'সোভিয়েট ইনস্টিটিউট অব্ ব্রেইন রিসার্চে' নিযুক্ত পরীক্ষকদের পরামনোবিদ্যা সংক্রান্ত অনেক মন্তব্যের উল্লেখ আছে**। ১৯৫৯-৬২ সালের মধ্যে L. L. Vasilyev-এর কিছু লেখা প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে পরামনোবিদ্যা সংক্রান্ত অনেক কথা আছে। এর মধ্যে দুটি বই পরবর্তীকালে ইংলণ্ড ও আমেরিকা থেকে প্রকাশিত হয়।*** Wolman সম্পাদিত পুস্তকটিতে বলা হয়েছে যে আমেরিকায় Nautilus (Submarine experiment) জাহাজে টেলিপ্যাথি সম্পর্কিত পরীক্ষা সোভিয়েট রাষ্ট্রকে এ বিষয়ে অনুপ্রাণিত করে।**** ক্রুশ্চফ-এর আমলে পরামনোবিদ্যাচর্চাকে উৎসাহ দান করা হয়। বস্তুবাদী পণ্ডিতরা আধুনিকতম বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে টেলিপ্যাথিঅথবা দূর থেকে সম্মোহন ঘুম পাড়ানোর কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাননি।

এ ছাড়া আমেরিকার পরামনোবিদ্যার লেখক ও গবেষকরা সোভিয়েট দেশের নিনা নামে একটি মেয়ের মধ্যে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অভিব্যক্তি নিয়ে অনেক শোরগোল তুলেছেন। এই মেয়েটি সম্পর্কে সোভিয়েটের গবেষক ও চেক

---

* Handbook of Parapsychology ; Van Nostrand—New York 1971.

** "Their (the research team of the Brain Research Inst.) first efforts were directed toward confirming" one...Italian physiologist's claim "that he had discovered brain waves approximately 1 cm in length, which could be ideal basis of telepathy, Soviet Scientists failed to confirm this claim (ibid p. 887)

*** Vasilyev L. L., Experiments in Mental suggestion,— originally published by Leningrad State University in 1962 was later on published in U. K. and America, Later on "Mysterious Influence of Human Psyche ? New Hyder Park, New York, 1965 was originally published in USSR in 1959.

****The Nautilus experiment was later shown to be a hoax of fiction masquerading as science, but it was apparently quite seriously taken up in Russia. From the political point of view, the authorities, it appears, were reluctant to ignore parapsychology if there was any likelihood that the American military establishment was conducting successful experiments in U.S.A (Wolmaur p. 887) "To their great surprise the hypothesis (a kind of electromagnetic radiation formed the laws of telepathic communication was not supported. (ibid p. 880)

গবেষকরাও নাকি অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে বস্তুবাদসম্মত কোনো তত্ত্ব দিয়ে তার অতীন্দ্রিয় শক্তির ব্যাখ্যা দিতে পারেননি।

মেয়েটির মধ্যে যে শক্তির অভিব্যক্তি দেখে বিজ্ঞানী মহল চমকে গিয়েছিলেন, তাকে বলা হয় সাইকোকিনেসিস (Phycho-Kinesis) বা Pk। মনের এই তথাকথিত রহস্যভরা শক্তি জড়পদার্থকে প্রভাবিত করে। টেবিলের উপরে কয়েক ফুট দূরের জিনিষকে নিনা মানসিক শক্তি দ্বারা কাছে টেনে আনতে পারেন বলে পরীক্ষকরা রায় দিয়েছেন।

এই ধরনের শক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে কয়েক বছর আগে একজন ইজরেইলী যুবক বিপর্যস্ত হয়েছিলেন, সংবাদপত্রের পাঠকমাত্রেই সে খবর জানেন। আমাদের দেশের একজন সাধুবাবার ইন্দ্রিয়াতীত অলৌকিক শক্তি—বিশেষ করে 'সাইকোকিনেসিসের' রহস্য এদেশেরই জাদুকরেরা ফাঁস করে দিয়েছেন। কয়েক বছরের এই সব ঘটনা যাঁরা জানেন তাঁরাও কিন্তু অনেকে অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন। মুখে স্বীকার না করলেও, মনে মনে করেন, চিকিৎসক হিসেবে আমি বেশ জোর দিয়েই একথা বলতে পারি। বিজ্ঞান বহু প্রাকৃতিক ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, বিজ্ঞান বেশ কিছু প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারে না। আমরা দুভাবে আমাদের এই অক্ষমতার মোকাবিলা করতে পারি: (১) দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে বিশ্বাসীদের মত মনে করতে পারি যে পদার্থ ও শক্তি অগণিত রূপে বিরাজমান; বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক নতুন নতুন মৌলকণার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, শক্তির সমন্বয় নিয়ে আন্তর্দেশীয় গবেষণা চলেছে; আমরা যে-সব ঘটনার ব্যাখ্যা জানি না, একদিন তা জানা যাবে। সেদিন হয়তো আবার অনেক নতুন অজানা ঘটনা বা শক্তির হদিশ মিলবে যা হয়তো এমনি রহস্যময় বলে কিছু লোকের মনে হবে; অথবা ভাবতে পারি যে (২) বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে সব সত্যের সন্ধান দিচ্ছে, সেগুলো সবই বাহ্য ও অতিসাধারণ কিম্বা মায়া; আসল সত্যের সন্ধান পেতে হলে আজকের দিনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সীমিত দৃষ্টির সাহায্য অপ্রয়োজনীয়; ইন্দ্রিয়াতীত শক্তির উন্মেষ ও বিবর্তনের জন্য আমাদের সাধুসন্তদের পন্থা অনুসরণ করতে হবে অথবা নতুন কোনো পরাবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আবিষ্কার অদূর ভবিষ্যতেই ঘটবে।

আমরা অবশ্য প্রথমোক্ত চিন্তাধারার সমর্থক এবং মনে করি যে পরামনোবিদ্যার এ পর্যন্ত যতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তার ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীরা দিতে হয়তো পারছেন না, পরামনোবিদ্যাবিশারদরাও ব্যাখ্যা দিতে পারেননি শুধু তাঁদের অলৌকিক বিশ্বাসকে বিজ্ঞানের লেবেল এঁটে ধোপদুরস্ত ও আধুনিক ধারণা বলে চালাবার চেষ্টা করছেন। Hans Holzer তাঁর ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত 'দ্য

'ট্রুথ অ্যাবাউট ই. এস. পি.' বইটিতে আরো একটু কৌশলের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (তাঁর ভাষায় '*dialectical Marxism*'; আমাদের মত লোকের কাছে কথাটি নতুন এবং খুব সম্ভবত Marxism ও Dialectical materialism—দুই বিষয়েই তার সঠিক ধারণার অভাবের পরিচয়সূচক) ও মার্কসবাদকে ব্যঙ্গ করার প্রয়াস করেছেন*। Wolman সম্পাদিত বইটিতে তবু তথ্যগুলির উৎস দেওয়া আছে, Holzer-এর উৎস খুবই অস্পষ্ট। তিনি লিখেছেন, সোভিয়েটে অন্তত ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে নাকি 'পরামনোবিদ্যা' শেখাবার যন্ত্রপাতি ও সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি আছে। শুধু তাই নয়, গবেষকদের ওপর কোনো সরকারী বাধানিষেধ আরোপ করা হয় না। অবশ্য তিনি এই সংবাদ পরিবেশন করেছেন Ostander ও Schroeder-এর লেখা Psychic Discoveries Behind Iron Curtain নামক বই থেকে। আমি বইটি সংগ্রহ করতে পারিনি, কাজেই তাঁর খবরের উৎস বা সূত্র জানতে পারিনি।

আর এক জায়গায় Holzer লিখেছেন যে ই. এস. পি. সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের রাজনৈতিক মতবাদ বা দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও অতীন্দ্রিয়বাদের চর্চায় তাদের অগ্রগতির বাধা ঘটেনি।** তারা যদিও মুখে বলছে বটে সব রকমের অতীন্দ্রিয় শক্তিরই একটা বাস্তবভিত্তি (physical basis) আছে; কিন্তু Holzer মনে করেন শীঘ্রই তারা ঠিক পথে আসবে। মজার কথা এই যে একটু পরেই মনে হয় যে Holzer প্রায় সোভিয়েট গবেষকদের সঙ্গে প্রায় সমধর্মী।*** সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা তো তাঁরই

---

* "At this time (1972) there are at least 8 Universities in the Soviet Union with full time, full-staffed research centres in parapsychology. What is more, there is no restrictions placed upon those working in this field and they were free to publish anything they like, whether or not they confirm to dialectical Marxism"...... "Allegedly they have learned to use hypnosis at a distance, they have shown us photographs of experiments in psychokinesis. (Hans Holzer, ibid p. 18)

** ESP in no way interferes with their political philosophy; dialectical Marxism may by opposed to the existence of soul in man, but it seems quite compatible with telepathy and communication between minds,···Although the Russians cling to the nation that there is a physical basis for ESP faculties (p. 40)

***E S P.in my view is not a separate sixth sense different and apart from the ordinary five senses. If...man has

মত মনে করে (তাঁরই মতে) যে অলৌকিকত্ব বা ইন্দ্রিয়াতীত রহস্যময়তার কুয়াশায় আচ্ছন্ন না রেখে বিজ্ঞানসম্মত পথে অনুসন্ধান করে অসাধারণ ঘটনার ব্যাখ্যা খোঁজা দরকার। তা বলে প্রকৃতির খেয়াল বলে কিছু নেই, একথা সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা বোধহয় মনে করে না ; যদিও তার যুক্তিসম্মত বাস্তবতাভিত্তিক ব্যাখ্যা আছে। আঙ্গুলের ডগা দিয়ে দেখতে পাওয়ার ক্ষমতার অধিকারী কোনো ব্যক্তিকে পরাস্বাভাবিক বা ঈশ্বরদত্ত শক্তি মনে না করে তাঁরা মনে করেন যে মস্তিষ্কের দৃষ্টি কেন্দ্রের সঙ্গে কোনো জেনেটিক কারণে বোধহয় আঙ্গুলের অগ্রভাগের মস্তিষ্কস্থিত স্পর্শকেন্দ্রের যোগাযোগ ঘটেছে। অভ্যাস করে কিছু ব্যক্তি এই ক্ষমতা আয়ত্তও করেছেন বলে সোভিয়েট পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে। এই ধরনের বা শকুন্তলাদেবীর মত অসাধারণ ক্ষমতা নিয়ে কেউ জন্মায় না যা ইন্দ্রিয়াতীত শক্তিতে সকলের জন্মগত অধিকার আছে—Holzer-এর এই অভিমতের সঙ্গে বোধহয় সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা একমত হবেন না।

সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা, আমরা যতদূর জানি, টেলিপ্যাথি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। মৃতব্যক্তির আত্মার সঙ্গে মিডিয়ার মাধ্যমে যোগাযোগ হয় বলে বস্তুবাদে বিশ্বাসী কোনো বিজ্ঞানীই মনে করেন না। জাতিস্মরতাকে আশ্রয় করেই কিন্তু পরামনোবিদ্যা গড়ে উঠেছে। পি. কে. বা ইচ্ছাশক্তি দিয়ে অজৈব বস্তুকে প্রভাবিত করার কাহিনী আমরা যা কিছু জেনেছি—তার অধিকাংশই পরবর্তীকালে হাতছাঁপাই এর ফলে বা সম্মোহন প্রভাবে ঘটেছে বলে জানা গেছে। নিনার ব্যাপার নিয়ে পশ্চিমী গবেষকদের যতটা ঔৎসুক্য বা আগ্রহ, সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের ততটা নেই। আমরা ১৯৭৫ সালে সোভিয়েট বিজ্ঞান একাডেমির সঙ্গেও আমাদের চেনাজানা শারীরবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীদের সঙ্গে চিঠিপত্র লিখে এই পরাবিদ্যা চর্চার সত্যতা সম্পর্কে কোনো সংবাদ সংগ্রহ করতে পারিনি। ১৯৭৫ সালের মানবমনের একটি সংখ্যা থেকে সামান্য কিছু উদ্ধৃতি দিলে আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার হবে মনে হয় :

---

five extra senses, they are the extra range of the five senses we generally recognise. Activated by certain emotional conditions we are able to extend our five senses beyond their known boundaries, but this ability is by no means a freak of nature, an exception granted by some superior power to a select few or developed only through strenuous or protracted method...It is the birthright of everyone. (ibid p. 40)

পরামনোবিদ্যা তথা সাইকোট্রনিকস্

প্রথমে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও পরে আরও কিছু সংখ্যক কৌতূহলী পাঠক (রাধামোহন তরফদার, গায়ত্রী বসু, রাজা সেন, শঙ্কর সেন, ত্রিদিবেশ মুখোপাধ্যায়) সোভিয়েট প্রচার প্রতিষ্ঠান মারফৎ প্রাপ্ত 'U S S R probes mystic powers of mind and bodies' শীর্ষক প্রবন্ধে যে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল, (২৩. ৮. ৭৪) সেই সম্পর্কে সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের অভিমত জানবার জন্য আমাদের পত্র লিখেছিলেন। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ পত্রটি অক্টোবর ১৯৪৭ সংখ্যা মানবমনে ছাপা হয়েছিল। অন্যান্য পত্রলেখকদের বক্তব্য ও প্রশ্ন একই ধরনের হওয়ায় সব প্রশ্নের উত্তর একসঙ্গে দেবার চেষ্টা করেছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৭৫ জানুয়ারী সংখ্যায় কণাদ শর্মা লিখিত সাইকোট্রনিকস্ প্রসঙ্গে শীর্ষক প্রবন্ধে যে বক্তব্য উপস্থিত হয়েছে আমরা সেই বক্তব্যকে বাস্তবানুগ ও বিজ্ঞানসম্মত বলে মনে করি। যতদিন না ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি সম্পর্কে যুক্তিবুদ্ধিগ্রাহ্য বিজ্ঞাসম্মত তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে, ততদিন আমরা এই অভিমতই পোষণ করব। বিজ্ঞানসম্মত তথ্য বলতে আমরা বুঝি সেই সব তথ্য যা অন্য পরীক্ষাগারে একই শর্তাধীন অবস্থায় অন্য পরীক্ষকের পরীক্ষাদ্বারা সমর্থিত। এইবার সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের কথায় আসা যাক।

আমরা ঐ বুলেটিনটি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েট বিজ্ঞান আকাদেমীর 'ডিরেক্টার অফ্ ইনস্টিটিউট অফ্ হায়ার নার্ভাস এ্যাকটিভিটি'র পরিচালক ও অধ্যাপক ই. এ. আসরেটিয়ান, সঙ্গে যোগাযোগ করি। বিজ্ঞান আকাদেমীর সায়েন্টিফিক সেক্রেটারী আর. এল. গলিনোভা ১৭ই এপ্রিল তারিখের লিখিত পত্রে জানিয়েছেন: As far as we know indirectly the International Congress on Psychotronics is going to be held in 1975 in Prague. (unfortunately we do not know the precise date of the Congress)। পত্রটি পড়লেই বোঝা যায় সোভিয়েটের উচ্চতম বিজ্ঞান চর্চার সংস্থা সাইকোট্রনিকস্ সম্পর্কে আগ্রহী নন। এ সম্পর্কে বিশেষ খবরও রাখেন না। অধ্যাপক আসরেটিয়ান পাভলভ শিষ্যদের শীর্ষস্থানীয় একজন। গত বছর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শারীরবৃত্ত কংগ্রেসে তিনি উপস্থিত ছিলেন। তাঁর চিঠির শেষ কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করছি: ....there is no Special Institute in our country on investigations in the field of "mystic process", but there are some scientists, and particularly,

Dr. Yu. A. Kholodov, in our Institute, who works on the problems, which are close to that you are interested in. And under separate cover I am sending to you some reprints of Dr. Yu. A. Kholodov's works. চিঠিটি লিখেছেন, ২০শে মার্চ ১৯৭৫। তড়িৎ চৌম্বক শক্তি কি ভাবে অনেক সময় ইন্দ্রিয় মাধ্যম ছাড়াই মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করতে পারে—এ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন, খোলোদেভ। পশ্চিমী পরামনোবিদদের 'অলৌকিক' শক্তির সন্ধান তিনি পেয়েছেন বলে মনে হয় না। অধ্যাপক আসরেটিয়ান প্যারাসাইকোলজি সম্পর্কে আদৌ উৎসাহী নন। কিছুদিন আগে মস্কোর 'ব্রেইন রিসার্চ ইনস্টিটিউটে'র কণ্ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ও এস. আন্দ্রিয়ানভের সঙ্গে কলকাতাতে এক সাক্ষাৎকারের সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি আমাদের দেশের ও পশ্চিমী দেশের পরামনোবিদ্যার চর্চা সম্পর্কে (বিশেষ করে জাতিস্মরতা সম্পর্কে) কিছু খোঁজখবর রাখেন। এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত নয়—এই ধরনের অভিমত তিনি প্রকাশ করলেন। তার দেশে এই ধরনের কোনো গবেষণা চলছে কিনা তিনি খবর রাখেন না।

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ মনের রোগ

মুখবন্ধ

মনোরোগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কৌতূহলের চেয়ে বোধহয় অনুকম্পা ও ভয়ের ভাবটা বেশি। যৌনব্যাধি ছাড়া আর সবরকম শারীরিক ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের সহানুভূতি উদ্রেক করেন, কিন্তু মনের রোগের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু আলাদা। নিউরোসিস-জাতীয় মনের রোগে যাঁরা ভোগেন, তাঁদের ভাগ্যে প্রায়ই বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের অনুকম্পা বা ব্যঙ্গ-তিরস্কার জুটে থাকে। 'মনের জোর কর, এত দুর্বল হলে চলবে কেন?' 'নিজেকে সামলাতে পারো না? হাত ধোবার ইচ্ছে হলেই হাত ধুতে হবে! বেশ তো।'—এই ধরনের নানাবিধ মন্তব্য শুনতে শুনতে অসুস্থ ব্যক্তিদের মনে হয় যে তাঁরা সত্যিই অন্য সবার থেকে দুর্বল ও হীন। বড়দরের অসুখে অনেক সময় রোগীরা সাময়িকভাবে উগ্র, অস্থির অথবা অতিমাত্রায় বিষণ্ণ হয়ে পড়েন, বাস্তবের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কচ্যুতি ঘটে। অমূল প্রত্যক্ষ (hallucination), ভ্রান্তিমূলক (delusional) উপসর্গের দরুণ সুস্থ মানুষ তাঁদের বুঝতে পারে না; তাঁরা অন্য জগতের বাসিন্দা বা অন্য গোষ্ঠীর মানুষ বলে পরিগণিত হন। খুব নিকট-আত্মীয় ছাড়া আর সবাই এঁদের এড়িয়ে চলে, ভয় পায়। বহু মনোরোগী অন্তরঙ্গ আপনজনের কাছেও নিজেদের চিকিৎসার ব্যাপার গোপন করতে চান। চেনা ডাক্তারের কাছে যেতে লজ্জা বোধ করেন। তাঁরা মনে করেন যে লোক জানাজানি হয়ে গেলে তাঁদের সম্মান হানি ঘটবে। দু'একজন আপনজনের কাছে নিজের অসুখের কথা বলতে গিয়ে তাঁরা দেখতে পান যে অন্যে তাঁদের ভুল বুঝছে: প্রথমে তারা বিস্ময় প্রকাশ করে, তারপর এঁদের পরিত্যাগ করে এবং শেষ পর্যন্ত বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে থাকে। কাজেই রোগীরা যতদিন পারেন অসুখ ও চিকিৎসার ব্যাপার গোপন রাখতে চান; এমন কি অনেক সময় চিকিৎসকের কাছে না গিয়ে রোগ পুষে রাখাই শ্রেয় মনে করেন।

মনের অসুখের প্রতি বিরূপ মনোভাবের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, এ ব্যাপারে এখনও আমরা আমাদের পূর্বসূরিদের ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছি। যাদের আচার ব্যবহার কথাবার্তা বুঝতে পারি না তাদের আমরা সাধারণত ভিন্ন গোত্রের মনে করি, এবং স্বভাবতই তাদের প্রতি শত্রুতার মনোভাব পোষণ করি। সেই কারণে উনিশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত সভ্য দেশেও

উন্মাদ রোগগ্রস্তদের মানুষ বলেই গণ্য করা হত না। উলঙ্গ করে, হাত পা বেঁধে অন্ধকার ঘরের ঠাণ্ডা মেঝেতে তাদের ফেলে রাখা হ'ত। তাদের মলমূত্র পরিষ্কার করার কোনো ব্যবস্থা পর্যন্ত ছিল না; দিনান্তে কোনোদিন এক টুকরো রুটি পেত, কোনোদিন পেত না। মনে করা হ'ত, শয়তান বা দুষ্টগ্রহ তাদের দেহে অধিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের নির্দয়ভাবে প্রহার করা হ'ত, এবং দৈহিক ও মানসিক কোনো অত্যাচার থেকে তারা রেহাই পেত না। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে প্যারীর এক হাসপাতালের ডাক্তার পিনেল তাঁর রোগীদের শৃঙ্খল মুক্ত করে তাঁদের মানুষ হিসেবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত মনোরোগের ইতিহাসের এক বৈপ্লবিক ঘটনা। তিনি শুধু যে হতভাগ্য রোগীদের শারীরিক বন্ধন ও অত্যাচার থেকে মুক্ত করলেন তাই নয়, তাঁর এই কার্যের দ্বারা চিকিৎসক ও সমাজপতিদের মধ্যযুগীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করলেন। কিন্তু এখনও সব জায়গায় আসুরিক চিকিৎসা পুরোপুরি পরিত্যক্ত হয়েছে ভাবলে ভুল হবে। তাছাড়া, যন্ত্র মারফত যন্ত্রণা দেবার পদ্ধতি এখনও বিধিসম্মত বলে পরিগণিত। রোগীদের প্রতি সাধারণের ব্যবহার দেখে মনে হয় আমরা এখনও মধ্যযুগীয় সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারিনি। তার জন্য দায়ী মন ও মনোরোগ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতা, বিজ্ঞানসম্মত ধারণার অভাব।

মধ্যযুগের ধর্মীয় ও আধিভৌতিক ধ্যান ধারণাই নতুন মোড়কে মুড়ে, নতুন পরিভাষায় সাজিয়ে, আজও সাধারণের কাছে পরিবেশন করা হচ্ছে। নিজ্ঞ্যনবাদ ও অজাচার প্রবৃত্তির অবদমনভিত্তিক তত্ত্ব যতই জনপ্রিয় হোক না কেন, মনোরোগীর মর্যাদা তার দ্বারা আগের তুলনায় একটুও বর্ধিত হয়নি। তাই তাদের সম্পর্কে সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গিরও খুব বেশি পরিবর্তন ঘটেনি। মনের রোগের ব্যাপকতা সব দেশেই দ্রুতহারে বাড়ছে; অথচ মনের রোগের সর্বজনগ্রাহ্য তত্ত্ব এখনও গড়ে ওঠেনি, মনোরোগীদের প্রতি চিকিৎসকদের মনোভাবের যদিও কিছুটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। মনের রোগ কেন হয়, সে সম্বন্ধে বিষয়মুখী ধারণা না জন্মালে চিকিৎসা ও প্রতিরোধের সফল সঠিক উপায় আবিষ্কৃত হতে পারে না। ক্যানসার ও হৃদরোগ মনের রোগের মতই দ্রুত বর্ধমান, এই দুটি রোগ সম্পর্কেও সর্বজনগ্রাহ্য কোনো নিদানতত্ত্ব এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু এই বিষয়ে সব দেশের বিজ্ঞানীরা ভাবের আদান প্রদান করছেন, এবং তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। কাজেই আশা করা যায়, এই দুই মারাত্মক রোগকে অদূর ভবিষ্যতে সমবেত প্রচেষ্টায় পরাস্ত করা বোধহয় সম্ভব হবে। কিন্তু মনের রোগ সম্পর্কে এ আশা আমরা পোষণ করতে পারি কি? মন ও মনোরোগ নিয়ে ভাববাদী দার্শনিকের প্রকোষ্ঠভিত্তিক ও অন্যান্য বহুবিধ তত্ত্ব, যান্ত্রিক জড়বাদীদের ব্যবহারবাদী তত্ত্ব, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীদের মস্তিষ্কভিত্তিক তত্ত্ব ছাড়াও

প্রচলিত হয়েছে আদিমযুগের, মধ্যযুগের ধর্মীয় ও অতিকথাভিত্তিক বহু রকমের পরস্পরবিরোধী ধ্যানধারণা। এই বিরোধ মৌলিক এবং জীবনদর্শন প্রভাবিত। এঁদের মধ্যে তথ্যের আদান-হলেও ভাব বিনিময় সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। ১৯৬৮ সালে ইংলণ্ডের ডাঃ ব্রায়ান কিরম্যান এবং ১৯৭৪ সালে আমেরিকার প্রোঃ ফিলিপ জে. হিন্টস এই ধরনেরই অভিমত প্রকাশ করেছেন।

আজ একথা অনেকেই হয়তো স্বীকার করছেন যে মনের অসুখ মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের ফল, এবং মস্তিষ্ক-সম্পর্করহিত মনের প্রকোষ্ঠ-কেন্দ্রিক তত্ত্ব ও মানসিক রোগের দূরকল্পনাভিত্তিক অতিকথামূলক (mythical) ধারণার মূল আগের তুলনায় অনেকটা শিথিল। কিন্তু তবুও মনোবিদ্যা ও মনের চিকিৎসায় রহস্যময়তা এবং দূরকল্পনার প্রভাব এখনও বিদ্যমান। শুধু সাধারণ মানুষের মধ্যে নয়, শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত মহলেও টোটকা, দৈব, গুরুবাদী চিকিৎসা এবং গ্রহশান্তির ব্যবস্থা আজও প্রচলিত। কিছুদিন আগের একটি সমীক্ষার প্রতিবেদনে আছে যে পশ্চিমবঙ্গের ৬১% নাগরিক ও ৯৬% গ্রামবাসী মনের অসুখে শুধু নয়, দীর্ঘস্থায়ী সব অসুখের জন্য গ্রহশান্তির ব্যবস্থা করে থাকেন।* বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অবাধ উন্নয়নের যুগে মনোরোগ চিকিৎসায় এখনও আদিম গোষ্ঠী-সমাজের বিধিব্যবস্থার অবাধ প্রভাব। ফ্রয়েডোত্তর যুগের মনঃসমীক্ষা উন্নত দেশে কিছুটা শোধিত সংস্কৃত রূপ পরিগ্রহণ করেছে। আমাদের দেশে অবশ্য এখনও এই ঢেউ এসে পৌঁছায়নি। এবং মনোসমীক্ষকরা স্বীকার করেছেন যে, সব না হোক, অনেক মানসিক রোগের মূলেই সামাজিক উপাদানের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু তাঁরা সামগ্রিকভাবে যন্ত্র সভ্যতাকে মানসিক রোগের জন্য দায়ী করছেন। পুরনো উৎপাদন সম্পর্ক এই উন্নত যন্ত্রযুগে অচল। অসম উৎকট প্রতিযোগিতা, বেকারী, অনিশ্চয়তা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, হতাশা, ক্ষোভ, হিংসা ব্যক্তিমনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে—ফলে ব্যক্তির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। এইসব কারণেই যে মনোরোগের এই ব্যাপকতা—এই সহজ সরল সত্য কথাটা তাঁরা বলতে পারছেন না, হয়তো ভাবতেও পারছেন না। মনের গভীরে প্রবেশ না করে নতুন অবস্থার সঙ্গে ব্যক্তিকে মানিয়ে নেবার জন্য ব্যবহারবাদী স্কিনার-এর 'অপারেণ্ট কণ্ডিশনিং' যন্ত্রযুগের উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা—এই দাবী অনেকে করেছেন। কিন্তু এইভাবে মানুষকে যন্ত্র বা পশুর মতো মনে করার মধ্যে মানবিক শুভেচ্ছা ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির অভাব আছে। আজকাল আচরণবাদী (behavioristic) চিকিৎসাব্যবস্থা ক্রমশ সমাদৃত হচ্ছে। পাভলভ এখনও অপরিচিত বললেই চলে।

---

* *Journal of Social Research*. Vol. XVI. No. 2, p. 11.

মনের রোগ সম্পর্কিত রহস্যময়তা, কুসংস্কার ও ভয় দূর করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা 'পাভলভ-পরিচিতি' গ্রন্থের এই পর্বটি প্রকাশনে প্রবৃত্ত হয়েছি। চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ্যপুস্তক রচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। মনের রোগ কেন হয়, কাদের হয়, মনের রোগীদের মস্তিষ্কের বৈশিষ্ট্য কিছু আছে কিনা—সাধারণের বোধগম্য করেই বিবৃত করার চেষ্টা করেছি। বর্তমান সময়কে 'উদ্বেগের যুগ' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই যুগে জীবনের জটিলতা বেড়েছে, জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার দৌলতে অনেক কিছু পেয়েছি। কিন্তু তার বিনিময়ে শান্তি ও তৃপ্তিকে বিসর্জন দিতে হয়েছে। ধনতান্ত্রিক যন্ত্রসভ্যতা সম্পর্কে একথা নিঃসন্দেহে প্রযোজ্য। জ্ঞানের ভাণ্ডার স্ফীত হচ্ছে, দ্রুত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটছে, তার সঙ্গে তাল রেখে মানসিক পরিবর্তন ও প্রস্তুতি ঘটছে না। জীবনের সব পর্যায়ে, সমাজের সব স্তরে বিচ্ছিন্নতা মানুষে মানুষে স্বাভাবিক সম্পর্কের বাঁধনকে শিথিল করে দিচ্ছে। একদিকে কিছু লোক প্রাচুর্যের ভারে পীড়িত, অন্যদিকে অগণিত মানুষ দারিদ্র্যের চাপে নিষ্পেষিত। আবহাওয়া বিষাক্ত, সমুদ্রের জল বিষাক্ত, মানুষের মনও তিক্ত। কোনোমতে বিশ্বযুদ্ধ প্রতিরোধ করা হচ্ছে, কিন্তু খণ্ডযুদ্ধ ও হিংস্রতার বিবিধ প্রকাশ রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। জনবিস্ফোরণের আতঙ্ক এশিয়া আফ্রিকার মানুষকে বিচলিত করছে। পুরনো মূল্যবোধ ভেঙে পড়ছে, কিন্তু পরিবর্তে নতুন মূল্যবোধ গড়ে উঠছে না। মানুষের জীবন ক্রমশ উৎকেন্দ্রিক অস্থির হয়ে উঠেছে। যৌথ-পরিবার প্রথা অনেকদিন ভেঙে পড়েছে, কিন্তু মানসিকতায় রয়ে গেছে। নিউক্লিয়ার পরিবারের স্বামী-স্ত্রী পুত্রকন্যার মধ্যে যে নতুন সমস্যা দেখা দিচ্ছে সেই সব পারিবারিক সমস্যা মেটাবার কোনো সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে না। বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা প্রতি বৎসরই বাড়ছে। অসুখী মাতাপিতার মাধ্যমে শৈশব থেকে সন্তানের মনে অসহায়ত্ব ও উৎকণ্ঠার বীজ অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতেও কিছু মানুষ কোনোরকমে যান্ত্রিকভাবে দিন কাটাচ্ছে, গতানুগতিকভাবে জনতার প্রবাহে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। কিন্তু যারা সমস্যা সমাধানে অসমর্থ, তাদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আমেরিকায় নাকি প্রতি দশজনে একজন লোক মনের দিক থেকে রুগ্ন। ইংলণ্ড ও ওয়েলসের চার কোটি অধিবাসীর জন্যে মানসিক রোগগ্রস্তদের ও জড়বুদ্ধিদের জন্য হাসপাতালের শয্যাসংখ্যার দ্রুতবৃদ্ধি সত্ত্বেও স্থানসঙ্কুলান হচ্ছে না। গত বিশ বছরে মনোরোগীর সংখ্যা অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের দেশের সরকার না হয় মনের রোগের জন্য বেশি অর্থবরাদ্দ করতে অসমর্থ, অন্যান্য সমস্যা সমাধানে সরকার ব্যস্ত; কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে এই রোগ সম্পর্কে গুরুত্ববোধের অভাব, অনুসন্ধিৎসাও

কম। এ-রোগের গুরুত্ব সম্পর্কে যদি কিছু মানুষকেও অবহিত করতে পারি তবে এই পুস্তক প্রকাশ সার্থক মনে করব।

কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাভিত্তিক অভিমত এই প্রসঙ্গে পাঠকদের কাছে তুলে ধরছি।

প্রায় ৩৫ বছর ধরে মনের রোগ নিয়ে চর্চা করছি: মনোরোগীদের চিকিৎসা করছি। আগের থেকে এখন মানসিক চিকিৎসাপদ্ধতির উন্নতি হোক আর নাই হোক, উন্নততর উপসর্গনিরামক ওষুধের দৌলতে বেশী কিছু সংখ্যক রোগী এখন শুরুতেই চিকিৎসিত হয়ে সাময়িকভাবে আরোগ্য লাভ করেন। যদি ওষুধের সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত 'সাইকোথেরাপীর সাহায্য নেওয়া হয় তা হলে তাড়াতাড়ি আরোগ্য লাভ হতে পারে। ওষুধ এবং বৈদ্যুতিক শক দিয়ে যাদের ভাল করা যায়নি, তাদের বেলায় বিজ্ঞানসম্মত 'সাইকোথেরাপী' বেশ কিছু ক্ষেত্রে সুফল দিতে পারে। এ ছাড়া বেশিদিন সুস্থ ও উপসর্গহীন অবস্থায় থাকারও সম্ভাবনা থাকে। পুনরাক্রমণ অনেক ক্ষেত্রে ঘটে রোগী অথবা আত্মীয়স্বজনের খামখেয়ালিপনার জন্য। ভাল হবার পরও আরো অনেকদিন চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে এবং প্রয়োজনমত ওষুধ খেতে হবে—চিকিৎসকদের এই নির্দেশ শিক্ষিত ও স্বচ্ছল পরিবারের লোকেরাও গ্রহণ করেন না। খেদোন্মত্ত বাতুলতার (Manic depressive psychosis) আবর্তনের কাল কিছু কিছু ক্ষেত্রে পূর্বনির্ধারিত: তার কিছু আগে থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অনেক সময় পুনরাক্রমণ রোধ করা যায়। চিত্তভ্রংশী বাতুলতার (schizo-phrenia) ক্ষেত্রে রোগীর আত্মীয়স্বজন অনেক সময় ছোটখাটো ব্যাপারে আচরণ বা কথাবার্তার সামান্য অসঙ্গতি থেকে অথবা ঘুমের স্বল্পতা থেকে পুনরাক্রমণের আভাস পান। চিকিৎসকের সঙ্গে তখনই যোগাযোগ করলে পুনরাক্রমণ পুরোপুরি রোধ করা না গেলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রোগের তীব্রতা হ্রাস পায়। এই সব রোগী যদি কোনো 'সাইকোথেরাপিস্টে'র তত্ত্বাবধানে থাকেন, তাহলে পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা আরো কমে।

পুনরাক্রমণের অন্যান্য কারণের মধ্যে প্রধানটি সম্পর্কে এখানে দু'চার কথা বলা দরকার। যে পরিবেশে রোগের উৎপত্তি প্রাথমিক চিকিৎসার পর অধিকাংশ রোগীকেই সেই পরিবেশে ফিরে যেতে হয়। যে কারণে রোগের উদ্ভব, সেই কারণের বেশ কিছুটা যে পরিবেশসঞ্জাত—সে বিষয়ে সব চিকিৎসকই বোধ হয় একমত। চিকিৎসকের পক্ষে পরিবেশ পরিবর্তন সম্ভব নয়। কাজেই ম্যালেরিয়া রোগী যেমন মশকাকীর্ণ স্থানে থাকলে আবার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হবেন, তেমনি চিকিৎসায় ভালো হওয়া স্কিজোফ্রেনিয়ার রোগী পুরনো পরিবেশে এলে আবার রোগাক্রান্ত হবেন—এই সম্ভাবনাই বেশি।

এ ছাড়া একবার স্কিজোফ্রেনিয়া জাতীয় অসুখে আক্রান্ত হলে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলেই অসুখ সারার পর হতভাগ্য ব্যক্তিটির (নির্দোষ আমোদ প্রমোদ মনে করে) অস্বাভাবিক আচরণ বা অসংবদ্ধ কথাবার্তা নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে থাকেন। এর ফল বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিষময় হয়। অথবা তাঁরা, এমনকি নিকট আত্মীয় স্বজনরা, তাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন না, বরং কিছুটা অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকেন। তখন সুস্থ হয়েও তার মনে হয় সে বোধ হয় সুস্থ হয়নি অথবা সে অন্যদের মতন নয়। হীনমন্যতা তাকে বিমর্ষ করে, স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব ঘটে, আবার সে নিজেকে পারিপার্শ্বিক সব কিছু থেকে গুটিয়ে নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ঠিক বিপরীত ঘটনাও ঘটতে দেখা যায়। সুস্থ হয়ে পুরনো পরিবেশে ফেরার পর থেকেই বাড়ীর লোকেরা পরিবেশের অন্যান্যরা তাকে একেবারে স্বাভাবিক এবং আগের মত সব কাজ করতে সক্ষম মনে করে তার ওপর পুরনো কাজের পুরো ভার চাপিয়ে দিয়ে থাকেন। এর ফলও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অশুভ হয়; এ চাপ সহ্য করা তার পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। তাই আমার মতো অনেক চিকিৎসকই মনে করেন চিকিৎসান্তে পুনরাক্রমণ রোধ করার জন্য অন্ততঃ বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তির জন্য পুনর্বাসন দরকার। আমাদের দেশে এ ধরনের বিশ্বাসযোগ্য পুনর্বাসন কেন্দ্র আছে কিনা আমার জানা নেই। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (W. H. O.) জড়বুদ্ধি বা উনমানসিকদের (mentally retarded) মতো প্রতিবন্ধীদের যে সব সুবিধার অধিকারী করেছেন, চিকিৎসোত্তর স্কিজোফ্রেনিকদের সেই সব সুবিধার অধিকার দিলে এদের এবং সমাজের অনেক বেশি কল্যাণ হবে। জন্ম থেকেই যাঁরা দুর্ভাগ্যক্রমে অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন তাঁদের অবহেলা করার কথা বলছি না। আমি বলছি স্কিজোফ্রেনিকরা উপেক্ষিত ও অবহেলিত; বেশির ভাগ স্কিজোফ্রেনিকই বেশ বুদ্ধিমান, এবং এদের অনেকেই কৈশোর শেষে বা যৌবনের প্রথমে রোগাক্রান্ত হন। রোগাক্রান্ত হবার আগে এঁদের অনেকেই (যাঁরা সুযোগ সুবিধা পান) কিছুটা লেখাপড়া শিখেছেন অনেকেই ইন্‌জিনিয়ারিং বা ডাক্তারী পড়েছেন। সমাজ, পরিবারের এদের শিক্ষার জন্য বেশ কিছু অর্থব্যয় হয়েছে। যে কেসগুলি চিকিৎসান্তে সুস্থ হয়ে ওঠে তাঁদের বেশির ভাগেরই (অবশ্য যদি বেশি মাত্রায় বৈদ্যুতিক শক দেওয়া না হয়) পূর্ব অর্জিত জ্ঞান ও বুদ্ধি বজায় থাকে ও উপযুক্ত পরিবেশে পুনর্বাসিত হলে তারা নিজেদের সমাজের কাজে নিয়োজিত করতে পারে।

মনের রোগের সংজ্ঞার্থ ও শ্রেণীবিভাগ

মনের রোগ কাকে বলে? কোনো ব্যক্তির চিন্তাভাবনা, আচার ব্যবহার কথাবার্তার অসঙ্গতি ও অস্বাভাবিকত্ব দেখলে আমরা সাধারণত মনে করি সে মানসিক অসুস্থতায় ভুগছে। এই অসঙ্গতি অস্বাভাবিকতা মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের কোনো আঘাত, রোগজীবাণুঘটিত আক্রমণ, অথবা টিউমার (tumour) থেকে ঘটতে পারে। শারীরিক অসুস্থতার বা কোনো মাদকদ্রব্যের প্রভাবেও মানসিক রোগ-উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এই সব মানসিক উপসর্গ আমাদের আলোচ্য সীমার মধ্যে পড়ে না। আমরা শুধু মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের কার্মিক বিশৃঙ্খলার (functional disorder) দরুণ রোগ-উপসর্গের আলোচনা করব। বর্তমান পুস্তকে বংশগতি-প্রভাবিত জড়বুদ্ধিদের (Retarded) সম্পর্কেও কিছু বলছি না। পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য হলে যে সব মনের অসুখ দেখা দিতে পারে, সেই সব অসুখই আমাদের আলোচ্য।

এইসব অসুখের শ্রেণীবিভাগ মাঝে মাঝেই বদলাচ্ছে। এক এক দেশে আবার এক এক ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। তবে এক ব্যাপারে সকলেই মোটামুটি প্রায় একমত: সব মনের রোগকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা চলে। অভিযোজনের আংশিক অসুবিধে হলে ব্যক্তি বাস্তব ও সমাজজীবনের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে কোনো রকমে চলতে পারে। এর ফলে যে-সব রোগ উপসর্গ দেখা দিয়ে থাকে, তাদের বলা হয় 'নিউরোটিক' রোগলক্ষণ। এই জাতীয় মৃদু রোগের নাম 'নিউরোসিস'; বাংলায় বলা হয় উদ্বায়ুরোগ। ফার্স্টের বস্তুবাদী সংজ্ঞার্থ পরে দেওয়া হয়েছে। 'নিউরোসিস' কথাটি শিক্ষিত সমাজে বেশি পরিচিত। পরিবেশের চাপে বা অন্য কারণে যখন বড়রকমের বিশৃঙ্খলা ঘটে, তখন ব্যক্তি বাস্তবজীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজের কল্পনার জগতে বাস করে; সেই কাল্পনিক জগতের বিধিবিধান, নিয়মশৃঙ্খলা অন্য মানুষের জগতের নিয়ম-কানুনের সঙ্গে মেলে না। তবে সেখানেও তাদের সমস্যা আছে, সমস্যা সমাধানের চেষ্টা আছে। সে জগতেও তাদেরও সুখ-সুবিধা, দুঃখ-অসুবিধা আছে। বাস্তব জীবনের অন্য মানুষকে তারা পুরোপুরি এড়িয়ে চলতে পারে না; এবং তাদের অসুবিধা ঘটাই প্রধানত আমরা—যারা সুস্থ বলে অভিহিত। এই বড় রকমের বিশৃঙ্খলাকে বলে উন্মত্ততা, ইংরেজিতে 'সাইকোসিস' (psychosis)।

প্রধানত সুবিধার জন্য, মনের রোগকে প্রথমত উদ্বায়ু ও উন্মত্ততা (neurosis and psychosis) এই দুই প্রধান ভাগে ভাগ করার পর আবার উপসর্গ অনুযায়ী উপবিভক্ত করা হয়েছে। নিউরোসিস চার রকমের: (১) উৎকণ্ঠিত বা আতঙ্কিত অবস্থা (anxiety state); (২) হিষ্টিরিয়া (hysteria); (৩) আবেশ বা আচ্ছন্ন অবস্থা (obsessional neurosis); (৪) নিউ-রোটিক বিষণ্ণতা (reactive depression)। উন্মত্ততা প্রধানত দু' রকমের: (১) চিত্তভ্রংশ বাতুলতা বা খণ্ডিতসত্তাবস্থা (schizophrenia) এবং (২) খেদোন্মত্ত বাতুলতা (manic-depressive psychosis)।

কিছু নিউরোটিকের রোগ ইতিহাস যথাস্থানে দেওয়া হয়েছে। আমরা নিউ-রোসিস ও স্কিজোফ্রেনিয়া কথা দুটি এখন থেকে অবাধে ব্যবহার করব। পাভলভ মস্তিষ্কের টাইপ-অনুযায়ী নিউরোসিসের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। যাদের মস্তিষ্কে প্রথম সাঙ্কেতিক স্তরের প্রাধান্য, তারা হিষ্টিরিয়া রোগাক্রান্ত হয়ে থাকে; দ্বিতীয় সাঙ্কেতিক স্তরের প্রাধান্য যাদের, তাদের রোগের তিনি নাম দিয়েছেন চিন্তারোগ বা সাইকাসথেনিয়া; আর যাদের মস্তিষ্কে কোনো স্তরেরই প্রাধান্য নেই তারা ভোগে নিউরাসথেনিয়া রোগে। আজকাল সাইকাসথেনিয়া ও নিউরাসথেনিয়া নাম দুটি ব্যবহৃত হয় না। সাইকাসথেনিয়াকে আবেশ বা আচ্ছন্ন অবস্থার (obsession) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, নিউরাসথেনিয়াকে নিউরোটিক বিষণ্ণতা হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। কিছু চিকিৎসকের মতে আবার নিউরোসিসের শ্রেণী-বিভাগ অর্থহীন; কেননা রোগীর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের রোগলক্ষণ ও উপসর্গ প্রকাশ হতে দেখা যায়। পাভলভের বিচারে খেদোন্মত্ত বাতুলতা, কোলেরিক টাইপের মধ্যে উগ্রতার লক্ষণ এবং মেলানকলিক টাইপের মধ্যে বিষণ্ণতার লক্ষণ বিশেষভাবে প্রকাশ পাবে। চিত্তভ্রংশ বা স্কিজোফ্রেনিয়া রোগ সম্পর্কে পাভলভের বিচার ও পর্যবেক্ষণ অশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, তাঁর দু'একটি মন্তব্য সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করা প্রয়োজন। অভিজ্ঞ মনোরোগচিকিৎসক জানেন উন্মাদ রোগও (phychosis) একই রোগীর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

স্কিজোফ্রেনিয়া সম্পর্কে পাভলভ

পাভলভই প্রথম প্রমাণ করেন যে স্বাভাবিক মননক্রিয়ার অধঃস্তর উচ্চমস্তিষ্ক। এবং এইভাবে বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করেন। তিনিই আবার অস্বাভাবিক মননক্রিয়ার শারীরবৃত্তিক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করে মনোরোগবিদ্যাকে

প্রকৃতিবিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। তাঁর আগে মন ও মনোরোগ দ্বয়বাদী দার্শনিকদের অনুমান ও দূরকল্পনার বিষয়বস্তু ছিল। কাণ্ট মনে করতেন, কোনো ব্যক্তি উন্মাদ কিনা—এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা শুধু দার্শনিকদেরই আছে। কুর্ট স্নাইডার ১৯৫১ সালে হাইডেলবার্গে এক বক্তৃতায় এই মত প্রকাশ করেন যে, মনোরোগবিদ্যা মস্তিষ্ক-রোগবিজ্ঞানের আওতার মধ্যে পড়ে না, মনোরোগবিদ্যা আসলে অধিবিদ্যারই অন্তর্গত। জাসপার্স বলেছেন, মনোবিকারের বিষয়ীগত দিকটাই মাত্র জানা যায় এবং সেই বিষয়ীগত জ্ঞানই আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। ফ্রয়েডের মন্তব্য বিশেষ উদ্ধৃতির-যোগ্য, কেননা তিনিই বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত মনোরোগ শাস্ত্রের প্রধান প্রবক্তা হিসাবে স্বীকৃত।* প্রখ্যাত শারীরবৃত্তবিদ শেরিংটন বলেছেন, মস্তিষ্কের সঙ্গে মানসিকতার বা মননক্রিয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। সে-আমলের যে-সব বিজ্ঞানী দ্বয়বাদে বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁরাও মস্তিষ্কের শারীরবৃত্তিক জ্ঞানের অভাবে মনোরোগের নিদান ও বিকারতত্ত্বের গবেষণায় বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। পাভলভের শর্তাধীন পরাবর্তভিত্তিক মনস্তত্ত্ব ও পরীক্ষাধীন নিউরোসিস সৃষ্টি মনোরোগবিদ্যাকে বিজ্ঞানানুমোদিত পথে অগ্রগমনের পন্থার নির্দেশ দিয়েছে। ক্লিনিকে মনের অসুখের পর্যবেক্ষণ করার পর অধিকাংশ রোগ-উপসর্গের মস্তিষ্ক ভিত্তিক সঠিক কারণ নির্দেশ করে তিনি বিষয়মুখীন গবেষণার পথ প্রশস্ত করেন।

স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা অন্যান্য মনোরোগীর তুলনায় অনেক বেশি। স্কিজোফ্রেনিয়া সব থেকে জটিল ধরনের মনোরোগ। স্কিজোফ্রেনিয়া আবার অনেক উপশ্রেণীতে বিভক্ত। সব দেশে গবেষকদের দৃষ্টি এই দুরারোগ্য ব্যাধিটির প্রতি বিশেষভাবে নিবদ্ধ। বর্তমানে এই ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের মস্তিষ্কের জৈবরাসায়নিক তথ্য কিছু কিছু জানা গেছে এবং তার উপর ভিত্তি করে রোগ নিরাময়ের ওষুধও তৈরী হয়েছে। নিঃসঙ্কোচে বলা চলে যে, পাভলভের প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও শারীরবৃত্তিক ব্যাখ্যা পরবর্তীকালের এই সব গবেষণার সাফল্যের জন্য বহুলাংশে দায়ী।

---

* The medulla oblongota is a very serious and beautiful object I recall exactly how much time and effort I devoted to its study several years ago. But now I must say that I do not know of anything more indifferent to the psychological understanding of fear than the knowledge of the nervous path travelled by its excitattions : Freud S. Gesammelte werke XI. Bd. s406 (Quoted by Popov in *Psychopathology and Psychiatry*, Foreign Language Publishing, Moscow p 418.

স্কিজোফ্রেনিয়ায় উচ্চমস্তিষ্কের কোষে ক্রমবর্ধমান নিস্তেজনার দরুণ সম্মোহন-পর্ব ও আনুষঙ্গিক প্রতিরক্ষামূলক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়ে থাকে। বিভিন্ন ক্ষতিকর বস্তুর প্রভাবে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগে বিশৃঙ্খলা ঘটতে থাকে, দুটি সাঙ্কেতিক স্তরের মধ্যেও বিযুক্তি ঘটে। এছাড়া, পেশী সম্পর্কিত কিছু চেষ্টীয় কোষ শারীরবৃত্তিক দিক থেকে অনড় হয়ে যায়। পরের অধ্যায়ে আবেশের (obsession) শারীরবৃত্তিক ব্যাখ্যায় এ বিষয়ে আর একটু বিস্তারিত আলোচনা আছে। পাভলভ প্রথমে স্কিজোফ্রেনিয়ার এক বিশেষ অক্রিয় অবস্থা (catatonia,—এই অবস্থায় রোগী পুরোপুরি অক্রিয়, অচেতন, অনড় অবস্থার মধ্যে থাকে) সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করেন। বলেন, এই অবস্থা ঘটেছে রোগীর গুরুমস্তিষ্কের চেষ্টীয় অংশের (motor area of the cerebral cortex) বিচ্ছিন্নতা ও আংশিক নিস্তেজনার ফলে। সম্মোহনের এক বিশেষ পর্বের সঙ্গে এই অবস্থা তুলনীয়। পাভলভ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, স্কিজোফ্রেনিয়ার বিশেষ বিশেষ অবস্থা আসলে দীর্ঘস্থায়ী সম্মোহিত অবস্থারই অনুরূপ ; স্কিজোফ্রেনিয়া দুর্বল মস্তিষ্কের রোগ। এই দুর্বলতার মূলে বহির্বাস্তবের উপাদানের সঙ্গে জন্মগত কারণও থাকতে পারে। এদের স্নায়ুতন্ত্রের আঘাত সহ্য করার ক্ষমতার স্বল্পতাই রোগলক্ষণের জন্য দায়ী। পাভলভের মতে স্কিজোফ্রেনিয়ার উপসর্গগুলি প্রধানত প্রতিরক্ষামূলক। কোন ধরনের ক্ষতিকর প্রভাবে স্কিজোফ্রেনিয়াগ্রস্তের মস্তিষ্কে প্রতিক্রিয়ামূলক উপসর্গ সৃষ্টি হয় ? তিনি প্রথমে বলেছিলেন—এক ধরনের অধিবিষ বা টক্সিনই বোধ হয় এই ক্ষতিকর উপাদান ; আরও মনে করতেন, স্কিজোফ্রেনিয়ায় একই সঙ্গে বিকারভিত্তিক (pathological) ও শারীরবৃত্তিক উপসর্গের (প্রতিরক্ষা প্রয়াসের) অভিব্যক্তি দেখা যায়। পাভলভের পরবর্তী মন্তব্যের মধ্যেও এই দুই ধরনের (বিকার-ভিত্তিক ও শারীরবৃত্তিক—pathological and physiological) ক্রিয়ার সমকালীন উপস্থিতির উল্লেখ আছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ সমর্থিত।

পাভলভের মতে স্কিজোফ্রেনিয়া অন্যান্য মনোরোগের মতই মস্তিষ্কের ক্রিয়াকাণ্ডের বিশৃঙ্খলার ফল, কার্মিক (funcional) ব্যাধি। এ রোগ-প্রক্রিয়া অপরিবর্তনীয় নয় ; অর্থাৎ স্কিজোফ্রেনিয়া রোগীর আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা কোনো সময়েই সুদূরপরাহত নয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ মস্তিষ্কের স্বাভাবিক নিস্তেজনা কমার ফলে, কিছু কিছু রোগী আপনা থেকেই সুস্থ হয়ে ওঠেন। সোভিয়েত চিকিৎসকরা স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে খুব পুরনো স্কিজোফ্রেনিয়া রোগের গতিও পরিবর্তিত হতে পারে।

পাভলভ তাঁর অভিমতে দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন ; আরো বলেছেন, মনের রোগ এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হতে

পারে। 'ফাংশনাল" ও 'অরগ্যানিকের' (functional and organic) মধ্যে কোনো অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান তিনি দেখেননি। সব শেষে পাভলভের বক্তব্য: মনের রোগের মধ্যে দেব বা দানবের খেলা নেই, রহস্যময়তা, অলৌকিকতা নেই, মনের তথাকথিত গভীরে রোগের মূল অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই ; মনের রোগ মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের রোগসঞ্জাত।*

পাভলভীয় চিকিৎসা পদ্ধতি

মনে হয় না সাধারণ পাঠকের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে কোনো বিশেষ আগ্রহ আছে। তবুও 'মনোবিদের ডায়েরী' থেকে রোগীর ইতিহাস ও চিকিৎসা (সাইকোথেরাপি) সম্পর্কিত কিছু বিবরণ দেওয়া হল ; তা থেকে মোটামুটি একটা ধারণা তৈরী হতে পারে। ফ্রয়েডীয় পদ্ধতির প্রায় বিপরীত ধর্মী এই চিকিৎসাতে রোগীর যুক্তি, বুদ্ধি, চেতনা বাড়িয়ে তার মানসিক বিশৃঙ্খলা দূর করার চেষ্টা হয়। সম্মোহন ও অভিভাবনের সাহায্য অনেক সময় প্রয়োজন হতে পারে। কথা—বিশেষ করে, অভিভাবনমূলক কথাকেই পাভলভীয় চিকিৎসার বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে।** তবে অন্যান্য স্কুলের সম্মোহন-অভিভাবন চিকিৎসকের ও পাভলভীয় চিকিৎসকের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। সে-পার্থক্য এই দুই দলের চিকিৎসকের জীবনদর্শনের পার্থক্য, দ্বয়বাদী ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনের পার্থক্য।

চিকিৎসার বিবরণ পড়ে একথা যেন কেউ মনে না করেন যে পাভলভ প্রবর্তিত চিকিৎসাতে সব সময় সুফল পাওয়া যাবেই। মনোবিদের ডায়েরীর মাত্র কয়েকটি রোগীর ইতিহাস আমরা নিদর্শন হিসেবে ব্যবহার করেছি ; আরো বহু ইতিহাস তাঁর ডায়েরীতে থাকতে পারে, যেখানে কোনো ফল পাওয়া যায় নি।

পাভলভের পরীক্ষামূলক নিউরোসিস

পাভলভ ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষামূলকভাবে নিউরোসিস সৃষ্টি নিঃসন্দেহে মনোরোগের গবেষণায় ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

---

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

** ঐ

তবে পাভলভের পরাবর্তমূলক গবেষণা ও নিউরোসিস সৃষ্টির অনেক আগে থেকেই বিজ্ঞানসম্মত মনোরোগবিদ্যার অনুশীলন ও চর্চা শুরু হয়েছিল।

ফরাসীদেশে অষ্টাদশ শতকে যুক্তিবাদী ভাবধারার প্রভাবে ফিলিপ পিনেল ও এস্‌কুইরোলের মত প্রখ্যাত চিকিৎসক মনোরোগবিদ্যাকে বস্তুবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন এবং অনেকখানি সাফল্যলাভ করেন। জার্মানীতে উইলহেলম গ্রাইসেঙ্গার স্পষ্টই বলেছিলেন যে, মনোরোগ মানে মস্তিষ্কের রোগ এবং মননক্রিয়া মাত্রেই পরাবর্তক্রিয়া। সুবিখ্যাত বৃটিশ চিকিৎসক হেনরী মওড্‌সলে স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক সব রকমের মানসিকতার বস্তুবাদসম্মত ব্যাখ্যা দেবার এবং চিকিৎসার ব্যাপারে চার্লস ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ ভিত্তিক পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার সনদে স্বাক্ষরকারী বেঞ্জামিন রাশ তাঁর দেশে মনোরোগবিদ্যা ও চিকিৎসার প্রবর্তন করেন। বস্তুবাদী মতামতের জন্য তাঁকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। এই বস্তুবাদী ধারা উনিশ শতকের শেষের দিকে সাধারণ চিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গে মিলিত হয় এবং মনোরোগের শ্রেণী বিভাগ করা হয়। জার্মান চিকিৎসক এমিল ক্রেইপলিন এবং রুশ চিকিৎসক সার্গাই কোরসাকভ সাধারণ চিকিৎসাবিদ্যার নিদানতত্ত্ব ও উপসর্গ-বিচার বিধি অনুযায়ী মনের রোগের শ্রেণী বিভাগের চেষ্টা করেন। বিভিন্ন মনের রোগের বিশেষ বিশেষ উপসর্গগুলি এবং রোগীর মানসিক বৈশিষ্ট্য ও অস্বাভাবিকতার সঙ্গে চিকিৎসকরা এই সময় থেকেই পরিচিত। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের শেষে ফ্রয়েডতত্ত্ব ইয়োরোপ থেকে আমেরিকায় রপ্তানী হবার ফলে মনের রোগের কারণ নির্ণয়ে ও চিকিৎসায় ভাববাদী ধ্যানধারণা প্রসার লাভ করতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের হত্যালীলা, যুদ্ধোত্তর আমেরিকা-ইয়োরোপের অর্থ-নৈতিক মন্দা, প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্ম, ইত্যাদি গুরুতর সমস্যা পশ্চিমী দুনিয়ার চিন্তানায়কদের বিশেষ ভাবে বিচলিত করে। প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসের ও মূল্যবোধের ভিত শিথিল হয়ে পড়ে; অনেক নতুন প্রশ্ন বুদ্ধিবাদীদের চঞ্চল করে তোলে। প্রচলিত ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রে এই সব নতুন প্রশ্নের উত্তর মেলে না। 'মানুষের মন' চিন্তাবিদদের প্রধান গবেষণার বস্তু হয়ে ওঠে। 'মন' সম্পর্কে নতুন ধারণার এবং স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক মননক্রিয়ার নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজন অনুভূত হয়। কেন যুদ্ধ হয়? কেন এই মন্দা? কেন এই সামাজিক বৈষম্য? —এ সবের ব্যাখ্যা পেতে হলে মানবমনের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হওয়া দরকার; ফ্রয়েডীয় এই নির্দেশ স্বাভাবিকভাবেই ভাববাদী মনস্তাত্ত্বিকদের বিশেষ মনঃপূত হল। এই সমাজের স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে হলে বস্তুবাদী দর্শনের চৈতন্যের প্রতিফলনতত্ত্বকে এবং সমাজ পরিবর্তনের অনিবার্যতাতত্ত্বকে অস্বীকার করা বিশেষ প্রয়োজন। এর বিকল্প পাওয়া গেল ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞান তত্ত্বে। ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব

পুরুষ প্রাধান্য, শ্রেণী প্রাধান্য ও জাতিবর্ণ প্রাধান্যকে প্রকারান্তরে ও পরোক্ষভাবে অনুমোদন করে সমাজ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার বিরোধিতা করল— প্রথমদিকে অবশ্য প্রধানত তত্ত্ববাগীশদের দ্বারা সমাদৃত হল ফ্রয়েডতত্ত্ব; মনের রোগের চিকিৎসায় বস্তুবাদী ধারণারই প্রাধান্য বজায় থাকল। কিন্তু মন ও মনের রোগের মস্তিষ্কভিত্তিক জ্ঞান বৃদ্ধির কোনো সম্ভাবনা পশ্চিমী বিজ্ঞানীরা দেখতে পেলেন না। পাভলভের ও বেকটেরেফের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় খবর অনেকেরই অজানা, যাঁরা জানলেন তাঁরা এই পরীক্ষায় ফলাফলকে যান্ত্রিক ভাবে গ্রহণ ও প্রয়োগ করলেন, মনের সূক্ষ্ম ও জটিল ক্রিয়া-প্রক্রিয়া তাঁরা বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হলেন না। মনের রোগের বিষয়ীগত জ্ঞান যতটা সংগৃহীত হল তার তুলনায় বিষয়গত পরীক্ষালব্ধ তথ্যের পরিমাণ ছিল নগণ্য। সোভিয়েতের সঙ্গে সম্যক যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় পাভলভতত্ত্ব অনাদৃতই হয়ে ছিল। এর ফলে সর্বস্তরে ফ্রয়েডের অনুমানভিত্তিক 'depth psychology'-র প্রসার ঘটল।* কিন্তু চিকিৎসাক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল না পাবার দরুণ, অথবা চিকিৎসাপদ্ধতি বিশেষ জটিল ও দীর্ঘস্থায়ী হবার দরুণ পশ্চিমী চিকিৎসকরা তত্ত্বের দিক থেকে ভাববাদী ও ফ্রয়েডীয়ান থাকলেও, প্রয়োগের দিক থেকে 'প্র্যাগম্যাটিক' রয়ে গেলেন।

প্রকোষ্ঠভিত্তিক ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষার পাশাপাশি তিরিশের দশক থেকে ইনসুলিন চিকিৎসা, দীর্ঘস্থায়ী ঘুমের চিকিৎসা ও মস্তিষ্কে তড়িৎ প্রয়োগ চিকিৎসা, ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৯৫০ থেকে মনের রোগের ভেষজ চিকিৎসা সর্বদেশে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। মাথা ঠাণ্ডা করার (ট্রাংকিউলাইজার) ও বিষণ্ণতা দূর করার (য়্যান্টিডিপ্রেস্যাণ্ট) ওষুধের সফলতা সপ্রমাণ হবার পর মনের রোগ তথা মানসিকতার ভিত্তিভূমি যে মস্তিষ্ক এই ধারণা অনেকাংশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই ওষুধগুলি মস্তিষ্ক কোষকে নিস্তেজিত অথবা উত্তেজিত করে মনকে প্রভাবিত করে। ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব দিয়ে এই সব ওষুধের ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যা চলে না। বর্তমানে সবদেশে মনোরোগবিদ্যার শিক্ষক ও ছাত্রদের একাংশ পাভলভের শর্তাধীন পরাবর্তভিত্তিক মনোবিদ্যার অধ্যয়ন ও অনুশীলনে আগ্রহী। মনোরোগবিদ্যার সঙ্কট সমাধান বস্তুবাদীদের প্রতিফলনতত্ত্ব ও পাভলভের শর্তাধীন পরাবর্তের চর্চা ছাড়া যে হতে পারে না—এই অভিমত পশ্চিমী অনেক চিকিৎসকই এখন পোষণ করেন। ১৯৬০ সালের অক্টোবরে নিউইয়র্ক বিজ্ঞান পর্ষৎ কর্তৃক এক পাভলভীয় কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবার পর এদিকে অনেকের

---

* Y Popov and L Rokhlin ; Psychopathology & Psychiatry ; Moscow p 5

দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। তার আগে, ১৯৫৪ সালে নিউইয়র্কের একজন ফ্রয়েডপন্থী চিকিৎসক একখানি বই প্রকাশ করে ফ্রয়েডীয় চিকিৎসাপদ্ধতির অসারতা, যুক্তিহীনতা পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন ; এবং সঙ্গে সঙ্গে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে সত্যিকারের বিজ্ঞানসম্মত মনোরোগবিদ্যার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় দুটি শর্ত—জ্ঞানের প্রতিফলন তত্ত্ব এবং মানসিকতা ও মনোরোগ সম্পর্কিত বিষয়মুখী পরীক্ষামূলক গবেষণা ব্যবস্থা বর্তমানে আমাদের জানা।* প্রাণীর উপর পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে রোগবিদ্যার জ্ঞান ক্রম-প্রসারমান। মনোরোগবিদ্যার ক্ষেত্রে পরীক্ষাধীন কুকুরের মনোরোগ সৃষ্টি করে পাভলভ ও তাঁর সুযোগ্য সহকর্মীরা মনোরোগবিদ্যার বস্তুবাদী ধারাকে আরো ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং মনের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ভেষজ প্রয়োগের যৌক্তিকতা সপ্রমাণ করেন।

১৯২২ থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে পাভলভের পরিচালনাধীন প্রথম পরীক্ষামূলক নিউরোসিস নিয়ে গবেষণা করা হয়।

পেত্রভার পরীক্ষাধীনে ছিল দুটি বিপরীত টাইপের কুকুর। একটির মস্তিষ্ক অতি উত্তেজনাপ্রবণ, অন্যটির মস্তিষ্কে ছিল অতি-নিস্তেজনাপ্রবণতা। দুটিকেই ছয়টি শর্তাধীন পরাবর্ত শেখানো হলো। তারপর এদের আরো কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করা হলো। বেশ জোরালো বিদ্যুৎ তরঙ্গের শক খাদ্য-পরাবর্তের উদ্দীপক হিসাবে ব্যবহার করলেন পেত্রভা। সাধারণত এই ধরনের উদ্দীপকে শর্তহীন প্রতিরক্ষা-পরাবর্ত দেখা দিয়ে থাকে। আত্মরক্ষার সহজাত তাগিদে প্রাণীমাত্রেই এই ধরনের বেদনাদায়ক উদ্দীপক এড়িয়ে চলে। কিন্তু শিক্ষা দেবার ফলে কুকুর দুটি এই উদ্দীপকে প্রথমদিকে ঠিকমত সাড়া দিল ; তাদের খাদ্য-পরাবর্ত গড়ে উঠল। পরীক্ষক বারবার ওদের এই কঠিন পরীক্ষায় ফেলতে লাগলেন ; বৈদ্যুতিক শকের মাত্রাও বাড়িয়ে দিলেন। কুকুর দুটির স্নায়ুমণ্ডলীর এই চাপ সহ্য করতে পারল না ; তারা অসুস্থ হয়ে পড়ল। আগেকার তৈরী পরাবর্তগুলো বিশৃঙ্খল হয়ে গেল। অতি-উত্তেজনাপ্রবণটির নিস্তেজনা ক্ষমতা আরো কমে গেল, অতিমাত্রায় চীৎকার ও লাফঝাঁফ আরম্ভ করে দিল ; অতি-নিস্তেজনাপ্রবণটির ইতিবাচক পরাবর্ত ভেঙ্গে পড়ল, দিনরাত ঝিমুতে লাগল। এইভাবে

* The pre-requisites of a truly scientific basis for psychiatry are already in existence. These include—firstly, the reflection theory of knowledge, and secondly, certain objective, experimental approaches to mental phenomena. [Hurst, Joseph B ; The Neurotic, New York, Citadel Press, p viii]

ল্যাবরেটরীতে প্রথম নিউরোসিস সৃষ্টি করলেন পেত্রভা। এই অবস্থা বেশ কয়েকমাস স্থায়ী হল। নিস্তেজনাধর্মী কুকুরটি কয়েকমাসের বিশ্রামেই সুস্থ হয়ে উঠল, কিন্তু উত্তেজনাধর্মীটির বেলায় শুধু বিশ্রামে কাজ হল না। ব্রোমাইড জাতীয় ওষুধের প্রয়োজন হয়েছিল তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে।

তাদের অসুস্থতার কারণ কি? উপসর্গের এই বৈপরীত্যই বা কেন?

উত্তেজনা ও নিস্তেজনাক্রিয়ার তীব্র সংঘাত থেকে অসুস্থতার সৃষ্টি হয়েছে, — পাভলভের এই অভিমত। বেদনাদায়ক উদ্দীপকের দরুণ সহজাত আত্মরক্ষার পরাবর্ত নিবৃত্ত করতে হচ্ছে। আবার সেই উদ্দীপককে ভিত্তি করে শর্তাধীন খাদ্য-পরাবর্ত গড়ে তুলতে হচ্ছে। এই দুই বিপরীত প্রক্রিয়ার পরস্পর বিরোধিতার ফলে মস্তিষ্ককোষ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অতি-উত্তেজনাপ্রবণ কুকুরটির নিস্তেজনা প্রক্রিয়া ক্রমশ হ্রাস পেয়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। আর অন্যটির বেলায় উত্তেজনা-ক্ষমতা আরো কমে যাওয়ায় কুকুরটি দুর্বল, নিস্তেজ ও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

অন্য একজন গবেষক রিকম্যানের পরীক্ষাধীন কুকুরটিও ছিল অতি-নিস্তেজনা-ধর্মী। রিকম্যান কুকুরটির উপর অল্প সময়ের মধ্যে কয়েকটি অস্বাভাবিক জোরালো উদ্দীপকের প্রভাব পরীক্ষা করতে চাইলেন। দর্শন ও শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে বিশেষভাবে উত্তেজিত করল এইসব উদ্দীপক। প্রতিক্রিয়াও সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল। কুকুরটা প্রথমটায় বিচলিত ও অস্থির হয়ে উঠল। তারপর স্থির ও শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনের পা দুটো প্রসারিত, মাথা পেছন দিকে হেলানো, চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে; অদ্ভুত আকৃতি ধারণ করল কুকুরটি। সব পরাবর্ত ভেঙ্গে পড়ল। দু-সপ্তাহ ধরে এই অবস্থা রইল; কিন্তু এরপরও ঐসব অস্বাভাবিক উদ্দীপকের যে কোনো একটা প্রয়োগ করলেই কুকুরটি অসুস্থ হয়ে পড়ত।

এবার উত্তেজনা- নিস্তেজনার সংঘাত নয়: নিউরোসিস সৃষ্টি হয়েছে মাত্রাধিক উত্তেজনার দরুণ। নিস্তেজনা-প্রক্রিয়া উচ্চ-মস্তিষ্ক থেকে মধ্যমস্তিষ্ক পর্যন্ত নেমে এসেছে। মাত্রাধিক উত্তেজনা প্রতিরক্ষামূলক নিস্তেজনা ঘটিয়েছে। ল্যাবরেটরীতে রিকম্যান 'নার্ভাস ব্রেকডাউন' সৃষ্টি করেছেন। ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লেনিনগ্রাডে ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি-বন্যার সময় এই কুকুরটি আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে। এবার আরো স্থায়ী হয়েছিল 'নার্ভাস ব্রেকডাউন'। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মাত্রাধিক উত্তেজনার দরুণ নিউরোসিস ঘটাতে পারে।

প্রথম দিককার পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে মনে হয়েছিল যে সুষম টাইপ বুঝি নিউরোসিসে আক্রান্ত হয় না। আরো মনে হয়েছিল যে, উপসর্গগুলোর সব সময়েই বুঝি নার্ভতন্ত্রের টাইপ অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য থাকে। পরবর্তী গবেষণার ফলে

এই ধারণার পরিবর্জন পরিবর্ধন ঘটে। আরো অনেক নতুন তথ্য সংগৃহীত হবার ফলে পাভলভের তত্ত্ব আরো বেশী সমৃদ্ধ হয়।

মস্তিষ্কের টাইপ সব সময়ে অসুস্থতা-সুস্থতার নিদর্শক নয়। যে কোনো সবল সুষম টাইপেরও নিউরোসিস হতে পারে বা 'নার্ভাস ব্রেকডাউন' ঘটতে পারে : নির্ভর করছে পরিবেশের জটিলতা ও চাপের উপর। অনেক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত ও যোগাযোগ থেকে মানসিক রোগ দেখা দেয়। ঘটনার বিশেষ ধরন এবং প্রাণীর পূর্ব-অভিজ্ঞতাজাত মানসিকতাও মানসিক বিপর্যয়কে প্রভাবিত করে। পর পর অনেক আঘাত বা কঠিন কাজের সম্মুখীন হলে সবল সুষম প্রাণীও অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে।

পেত্রভা ও রিকম্যানের পর ল্যাবরেটরীতে আর এক ধরনের কারণ নির্ণয় করা হল। দেখা গেল, উদ্দীপকের পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলার হেরফের করেও কুকুরকে বিভ্রান্ত ও অসুস্থ করা যায়; বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্দীপকভিত্তিক শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে তোলবার পর যদি উদ্দীপকের সময় এদিক-ওদিক করা হয়, তা হলে অনেক সময় কুকুর অসুস্থ হয়ে পড়েছে দেখা যায়। বাঁধাধরা অভ্যাসের ব্যতিক্রম এখানে অসুস্থতার কারণ। মানুষের বেলাতেও এই ধরনের অসুস্থতা দেখা দিয়ে থাকে। নিত্য অভ্যস্ত জীবনধারার আকস্মিক পরিবর্তন ঘটলে অনেক মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাই চাকরী থেকে অবসর গ্রহণের পর কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিউরোসিস দেখা যায়।

পেত্রভার পরীক্ষাধীন কুকুরদের নিস্তেজনা প্রক্রিয়ার উপর অতিরিক্ত চাপ পড়েছিল, রিকম্যানের পরীক্ষায় উত্তেজনা-প্রক্রিয়ার মাত্রাধিক পীড়ন ঘটেছিল, আর এই ক্ষেত্রে স্নায়ুতন্ত্রের গতিময়তার উপর বেশী চাপ পড়ছে। উত্তেজনা, নিস্তেজনা আর গতিময়তা এই তিন প্রক্রিয়ার উপর অতিরিক্ত পীড়নের ফলে এই প্রথম নিউরোসিসের মডেল তৈরী হলো। ক্লিনকে কারণ বিশ্লেষণ করে পাভলভ নিজের যুক্তির সমর্থন পেলেন। আকস্মিক মানসিক আঘাত বা বিপর্যয়, বিপরীতধর্মী কার্যকলাপ বা চিন্তা ভাবনার সংঘর্ষ এবং অভ্যস্ত জীবনযাত্রার হঠাৎ পরিবর্তন— এই তিন কারণেই মানুষের নিউরোসিস হয়ে থাকে। পরীক্ষামূলক নিউরোসিস থেকে পাওয়া আরও একটি তথ্য মনের রোগের হাসপাতালে সমর্থিত হল। রোগ-উপসর্গের প্যাটার্ণ সম্পর্কিত ধারণাও বদলে গেল। জানা গেল যে মস্তিষ্কের টাইপ আর রোগের টাইপের পূর্ববর্ণিত সম্পর্ক সবসময় সব অবস্থায় সঠিক নয়।

পরীক্ষামূলক নিউরোসিসের উপসর্গ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পাভলভ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের ফলে মস্তিষ্কের বহু জটিল ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ও অস্বাভাবিক ব্যবহারের হদিশ পাওয়া গেল। সম্মোহনের বিভিন্ন পর্ব-সংশ্লিষ্ট এই আবিষ্কার পাভলভীয় মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। প্রথম

তৃতীয় খণ্ডে এ-বিষয়ে আলোচনা আছে। মানসিক ধর্ম ও মনোরোগীর অনেক তথাকথিত দুর্বোধ্য আচরণ ও সংলাপ যে মস্তিষ্কের নিদ্রা-জাগরণের পরিবৃত্তি-কালীন অবস্থার ও পরিবেশের প্রভাব সঞ্জাত—পরীক্ষাগারে সঞ্জাত তথ্যের সাহায্যে সেই ধারণা প্রমাণিত হল।

পরীক্ষাধীন কুকুর মৃদু একঘেয়ে উদ্দীপকের প্রভাবে প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়ত। বলা চলে, তারা সম্মোহিত হয়েছে। এই সময় জাগ্রত থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় উপনীত হবার মধ্যে তিনটি পর্ব বা দশার সন্ধান পেলেন পাভলভ। সম্মোহনের এই তিন পর্ব নিস্তেজনা প্রক্রিয়ার বিস্তার সাপেক্ষ। এই তিন পর্বে মস্তিষ্কের ধর্ম তিন রকমের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে দেখা দিয়ে থাকে। প্রথম পর্বের নাম সমতাপর্ব বা phase of equalisation ; এই পর্বে জোরালো এবং ক্ষীণ উদ্দীপক একই মাত্রার সাড়া জাগায়। জাগ্রত অবস্থায় উদ্দীপক-শক্তির তারতম্যের সঙ্গে সাড়ার মাত্রা বেশী কম হয়। দশ মাত্রার উদ্দীপকে যদি দশ ফোঁটা লালা ঝরে, তবে কুড়ি মাত্রার উদ্দীপকে ঝরবে কুড়ি ফোঁটা, তিরিশ মাত্রায় তিরিশ ফোঁটা; ইত্যাদি। সমতা পর্বে এই স্বাভাবিক ব্যবহার বা প্রতিক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে। নিস্তেজনা এই পর্বে অনেকটা ছড়িয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় পর্বের নাম আপাত-স্ববিরোধী বা paradoxical পর্ব। এই পর্বে জোরালো উদ্দীপকে নামমাত্র সাড়া জাগে অথবা একেবারেই জাগে না ; অথচ ক্ষীণ উদ্দীপকে সাড়া জাগায়, বেশ জোরালো সাড়া জাগায়। নিস্তেজনার আরো বিস্তার ঘটেছে। তিরিশ মাত্রার উদ্দীপকে লালা ঝরছে না, কুড়িমাত্রার উদ্দীপকে হয়ত বা পাঁচ ফোঁটা পড়ল, কিন্তু দশমাত্রার উদ্দীপকে লালার মাত্রা অনেক বেড়ে গেল। সম্মোহিত অবস্থায় সংবেশকের মৃদু নির্দেশ জোরালো উদ্দীপকের কাজ করে, আমরা জানি। পাভলভের মতে সম্মোহিত অবস্থা পরীক্ষাধীন paradoxical phase-এর সঙ্গে তুলনীয়। সম্মোহন, পাভলভ মনে করেন, মস্তিষ্কের আংশিক নিস্তেজনার ফল ; আর ঘুমে নিস্তেজনাপ্রবাহ প্রায় গোটা মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে।

তৃতীয় পর্বকে বলা হয় অতি স্ব-বিরোধী বা ultra paradoxical পর্ব। এই সময় নেতিধর্মী উদ্দীপক ইতিবাচক হয়ে ওঠে, ইতিধর্মী হয়ে ওঠে নেতিবাচক।

সুস্থ মস্তিষ্কে এই পর্ব তিনটি ক্ষণস্থায়ী এবং তৃতীয় পর্বের পরই প্রাণী ঘুমিয়ে পড়ে। অসুস্থ অবস্থায় কিন্তু যে কোনো একটি পর্ব কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।

সম্মোহন-পর্বের আবিষ্কারের ফলে বোঝা গেল যে নিউরোসিসের উপসর্গ হয় উত্তেজনাভিত্তিক না হয় নিস্তেজনাভিত্তিক হবে (পেত্রভের প্রথম পরীক্ষা)—এ ধারণা ঠিক নয়। উত্তেজনাভিত্তিক উপসর্গের সঙ্গে যে কোনো সম্মোহন পর্বের উপসর্গও দেখা দিতে পারে ; আবার নিস্তেজনাধর্মী প্রাণীর উপসর্গেও উত্তেজনার

প্রকাশ থাকতে পারে। মানুষের হিষ্টিরিয়া প্রথম সাংকেতিক-তন্ত্রের প্রাধান্য সূচিত করে এবং প্রধানত দুর্বল মস্তিষ্কের রোগ। কিন্তু সব হিষ্টিরিয়া রোগী যে দুর্বল হবে এবং তাদের মস্তিষ্কে প্রথম সাংকেতিক-তন্ত্রের প্রাধান্য থাকবে এমন কোনো কথা নেই।

শক্তি, ভারসাম্য ও গতিময়তা—মস্তিষ্কের এই তিনটি প্রধান ধর্মের যে কোনো একটির অতিমাত্রায় পীড়নের ফলে সবল দুর্বল সব রকমের প্রাণীরই নিউরোসিস দেখা দিতে পারে। ল্যাবরেটরীর প্রথমদিককার পরীক্ষামূলক নিউরোসিস থেকে এইটুকু জানা গেল। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে, মনোবিকার অতি পীড়নের অব্যবহিত পরেই ঘটবে—এমন কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। দু'চার দিন পরেও অসুখ দেখা দিতে পারে। (I. Smolensky, Pathophysiology of the Higher Nervous Activty, p-15, Moscow 1954) এরপরও অবশ্য আরও অনেক জটিল বিষয় নিয়ে গবেষণা চালান পাভলভ। মস্তিষ্কের অংশ-বিশেষের অনড় অবস্থা বুঝতে নতুন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে। অবশেসন বা আচ্ছন্ন অবস্থার আলোচনার সময় সেইসব পরীক্ষার ফলাফল উত্থাপন করা হবে। পাভলভের নির্দেশিত পথে যে কোনো মানসিক অসুস্থার কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। এখন ল্যাবরেটরীতে প্রাণীর উপর পরীক্ষা থেকে পাওয়া তথ্য এবং জ্ঞান কিভাবে ক্লিনিকে প্রযুক্ত হল, আমাদের জানা দরকার। উচ্চমস্তিষ্কের কার্মিক ব্যাধি অন্য ভাবে, খুব ধীরে ধীরে দেখা দিকে পারে।*

এখানে পরীক্ষামূলক নিউরোসিস সৃষ্টির পূর্ববর্ণিত তিনটি কারণের একটিও বর্তমান নেই, তথাপি উচ্চমস্তিষ্কের কাজকর্মের বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে—অনেকটা ল্যাবরেটরীতে সৃষ্টি নিউরোসিসের মত। আগেকার শেখা শর্তাধীন পরাবর্ত ভেঙ্গে পড়ছে, আনকোরা নতুন পরাবর্ত সৃষ্টির খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে না। এ-ছাড়া কিছু ক্ষেত্রে অন্তর্জাত নিস্তেজনার দুর্বলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে অর্থাৎ

---

* "There is a special group of chronic disturbances of the higer nervous activity which develops, so to say leisurely, are not connected with any definite and obviously difficult task and conseqnently do not have the character of an acute nervous breakdown.

"In some cases, usualy after long and uninterrupted Laboratory work with one and the same conditioned stimulus (for 2 to 4 years and more) all conditioned reflexes began to fade away and vanish ..." (I. Smolensky, Pathophysiology of the Nervous system) ...

উত্তেজনা আপনা থেকে কমছে না।

ক্লিনিকে রোগী সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা থেকেও এই ল্যাবরেটরিতে পরিলক্ষিত আপাত দৃষ্টিতে কারণবিহীন ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা নিউরোসিসের সমর্থন মেলে। রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে কারাবাসের একঘেয়েমির পর এই ধরনের অসুস্থতা দেখা দিয়ে থাকে। বেশ কিছু কাল বিশ্রাম এবং নানা রকমের আনন্দদায়ী মৃদু উদ্দীপনার ফলে এই অসুখ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেরে যায়।

পরীক্ষামূলক নিউরোসিস থেকে মনোরোগের প্রাথমিক সূত্রগুলি আবিষ্কৃত হল, কিন্তু শেষ অভিমত প্রকাশের মত জ্ঞান অর্জন করা হল না। কুকুরের উপর পরীক্ষিত তথ্য যান্ত্রিকভাবে মানুষের উপর প্রয়োগ করা চলে না। কুকুরের স্নায়ু-তন্ত্র ও মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যমূলক পার্থক্যের কথা পাভলভ সব সময় মনে রেখেছেন। কথা বলার ক্ষমতা মানুষকে প্রাণীজগৎ থেকে সম্পূর্ণ এক পৃথক শক্তির অধিকারী করেছে। বাকৃতন্ত্র বা এই দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্রের কথা বিচার না করে মানুষের রোগ নির্ণয় বা চিকিৎসা সম্ভব নয়। এই দ্বিতীয়তন্ত্র বিবর্তনের শেষ ধাপে গঠিত হয়েছে এবং এই তন্ত্র জাগ্রত মানুষের চিন্তা-ভাবনা আচার-ব্যবহারের প্রধান নিয়ন্ত্রক। এখানে ফ্রয়েডের সঙ্গে পাভলভের মতভেদ লক্ষণীয়। সহজাত প্রবৃত্তি যথেষ্ট শক্তিশালী কিন্তু মানসিকতার নিয়ামক নয়,—এই হচ্ছে পাভলভের বক্তব্য। ফ্রয়েড গুরুত্ব দিয়েছেন নির্জ্ঞান-এর উপর, পাভলভ দিয়েছেন চৈতন্যের উপর। মনোরোগ সম্পর্কে গবেষণার জন্য জীবনের শেষ কয়েক বছর পাভলভ মানসিক রোগের ক্লিনিকে নিজেকে পুরোপুরি নিয়োজিত করেন। নিউরোটিক ব্যবহারের মূলে নার্ভতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আরও অনেক কিছু বিচার্য বলে তিনি বিবেচনা করলেন। রোগীর সমাজ জীবন, পারিবারিক জীবন, কর্মস্থান, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি জীবনের সব কিছু না জানলে কারণ নির্ণয় বা চিকিৎসা সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি বা তাঁর ছাত্ররা কখনও নির্জ্ঞান প্রেষণা বা অবদমিত ইচ্ছা নিয়ে মাথা ঘামান না। তাঁরা মনে করেন নিউরোটিক ব্যবহারের জন্য স্নায়ুতন্ত্রের বৈকল্য বা বিশৃঙ্খলা দায়ী। তাঁদের প্রধান বিচার্য কিভাবে এবং কেন এই স্নায়ুতন্ত্রের প্রক্রিয়াগত বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। মানসিক আঘাত, মানসিক দ্বন্দ্ব এবং জীবনের বিশেষ পরিবর্তনের ইতিহাস থেকে তিনি এর উত্তর পাবার চেষ্টা করেন। আপাতদৃষ্টিতে অন্য স্কুলের চিকিৎসকদের সঙ্গে এ-ব্যাপারে তাঁদের কোনো পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু আঘাত ও দ্বন্দ্বের ব্যাখ্যা ও তা থেকে সিদ্ধান্তে আসার ব্যাপারে পাভলভ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারেন।

কুকুরের উপর পরীক্ষালব্ধ তথ্য প্রাথমিক জ্ঞানের সূচনা মাত্র। ক্লিনিকে সেই জ্ঞান প্রয়োগের ফলে অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেল, জ্ঞানের

পরিধি আরও বিস্তৃত হল। পরীক্ষামূলক নিউরোসিস পাভলভ-তত্ত্বের প্রধান অবলম্বন এবং মনোরোগের সহজ সাধারণ মডেল। মস্তিষ্কাশ্রিত মনোবিজ্ঞান পাভলভের এই গবেষণার ফলে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ।

এককথায় বলতে গেলে, নিউরোসিস চলমান ভারসাম্যের বিপর্যয়। জীবন পথে চলতে গিয়ে মানুষকে অনেক আঘাত, অনেক দ্বন্দ্ব, বিরোধ, সমস্যা, অনেক পরিবর্তনের মুখোমুখি হতে হয়। আঘাত সহ্য করে, দ্বন্দ্ব-বিরোধের সঙ্গে লড়াই করে, সমস্যার সমাধান করে, বাইরের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানুষ মানিয়ে নেয়। এইভাবে চলমান ভারসাম্য বজায় থাকে। যখন বহির্বাস্তবের চাপ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন ঘটে নার্ভ-প্রক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা।

অনুষঙ্গ পদ্ধতিতে কিভাবে ফ্রয়েডিয়ানরা সাইকো-এ্যানালিসিস করে থাকেন, তা অনেকেরই জানা থাকার সম্ভবনা। কেননা অনেকদিন ধরেই এ-বিষয়ে পুঁথি পুস্তক, পত্র-পত্রিকা বাজারে পাওয়া যায়। পাভলভের রোগ নির্ণয় পদ্ধতি এবং বিশ্লেষণের ধারা তত বেশী পরিচিত নয়। তাই এ সম্বন্ধে আরো দু-একটি কথা বলা উচিত মনে করছি। পাভলভ ও ফ্রয়েডের তত্ত্বগত পার্থক্যও এর ফলে পাঠকের কাছে অনেকটা সহজবোধ্য হবে।

কুড়ি বছর ধরে হাসপাতালের বিছানায় নিশ্চল নির্বাক হয়ে শয্যাগত থাকার পর একজন রোগী অল্প অল্প নড়াচড়া কথাবলা আরম্ভ করলেন যখন, তখন তাঁর বয়স ষাট। এতদিন তাঁকে টিউব দিয়ে খাওয়ানো হয়েছে। এই খাদ্য হজম করা ছাড়া আর কোনো সক্রিয় জীবনের লক্ষণ তাঁর মধ্যে ছিল না। অবশ্য অগভীর শ্বাসপ্রশ্বাস ও দুর্বল নাড়ীর স্পন্দন থেকেও বোঝা যেত যে তিনি জীবিত আছেন। তবে তাঁকে দেখে চট করে বোঝা যেত না যে তিনি জীবিত না মৃত। এই জীবন্মৃত অবস্থা ক্রমশ কেটে যেতে লাগল ; নিজের চেষ্টায় বসতে পারলেন, কথাও বলতে লাগলেন। নিজের অবস্থা প্রসঙ্গে বললেন যে তিনি সবকিছু শুনতে পেতেন, বুঝতে পারতেন, কিন্তু কথা বলার বা নড়াচড়া করার শক্তি ছিল না। হাত-পা-জিভ সবই পাথরের মত ভারী মনে হত। কথা ত দূরের কথা, নিঃশ্বাস নেওয়াই ছিল এক প্রাণান্তকর কঠিন ব্যাপার।

পাভলভের আগে বহু চিকিৎসকই এই রোগীকে দেখেছিলেন এবং এ-নিয়ে অনেক আলোচনাও করেছিলেন। এই অসাড় নিশ্চল অবস্থা, অনেকে মনে করেছিলেন—তীব্র প্রক্ষোভের ফল। এঁরা কেউই মস্তিষ্কের বিশেষ অবস্থা নিয়ে মাথা ঘামালেন না। শারীরবৃত্তিক ব্যাখ্যা দিতে প্রথম এগিয়ে এলেন পাভলভ। এই অনড় অচল অবস্থার জন্য উচ্চমস্তিষ্কের কি ধরনের বিকলতা দায়ী সেই বিচারে প্রবৃত্ত হলেন তিনি। পাভলভের রোগনির্ণয় পদ্ধতি ও বিশ্লেষণের রীতির বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সমসময়েই রোগীর নার্ভতন্ত্রের ক্রিয়াকলাপের বৈকল্য ও বৈশিষ্ট্য

নিয়ে মাথা ঘামাতেন। কেন অসুস্থতা? সমাজ ও পরিবেশের কোন আঘাত, কোন দ্বন্দ্ব অসুস্থতার কারণ? নিঃসন্দেহে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। পাভলভ এ প্রশ্নের জবাব ত খুঁজতেনই, উপরন্তু নার্ভতন্ত্রের বিকার বৈকল্য সঠিকভাবে অনুধাবন করে রোগী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করতেন। বিষয়ীগত খুঁটিনাটির দিকে নজর না দিয়ে বিকারতত্ত্বের দিকে বেশী মনোনিবেশ করতেন। উপসর্গ সৃষ্টির কারণ বিশ্লেষণ করতেন স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা-নিস্তেজনা গতিময়তার পরিপ্রেক্ষিতে। ফ্রয়েড রোগ উপসর্গের কারণ বিশ্লেষণ করতেন নির্জ্ঞানরাজ্যে, পাভলভ অনুসন্ধান করতেন কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রে; বিশেষ করে গুরুমস্তিষ্কের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মধ্যে সংজ্ঞান রাজ্যে। কেননা, পাভলভের মতে মনের বিকার গুরু মস্তিষ্ক-ক্রিয়ার বিকার ছাড়া ঘটে না।

পাভলভের কাছে এই রোগীর উপসর্গগুলির বৈশিষ্ট্য কিভাবে প্রতিভাত হল? উচ্চমস্তিষ্কের কোন্ ধরনের বিশৃঙ্খলা এই অনড় অশক্ত অবস্থার জন্য দায়ী? প্রধানত তার পেশীগুলোর উপর সে কর্তৃত্ব হারিয়েছে, ইচ্ছামত দেহের কোনো অংশই নাড়াতে পারছে না, দেখাশোনা বোঝার ক্ষমতা রয়েছে। সুতরাং উচ্চমস্তিষ্কের শুধু একটি বিশেষ অংশ, যা অঙ্গ সঞ্চালনের জন্য দায়ী, যাকে বলা হয় চেষ্টিয় অংশ—এ ক্ষেত্রে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়। তিনি সিদ্ধান্তে এলেন যে, এর বেলায় যা ঘটেছে তাকে বলা চলে—শুধুমাত্র চেষ্টিয় অংশের ব্যাপক নিস্তেজনা।*

এ ধরনের বিশেষ নিস্তেজনা ল্যাবরেটরীতে কুকুরের মস্তিষ্কে পাভলভ দেখেছেন, মানুষের এ অবস্থার কথাও তিনি জানেন। এ অবস্থা এক ধরনের সম্মোহিত অবস্থা। সম্মোহনের নানা পর্ব নিয়ে পাভলভের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা আমরা জানি; সম্মোহনের এক পর্বে মানুষের ঠিক এই অবস্থা হয়। সব বুঝতে পারে, শুনতে পারে; কিন্তু পেশীগুলো স্বেচ্ছাচালিত অবস্থায় থাকে না। ঘুম ভাঙার পর কিছুক্ষণ এই অবস্থায় থাকার অভিজ্ঞতা অনেকেরই হয়ত আছে। শেষ পর্যন্ত তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে রোগী আংশিক ভাবে নিদ্রাচ্ছন্ন বা সম্মোহিত।**

এখন প্রশ্ন আসবে মস্তিষ্কের অংশ বিশেষের এই নিস্তেজনার কারণ কি? কি ভাবে এবং কেন এই নিস্তেজনা ঘটেছে?

উত্তরে পাভলভ প্রধানত দুটি কারণের নির্দেশ দিলেন। হয়ত মস্তিষ্কের চেষ্টিয়

---

* The exclusion of the activity of only the motor region of the cerebral hemisphares.

** The patient would present an example of chronic partial sleep or hypnosis.

পদার্থ নিঃশেষিত হয়ে গেছে কোনো বিশেষ কষ্টসাধ্য কাজের ফলে; কিম্বা অন্য কোনো স্থানের ক্ষয়ক্ষতির দরুণ সাধারণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মস্তিষ্ক; ফলে ঘটেছে চেষ্টিয় অংশের এই নিস্তেজনা। ষাট বছর বয়সে আপনা থেকে রোগী আরোগ্য লাভ করছে—এ থেকে পাভলভ মনে করলেন তাঁর বক্তব্য সঠিক ভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। বার্ধক্যে নিস্তেজনা স্বভাবত হ্রাস পায়। অনেকে ষাট-পঁয়ষট্টির কোটা পেরিয়ে প্রগলভ, চপলমতি হয়ে দায়িত্বহীন কথাবার্তা বলে থাকেন। চলতি কথায় এই অবস্থাকে বলে 'বাহাত্তুরে পাওয়া'। শারীরবৃত্তিক পরিভাষায় বার্ধক্যে নিস্তেজনা কমতে থাকে; ফলে কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহারে অসংযমী হয়ে ওঠেন অনেক বৃদ্ধ।

এবার যে পরীক্ষাটির কথা বলতে যাচ্ছি আবেশ বা অবশেসনকে (obsession) বুঝতে সেটি আমাদের অনেকখানি সাহায্য করবে। এটিরও সূত্রপাত করেন পেত্রভা। সিঁড়ির উঁচু ধাপে পরীক্ষাধীন কুকুরটিকে খাবার দেওয়া হচ্ছিল; একবার এই অবস্থায় উঁচু থেকে কুকুরটি মেঝের উপর পড়ে গেল। এরপর কয়েকবার এই পরীক্ষাটির পুনরাবৃত্তি করা হয়। ফলে কুকুরটির মধ্যে নিউরোসিসের সাধারণ লক্ষণ প্রকাশ পেল, সঙ্গে সঙ্গে উঁচু জায়গার ভয়ও দেখা দিল। খেতে অনিচ্ছা, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে অক্ষমতা, সব সময় ঘরের দেওয়াল ঘেঁসে চলা,—ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পেল: 'অবশেসনের' একটি মডেল তৈরী হল। উঁচু জায়গায় ভয়—এই উপসর্গগুলোর মধ্যে প্রধানতম উপসর্গ হিসেবে দেখা দিল।

অন্যান্য পরীক্ষাগুলো থেকে পেত্রভার এই পরীক্ষাটির পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য কোথায়? অন্যান্য পরীক্ষাগুলোতে গোটা মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের বিকার ও ত্রুটি ঘটেছে, এখানে বিশেষভাবে একটি বা কয়েকটি কোষসমষ্টিতে অসুস্থতা প্রকাশ পেয়েছে। পাভলভের ভাষায়—'অ্যান এনটায়ারলি আইসোলেটেড এরিয়া অফ দি কর্টেক্স' অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মস্তিষ্কের চলমান ভারসাম্যের অভাব থেকে এই অসুস্থতা সৃষ্টি হয়েছে। উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে খাদ্য গ্রহণের সময় কুকুরটিকে এক বিশেষ ধরনের 'ডায়নামিক স্টেরিওটিপি' বজায় রাখতে হয়েছিল। কয়েকবার পড়ে যাবার ফলে চলমান ভারসাম্য বজায় রাখার কাজে বাধার সৃষ্টি হয়েছে। নিজেকে বিশেষ অবস্থায় মানিয়ে নেবার অক্ষমতা থেকে মস্তিষ্কের কয়েকটি বিশেষভাবে সম্পর্কিত বিন্দুর নিস্তেজনা ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে, বিন্দুগুলি উত্তেজিত অবস্থায় অনড় হয়ে পড়েছে। উঁচু জায়গা থেকে পড়ে যাবার ভয়ের দরুণ উত্তেজনা সারা মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়েনি বটে, কিন্তু ঐ বিশেষ বিন্দুগুলিতে যেন অবস্থান ধর্মঘট করে বসে আছে। শর্তাধীন পরাবর্তটি যেন এক জায়গায় জমে 'ফ্রোজন' হয়ে পড়েছে। কণ্ডিশন বদলে গেছে, তবুও পরাবর্তটির পরিবর্তন ঘটছে না; কেননা উত্তেজিত বিন্দুটির উত্তেজনা প্রায় স্থায়িত্বের পর্যায়ে

পৌঁছে গেছে। আশেপাশের অন্যান্য অংশ সুস্থ রয়েছে, কাজেই যুক্তিবুদ্ধি সাধারণভাবে মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করছে। কিন্তু অসুস্থ অংশগুলোর ক্রিয়াকলাপে যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, যুক্তিবুদ্ধি উত্তেজিত অংশের সুস্থতা ফিরিয়ে আনতে পারছে না।

অনেক সময় দেখা যায় যে অবসেশনাল নিউরোসিসের রোগীর মনে পুরণো ধারণার বিরোধী অবস্থার প্রকাশ ঘটেছে। নিজের দৈহিক সুস্থতা যার গর্বের বিষয় ছিল সেই লোক রোগের ভয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে। চিরদিন সততা ও সামাজিকতায় অভ্যস্ত ব্যক্তির মনে ভয় ঢুকেছে যে সে অসৎ, অসামাজিক কাজ করে বসতে পারে। সন্তানকে যে নিজের থেকেও ভালবাসে, তার মনে ভয়— সন্তানকে সে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারে। সাধারণভাবে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় ধরে নেওয়া হয় যে রোগীর নির্জ্ঞানে ঐ ধরনের কোন অবদমিত ইচ্ছা রয়েছে, অথবা অন্য কোনো অপরাধবোধ থেকে এই অপরাধমন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। যে ভাবেই ব্যাখ্যা দেওয়া যাক না কেন রোগী আরও বেশী আতঙ্কিত, সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। পাভলভ নির্জ্ঞানবাদ বা রহস্যবাদের সাহায্য না নিয়ে এই বিশেষ মানসিকতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মস্তিষ্কের এই অতি স্ব-বিরোধী অবস্থার (আলট্রা প্যারাডক্সিক্যাল) শারীরবৃত্তমূলক তাৎপর্য পূর্বেই বিশেষভাবে বিবৃত হয়েছে। বস্তুবাদী মনস্তাত্ত্বিকের কাছে বৈপরীত্যের ডায়ালেকটিস অতি পরিচিত ঘটনা।

এইবার যে প্রশ্নটি উত্থাপন করব, সেটি নিয়ে পাভলভপন্থীদের মধ্যেও যথেষ্ট মতভেদ বিদ্যমান। কোন ধরনের মস্তিষ্ক আবেশিক নিউরোসিসে আক্রান্ত হয়? একদল বলেন যে আবেশিক বা অবসেশনাল নিউরোসিস দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের প্রাধান্য থেকে সৃষ্টি হয়। 'সাইকেসথেনিয়া' দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের অতিপ্রাধান্যজনিত রোগ। স.ধারণভাবে একে হ্যামলেটের মানসিক বৈশিষ্ট্য বলে ধরা হয়। 'হবে কি হবে না?' এই নিয়েই এদের চিন্তা। অবশ্য কোনো শারীরিক রোগ বা মানসিক দুর্যোগ আগে থেকে মস্তিষ্ককে দুর্বল করে দেবার ফলেই আবেশিক নিউরোসিসের আক্রমণ ঘটে। এই মতাবলম্বীরা এই রোগকে দুরারোগ্য বলে মনে করেন।

অন্য এক দলের মতে, আবেশিক নিউরোসিস শুধু বুদ্ধিবাগীশদের রোগ নয়। যখন বুদ্ধিবাগীশরা এই রোগে আক্রান্ত হন তখন হয়ত এর আরোগ্য দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসা এবং অন্যান্য অনেক কিছু শর্তের উপর নির্ভরশীল। প্রথম সাংকেতিক স্তরের আধিক্য যে মস্তিষ্কে, সে মস্তিষ্কেও আবেশিক নিউরোসিস দেখা দিয়ে থাকে। পেত্রভার পরীক্ষাধীন কুকুরটির উল্লেখ করে এঁরা বলেন যে, পশুর মধ্যে আতঙ্কের আবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে: পশুর দ্বিতীয় সাংকেতিক

স্তরের বালাই নেই। কাজেই অবসেশনকে এঁরা সাইকেসথেনিয়ার সঙ্গে যুক্ত করতে চান না। অবসেশন এঁদের চিকিৎসায় আরোগ্য হয়েছে বলে এঁরা দাবী করেন।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে হয়, শিল্পী-মস্তিষ্কও (যাদের মধ্যে প্রথম সাংকেতিক স্তর বা অনুভূতি-সংবেদনের আধিক্য) আবেশিক নিউরোসিসে আক্রান্ত হয়ে থাকে। শিল্পী-মস্তিষ্ক সাধারণ অভিভাবনে সাড়া দিয়ে থাকে, কাজেই এই টাইপের রোগীদের আরোগ্যের সম্ভাবনা বেশি।

আবেশিক অবস্থা বা বাধ্যকারী (কমপালসিভ) ক্রিয়াকলাপ সব সময়েই শুধু নিউরোসিসের উপসর্গ নাও হতে পারে। স্কিজোফ্রেনিয়ার মত সাইকোসিসেও অনেক সময় আবেশিক উপসর্গ, বিশেষ করে রোগাতঙ্কের (হাইপোকনড্রিয়া) লক্ষণ দেখা দিতে পারে। অন্যান্য সাইকোসিস বা উন্মাদ রোগেও আবেশিক রোগ লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। আবার অন্যান্য নিউরোসিসের সঙ্গেও আবেশিক বা বাধ্যকারী উপসর্গের আবির্ভাব ঘটতে পারে। প্রথমদিকে নিউরোসিস বিশেষ একটি ধরনের উপসর্গ নিয়ে দেখা দিলেও, কিছুদিন পরে নানা উপসর্গের সৃষ্টি হয়। একেবারে অবিমিশ্র নিউরোসিস খুব কমই পাওয়া যায়।

পাভলভ-ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে নিউরোসিসের কারণ সম্পর্কে আর যে সব তথ্য পাওয়া গেছে, এখানে তার অবতারণা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

নিউরোসিস-উৎপাদন পরীক্ষা থেকে প্রাণীর নানা রকম দৈহিক উপসর্গ দেখা দিয়েছে এবং দেখা দিয়ে থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাসের হ্রাস বৃদ্ধি, রক্তচাপ কমা-বাড়া ইত্যাদি উপসর্গ সব রোগীর বেলাতেই লক্ষ্য করা যায়। ল্যাবরেটরীর কুকুরের উপর পরীক্ষা করার সময় লক্ষ্য করা গেছে যে তাদের লালা নিঃসরণ বিনা কারণে বাড়ছে, লোম পড়ে যাচ্ছে, একজিমা জাতীয় চর্মরোগ বা অন্য ধরনের ক্ষত দেখা দিয়েছে। এ-ছাড়া যে কোনো আন্তরযন্ত্রের বিশৃঙ্খলা নিউরোসিসে দেখা দিতে পারে। হজমের গোলমাল. ডিসপেপসিয়া, অন্ত্রক্ষত ইত্যাদি নানা রকমের রোগলক্ষণ পরীক্ষাধীন কুকুরগুলোর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। আমেরিকান চিকিৎসকরা (সাইকো-সোমাটিষ্ট) মানসিক বিশৃঙ্খলা থেকে উৎপন্ন শারীরিক ব্যাধি বলে যে-সব উপসর্গের নামকরণ করেছেন, পাভলভিয়ানরা সেগুলোকে কার্টিকো-ভিসেরাল, অর্থাৎ মস্তিষ্ক প্রভাবিত আন্তর-যান্ত্রিক গোলযোগ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। পাভলভের প্রত্যয় অনুযায়ী গুরুমস্তিষ্ক শুধু যে বহির্বাস্তবের সঙ্গে প্রাণীর সামঞ্জস্যবিধান করে তাই নয়, প্রাণীর দেহের ভিতরকার প্রতিটি যন্ত্রের ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রণও করে। মস্তিষ্কের বিশৃঙ্খলা কয়েকটি কোষের মধ্যেই

সীমাবদ্ধ থাকে না, সাধারণভাবে সারা মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়ে ; কাজেই দেহ মনকে সমানভাবে প্রভাবিত করে। নিউরোসিস থেকে শারীরিক পরিবর্তন এবং দৈহিক অসুস্থতা ঘটে থাকে। পাভলভের মৃত্যুর পর কলতুসীর গবেষণাগারে বিকফ ও তাঁর সহকর্মীরা এ নিয়ে অনেক ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং তার ফলে বহু তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে।

এইবার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। এযাবত বাইরের জগতের উদ্দীপক থেকে সৃষ্ট নিউরোসিসের কথাই আমরা বলেছি। গবেষণাগারের পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, আন্তরযন্ত্রের অর্থাৎ দেহের ভিতরকার বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় থেকেও নিউরোসিস সৃষ্টি হতে পারে। একটু আগে মানসিক কারণে শারীরিক অসুস্থতার কথার উল্লেখ করেছি। আন্তরযন্ত্রের বিকলতা থেকে সৃষ্ট নিউরোসিসের সঙ্গে 'কার্টিকো-ভিসেরাল সিনড্রোমকে' এক করে ফেললে আমরা ভুল করবো। এখানে শারীরিক অসুস্থতা থেকে মানসিক বিকারের সৃষ্টি হয়, ফলে শারীরিক অসুস্থতা অনেক সময় আরো জটিল হয়ে ওঠে ও দুরারোগ্যের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে।

এ সম্পর্কে দুটি একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। প্রাণী মাত্রেরই গর্ভধারণকালে ও সদ্যোজাত শাবককে লালনপালনকালে মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। এই সময় নতুন শর্তাধীন পরাবর্ত তৈরী করা কঠিন হয়ে পড়ে ; নিস্তেজনা উত্তেজনা প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটে, এগুলো অবশ্য স্বাভাবিক শারীর-বৃত্তিক পরাবর্ত ; অসুস্থতার নিদর্শন নয়। হরমোনের প্রভাবে মস্তিষ্কের এই পরিবর্তন ঘটে।

পাভলভের গবেষণাগারে পুং হরমোন, থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড এবং পিট্যুটারী হরমোনের সঙ্গে নিউরোসিসের সম্পর্ক নিয়ে নানা রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। কুকুরকে খাসী করার পর তার স্নায়ুতন্ত্রের উপর প্রতি-ক্রিয়া নানাদিক দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর ফলে মস্তিষ্ককোষের উত্তেজনা নিস্তেজনা শক্তি, ভারসাম্য ও গতিময়তা—তিনদিকই বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়, দেখা গেছে। কিন্তু এই পরিবর্তন চিরস্থায়ী নয়। ধীরে ধীরে কিছু দিনের মধ্যে প্রাণীটি তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে, এর পর খুব সহজেই এই সব কুকুর নিউরোসিসে আক্রান্ত হয়ে পড়তে পারে। এই সব প্রাণীদের উপর নিউরোসিস আরোগ্যের নানাবিধ চিকিৎসা প্রণালী প্রয়োগ করার ফলে চিকিৎসা বিষয়ে অনেক নতুন জ্ঞান লাভ হয়েছে। আবেশিক নিউরোসিসে অনেক পাভলভীয় মনোচিকিৎসক নিয়ম করে পুং হরমোন ইঞ্জেকশন দিয়ে থাকেন।

অন্যান্য হরমোন প্রভাবিত নিউরোসিস নিয়ে এখনও গবেষণা চলেছে।

সুনির্দিষ্ট কোন ফলাফল পাওয়া গেছে বলে আমার জানা নেই। উচ্চমস্তিষ্কের উপর নানারকমের বিষ ও মাদকদ্রব্যের প্রভাব নিয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছে।

এর মধ্যে এ্যালকোহলের প্রভাব সম্পর্কিত পরীক্ষাগুলো খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। নিয়মিত এ্যালকোহল সেবনের ফলে কুকুরের নিস্তেজনাপ্রক্রিয়া প্রথমে দুর্বল হয়ে পড়ে, তার আত্মসংযমের অভাব ঘটে। তারপর উত্তেজনা প্রক্রিয়াও দুর্বল হতে থাতে। এরপর আসে সম্মোহন পর্ব, প্রথমে সমমাত্রিক তারপর স্ববিরোধী ও অবশেষে অতিস্ববিরোধী অবস্থা। এই পর্ব প্রতিরক্ষামূলক নিস্তেজনা পর্ব, প্রাণীর আত্মরক্ষার শেষ উপায়। কিন্তু এ্যালকোহলের প্রভাব চলতে থাকার দরুন এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। ক্রমশ প্রাণী আবেশিক নিউরোসিস, আতঙ্ক ও ভ্রান্তিমূলক উপসর্গে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

পাভলভ 'নিউরোসিস' সৃষ্টি এবং নিউরোসিস-এর কারণ নির্ধারণ ছাড়াও উন্মাদ রোগের উপসর্গ ব্যাখ্যায় মনস্তাত্ত্বিক বিকারের (psychopathological) প্রচলিত ধারণার পরিবর্তে মনের অধঃস্তর মস্তিষ্কের কোষক্রিয়াভিত্তিক—শারীরবৃত্তিক বিকার (patho-physiological)-এর ওপর গুরুত্ব দিলেন। 'Twenty years of objective study' বইটির ৭২৫ পৃষ্ঠায় তিনি বললেন "the physiological study of higher nervous activity provides the clue to an understanding of certain sides and phenomena of the pictures of psychosis".

উন্মাদরোগে মাঝে মাঝে দেখা যায় রোগী একই কথা বারবার বলছে, একই কাজ বার বার করছে। প্রায়ই এইসব কথা কাজের অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। এক রকমের স্কিজোফ্রেনিয়ায় (catatonic schizophrenia) রোগী একই ভাবে, হয়তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা, অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকে। পাভলভ এই ধরনের রোগ উপসর্গের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বললেন যে, মস্তিষ্ক বল্কলের চেষ্টীয় অংশের (motor area of the cortex) সংশ্লিষ্ট কোষের সক্রিয়তা নষ্ট হয়েছে, কোষগুলো অনড় (inert) হয়েছে। কখনও মস্তিষ্কবল্কলের মাত্র কয়েকটি কোষ, কখনও বা চেষ্টীয় অঞ্চলের অনেকখানি জুড়ে এই অনড়তা আসতে পারে। এর ফলে শুধু পেশীর সঞ্চালনে অক্ষমতা বা কয়েকটি পেশীর বারবার একই ধরনের উদ্দীপনা ঘটতে পারে, এ-ছাড়া উপলব্ধিরও (perception) অনড়তা দেখা দিতে পারে। কারণ মস্তিষ্কবল্কলের অনড়তার দরুণ অন্তর্মুখীন ও বহির্মুখীন দুধরনের উদ্দীপকই ঠিকমত সাড়া জাগাতে পারে না।

এই অস্বাভাবিক বিকারভিত্তিক অনড়তা মস্তিষ্ককোষের সর্বস্তরে উদ্ভূত হতে পারে। প্রাথমিক ও দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরে, (first and second signalling

system) অর্থাৎ অনুভূতি ও বাচনভিত্তিক উপলব্ধির স্তরে সম্প্রসারিত হলে অনড়তার মাত্রার তারতম্য অনুযায়ী বিকৃত ধারণা বা বিকৃত অনুভূতির-উদ্রেক হবে। ভ্রান্তিমূলক অসুস্থচিন্তা (delusion) ও অমূলপ্রত্যক্ষের ব্যাখ্যায় এই অনড়তার ভূমিকারও উল্লেখ করেছেন পাভলভ। (Ibid pp 644-45)

নিস্তেজনা প্রক্রিয়ার পরিক্রমা কেন্দ্রীভবন, বিশেষ করে সম্মোহন ঘুমের, বিভিন্ন স্তরে এর গভীরতার সংগে উন্মাদ রোগীর বেশ কিছু রোগলক্ষণ সম্পর্কিত। বলা যেতে পারে, উন্মত্ততার অন্যকিছু উপসর্গেরও শারীরবৃত্তিক অসুস্থতাভিত্তিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন পাভলভ। সম্মোহনপর্বে নিস্তেজনা প্রক্রিয়া যখন চেষ্টীয় বিশ্লেষণী অঞ্চলে (motor-analyser area) বিস্তারিত হয় তখন অতিস্ববিরোধী অবস্থার (ultra-paradoxical phase) দরুণ রোগীর মধ্যে নাস্তিক্যভাব বা যুক্তিহীন বিরোধীভাবের (negativism) উদয় হয়। নিস্তেজনা যখন আরো নীচের দিকে নেমে আসে তখন নিশ্চলতা বা অচৈতন্যভাব দেখা দিয়ে থাকে।

স্কিজোফ্রেনিয়া সম্পর্কে পাভলভের বক্তব্য আগেই বলা হয়েছে। খেদোন্মত্ত-বাতুলতা সম্পর্কে (manic-deperssive psychosis) পাভলভের শারীরবৃত্তিক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করছি।

স্নায়ুসংস্থার অতিরিক্ত পীড়ন অথবা কোনো বড়দরের শারীরিক অসুস্থতার ফলে উত্তেজনাপ্রবণ ব্যক্তির মধ্যে এই ধরনের অসুখ দেখা যায়। এদের স্বাভাবিক নিস্তেজনা ক্ষমতার স্বল্পতা ফলে অতিরিক্ত পীড়নের সুস্থ পরিপূরণ ঘটে না। উত্তেজনা সারা মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়ে; কোষের কর্মশক্তিকে ব্যাহত করে, মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের তথা মানসিকতার বিশৃঙ্খলা ঘটায়। এইভাবে কয়েকঘণ্টা বা কয়েক দিনের মধ্যে উত্তেজক-পদার্থ নিঃশেষ হয়ে গেলে গোটা মস্তিষ্কে সক্রিয় শর্তহীন নিস্তেজনা (protective inhibition) নেমে আসে। এর ফলে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের ছন্দপাত ঘটে। সার্বিক নিস্তেজনা কিছুদিন ধরে চলার পর আবার মস্তিষ্কে উত্তেজক পদার্থ জমতে থাকে। বহির্বাস্তব অর্থাৎ পরিবেশের যে-সব উদ্দীপক অতি উত্তেজনার সৃষ্টির জন্য দায়ী তারা বিদ্যমানই থাকে; কাজেই উত্তেজকবস্তুর মাত্রা বাড়লেই আবার অতি উত্তেজনা পর্বের শুরু হয়। এই ভাবে চক্রাকারে চলতে থাকে উত্তেজনার পর নিস্তেজনা এবং নিস্তেজনার পর আবার উত্তেজনা—অবশ্য অস্বাভাবিক ও অসুস্থভাবে দুই পর্বেই মাত্রাধিক্য বিদ্যমান থাকে। "Hence in particularly difficult conditions of life or in certain conditions unfavourable for the organism, there sets in, finally, manic depressive psychosis" (Pavlov, Twenty years of objective study-p 677).

নিউর‍্যাসথেনিয়া (Neurasthenia)। প্যারানইয়া (Paranoia) ইত্যাদিরও

শারীরবৃত্তিক বিকারজনিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন পাভলভ। আগ্রহী পাঠক এই সংক্ষিপ্ত সমাচার জানতে হলে মস্কো থেকে প্রকাশিত ইংরিজি ভাষায় অনূদিত ইভানভ স্মলেনসকী লিখিত 'Essays on the Patho-physiology of the Higher Nervous System বইটি পড়তে পারেন।

মনোরোগের কারণ

অনেকের মতে মনোরোগবিদ্যা আজও অনতিক্রান্ত শৈশব। কারণ, মানসিকতা এখনও ভাবাবাদাশ্রিত রহস্যময়তায় আচ্ছন্ন। একজন আমেরিকান মনোরোগ-বিদের মতে এ বিদ্যা রসায়ন বিজ্ঞানের সম্প্রসারণের পূর্বযুগীয় কিমিয়াবিদ্যার সঙ্গে তুলনীয়। নার্ভতন্ত্রকে শান্ত করার ট্রাংকুইলিজার, ইলেকট্রিক শক, ইনসুলিন কোমা—ইত্যাদি নানা রকমের হাতিয়ার থাকা সত্ত্বেও মনোরোগকে আয়ত্তে আনা যাচ্ছে না। পশ্চিম ইয়োরোপ, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকায় এর প্রাদুর্ভাব ও বিস্তার ক্রমবর্ধমান। মনোরোগের নিদানতত্ত্ব এখনও অসংগঠিত ও প্রয়োগবিধি অনেকটা আনুমানিক। অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) প্রয়োগজাত তথ্যপ্রমাণ থেকে যতক্ষণ না একটা সামগ্রিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, ততক্ষণ মনোরোগবিদ্যা বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে না ; প্রকৃত কারণ না জানা পর্যন্ত কোনো রোগের প্রতিষেধক ও প্রতিবিধায়ক ব্যবস্থা অচিন্তনীয়। অপেক্ষাকৃত কম জটিল হলেও নিউরোসিসের সর্বদেশ-ব্যাপ্তি ও ক্রমপ্রসার মনোরোগবিদ, মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। নিউরোসিসের কারণ নির্ণয়ে পশ্চিমী দেশগুলির ভাববাদাশ্রিত পদ্ধতি ও তত্ত্বগুলিই এখানে আলোচ্য।

অনেক পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব প্রচলিত: যথা ফ্রয়েড, ইয়ুং, অ্যাডলারের প্রবৃত্তিমূলক তত্ত্ব ; হর্নির সমাজ সমস্যামূলক তত্ত্ব ; রাইখের নিগূঢ় তত্ত্ব। এ-ছাড়া আছে সর্ব-সারগ্রাহী 'একলেক্‌টিক' তত্ত্ব। স্বল্প পরিচিত হলেও মধ্য ইয়োরোপে কিয়ের্কেগার্ড, সার্ত্র, মে, লেইং প্রমুখের তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ফ্রাঙ্কল, কারুসো, ভ্যানডারবার্গ ইত্যাদি সমর্থিত অস্তিত্ববাদী (existential) তত্ত্বও উল্লেখযোগ্য। ফ্রয়েড তত্ত্বই অবশ্য সর্বজনবিদিত ও সর্বাধিক প্রয়োজিত ; অন্যান্য মতবাদ ও তত্ত্ব ফ্রয়েড তত্ত্বেরই মার্জিত অথবা পরিবর্তিত সংস্করণ। বর্তমানে স্কিনারের নেতৃত্বে আমেরিকা ও পশ্চিম ইয়োরোপে ব্যবহারবাদী তত্ত্ব বিশেষভাবে প্রসার লাভ করেছে।

কোলম্যান তাঁর গ্রন্থে (*Abnormal Psychology and Modern Life*.

Indian Edition, 1972), মনোরোগের এই কয়েকটি মডেলের উল্লেখ করেছেন: (১) মনঃসমীক্ষণ (psycho-analytic) মডেল (২) ব্যবহার-বাদী (behavioristic) মডেল, (৩) মানবিক (humanistic) মডেল, (৪) অস্তিত্ববাদী (existential) মডেল, (৫) ব্যক্তি সম্পর্কঘটিত (inter-personal) মডেল। মনঃসমীক্ষণ মডেল ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ফ্রয়েড, ইয়ুং, এ্যাডলার, মেনিনজার প্রমুখের ধ্যানধারণাকে ভিত্তি করে তিনি এই মডেল তৈরী করেছেন। ব্যবহারবাদী মডেলের প্রবক্তা হিসেবে কোলম্যান আমেরিকান মনস্তাত্ত্বিকদের রীতি অনুযায়ী ভুল করে পাভলভকে ওয়াটসন-স্কিনারের সঙ্গে এক গোষ্ঠীভুক্ত করেছেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী অস্বভাবী আচরণ প্রধানত তিন কারণে ঘটে থাকে: (ক) নিজেকে মানিয়ে নেবার দক্ষতার অভাব, (খ) ভুল পদ্ধতিতে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে শেখা এবং (৩) কোনো দ্বন্দ্ব সংঘাতের মুহূর্তে ঠিক পথ বা সিদ্ধান্তটি বেছে নেবার অক্ষমতা। ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব ভাববাদী ও ধর্মীয় দর্শন প্রভাবিত, ব্যবহারবাদী তত্ত্ব, যান্ত্রিক জড়বাদী দর্শনাশ্রিত। তৃতীয় মডেলটির মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। এই মডেলের প্রবক্তাদের মধ্যে যাঁরা জীবিত আছেন, তাঁদের মধ্যে রজার্স এবং মৃতদের মধ্যে জেম্‌স্ ও ম্যাসলোর নামই বিশেষভাবে পরিচিত। এদের মডেল মোটামুটি ব্যবহারবাদী এবং মনঃসমীক্ষণ মডেলের একটা মিশ্রণ। চতুর্থ—অস্তিত্ববাদী মডেলের প্রবক্তারা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ব্যক্তি মানুষ জীবনের অর্থ ও নিজস্ব মূল্যবোধের সন্ধানে, সদাই সচেষ্ট। এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে নিজেকে পরিচালিত করা ও আত্মপূর্ণতা লাভ করা—এঁদের মতে, ব্যক্তির স্বতঃপ্রণোদিত অভীপ্সা। প্রধানত এরা নিরীশ্বরবাদী ও ঈশ্বরে বিশ্বাসী এই দুই দলে বিভক্ত। মানবিক মডেলে ও এই মডেলের মধ্যে বেশ কিছুটা মিল থাকলেও আবার অমিলও আছে। অস্তিত্ববাদীরা সাধারণত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদ পোষণ করেন না। পাঁচ নম্বর মডেলের প্রধান নির্মাতা সুলিভ্যান অস্তিত্ববাদীদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ও ব্যক্তির আত্মপরিপূর্ণতার প্রবণতাকে স্বীকার করেন, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে চলমান সামাজিক পরিবেশের বিশ্লেষণকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। আমাদের মতে এই ধরনের মডেল সৃষ্টি মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের মন ও রোগ সম্পর্কে বাস্তব বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের দৈন্যেরই পরিচায়ক।

ফ্রয়েডতত্ত্বের আদিকথা এই যে মানুষ মাত্রেই জৈব প্রবৃত্তির দাস। প্রবৃত্তির অচরিতার্থতা থেকে নিউরোসিসের জন্ম। সমাজ, বিশেষ করে পরিবার, শিশুর নির্জ্ঞান কামাকাঙ্ক্ষার পথে যে সব বাধানিষেধ আরোপ করেছে তার থেকে আসে অচরিতার্থতা বা ব্যর্থতা, ফলে নিউরোসিস।

এই প্রবৃত্তি-সর্বস্ব তত্ত্বকে মুখে নস্যাৎ করলেও এবং আধুনিক সমাজ ও সভ্যতাকে নিউরোসিসের কারণ বলে অভিহিত করলেও—নিও ফ্রয়েডিয়ানদের লেখায় কোথাও ঐ সমাজব্যবস্থা বিশ্লেষণ করবার ঝোঁক লক্ষিত হয় না। কার্ডিনার* ত' পুরোপুরি ফ্রয়েডরই অনুবর্তী। মাতৃস্তন্যপানবিরতি, শিশুচর্চা, মলমূত্রত্যাগের অভ্যাস—ইত্যাদি নিয়েই তাঁর গবেষণা। সমাজের বিন্যাস বা কাঠামো তার আলোচনা-গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

অন্যান্য মনোবিদ ও মনোরোগবিদ্‌রাও শিশুমনের উপর পরিবার, বিশেষ করে পিতামাতার অস্বাস্থ্যকর প্রভাব নিয়েই প্রধানত গবেষণা করেন। পিতামাতার নিষ্ঠুরতা, স্নেহমায়াহীনতা, বিবাহবিচ্ছেদ এবং অন্যান্য পারিবারিক কারণগুলোই বারবার করে সামনে তুলে ধরা হয়েছে। মোটকথা শৈশবের অহিতকর ও ধ্বংসাত্মক অভিজ্ঞতা থেকেই মাত্র নিউরোসিসের উদ্ভব—এ ধারণা ফ্রয়েডীয় আদিতত্ত্বেরই সম্পূরক ও সহায়ক।

শুধু শৈশবের অভিজ্ঞতা থেকেই নিউরোসিসের উদ্ভব—ফ্রয়েডীয় এই তত্ত্বের ভ্রমাত্মক দিক নিয়ে খুবই কম আলোচনা হয়েছে। পিতামাতার নিষ্ঠুরতা বা অতিস্নেহ-প্রবণতার সামাজিক কারণগুলিও অবিশ্লেষিত রয়ে গেছে। ফ্রয়েড তবুও পিতৃবিদ্বেষ ও সন্তানবিদ্বেষের কারণ হিসাবে তাঁর কামসর্বস্ব থিওরী ইদিপাস কমপ্লেক্সের আমদানি করেছেন, তাঁর উত্তরসূরীরা কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে, তাও মনে করেন নি। হর্ণি ইত্যাদির লেখা বিবরণপ্রধান—ব্যাখ্যামূলক নয়।

শিশুবয়সের বিরূপ ও অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা থেকে নিউরোসিস ঘটতে পারে—অস্বীকার করছি না। কিন্তু পরিণত বয়সের মানসিক আঘাতে নিউরোসিস হবে না কেন? শৈশবে যাদের অনাদরে মানসিক ক্ষয়ক্ষতি ঘটে, পরবর্তী জীবনের সুস্থ পরিবেশে, সাফল্যজনিত আবহাওয়ায় সে ক্ষয়ক্ষতির পূরণ ঘটবে না কেন? সুস্থ পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে শৈশব অতিবাহিত করে; বয়ঃসন্ধিতে বা যৌবনে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মনোবিকার জন্মাবে না কেন? মনোরোগবিদ মাত্রেই নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে জানেন—ফ্রয়েডপন্থীদের তত্ত্ব অযৌক্তিক ও অবাস্তব। শৈশবে অসুস্থ হলে সারাজীবন অসুস্থ থাকতে হবে কিংবা শৈশবে সুস্থভাবে কাটলে আর কোন ঝড়ঝাপটাতেই মানসিক বিকার ঘটবে না, এই স্থিতিশীল ধারণা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক।

'মানব প্রকৃতি অপরিবর্তনীয়'—এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ফ্রয়েডীয়

---

* Kardiner Abraham (পরিশিষ্ট দেখুন)

মতবাদ। মানব প্রকৃতির নিয়ামক ও নির্ধারক নির্জ্ঞান মনের গোপন গুহাচারী জৈব প্রবৃত্তি। জৈব প্রবৃত্তি শাশ্বত ও সনাতন; সুতরাং মানব প্রকৃতি অপরিবর্তনীয়—এই হল ফ্রয়েড ও তার অনুগামীদের মূল বক্তব্য। যারা প্রবৃত্তিমূলক তত্ত্বে বিশ্বাসী নন বলে প্রচার করেন তারাও কিন্তু মনে করেন শৈশবে একবার নিউরোসিসের সূত্রপাত হলে আমরণ তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে। পরিবেশের প্রভাব ও মনের পরিবর্তনশীলতায় অনাস্থা এঁদের ধারণাতেও সুস্পষ্ট। এঁরাও ফ্রয়েডেরই মতো সনাতনপন্থী।

অস্বাভাবিক অসুস্থ পারিবারিক অবস্থাকে নিউরোসিসের মৌল কারণ বলে মনে করা হচ্ছে, অথচ একবারও বলা হচ্ছে না এই পারিবারিক অসুস্থতার কারণ কি? অসুস্থ পরিবার যেন অনেকটা আপনা থেকেই জন্ম নিয়েছে। আধুনিক মনোরোগবিদ্ সমাজের বিভিন্ন রীতিনীতির পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা করলেও নিউরোসিসের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে শুধু শৈশবের তিক্ত অভিজ্ঞতার ও পিতামাতার অস্বাভাবিক ব্যবহারের কথাই তুলেছেন বারবার। গত একশ বছরে সমাজব্যবস্থার শোষণ ও প্রতিযোগিতার অস্বাভাবিক ও বিকৃতরূপের প্রতিফলন যে ব্যক্তি বা পরিবারের মধ্যে পড়তে পারে ও ব্যক্তিসম্পর্ক ও পারিবারিক সম্পর্ককে বিষাক্ত করে তুলতে পারে—এ সম্ভাবনা সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা নীরব। কেউ কেউ সামগ্রিকভাবে বর্তমান যন্ত্রসভ্যতা ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োগবিদ্যাকে দায়ী করেছেন, এইমাত্র। এই মনোভাবের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে ফ্রয়েডীয় পণ্ডিতেরা চৈতন্যের বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় অবিশ্বাসী। নিউরোটিকের চিন্তা ও উদ্দেশ্য যে তার বর্তমান বিকৃত পরিবেশের প্রতিফলন—এ সহজ সত্যকে এঁরা এড়িয়ে চলেন বা বুঝতে পারেন না। কাজেই পিতামাতার অস্বাভাবিক মনোবৃত্তিকে এত ফলাও করে প্রচার করে থাকেন। সমাজের দুষ্ট ক্ষতগুলোর দিকে তাকাতেও চান না। পিতামাতার অস্বাভাবিক ব্যবহারের কারণ নির্দেশে পিতামহ-পিতামহীর অস্বাভাবিক মনোবৃত্তিকে টেনে আনেন এবং এর জন্য এঁদের মাতাপিতার অর্থাৎ প্রপিতামহকুলের ব্যক্তিত্বের বিকারকে দায়ী করেন। অর্থাৎ বর্তমানকে এড়িয়ে বংশপরম্পরা মানসিক অস্বাভাবিকতার অব্যাহত ধারাকে দায়ী করেন নিউরোসিসের মৌল কারণ হিসাবে। নিউরোসিসের এই মানসিক বা সাবজেকৃটিভ ব্যাখ্যা ভাববাদ দর্শনেরই এক বিশেষ রূপ।

বহুরূপে ভাববাদী ধারণা সমাজে প্রচলিত। এঁদের আসল সুর কিন্তু এক। যথা: আত্মা, অবিনশ্বর, বিশ্বজনীন ভাব বা আইডিয়া মুখ্য আর বাস্তব ধুলোমাটির জগৎ গৌণ—পরমপুরুষ বা পরমাত্মার লীলা; এক অপৌরুষেয় অবিনশ্বর শক্তি বাহ্য জগতের নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রক, ইত্যাদি; আসলে এই বাস্তব

—পা.প.(২-২)-৬

জগতের অস্তিত্ব কেবলমাত্র আমাদের চিন্তায় ও কল্পনায়, অথবা বস্তুজগৎ অজ্ঞেয় অপ্রয়োজনীয়, আসল সত্য আমাদের চিন্তা ধ্যানধারণা। অবজেকটিভ সত্যকে সরাসরি বা কৌশলে অস্বীকার করার চেষ্টা ভাববাদের আসল উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য এ-ধারণা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞানের সঙ্গে এর বিরোধ মৌলিক ও আপোস অসম্ভব। বিজ্ঞান অনেক পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে বস্তুজগৎ বিদ্যমান ও নিজস্ব নিয়ম-শৃঙ্খলে বাঁধা। আমাদের অনুভূতি বা ধ্যানধারণা নিরপেক্ষ এই বস্তুজগতের অস্তিত্ব। এ পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের আবির্ভাবের বহু আগে থেকেই অসংখ্য বস্তুকণা সমন্বিত জগৎ বিদ্যমান ছিল। এই বাস্তবজগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুশীলন দ্বারা জ্ঞেয়, অধিতব্য। সেই জ্ঞান ও বিদ্যা জাগতিক কল্যাণে প্রযোজ্য। প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আজ ভাববাদের প্রভাব ক্ষীয়মান, কেননা প্রকৃতিবিজ্ঞান আজ স্বকীয় মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত। তবে সমাজবিদ্যায় ভাববাদের আধিপত্য এখনও সুস্পষ্ট। তাই দেখতে পাই ইতিহাস বা জাতির গতি-প্রকৃতি ও কার্যকারণের ব্যাখ্যায় অভিপ্রায়িক প্রয়োজনকে অস্বীকারের চেষ্টা ও আধ্যাত্মিক শক্তি, রহস্যময়তা অথবা মানুষের সহজাত শাশ্বত প্রকৃতির অবতারণা; বস্তুজগত, সামাজিক পরিবেশ ও প্রয়োজন যে মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে—এই বৈজ্ঞানিক সত্যের অপলাপ প্রচেষ্টা। মনোরোগ বিদ্যায় ভাববাদের প্রয়োগ দেখতে পাই ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে ও প্রয়োগধারায় এবং অস্তিত্ববাদীদের চিন্তাভাবনায়। মানুষের ব্যবহার ও চিন্তাধারা বিশুদ্ধ মানসিক কারণ সঞ্জাত এবং এঁদের মতে এই মানসিকতার সঙ্গে তার বাস্তব জীবনের পারিপার্শ্বিকের বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই, থাকলেও সে সম্পর্ক আনুষঙ্গিক মাত্র। মননক্রিয়া স্থান-কাল-পরিবেশ নিরপেক্ষ—নানাভাবে এই কথার পুনরাবৃত্তি করে যান এঁরা। মানুষের চিন্তা-ভাবনা ক্রিয়াকলাপের উৎস তার নিজের মধ্যেই অথবা নির্জ্ঞান মনে—এই কথার তাৎপর্য এই যে চিন্তাভাবনা কার্যকলাপ বাইরের বস্তুজগতের প্রভাবমুক্ত। এর ফলে রহস্যবাদের দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া এই সব তত্ত্ববিদের আর কোনো গত্যন্তর থাকে না। তাই হর্ণির* দলকে আভ্যন্তরীণ বা সহজাত প্রেরণার (inner urge) সন্ধানে বুদ্ধ, তাও, কিয়ের্কগার্ড, বার্গসঁর দ্বারস্থ হতে হয়। অবশ্য, আগেই উল্লেখ করেছি, বর্তমানে এই ভাববাদী দর্শনাশ্রিত মনোরোগতত্ত্বের প্রয়োগ-অসাফল্যের দরুণই বোধ হয় আমেরিকায় ওয়াটসনের ব্যবহারবাদকে প্রশিক্ষণ ও চিকিৎসা ব্যাপারে যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন স্কিনার। এই তত্ত্ব ও পদ্ধতি দুইই মানুষকে যন্ত্রের মত

* Karen Horney (পরিশিষ্ট দেখুন)

গণ্য করে। এই তত্ত্ব বিজ্ঞান সমর্থিত বলে আমরা মনে করি না। আর একবার পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, এই যান্ত্রিক জড়বাদী তত্ত্বের সঙ্গে পাভলভীয় তত্ত্বের সম্পর্ক নেই।

আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিগ্রহ ও পারস্পরিক কলহ-দ্বন্দ্বের কারণ খুঁজতে গিয়েও রাজনীতি, অর্থনীতি বা সামাজিক অন্তর্দ্বন্দ্বের দিকে এঁদের দৃষ্টি পড়ে না। এঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে শিশুমনের আক্রমণাত্মক ও অসহযোগিতামূলক ভাবধারার দিকে—যার মূলে, এঁদের মতে কেবলমাত্র সহজাত প্রবৃত্তি অথবা আনুষঙ্গিক কারণ বিদ্যমান। শুধু অবৈজ্ঞানিক নয়—হাস্যকরও বটে এই তত্ত্ব।

সম্প্রতি, বিশেষ করে গত দশকে, পশ্চিম ইয়োরোপ, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকায় মনোরোগের ব্যাপক দ্রুত বিস্তৃতির উল্লেখ প্রথমেই করেছি। অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাই সমাজবিদ্ বা মনোরোগবিদ্‌রা আজ সামাজিক কারণ অনুসন্ধানে তৎপর। গোঁড়া ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। শিল্পাগ্রসর দেশগুলোতে, বিশেষ করে আমেরিকায় এ রোগের প্রকোপ লক্ষ্য করে অদ্ভুত অদ্ভুত তত্ত্বের অবতারণা করেছেন এ-দেশের সমাজবিদ্যা ও মনোবিদ্যার পণ্ডিতেরা।

বিজ্ঞানের অভাবনীয় অগ্রগতি ও উৎপাদন ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের প্রয়োগকে এঁরা মনোরোগের এই ব্যাপক বিস্তৃতির কারণ হিসাবে ধরে নিয়েছেন। বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যার সফলতার ফলে সমাজে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। নতুন পুরনোর দ্বন্দ্ব মানুষকে অস্থির করে তুলেছে। নতুন পুরনোর দ্বন্দ্ব নিশ্চয়ই সংঘাতের সৃষ্টি করে, কিন্তু সংঘাত ঘটলেই নিউরোসিস হবে এমন কোন কথা নেই। সংঘাত ও দ্বন্দ্ব ছাড়া যে-কোন ধরনের অগ্রগতি বা বৃদ্ধি অসম্ভব। নতুন পুরনোর সংঘর্ষকে মনোরোগের মৌল ও একমাত্র কারণ হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা অনেক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। সমাজব্যবস্থা ও উৎপাদন ব্যবস্থায় অতি দ্রুত ও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে সোভিয়েত রাশিয়ায়। আমরা জানি, সেখানে মনোরোগের বিস্তার ত' ঘটেই নি, বরঞ্চ প্রসার ক্রমসংকুচিত। মনোরোগের কারণ নির্ণয়ে মানসিক সংঘাত বা প্রক্ষোভজনিত আলোড়নকেও অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এ যাবৎ। মানসিক আঘাতের দরুণ যে চাঞ্চল্য দেখা যায় তাকে সব সময় মনোবিকারের পর্যায়ে ফেলা যায় না। প্রেমের প্রত্যাখ্যানে, পরমাত্মীয় বিয়োগে, অহেতুক চরিত্রদোষারোপে—মনস্তাপে ভুগবেন সবাই। জীবনে দুঃখ বিক্ষোভ থাকবেই, অপূর্ণ প্রত্যাশা ও তৎজনিত নিরাশা আসবেই। বাঁচতে গেলে মাঝে মাঝে মর্মন্তুদ বেদনা, গুরুতর আঘাত, উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কার সম্মুখীন হতেই হবে। এরকম অবস্থায় সাময়িকভাবে মনের শান্তি হারানো নিউরোসিসের লক্ষণ নয়। ব্যক্তির নার্ভতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ও আঘাতের প্রভাবের গুরুত্বের উপর

নির্ভর করে -এসব ক্ষেত্রে মনোরোগ দেখা দেবে কিনা। মনঃপীড়া হলেই মনোরোগ জন্মাবে এ ধারণা ঠিক নয়। মানসিক কারণের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ সামাজিক কারণগুলিকে চোখের আড়ালে নিয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে, যদি মানসিক কারণগুলোকে বংশানুক্রমিক বা অপরিবর্তনীয় বলে আখ্যাত করা হয় এবং সমাজনিরপেক্ষ বলে ভাবা হয়।

আমেরিকান মনোরোগবিদ্ ফার্স্ট-এর মতে—ব্যক্তির মনে সমাজের ব্যক্তি-কেন্দ্রিক, ধ্বংসাত্মক, অসামাজিক প্রবণতাগুলির প্রতিফলন থেকে নিউরোসিসের উদ্ভব।*

বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় শোষণধর্মিতা, অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা ও নিরাপত্তার অভাববোধ থেকে নিউরোসিসের জন্ম। আমাদের এই সমাজে শিশুর লালন-পালনে অধিকাংশ পিতামাতাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোভাবের পরিচয় দিয়ে থাকেন। শিশুর মনে মাতাপিতার দাম্পত্য দ্বন্দ্বের প্রতিফলন ঘটে। পুরুষ-প্রধান সমাজে সত্যিকারের সুস্থ স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক বিরল। এ-ছাড়া খেলা, নাটক, সিনেমা, টিভি ও গল্পের ভেতর দিয়ে এই সমাজের নিষ্ঠুরতা, শোষণ, প্রতিযোগিতা, স্বার্থপরতা এবং সর্বোপরি আজকের দিনে পারমাণবিক ভীতি শিশুর মনে বিকারের সৃষ্টি করে। ফার্স্ট তাই মনে করেন—পিতামাতার অস্বাভাবিকতা নয়, সমাজের অস্বাভাবিকতাই নিউরোসিসের কারণ। সমাজের দুর্নীতি মাতাপিতার মধ্য দিয়ে শিশুমনকে সংক্রামিত ও বিকৃত করে—এই মাত্র।

শিশু সাধারণত পরিবেশের প্রতিটি উদ্দীপকে সাড়া দেবার জন্য প্রস্তুত। বাড়ীতে হোক বা স্কুলে হোক, তাকে যদি নিয়ত পূর্ব উল্লিখিত ধ্বংসাত্মক ও নঞর্থক উদ্দীপনার সম্মুখীন হতে হয়, তবে তার মধ্যে নিউরোসিসের লক্ষণ প্রকাশ পাবে—এটাই তো স্বাভাবিক।

ফ্রয়েডপন্থীরা নিউরোসিসের কারণ নির্ণয়ে বয়ঃসন্ধিকালের যৌন সমস্যার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মানুষের যৌনলিপ্সা পুরোপুরি সহজাত প্রবৃত্তিমূলক বা জীবধর্মানুগ -একথা আমরা বিশ্বাস করি না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বটে মানুষের এই রিপুটি অত্যন্ত প্রবল এবং একে কেন্দ্র করে যে-সব সমস্যার উদ্ভব হয়, সেগুলির সমাধান অত্যন্ত কঠিন। এ-কথা সত্যি, বয়ঃসন্ধিকালে

* We would regard neurosis as being the intensive reflection within the sick individuals's practice and consciousness of certain highly individualistic, destructive and antisocial qualities engendered by specific aspects of the social system in which he lives. Furst Joseph—The Neurotic, Citadel Press, Newyork, 1954.

দেহমনের কতকগুলি বিশেষ পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং সামান্য অনবধানতা ও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ও যৌনকেন্দ্রিক মনোবিকারের উদ্ভব হতে পারে। কিন্তু সমাজব্যবস্থা যদি শোষণকেন্দ্রিক না হয় ও কিশোর-কিশোরীর শিক্ষা-ব্যবস্থা যদি উন্নততর হয়, এ সমস্যা নিঃসন্দেহে অনেক সহজ হয়ে আসে। যৌন সম্পর্কের ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার ও রহস্যময়তা এ সমস্যাকে ঘোরালো করে তুলেছে। বিশেষ করে ফ্রয়েডীয় যৌনসর্বস্বতত্ত্ব, ইদিপাস ও ইলেকট্রা কমপ্লেক্সের সরস বর্ণনা সম্বলিত মনস্তত্ত্বের বই, পত্রিকা ও চলচ্চিত্র অভিভাবকদের মনে যে যৌন বিকারের উন্মেষ ঘটায় তার কিছুটা অন্তত কিশোর মনে সংক্রামিত হয়। যদি সমাজে বা পরিবারে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার স্বীকৃত হয় এবং নারীর হীনমন্যতা দূরীভূত হয়, তবে যৌন সমস্যা অনেক কম দেখা দেবে এবং কিশোর-কিশোরীদের এই সম্পর্কিত ভুল ভ্রান্তি অনেক কম ঘটবে। আমরা সত্যিকারের স্নেহ, প্রেম ও ভালবাসার বিকাশ দেখতে পাব এবং এদের মূলে অবদমিত যৌনাবেগের কল্পনা করে আঁতকে উঠতে হবে না।

আজকাল আমেরিকা থেকে যে সব মনোবিদ্যার বই প্রকাশিত হচ্ছে, তা পড়লে বোঝা যায় সেখানে ক্রমশ ফ্রয়েডীয় সর্বরতিবাদ তত্ত্বের প্রভাব কমে আসছে। Shibbles লিখেছেন, যে-সব চিত্তবৃত্তিকে যৌনতামূলক বলে ভাবা হয়, তার দশভাগের নয় ভাগই মানুষের বিচিত্র কল্পনাশক্তির অবদান। নারীদের যৌনলিপ্সা পুরুষের চেয়ে কম—এর কারণ বোধ হয় তারা পুরুষের চেয়ে কম কল্পনাপ্রবণ।*

বয়ঃসন্ধিকালে এই সমস্যা সমাকীর্ণ সমাজে কিশোর কিশোরীরা কোনও সুস্থ সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের ছবি দেখতে পায় না। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ অতি সীমিত হওয়ায় এবং উদ্দেশ্যমূলক সৃজনধর্মী কর্ম-প্রেরণার অভাবে তারা বয়ঃপ্রাপ্তদের নৈরাশ্যবাদ ও সিনিসিজমের অংশীদার হয়ে ওঠে। পলায়নী মনোভাব থেকে যৌনলিপ্সা ও আনুষঙ্গিক বিকৃতি বৃদ্ধি পায়। এর ওপর এই বিশেষ সময়ে যে পুষ্টিকর খাদ্য ও পেশী সঞ্চালনী ব্যায়ামের প্রয়োজন, খুব কম ছেলেমেয়েদের মধ্যে সে সুযোগ ঘটে। দৈহিক স্বাস্থ্যহীনতা মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায়। স্কুল কলেজে ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ব্যবস্থাও কিশোরমনের বিকৃতির অন্যতম কারণ। মোট কথা, সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যা,

---

* Nine tenths of that which is attributed to sexuality is the work of our magnificent ability to imagine. (Shibbles Warren, Emotion, Language Press, U.S.A. 1947, p 872)

নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার অভাব, আত্মকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা, সহযোগিতামূলক সমবায় প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা ইত্যাদি কিশোর মনে যে প্রভাব বিস্তার করে, ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক সে সম্বন্ধে খুব বেশী আগ্রহী নন। বাস্তব কারণকে এভাবে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতই হোক আর অজ্ঞতাপ্রসূতই হোক, বিজ্ঞানের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

বস্তুবাদী মনোরোগবিদ্‌রা কোন সময়েই মানবমনের অপরিবর্তনীয়তত্ত্বকে আমল দেননি। পরিবর্তনশীল জীবন মানবমনে নতুন গুণ, ধর্মের উন্মেষ ঘটায় ও বিশেষ অবস্থায় সেই গুণধর্ম সন্তান-সন্ততিতে বর্তায়। পাভলভ সপ্রমাণ করেছেন মস্তিষ্ককোষের ও নার্ভতন্ত্রের জন্মগত বৈশিষ্ট্য বাস্তব জীবনের পরিবেশের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়। সামাজিক ধ্যান-ধারণা, শিক্ষাদীক্ষা, সমাজে মানুষের বিশেষ অবস্থান কেন্দ্র ও তদ্‌জনিত সুখ-সুবিধা—এ সমস্তই চরিত্র ও মানসিকতার আসল সংগঠক। পাভলভের বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি পুরনো দিনের আত্মার অবিনশ্বর তত্ত্বকে ধূলিসাৎ করেছে: সবকিছু পরিবর্তব্য, সময়ে সঠিক ব্যবস্থা অবলম্বন করলে মনোধর্মের পরিবর্তন সম্ভব—এই প্রগতিশীল ধারণা মনোরোগ চিকিৎসকদের মনে নতুন আশা ও উৎসাহের তরঙ্গ এনে দিয়েছে। মনোরোগের কারণ নিহিত রয়েছে সমাজব্যবস্থার বিচ্যুতি-বৈষম্যের মধ্যে এবং এ রোগের চিকিৎসা বা প্রতিরোধের সামাজিক কারণ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ সর্বপ্রধান কর্তব্য বলে মনে করেন পাভলভ-অনুগামী চিকিৎসকরা।

যে সব দেশে মনোরোগের প্রাদুর্ভাব ক্রম-বর্ধমান, গত শতাব্দীর এক রুশ চিকিৎসকের একটি উক্তি, সে সব দেশের পক্ষে বোধহয় আজও প্রযোজ্য।*

ফ্রয়েডের তত্ত্ব ও চিকিৎসাপদ্ধতি আমাদের দেশে সব থেকে বেশী পরিচিত ও প্রচলিত; তাই ফ্রয়েডবাদ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্যেকবিশেষ প্রাধান্য দিতে হচ্ছে।

বস্তুবাদীরা মনে করেন যে, মনোরোগের, বিশেষ করে নিউরোসিসের কারণ নির্ণয়ে ভাববাদী মনস্তাত্ত্বিক ও মনোরোগবিদ্‌দের মতামত শুধু যে ভ্রান্ত তাই

* The pride of the poor is humiliated, talents are not appreciated, modesty is insulted, the sanctity of feeling is ridiculed, honesty is disbelieved and rights are disrespected,......Physically, poverty means lack of food, unwholesome food, unhealthful housing, shabby clothes and footwear, diseases are neglected to the utmost, all of which foster the development of insanity.

নয়, সমাজের পক্ষে ক্ষতিকরও বটে। অন্তর্দর্শনজাত তত্ত্বকথা উদ্দেশ্যমূলক না
অজ্ঞতাপ্রসূত এ নিয়ে তর্ক না করেও একথা বলা চলে যে আনুমানিক তত্ত্বকে
তথ্যসমর্থিত বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে প্রচার করার ফলে জনসাধারণের মনে
ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে। এরিক ফ্রম যখন বলেন ফ্যাসিজম্
বা কমিউনিজমের আসল কারণ মানবমনের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা, নির্ভরশীলতা বা
স্বাধীনতা-বিতৃষ্ণা—তখন এটি মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে, সামাজিক দ্বন্দ্ব ও
সমাজের অন্যায় অবিচার থেকে সাধারণের দৃষ্টি সরিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।
যুদ্ধ বিগ্রহের আসল কারণ মানবমনের অন্তর্নিহিত ধ্বংসাত্মক বা আক্রমণাত্মক
প্রবৃত্তি—একথা বলার মানে বিশেষ ধরনের দেউলিয়া সমাজব্যবস্থার
পক্ষে ওকালতি নয় কি? যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে শুধু পশুর মতো
কোন রকমে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টায় মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে অস্বাস্থ্যকর
প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে দিনরাত, যে ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মুনাফা সংগ্রহের
নিরঙ্কুশ অধিকার ও শোষণের অবাধ সুযোগ-সুবিধা—সে ব্যবস্থায় মানুষের মনে
আক্রমণাত্মক বা ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তির উন্মেষকে মনের অন্তর্নিহিত ত্রুটি বলা
চলে কি?

হিংসাদ্বেষ, ধ্বংসাত্মক মনোবৃত্তি অন্তরে সুপ্ত থাকে, বিশেষ পরিবেশে
আত্মপ্রকাশ করে—এই মতবাদের সপক্ষে আজকাল আবার 'জেনেটিক'-তত্ত্ব
উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে। মানুষের সব প্রবৃত্তি এঁদের মতে জন্ম-অর্জিত;
কোষকেন্দ্রের ক্রোমোজোমের মধ্যে অবস্থিত পিতৃ বা মাতৃসূত্রে পাওয়া 'জিনে'র
মধ্যে থাকে এই সব ধ্বংসাত্মক, হিংসাত্মক মনোবৃত্তি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত বিশেষ
বিশেষ মানসিক বৃত্তির বাহক 'জিনে'র সন্ধান পাওয়া যায়নি। কাজেই এই তত্ত্বও
অনুমাননির্ভর। একই পরিবেশের মধ্যে পালিত একজনের মধ্যে হিংস্রতার
প্রাবল্য দেখা দেয়, কিন্তু অন্যজনের মধ্যে দেখা যায় না—এর ব্যাখ্যা অনেকে
'জেনেটিক' পার্থক্যের মধ্যে খুঁজতে চান। ভুলে যান যে, একই পরিবেশে
থাকলেও পরিবেশের সব উদ্দীপক সকলকে সমানভাবে প্রভাবিত করে না।
এই ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়ও অনেক সদর্থক উপাদান আছে। তাছাড়া,
শিক্ষাদীক্ষা, বিশ্লেষণক্ষমতা, পূর্ব-অভিজ্ঞতা, 'প্রি-কনডিশনিং-ইত্যাদি অনেক
কিছুই ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে ও পরিবেশের কোন ধরনের উদ্দীপকে সে সাড়া
দেবে সেটা নির্ধারিত করে। ব্যক্তি ও পরিবেশের মধ্যে ঘাত প্রতিঘাত একতরফা
নয়; পরিবেশ যেমন ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে, ব্যক্তিও তেমনি পরিবেশকে
পরিবর্তিত করে। যাঁরা মানসিক রোগের চিকিৎসা করেন তাঁরা জানেন এই
সব অসামাজিক অস্বাস্থ্যকর মনোভাবের জনক ও ধারক সমাজের ওপরতলার
শ্রেণী ও তাঁদের আশ্রিত ও পোষিত কিছু সুদক্ষ প্রযুক্তিবিদ্ ও বুদ্ধিজীবী।

সমাজের শোষিত শ্রেণী এর জন্য দায়ী নয়। একজন আমেরিকান লেখক এই মত পোষণ করেন।*

অন্য এক ধরনের বিভ্রান্তিকর প্রচার সম্বন্ধে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্তব্য মনে করছি। বলা হয়ে থাকে, এ সমাজ অসুস্থ, এ সমাজের সব মানুষই তাই অস্থির, উৎকণ্ঠিত, অসুস্থ, নিউরোটিক; এই সমাজব্যবস্থায় সুস্থদেহী তবু দেখতে পাওয়া যায়, সুস্থমনা সত্যই বিরল। একথা কিছুতেই বলা চলে না যে, এ সমাজের সবাই নিউরোটিক। নিউরোটিক শব্দটি বিশেষ অর্থব্যঞ্জক—এক ধরনের রোগ। সাময়িকভাবে মানসিক অস্থিরতা বা অশান্তি সকলেরই মনে দেখা দিতে পারে। বিশেষ কোন সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে বা সমস্যার সম্মুখে অনেক সুস্থ ব্যক্তির মনও বিকল হতে পারে। আবার নিজেরই চেষ্টায় বা পরিবেশের পরিবর্তনে মানসিক স্থিরতা সুস্থতা ও স্বাভাবিকতা ফিরে আসে। এদের নিউরোটিক আখ্যা দেওয়া অনুচিত। তাছাড়া এই বিপরীতধর্মী সমাজ ব্যবস্থায় অল্পবিস্তর উৎকেন্দ্রিকতা (eccentricity) ও অবিবেচনাপ্রবণতা (irrationality) অধিকাংশ মনেই সঞ্চারিত; এদের সকলকে নিউরোটিক ভাবলে ভুল হবে। সকলেই অল্পবিস্তর নিউরোটিক—এ প্রচার অভিসন্ধিপ্রসূত। যুদ্ধ-বিগ্রহ, বেকারী, সামাজিক অন্যায়—এ সবের মূলে নিউরোসিস: এই প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্ব সপ্রমাণ এ-প্রচারের অভিসন্ধি। কার্যকারণ সম্পর্কের এই বিকৃত ব্যাখ্যা সামাজিক ত্রুটি-বিচ্যুতিকে দৃষ্টির আড়ালে রাখার এক হীন অপকৌশল মাত্র।

ফ্রয়েড প্রমুখ পণ্ডিতদের রোগতত্ত্ব বিচারের আর একটি দিক আছে। ফ্রয়েডের মতে নিউরোসিসের কারণ বিশিষ্ট অন্তর্দ্বন্দ্ব। জীবনধর্মী ও মৃত্যুধর্মী প্রবৃত্তির সংঘাত থেকে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি—এই হল মূল তত্ত্ব। পরবর্তীকালে তিনি বলেছেন: নির্জ্ঞান সঞ্জাত সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে সামাজিক বিধিনিষেধের সংঘর্ষ থেকে মানসিক দ্বন্দ্ব—তথা নিউরোসিসের উৎপত্তি। যেদিক দিয়ে বিচার করা যাক না কেন, দেখা যাবে ফ্রয়েডবর্ণিত এই সব প্রবৃত্তি অপরিবর্তনীয়। কাজেই সংঘাতজনিত দ্বন্দ্বও স্থাণু এবং শাশ্বত। এ-দ্বন্দ্বের নিরসন সম্ভব নয়,

* The practices, ideas, morality and human relations that are destructive of people and which ultimately are the cause of much mental illness—do not arise from the exploited class, the working people. They arise from the capitalist class and from the middle class......the latter aids, abates and shares in the exploitation of the working people." Fur. t The Neurotic op cit p 129.

কেননা এ-দ্বন্দ্ব অনড়। এই মনোরোগতত্ত্ব রোগ নিরাময়ের কোনও সমাধান দিতে অপারগ। বস্তুত, ফ্রয়েড শেষ জীবনে এই সিদ্ধান্তেই এসেছিলেন। চিকিৎসার ফলাফল সম্বন্ধে তিনি হতাশাই ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন, নিউরোসিস সহজাত প্রবৃত্তিমূলক ; আরোগ্যবিধি আমাদের আয়ত্তের বাইরে।*

অবশ্য অন্যত্র ("*Civilization & its Discontents*" Hogarth Press, 1937) তিনি বলেছেন—"সভ্যতা" (?) নিউরোসিসের জনক এবং মানুষ যত সভ্য হতে থাকবে, নিউরোটিকের সংখ্যা তত বাড়বে। বর্তমান সভ্যতা ও সমাজব্যবস্থার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ না করে, এ ধরনের উক্তি নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। তবুও এ উক্তির মধ্যে খানিকটা অব্‌জেকটিভ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ আছে। কিন্তু মূলত ভাববাদী দর্শন তাঁর ধ্যানধারণাকে পুষ্ট করেছিল। কাজেই তাঁর মৌলিক তত্ত্বে অব্‌জেকটিভ কারণগুলোর আর সন্ধান মেলে না। জীবন মৃত্যুর দ্বন্দ্ব (Death-Eros Instinct) বা সুপারইগো-ইদের লড়াই—সব দ্বন্দ্বই তাঁর মতে ব্যক্তির গভীর মনোরাজ্যের ব্যাপার ; অন্তর্নিহিত অপরিবর্তনীয় সহজাত প্রবৃত্তির সংঘর্ষ। সামাজিক দ্বন্দ্বের সঙ্গে এ-সবের বিশেষ সম্পর্ক নেই, বরং সামাজিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষই মানসিক দ্বন্দ্বের প্রতিফলন। এ দৃষ্টিভঙ্গী বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ বিপরীত।

ফ্রয়েডের অনুগামীরা, বিশেষ করে হর্নি, নিউরোসিসের কারণ নির্ণয়ে 'সামাজিক' এই বিশেষণটি নানাভাবে ব্যবহার করেছেন। ফ্রয়েডের সহজাত প্রবৃত্তিমূলক দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করছেন হর্নি।**

তিনি যা বলেছেন তার সরলার্থ এই রকম : শৈশবের প্রতিকূল পরিবেশ থেকে নিজের ও অপরের মধ্যে অস্বস্তিজনক সম্পর্কের সৃষ্টি হয় ; এর ফলে ঘটে

---

* Sigmund Freud "Analysis—Terminable & Interminable"—Collected Papers, vol. V, pp 354.

** "The combination of many adverse environmental influences produces disturbances in the child's relation to self and others. The immediate effect is what I have called the 'basic anxiety', which is a collective term for a feeling of intrinsic weakness and helplessness toward a world perceived as potentially hostile or dangerous. The 'basic anxiety' renders it necessary to search for ways in which to cope with life safely. The ways that are chosen are those which under those given conditions are accessible. These ways, which I call the neurotic trends aequires a compulsory character" (New Ways in Psychoanalysis Kegan Paul, London, 1948 pp 276-77)-

মৌলিক উদ্বেগ। নিজের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও অসহায়তার দরুণ বিশ্বসংসারকে মনে হয় বিপদসংকুল ও শত্রুভাবাপন্ন। এই মৌলিক উদ্বেগ, এই দুর্বলতা ও অসহায়তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য ব্যক্তি নির্দিষ্ট পরিবেশে যে উপায় হাতের কাছে পায় তাই আঁকড়ে ধরে—এইভাবে চরিত্রে নিউরোটিক ধারার বিকাশ ঘটে এবং এই নিউরোটিক ধারা ঐ ব্যক্তির পক্ষে হয়ে দাঁড়ায় অপরিহার্য। হর্নির মতে নিউরোসিস মৌলিক উদ্বেগ থেকে পরিত্রাণের এক আবশ্যিক ও অনিবার্য পন্থা, ধ্বংসাত্মক সমাজ-ব্যবস্থায় অবস্থানের পরিণাম নয়। সমাজ শৈশবে শিশুকে একবারমাত্র ছুঁয়ে দিচ্ছে আর তার ফলে ঘটেছে নিউরোসিস। পরবর্তীকালে চলছে শুধু মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া—উদ্বেগের আক্রমণ, সে আক্রমণের প্রতিরোধ ইত্যাদি। ফ্রয়েড বলেছিলেন সামাজিক বাধানিষেধ সহজাত প্রবৃত্তিকে অবদমিত করার ফলে আন্তর-মানসিক যে ঘাত-প্রতিঘাতের সূত্রপাত —তার থেকে ঘটে নিউরোসিস। তত্ত্বের দিক থেকে, বিশেষ করে বিরোধকারী শক্তির অনড়তা ও অপরিবর্তনধর্মিতার দিক থেকে, এদের মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ নেই।

নিউরোটিক চরিত্রের বিশেষত্ব—বিরোধী ব্যক্তিত্বগুণের (contradictory personality traits) সমাবেশ, অর্থাৎ তার স্ববিরোধী সত্তা ও আন্তর্মানসিক দ্বন্দ্ব (intrapsychic conflicts) এই হল হর্নির বক্তব্য। নিউরোটিক চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এ ধারণা নির্ভুল নয়। সুস্থ মানুষ কোন ধ্বংসাত্মক বা আক্রমণাত্মক কাজ করে যতটা আত্মগ্লানি বা অনুতাপ বোধ করে, নিউরোটিক সব সময়ে ততটা করে না। স্ব-বিরোধী সত্তার অস্তিত্ব সত্ত্বেও দেখা যায় নিউরোটিক অতিমাত্রায় পরনির্ভরশীল ও বন্ধুভাবাপন্ন হতে পারে। যার উপর নির্ভর করছে বা যাকে বন্ধু ভাবছে, তাকে সবসময় ঘৃণা করছে না, শত্রু ভাবছে না। পরনির্ভরতা তার যতটা বেশি থাকে, আত্মনির্ভরতা ততটা থাকে না। বরং সুস্থ মানুষের মধ্যেই দেখি একই সময়ে অতিমাত্রায় ভালবাসার ও ঘৃণা করবার ক্ষমতা, বন্ধুতা ও ক্রোধ প্রকাশের প্রবণতা। হর্নি বলেন, নিউরোটিকরা নাকি তাদের স্ববিরোধী সত্তা সম্বন্ধে মোটেই সচেতন নয়।* আমি দেখেছি নিউরোটিকরা অধিকাংশ সময়ে তাদের বিরোধী মনোভাব সম্বন্ধে বেশীমাত্রায় সচেতন ; অন্তত তারা যে সুস্থ মানুষের চেয়ে বেশী আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মসচেতন, একথা সকলেই স্বীকার করবেন।

সমাজের অবিচার, অত্যাচার, হিংস্রতা, আতঙ্ক ইত্যাদি বাস্তব দিক ফ্রয়েডের সাইকো-এ্যানালিটিক তত্ত্বে উপেক্ষিত। হর্নির মতো তথাকথিত সমাজ সচেতন

---

* Horney—Our Inner Conflict, 1948, ch. I.

সাইকো-এনালিষ্টের তত্ত্ব শেষ পর্যন্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব ও জেকিল-হাইডের খেলায় পর্যবসিত। নিউরোটিকের মনে নাকি দুটি বিরোধী সত্তার সংঘর্ষ চলছে দিনরাত। একটি সত্তা ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন হয়ে আর একটি সত্তাকে গ্রাস করছে। "The God-like being is bound to hate his actual being"। রহস্যবাদীরা অনেকদিন থেকেই মানবমনে এই দেবাসুরের লড়াই দেখে আসছেন। নিও-ফ্রয়েডিয়ানরা তাদের থেকে বেশীদূরে এগিয়েছেন কি ?

সমাজব্যবস্থার গলদ বা সংস্কৃতির সংকট নিউরোসিসের কারণ—একথা এই সমাজ-সচেতন (?) মনোরোগবিদেরা মাঝে মাঝে বলেন বটে; কিন্তু সমাজব্যবস্থার গলদ সত্যিকারের কোথায় সেটা দেখিয়ে দেবার এতটুকু আগ্রহ এঁদের আদৌ নেই। সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে কোথায় বিরোধ? নিউরোটিকের চৈতন্যে সামাজিক কোন ভাবধারার প্রতিফলন: কি জন্য এই প্রতিফলন? এঁদের লেখার মধ্যে তার কোনই আভাস মেলে না। আগেই ফ্রমের কথা বলেছি। সমাজব্যবস্থার কথা বলতে গিয়ে মানুষের অগ্রগতির সর্বপ্রধান হাতিয়ার বিজ্ঞান, বিশেষ করে আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে এঁরা আক্রমণ করে থাকেন। শেষ পর্যন্ত এঁদের বিচার বিশ্লেষণে সেই ফ্রয়েডীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব, মনের অপরিবর্তনীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি অথবা প্রবৃত্তিমূলক ভাবধারাই প্রাধান্য লাভ করেছে দেখতে পাই। সমাজ থেকে ব্যক্তিকে দূরে সরিয়ে নিয়ে, তার নিজের সঙ্গে নিজের বিরোধের একটা কাল্পনিক তত্ত্ব এঁরা দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন। আন্তর্মানবিক সম্পর্ক নয়, ব্যক্তির আন্তর্মানসিক সম্পর্ক বা সংঘর্ষ এঁদের কাছে বড় কথা হয়ে ওঠে। বিজ্ঞান শেষ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথায় পর্যবসিত হয়। আসলে ফ্রয়েড ও নিওফ্রয়েডিয়ানদের মধ্যে তফাৎ শুধুমাত্র বাক্য বিন্যাসের। ফ্রয়েডের "Life instinct" ও হর্নির "Real self" একই পদার্থ।*

বার্টলেটের [F. H. Bartlett, "Sigmund Freud" (London, 1938] মতে সামাজিক মানুষ সম্বন্ধে ফ্রয়েডের কোনো ধারণাই ছিল না। সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য ফ্রয়েড ব্যক্তির অবচেতন মনে তলিয়ে যেতে পরামর্শ দিয়েছেন। ধর্মশাস্ত্র এই উপদেশ অনেকদিন ধরেই দিয়ে আসছে। হর্নি, ফ্রমও এই ধরনের কথা বলেছেন। হর্নি বলেছেন, আত্ম-উপলব্ধির শক্তিকে মুক্ত ও আয়ত্ত করাই 'নিউরোসিস' থেকে অব্যাহতির আদর্শ উপায়। এঁদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিকিৎসাপদ্ধতি সপ্রমাণ করে যে এঁরা সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ণয়ে সত্যিকারের উৎসাহী নন। সেই সনাতন আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মদর্শন ও আত্মোপলব্ধিই এঁদের

---

* এরিখ ফ্রমের শেষজীবনে লিখিত Anatomy of Human Destructiveness (Pelican)-এ তিনি অনেকটা বাস্তববাদী হয়েছেন।

ভরসা। হর্নির, "Neurosis & Human Growth" এবং ফ্রমের "Man For Himself" পড়লে আর এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না।

এই প্রসঙ্গে ফার্স্ট-এর মতামত বিশেষভাবে উল্লেখ্য। কেননা অনেকদিন তিনি সাইকোঅ্যানালিষ্ট হিসেবে প্র্যাক্টিস্ করেছেন।* নিজের মনে নয়,—বিরুদ্ধ শক্তির সংঘর্ষ ঘটছে বাইরে সমাজে। অবশ্য নিউরোটিকের অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই, একথা ফার্স্ট বলেননি, তিনি বলেছেন, এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সামাজিক দ্বন্দ্বের প্রতিফলন।** রাজনৈতিক লড়াই ও শ্রেণীসংগ্রাম আমাদের সমাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সব সময় বিদ্যমান। আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দিষ্ট হয় এই সংগ্রামে আমাদের বিশেষ ভূমিকা অনুযায়ী। এই সংগ্রামে নিজস্ব ভূমিকার সঠিক হদিশ না পাওয়ার জন্য নিউরোটিকের সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও ব্যবহারে দেখতে পাই বিচ্ছিন্নতা, উদ্দেশ্যহীনতা, সৃজনমূলক, গঠনমূলক কাজের প্রতি অনীহা, সুস্থ ব্যক্তি-সম্পর্ক-রক্ষা ব্যাপারে অক্ষমতা। নিউরাসথেনিকের শারীরিক দুর্বলতার অজুহাতে নিশ্চেষ্টতা, সাইক্যাসথেনিকের অব্যবস্থচিত্ততা ও দ্বিধা, এবং হিষ্টিরিকের ভয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে—এ সবের মূলে আছে নিউরোটিকের পারিবারিক ও সামাজিক বিরোধের প্রতিফলন। এখানে মনে রাখা দরকার যে মানুষের সবরকম আদর্শবাদ, মূল্যায়ন প্রচেষ্টা, উদ্দেশ্য, আবেগ; এককথায় সব রকমের ধ্যান-ধারণার সৃষ্টি করে সমাজের বিশেষ অর্থনৈতিক বিন্যাস, সামাজিক মূল্যবোধ, দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও অধিসৌধের অপরাপর উপাদান। অবশ্য ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ, দেশের পুরনো সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করে নিঃসন্দেহে। ব্যক্তিবিশেষের মানসিকতা শাশ্বত, সনাতন নয়; মনের অন্তর্নিহিত গুণ বা ধর্ম নয়: বিশেষ অবস্থা বা পরিবেশের ফল। সমাজব্যবস্থায় বিবদমান বহু শ্রেণীর অস্তিত্ব

---

* In contrast to the entire psychanalytic tradition, with all the subjective, mystical and esoteric involvements that necessarily and demonstrably flow from it. I would say unequivocally that the determining contradiction of neurosis is not an internal, psychological and subjective one. It is an external contradiction. It lies in the neurotic's social practice.—Hurst, The Neurotic op cit. p. 149.

** The internal conflicts are reflections and derivatives of the conflicts in his social practice and the latter express the contradictory relations that are inherent in our social system.—Ibid.

থাকবে, বিভিন্ন ধরনের আদর্শবাদ, মূল্যবোধ, নীতিবোধ, ধ্যানধারণা গড়ে উঠবেই। বস্তুজগতকে, সমাজকে সম্যকভাবে বুঝতে না পারলে অন্তর্জগতে বহির্বাস্তবের দ্বন্দ্বের প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু নিউরোসিস হবে কি হবে না—সেটা নির্ভর করবে ব্যক্তিবিশেষের নার্ভতন্ত্রের বিশেষ গঠন এবং দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের গুরুত্ব ও মাত্রার উপর। নার্ভতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ও মস্তিষ্কের টাইপের বিশেষত্বের সঙ্গে নিউরোসিসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, এ কথা ঠিক। কিন্তু মস্তিষ্কের টাইপ ও নার্ভতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের সবটাই জন্মসূত্রে পাওয়া বলে বস্তুবাদী মনস্তাত্ত্বিকরা মনে করেন না।

মনোরোগের কারণ নির্ণয়ে ফ্রয়েড, এ্যাডলার, ইয়ুং ও তাঁদের অনুবর্তী প্রবৃত্তিসর্বস্ব মনস্তাত্ত্বিকের দল যে কাল্পনিক সৌধ নির্মাণ করেছিলেন আজ নব আবিষ্কৃত তথ্যের আঘাতে সে সৌধ ভগ্নপ্রায়—এতক্ষণ ধরে আমি এ কথাই বলতে চেয়েছি। নিউরোসিসের কারণ সম্পর্কে পাভলভীয় ধারণা নিয়ে আলোচনা করবার আগে আর একটি মতবাদের উল্লেখ করা দরকার। নিউরোসিস তথা মনোরোগের কারণ নির্ণয়ে স্ট্রাম্পেল, রেমণ্ড প্রভৃতি পণ্ডিতের দল মস্তিষ্ককোষের সংস্থান সংক্রান্ত অতি সূক্ষ্ম পরিবর্তনের (micro-morphological ci anges) আবিষ্কারের আশা পোষণ করতেন। ফ্রয়েডীয় তাত্ত্বিকদের একেবারে বিপরীত মতাবলম্বী এঁরা। এঁরা ব্যবহারবাদীদের মতই যান্ত্রিক চেতনায় অতিমাত্রায় আচ্ছন্ন। ফির্কাও প্রবর্তিত কোষভিত্তিক বিকারতত্ত্বের (cellular pathology) অনুগামী এই স্ট্রাম্পেল-রেমণ্ডের দল। কোষের বিকার বা আকস্মিক পরিবর্তন ছাড়া রোগ উপসর্গ দেখা দিতে পারে না—এই ছিল এঁদের ধারণা। পরবর্তীকালে আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের হাসপাতালের রেকর্ড থেকে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে সাধারণত যত রোগী হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসার জন্য আসেন, তাদের অন্তত এক তৃতীয়াংশের রোগ উপসর্গের কোষভিত্তিক কোন কারণ নেই। যন্ত্রের বিকলতাজনিত রোগ উপসর্গ (functional symptoms) আজ চিকিৎসক মহলে সুবিদিত ও স্বীকৃত। যদিও এর বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা সুবিদিত নয়। দেহ-মন সমান্তরালবাদ (psycho-physical parallelism) সূত্র দিয়ে যন্ত্রের বিকলতাজনিত উপসর্গের ব্যাখ্যার চেষ্টা তিরিশের দশক থেকে প্রসার লাভ করেছে। বলা বাহুল্য এই ব্যাখ্যায় দেহ ও মনকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে দেখা হয়ে থাকে এবং

অনুমিত হয়ে থাকে যে তারা সমান্তরাল থেকে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ না রেখেও পরস্পরকে প্রভাবিত করে থাকে। বস্তুবাদীদের মতে এই তত্ত্বের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।*

এইবার পাভলভের তত্ত্বের অবতারণা করছি। পাভলভই প্রথম ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষামূলক নিউরোসিস সৃষ্টি করেন এবং এর দ্বারা নিউরোসিসের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়াকলাপভিত্তিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন। জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষের স্নায়ু-প্রক্রিয়া ও মানসিকতা গড়ে ওঠে। গুরুমস্তিষ্কের কোষগুলি খুবই নমনীয় ও সহজেই প্রভাবিত হয়, সমাজ ও প্রকৃতির নানা পরিবর্তনের সঙ্গে গতিশীল সামঞ্জস্য (dynamic equilibrium) রেখে চলবার ক্ষমতা আছে মানুষের। পুরনো অভ্যাস ভেঙ্গে নতুন অভ্যাস গড়ে জীবন পথে এগিয়ে চলে মানুষ। পাভলভ দেখিয়েছেন এই ভাঙ্গা-গড়ার কাজে গুরুমস্তিষ্কের ভূমিকা প্রধান। পাভলভের মতে গুরুমস্তিষ্ককোষের অতি নমনীয়তা (প্লাসটিসিটি) নতুন শর্তাধীন পরাবর্ত গঠনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। যদি শর্তগুলি হাতের কাছে থাকে, তবে নতুন পরাবর্ত গঠন সব সময়েই সম্ভব। কোনো অবস্থাতেই মানবপ্রকৃতি অনড় নয়, উৎকর্ষসাধনের সম্ভাবনায় উজ্জ্বল।

কিন্তু উচ্চমস্তিষ্কের সামনে এমন শর্তও আসতে পারে যে, শর্তানুযায়ী নতুন পরাবর্ত গড়া সেই মস্তিষ্কের পক্ষে সম্ভব নয়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের চাপ ক্রমশ বেড়ে উঠতে পারে; বেশিদিন ধরে চাপ চললে যে কোনো সুষম শক্তিশালী স্নায়ুতন্ত্রও এর চাপে ভেঙ্গে পড়তে পারে। ফলে উচ্চমস্তিষ্কের বিকলতাজনিত অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। দীর্ঘদিনস্থায়ী উচ্চমস্তিষ্কের বিকলতাজনিত অবস্থাই নিউরোসিস। নিউরোসিসের গতি-প্রকৃতি ও উৎপত্তির বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে নিউরোটিকের মস্তিষ্কের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্যের উপর।

ল্যাবরেটরী ও ক্লিনিক থেকে সংগৃহীত তথ্য (পাভলভকে ধন্যবাদ!) আজ মনোরোগের কারণ নির্ণয়ে বিশেষ আলোকপাত করেছে। এখন আমরা জানি যে, যদি কোনো স্নায়ুতন্ত্রের সহন ক্ষমতার থেকে বেশী জোরালো শর্তহীন বা শর্তাধীন পরাবর্ত মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে, তবে কোষের মৌলিক ধর্মের (উত্তেজনা-নিস্তেজনা) মাত্রা ও পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে কর্টেক্স ও সাবকর্টেক্স অর্থাৎ গুরুমস্তিষ্ক ও নিম্নমস্তিষ্কের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় ও মানুষের বেলায়, এছাড়া, প্রথম ও দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরে ঘটে বিশৃঙ্খলা। উত্তেজক বা নিস্তেজক উদ্দীপকের অতি তীব্রতা অথবা এদের গতিশীলতার দরুণ সংঘাত থেকে নিউরোসিসের উৎপত্তি।

* বিকফের Cortic-Viscerd Reflex—Moscow, দ্রষ্টব্য।

মানসিক উদ্দীপকের তীব্রতা ও আকস্মিকতা যেমন বিশৃঙ্খলা ঘটাতে পারে, তেমনি পারে উদ্দীপকের দীর্ঘস্থায়িতা। অবশ্য মানসিক রোগ দেখা দেবে কিনা, নির্ভর করে ব্যক্তির নার্ভতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের ও ব্যক্তির পক্ষে ঐ উদ্দীপকের কতখানি গুরুত্ব—তার উপর। এ-ছাড়া উদ্দীপনা-মুহূর্তে ব্যক্তির মানসিক অবস্থার কথাও মনে রাখা দরকার। প্রক্ষোভ-পীড়িত মনে লঘু উদ্দীপকের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। যদি বহির্বাস্তব ও অন্তরযন্ত্রের গতিশীল সামঞ্জস্য কোন ঘটনায় ভেঙ্গে পড়ে ও নতুন করে যদি সামঞ্জস্য বিন্যাসের চেষ্টা করতে হয়, তবে উচ্চমস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপে বিশৃঙ্খলা ঘটতে পারে, নিম্নমস্তিষ্কের প্রভাবাধীন হয়ে পড়তে পারে উচ্চমস্তিষ্ক। তখন উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, ভয়, আত্মবিশ্বাসের অভাব, দুর্বলতাবোধ, অপরিসীম ক্লান্তি ও সমাধানাতীত মানসিক দ্বন্দ্ব ইত্যাদি, নিউরোসিসের নানা উপসর্গ দেখা দেয়। ক্রমে মস্তিষ্কের স্থিতিস্থাপকতার আরও অবনতি ঘটতে থাকে। সহজ কাজ কঠিন মনে হয়, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বিড়ম্বনা হয়ে ওঠে। স্থিতিস্থাপকতার অবনতির ফলে ব্যক্তির অভিভাব্যতা, বিশেষ করে স্ব-অভিভাব্যতা (auto-suggestibility) বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীকালে এই স্ব-অভিভাব্যতা রোগ উপসর্গকে জটিলতর করে তোলে এবং রোগকে দীর্ঘস্থায়ী করতে সাহায্য করে। মনোরোগের বিভিন্ন কারণগুলোকে পৃথক পৃথক ভাবে বিশ্লেষণ করার আগে নিউরোসিসের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন।

প্রাক্-পাভলভ যুগে মনোরোগ তথা নিউরোসিসের শ্রেণীবিভাগের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না। পাভলভ প্রথম দেখালেন যে, নিউরোসিসের শ্রেণী মস্তিষ্কের টাইপের উপর নির্ভর করে। ১৯২৪ সালে লেনিনগ্রাডের বন্যার পর প্রথম প্রাণীর মধ্যে নার্ভতন্ত্রের বা মস্তিষ্কের বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করেন পাভলভ। সমুদ্রের ঢেউ পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে এসে আছড়ে পড়ছে ল্যাবরেটরির গায়ে। ঝড়-বিদ্যুতের মাতামাতি দাপাদাপি বাইরে। নীচুতলায় পাভলভের কুকুর-গুলোর আস্তানা, সেখানেও জল ঢুকছে অবিরাম। বাজের শব্দ, ঝড়ের শব্দ কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছে। আশেপাশে গাছপালা ভেঙ্গে পড়ছে—সেই শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিপন্ন মানুষের আর্ত চীৎকার। এমনি অবস্থায় কুকুরগুলোকে চারতলার একটি ঘরে নিয়ে আসা হয়। বিস্ময়ের সঙ্গে পাভলভ লক্ষ্য করলেন যে তারা পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিল না। কারণ কি? দারুণ দুর্যোগ ও বিপত্তির মুখে, এইরকম বন্যার সময় ভাসমান কোনো আশ্রয়ে বিষধর কেউটে আর মানুষ বন্ধুর মত একসঙ্গে থাকতে পারে—এ সংবাদ আমরা জানি। আকস্মিক দুর্যোগ আত্মরক্ষাপ্রবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করে প্রাণীর মস্তিষ্ক পুরোপুরি নিস্তেজিত করে দিয়েছে,—পাভলভ বুঝতে পারলেন। বেশী শক্তিশালী শর্তহীন রিফ্লেক্স কম শক্তিশালী রিফ্লেক্সকে অকেজো করে দিতে পারে পাভলভ জানতেন;

সে কথা এখন থাক। কুকুরগুলোকে এই 'নিদারুণ অভিজ্ঞতার' পর নিজের নিজের জায়গায় ফিরিয়ে আনা হল। কিছু সংখ্যক কুকুর আগের মতই ব্যবহার করতে লাগল, কিন্তু কয়েকটি কুকুরের আচরণে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। পাভলভ প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত নিউরোসিসের প্রকাশ দেখলেন। পাভলভ বুঝলেন বহির্বাস্তবের অতি শক্তিশালী উদ্দীপক (এক্ষেত্রে বন্যা) নার্ভতন্ত্রকে রোগাক্রান্ত করতে পারে, যার ফলে ঘটে উচ্চমস্তিষ্ক-ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা। আরও জানলেন যে, একই প্রজাতির সকল প্রাণীর নার্ভতন্ত্রে সহনশীলতা একরকমের নয়। শক্তিশালী উত্তেজক-উদ্দীপকের সংঘাত দুর্বল মস্তিষ্ককে রোগাক্রান্ত করতে পারে। আরও প্রকাশ পেল যে, বিভিন্ন ধরনের নার্ভতন্ত্রে রোগের প্রকাশ পায় বিভিন্নরূপে।

নার্ভতন্ত্রের ধরনটা কি? কোন্ কোন্ ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য দিয়ে বিভিন্ন ধরন সূচিত করা হয়? এ বৈশিষ্ট্য কি জন্মদত্ত না পরিবেশায়ত্ত? প্রথম পর্বে এ নিয়ে কিছু আলোচনা আছে। মনে হয়, তা সত্ত্বেও মনোরোগ প্রসঙ্গে আর একবার বলার প্রয়োজন।

নার্ভতন্ত্রের 'টাইপ" বা বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে মৌলিক নার্ভক্রিয়ার (উত্তেজনা ও নিস্তেজনা) মাত্রা, ভারসাম্য ও গতিময়তার (strength, balance & mobility) বিচার করা হয়। মাত্রা ও ভারসাম্য কথা দুটির ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। গতিময়তা উত্তেজনা থেকে নিস্তেজনা অথবা নিস্তেজনা থেকে উত্তেজনায় রূপান্তরণের মাপকাঠি। সেই নার্ভতন্ত্রকে বেশি গতিময় (mobile) বলি যেখানে এই রূপান্তরণ ক্রিয়া অতি সহজ ও দ্রুত সম্পন্ন হয়। গতিময়তা যাদের বেশী তারাই সহজে পুরনো শর্তাধীন পরাবর্ত ভেঙ্গে নতুন পরিবেশ অনুযায়ী নতুন শর্তাধীন পরাবর্ত তৈরী করতে সক্ষম, মানিয়ে নেবার ক্ষমতা তাদের বেশী। মোটামুটি চার রকমের টাইপ দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য বাস্তবক্ষেত্রে সকলকে এই চার টাইপের দেওয়ালের মধ্যে বাঁধা যায় না। চব্বিশেরও বেশী সাব্-টাইপ আবিষ্কার করা গেছে এযাবৎ। আমাদের আলোচনা কিন্তু চারটি টাইপের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

উত্তেজনা ও নিস্তেজনার তীব্রতার তারতম্য অনুযায়ী মস্তিষ্ককে প্রথমে 'সবল ও দুর্বল"—দুভাগে ভাগ করা হয়। দুর্বল টাইপের বিশেষত্ব এই যে, তাদের মস্তিষ্কে উত্তেজনা ও নিস্তেজনা দুয়েরই তীব্রতার অভাব, স্নায়ুপ্রক্রিয়ার মাত্রা কম। তাছাড়া এদের সহ্য ক্ষমতাও কম। উত্তেজনা ও নিস্তেজনার মাত্রা একটু বাড়লেই এরা আর তা সইতে পারে না। উচ্চমস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের বিশৃঙ্খলা এদের মধ্যে অতি সহজেই প্রকাশ পায়। নিউরোসিসের প্রধান উৎস হল এই দুর্বল টাইপের মস্তিষ্ক। বিষাদ রোগের প্রাদুর্ভাব এদের মধ্যে বেশী বলে এদের বলা

হয়েছে melancholic বা বিষণ্ণ টাইপ। এরা অল্পেতেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে; আত্মবিশ্বাস এদের থাকে না এবং এরা সব কাজে উৎসাহের অভাব বোধ করে। এরা সবতাতেই ভয় পায় ও সবসময় অতিমাত্রায় উৎকণ্ঠিত থাকে। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে এদের বিশেষ কষ্ট হয়, দুঃখকষ্টের মুখে বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে পড়ে, পরিবর্তন ও নতুনত্বকে সন্দেহের চোখে দেখে।

সবল মস্তিষ্কের তিনটি প্রধান টাইপ নির্দেশ করেছেন পাভলভ। এদের দুটি টাইপের মধ্যে আছে উত্তেজনা ও নিস্তেজনার সমতা আর একটি টাইপের মধ্যে এই সমতার অভাব। অসমঞ্জস এই টাইপের বিশেষত্ব এদের অতি উত্তেজনাপ্রবণতা। নিস্তেজনাক্রিয়া এদের দুর্বল। পাভলভের ভাষায় এরা "unrestrained" বা অসংযত টাইপ। মনোরোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা এদেরও যথেষ্ট। এরা সাধারণত অতিমাত্রায় উৎসাহী ও আত্মবিশ্বাসী। প্রাণশক্তি ও কর্মশক্তির প্রাচুর্যে সদাচঞ্চল, দৃঢ়চেতা ও সদাসর্বদা নতুনত্বের সন্ধানী। কিন্তু এরা অসহিষ্ণু ও অসংযমী। আত্মশক্তি সম্বন্ধে এদের ধারণার অতিশয়তা ও এদের সীমাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা এদের জীবনে প্রায়শই অসাফল্য নিয়ে আসে।

সুসমঞ্জস নার্ভতন্ত্রের অধিকারী দুটি টাইপের মধ্যে গতিময়তার পার্থক্য আছে। যে-টাইপের গতিময়তা কম, যাদের উত্তেজনা-নিস্তেজনার রূপান্তরণ অপেক্ষাকৃত সময়সাপেক্ষ, তাদের বলা হয় ফ্লেগম্যাটিক (phlegmatic) টাইপ। অপরপক্ষে অন্য টাইপের গতিময়তা বেশী। উত্তেজনা-নিস্তেজনা রূপান্তর সহজেই ঘটে। পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে খুব সহজেই এরা নিজেদের মানাতে পারে। উত্তেজনা-নিস্তেজনার সমতা থাকায় এই দুই টাইপে মনোরোগের প্রাদুর্ভাব বিরল। অবশ্য মনে রাখা দরকার, অতি-দুঃসহ পরিবেশে বা অতি-কঠিন জীবনসংগ্রামে এদেরও স্নায়ুপ্রক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে, এরাও ভেঙ্গে পড়তে পারে। দ্বিতীয়টি 'স্যাংগুইন' (sanguine) টাইপ বলে অভিহিত।

ফ্লেগ্‌ম্যাটিকের বিশেষত্ব, তারা সংযমী, অধ্যবসায়ী, অচঞ্চল, ধীর ও ঘাতসহ। এরা বিফলতায় ভেঙ্গে পড়ে না। উদ্যমশীলতার অভাব এদের মধ্যে দেখা যায় না। দীর্ঘকাল ধরে একই বিষয়ে এরা কাজ করে যেতে পারে। উদ্দীপকের দীর্ঘস্থায়িত্ব এদের বিকল করে না। তবে এরা চটপটে নয়, ধীরে সুস্থে কাজ করে ও এক কাজ থেকে অন্য কাজে যাওয়া এদের পক্ষে কষ্টসাধ্য। দীর্ঘস্থায়ী গবেষণামূলক কাজে এদের সাফল্যের সম্ভাবনা অধিক। বাহ্যত মনে হয় এরা যেন অনড় প্রকৃতির। কোনো সাড়া দিতে এদের সময় লাগে, অল্পেতে এদের

উৎসাহ জাগে না।

সবল সুষম টাইপের অপরটি বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করতে পারে অবলীলাক্রমে, কেননা গতিময়তা এদের বেশী। এরা সাড়া দেয় অল্পেতেই, আর সাড়া দেয় উৎসাহের সঙ্গে। বাহ্যত "অতি-উত্তেজনাপ্রবণ" টাইপের সঙ্গে এদের অনেক সাদৃশ্য। কিন্তু মনে রাখা দরকার এরা সংযমী। উত্তেজিত বা নিস্তেজিত সহজেই হয় বটে, কিন্তু আত্মসংযমের ক্ষমতা এদের যথেষ্ট। বড় ব্যবসায়ের কর্মকর্তা, পার্টিনেতা বা রাষ্ট্রনেতাদের এই ধরনের নার্ভতন্ত্র বাঞ্ছনীয়।

পশু ও মানুষ দুয়ের মধ্যেই এই চার টাইপের সন্ধান মিলবে। কিন্তু মানব-মস্তিষ্কের বিশেষত্ব তার দ্বিতীয় সাংকেতিক নার্ভতন্ত্র বা বাক্‌তন্ত্র (second signalling system)। এই বিশেষত্বের পরিপ্রেক্ষিতে পাভলভ মানুষের মধ্যে আরও তিনটি বিশিষ্ট টাইপের সন্ধান পেয়েছেন। পঞ্চেন্দ্রিয়কেন্দ্রিক প্রথম সাংকেতিক নার্ভতন্ত্র (first signalling system) ও দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্রের সুষম বিন্যাস দেখা যায় "মধ্যবর্তী বা intermediate টাইপে। এদের সংখ্যাই বেশী। 'আর্টিস্ট' টাইপ বলেছেন তাদের, যাদের প্রথম সাংকেতিকতন্ত্র অপেক্ষাকৃত বেশী শক্তিশালী দ্বিতীয়টির চেয়ে। আর 'দার্শনিক' টাইপ তারা, যাদের দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্র প্রথমটির থেকে বেশী জোরালো।

'আর্টিস্ট' বলতে কি বুঝেছেন পাভলভ? প্রথম সাংকেতিকতন্ত্র গন্ধ-স্পর্শ-রূপ-রস ইত্যাদির অনুভূতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বহির্বাস্তব আর্টিস্টদের কাজে মূর্ত কল্পনায় প্রতিভাত, ভাবাবেগ রঙীন ও জীবন্ত। আর 'দার্শনিক' ব্যস্ত থাকেন তত্ত্ব নিয়ে, বিমূর্ত চিন্তা আর ধ্যানধারণার মাধ্যমে কারবার করেন জগতের সঙ্গে। কতকগুলো বিমূর্ত গাণিতিক সংকেতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে কল্পনা করে নিতে এদের আটকায় না। এদের ধ্যানধারণায় থাকে না রঙিন ভাবোচ্ছ্বাস বা বাস্তবের প্রত্যক্ষ মূর্তরূপ। ভাষার যা কাজ —"সামান্যীকরণ ও বিমূর্তকরণ" (generalisation & abstraction)—এঁদের ভাষাভিত্তিক চিন্তার সাহায্যে এরা তাই করে থাকেন।

যদি প্রথম অথবা দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্রের যে কোনটি বেশী মাত্রায় সক্রিয় হয় কোন মস্তিষ্কে, তবে ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। অতিমাত্রায় আর্টিস্ট বা অতিমাত্রায় দার্শনিক টাইপের সৃষ্টি হয়।

নিউরোসিসের কারণ নির্ণয়ে ও শ্রেণীবিভাগে এই টাইপের জ্ঞান অপরিহার্য, তাই টাইপ সম্পর্কে আবার এত কথা বলতে হচ্ছে। টাইপের বৈশিষ্ট্যগুলি সবই জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ভাবলে কিন্তু ভুল হবে। মিচুরিন পাভলভ প্রমুখ বিজ্ঞানীরা কখনও "eternal & immutable heredity" তত্ত্ব অর্থাৎ কুল-সংক্রমিত গুণাবলীর অপরিবর্তনীয়তায় বিশ্বাস পোষণ করতেন না। বহির্বাস্তবের প্রভাব ও জীবনধারণের

সুযোগ সুবিধার তারতম্য থেকে প্রধানত টাইপ-এর বিশেষত্বগুলো গড়ে ওঠে। পাভলভের মতে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত নার্ভতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ও টাইপ পরিবেশের প্রভাবে পরিবর্তিত হতে পারে ও হয়ে থাকে।

কয়েক পুরুষ ধরে একই পরিবেশে গঠিত শর্তাধীন রিফ্লেক্স কুলসংক্রমক শর্তহীন রিফ্লেক্সে পরিণত হতে পারে। সাম্প্রতিককালের 'জীন' সম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে যে, জন্মসূত্রে লব্ধ গুণাবলীর পরিকল্পনানুযায়ী পরিবর্তন ঘটানো যায়। নার্ভতন্ত্রের টাইপ অনুযায়ী নিউরোসিসের শ্রেণীবিভাগ নিঃসন্দেহে মানসিক রোগ-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সূচনা। এই প্রথম বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে মনোরোগকে বুঝবার প্রয়াস—একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। একমাত্র মস্তিষ্ককোষের উত্তেজনা, নিস্তেজনা ও গতিময়তাকে ভিত্তি করে শ্রেণীবিভাগের মধ্য দিয়েই নিউরোসিস-এর গতি প্রকৃতি ও মস্তিষ্ককোষের বিকলতা সম্পর্কে জ্ঞান বাড়তে পারে।

মোটামুটি নিউরোসিসকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। নিউর্যাসথেনিয়া বা মধ্যবর্তী টাইপের নিউরোসিস, হিষ্টিরিয়া বা 'আর্টিস্ট' টাইপের নিউরোসিস এবং সাইক্যাসথেনিয়া বা দার্শনিক টাইপের নিউরোসিস। বিভিন্ন শ্রেণীর নিউরোসিসের বিশদ বিবরণ দেবার আগে সাধারণ ভাবে নিউরোসিসের সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা যাক।

আগেই বলেছি, পরিবেশের চাপ অনেক সময়েই ব্যক্তির নার্ভতন্ত্রের শক্তি ও সহনশীলতাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, উত্তেজনা-নিস্তেজনা প্রক্রিয়া ও তাদের গতিময়তা এমনভাবে অতি-পীড়িত হতে পারে যে উচ্চ মস্তিষ্ক ক্রিয়া বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। এই বিশৃঙ্খলাই নিউরোসিস।

উত্তেজনা-ক্রিয়ার অতি-পীড়ন ঘটে সাধারণত যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী পরিশ্রম ইত্যাদি থেকে। অনেকদিন ধরে বিপদের মধ্যে বা ভয়ে ভয়ে থাকলেও উত্তেজনা ক্রিয়ার অতিপীড়ন ঘটে। আমরা যখন অবস্থার বিপাকে, নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে কোনো প্রবল ইচ্ছা বা অভীষ্ট কর্মপ্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রণ বা দমন করতে বাধ্য হই, তখন নিস্তেজনা-প্রক্রিয়ায় অতি-পীড়ন (over strain) ঘটে। চাকরি যাবার ভয়ে বড় সাহেবের অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ না করা, নীরস কর্তব্যের খাতিরে প্রেমহীন দাম্পত্যজীবন যাপন করা, অনিচ্ছার সঙ্গে নিরানন্দ কাজ করা ইত্যাদি নিস্তেজনা ক্রিয়ার অতিপীড়ন ঘটাতে পারে। অনবরত এবং ঘন ঘন যাদের বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে মনঃসংযোগ করতে হয়, পরস্পরবিরোধী আদর্শ নিয়ে যাদের কাজ করতে হয়, অথবা যাদের কাজকর্ম বা চিন্তাধারার মধ্যে স্ব-বিরোধিতা বর্তমান, তাদের মধ্যে দেখা যায় গতিময়তার অতিপীড়ন (over-strain of mobility)। যাদের

নার্ভতন্ত্র অলস ধরনের (inert), তারা যদি বারবার অভ্যস্ত জীবন ধারণের রীতি বা পদ বদলাতে বাধ্য হয় – গতিময়তার অতিপীড়নের ফলে তাদেরও উচ্চ-মস্তিষ্কক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা ঘটা খুবই স্বাভাবিক।

একথা কোনো সময়েই যেন মনে করা না হয় যে, নার্ভতন্ত্র সহশক্তির সীমা পূর্ব-নিরূপিত বা দক্ষতা পূর্ব-নির্ধারিত। মনে রাখা দরকার, সহক্ষমতা বা দক্ষতা অপরিবর্তনীয়, বা স্থাণু (static) নয়। এর মাত্রাবৃদ্ধি সম্ভব। যেমন অতি পরিশ্রম, পুষ্টিকর খাদ্যাভাব, দৈহিক রোগ, মানসিক আঘাত, নিরাপত্তার অভাব ইত্যাদি নার্ভতন্ত্রকে দুর্বল করে দিতে পারে, তেমনি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, সুশিক্ষা ও সহনশীলতার অভ্যাস নার্ভতন্ত্রকে শক্তিশালী করে তুলতে পারে। ব্যক্তির দক্ষতা ও সহক্ষমতা বৃদ্ধির পক্ষে সব থেকে বেশী সহায়ক সমষ্টির সঙ্গে একাত্মবোধ ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাপত্তার আশ্বাস। যত বেশী সামাজিক হবে ব্যক্তি, ততই তার নিউরোসিসের সম্ভাবনা কম। যে সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা অবহেলিত, ব্যক্তিসম্মান পদদলিত, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত—সেখানে নিউরোটিকের সংখ্যা বেশী। যেখানে মানবতাবোধ বেশী জাগ্রত, পারস্পরিক সহানুভূতি সহৃদয়তা পরিস্ফুট ও বিষম প্রতিযোগিতা দূরীভূত সেখানে নিউরোটিকের সংখ্যা কম। যে মানুষ ভালবাসতে জানে, বন্ধুতার মর্যাদা রাখতে জানে, দেশাত্মবোধে উদ্‌বুদ্ধ, কল্যাণকর মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত—তার নিউরোসিসে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কম হতে বাধ্য।

নার্ভতন্ত্রের টাইপ সমস্যাটিকে পাভলভ অতি-গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে উপদেশ দিয়েছেন। কোনো ব্যক্তির নার্ভতন্ত্রের শক্তি বা পরিমাপের থেকে অনেক বেশী দামী তার ব্যক্তিত্বের সামাজিক মূল্য। উচ্চ মস্তিষ্ককোষের দুর্বলতাকে বা নার্ভতন্ত্রের গতিময়তার স্বল্পতা অথবা ভারসাম্যের অভাবকে জীবনের পক্ষে একটা নিদারুণ অসুবিধা ভাবলে ভুল হবে। আগেই বলেছি চারিত্রিক দৃঢ়তা, অনমনীয় ইচ্ছাশক্তি, শত্রুকে বা বিপদকে তুচ্ছ করা, কষ্ট-সহিষ্ণুতা, আদর্শের প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি সামাজিক গুণাবলী অভ্যাস-লভ্য ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক এবং নার্ভতন্ত্রের দুর্বলতার পরিপূরক। সমাজ ও ব্যক্তিসম্পর্কের সঠিক বিশ্লেষণ, জীবনের প্রধান সমস্যাগুলির সম্যক্ সমাধান, জটিল পরিস্থিতিতে ঠিকমত পথনির্ণয়,—জীবন সংগ্রামের অপরিহার্য অঙ্গ ও এর মূল্য নার্ভতন্ত্রের জন্মগত ক্ষমতার থেকে আদৌ কম নয়। নার্ভতন্ত্রের জন্মগত ক্ষমতা থেকে সামাজিক অভিজ্ঞতা-অর্জিত জ্ঞান ও চারিত্রিক বল মানুষের পক্ষে অনেক বেশী দামী।

নিউরোসিসের ব্যাপকতা ও প্রসার আমেরিকার হারে না হলেও আমাদের দেশে ক্রমবর্ধমান। আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের তুলনায় এখানে চিকিৎসার

ব্যাপারে আরও অব্যবস্থা। রোগীর চিন্তা ও ক্রিয়াকলাপকে ভিত্তি করে যে চিকিৎসা করা হয়, তার চলিত নাম 'সাইকো-থেরাপি'। ওষুধপত্র বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ছাড়া এ চিকিৎসা চলতে পারে বলে এক্ষেত্রে হাতুড়ের প্রাদুর্ভাব ও আধিপত্য খুব বেশী। আছেন সাধু, সন্ন্যাসী, যাজক, পুরোহিত, জ্যোতির্বিদ থেকে আধ্যাত্মিক শক্তির আধার গুরুদেব ও গুরুদেবী ; আছে অসংখ্য জলপড়া, ধুলোপড়া, মাদুলী, কবচ, মুষ্টিযোগ। এদের হাত পেরিয়ে চিকিৎসকের হাতে আসতে রোগীর বেশ খানিকটা সময় লাগে। অবশ্য অনেক সময় এদের হাতে কিছু কিছু রোগীর উপসর্গের সাময়িক উপশম হতে দেখা যায়। এতে এদের পশার বাড়ে আর মানসিক রোগের কারণ অলৌকিক রহস্যে ঘেরা বলে সাধারণের বিশ্বাস জন্মে : এরপর সর্বাধিক প্রচারিত 'সাইকো থেরাপী' হচ্ছে "সাইকো-এ্যানালিসিস" বা ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষা পদ্ধতি। মনঃসমীক্ষকদের দলে ডাক্তার ছাড়া কিছু সংখ্যক lay psycho-analysts-ও আছেন। আমাদের দেশে এঁরা সাধারণত দর্শন বা মনস্তত্ত্বের অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত। সমাজতান্ত্রিক দেশের বাইরে পাভলভীয় তত্ত্ব ও চিকিৎসাপদ্ধতি বিশেষ প্রসার লাভ করেনি। মাত্র ১৯৬০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পাভলভ সম্পর্কে আলোচনা ও তাঁর নির্দেশিত পদ্ধতিতে চিকিৎসার প্রচলন শুরু হয়েছে।

মনোরোগের কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের নানাদিক নিয়ে বিচার ও মনোরোগের কারণসম্পর্কিত পাভলভীয় গবেষণার উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে। এবার পাভলভীয় চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়ে সাধারণের বোধগম্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

রোগের ইতিহাস ও চিকিৎসা

কুকুরের মধ্যে নিউরোসিস উৎপাদন করে পাভলভ ও তার সহকর্মীরা নিউরোসিস ও অন্যান্য মনোরোগের কারণ সম্বন্ধে অনেক কথা আবিষ্কার করেন। চিকিৎসা সম্বন্ধেও এই উপলক্ষে তাদের অভিজ্ঞতা বাড়ে। পাভলভের সময় কেফিন ও ব্রোমাইড—এই দুটি ওষুধ ব্যবহৃত হত। কুকুরের নার্ভতন্ত্রের টাইপ অনুযায়ী ওষুধের সঠিক মাত্রা নির্ণয় করে তাঁরা ফলও পেয়েছিলেন। কেফিন উত্তেজনা ক্রিয়া ও ব্রোমাইড প্রধানত নিস্তেজনার ক্রিয়াকে শক্তিশালী করে। এ-ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে অসুস্থ প্রাণীকে সমস্যা সমাধানের দায় থেকে মুক্তি দিয়েও (বিশ্রাম) তাঁরা ফল পেয়েছেন। আজকাল সমাজতান্ত্রিক দেশে মনোরোগের চিকিৎসায় আধুনিক ওষুধ ব্যবহৃত হচ্ছে। নার্ভ শান্ত করার ওষুধ, (tranquiliser), স্নায়ুতন্ত্রকে উদ্দীপ্ত করে বিষণ্ণতা দূর করার ওষুধ (anti-depressant), ও অন্যান্য আধুনিক পদ্ধতির ব্যবহারে পশ্চিমী দুনিয়ার সঙ্গে তাঁদের বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। তবে নিদানতত্ত্ব ও মানসিক চিকিৎসার (psychotherapy) ব্যাপারে পাভলভ-অনুগামী বস্তুবাদী চিকিৎসকদের সঙ্গে পশ্চিমী দেশের ভাববাদী চিকিৎসকদের মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। 'পাভলভ পরিচিতির' পাঠকদের কাছে চিকিৎসা পদ্ধতির বিশদ বিবরণের কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। আমাদের উদ্দেশ্য কি অবস্থায়, কোন ধরনের সামাজিক পরিবেশে এবং কেন ব্যক্তি মানসিক রোগাক্রান্ত হয়—সেইটেই সাধারণ পাঠকদের কাছে তুলে ধরা। মনোরোগের কারণ সম্বন্ধে জনসাধারণের যত জ্ঞান বাড়বে, প্রতিকার ও প্রতিরোধ সম্পর্কে ততই তাঁদের আগ্রহ বাড়বে এবং নিজেদের বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রতিরোধের সম্ভাব্য উপায় ও প্রতিষেধকের উদ্ভাবনে সচেষ্ট হবেন। ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক, দ্বন্দ্ব, আন্তর্মানবিক প্রতিযোগিতা-সহযোগিতা সম্পর্কে আমরা যতই সজাগ হব, সমাজকে সুস্থ ও মানবিক করার কাজে যতই উদ্যোগী হব, ততই আমরা নিজেদের সুস্থ রাখতে পারব ও অন্যকে সুস্থ রাখবার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করতে সক্ষম হব। তাই এবার তত্ত্বগত আলোচনা বন্ধ রেখে মনোবিদের ডায়েরী থেকে প্রধান প্রধান মানসিক ব্যাধি কবলিত কিছু রোগীর ব্যক্তিগত রোগ ইতিহাসের বিবরণ দিচ্ছি। এই ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় ঘটলে মনোরোগ সম্পর্কিত অনেক ভ্রান্ত ধারণার নিরসন ঘটবে এবং এই সম্পর্কিত ভয় ও কুসংস্কার

অনেকাংশে দূরীভূত হবে। এই বিবরণে যতদূর সম্ভব টেকনিক্যাল কথা পরিহার করার এবং সাধারণের বোধগম্য করে রোগ ইতিহাস বলার চেষ্টা করছি। ডায়েরীর লেখন প্রায় অবিকৃত রাখতে গিয়ে কোনো ইতিহাস দীর্ঘ হয়েছে, কোনোটা হ্রস্ব হয়েছে। কিছু রোগী বা তার আত্মীয় সব কিছু ফেনিয়ে বলতে চায়, আবার কেউ বা সব কিছু সংক্ষেপে সারতে চায়। তাঁদের কথাবার্তা, মনোবিদের মন্তব্য যে রকমটি ডায়েরীতে ছিল—অবিকল সেই ভাবে পাঠকদের কাছে হাজির করা আমি যুক্তিসঙ্গত মনে করেছি। এতে রোগ ও রোগীর নিকট আত্মীয়দের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পাঠকদের একটা যথাযথ বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান জন্মাবে। আঙ্গিকের সৌকর্যহানির জন্য আমি দুঃখিত নই। কেননা আমরা সাহিত্য সৃষ্টি করছি না। মানসিক রোগ বহু রকমের, সব রকমের রোগীর ইতিহাস এই একখণ্ড পুস্তকে বিবৃত করা সম্ভব নয়। আমরা কয়েকটি মাত্র রোগ-ইতিহাসের মাধ্যমে রোগ ও সমাজের সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করব। বলা বাহুল্য, সাইকোথেরাপী শুধু মানুষের বেলায় প্রযোজ্য। আমাদের আলোচনা পাভলভীয় সাইকোথেরাপী পদ্ধতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

হিস্টিরিয়া (১)

এক ছোট শহর থেকে স্বামী স্ত্রীকে চিকিৎসা করার জন্য নিয়ে এলেন। ভদ্র মহিলার নাম ধরুন সরমা। বয়স ৩৫, তিনটি সন্তানের জননী। খুবই শীর্ণকায়, দেখতে মোটামুটি সুশ্রী। চোখ দুটোতে বিহ্বল দৃষ্টি। এক রকম ধরাধরি করেই নিয়ে আসা হল। খুবই দুর্বল। দাঁড়াতে পারেন, কিন্তু চলাফেরা করা কষ্টকর। মাসখানেক নাকি জলটুকু পর্যন্ত গলা দিয়ে নামছে না। মাঝে মাঝে 'মা মা' করে চীৎকার করে উঠছেন। খাওয়ানোর অনেক কিছু চেষ্টা হয়েছে—সবই বিফল। স্বামী শিক্ষিত মাঝারিগোছের সরকারী কর্মচারী। অবস্থা মোটামুটি ভাল। তিনি এসেই আমাকে চুপি চুপি বললেন যে, একজন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী অবশ্য বলেছেন, এক বিদেহী আত্মা ওকে ভর করেছে। তিনি কিন্তু ওসব ভুতুড়ে ব্যাপারে বিশ্বাস করেন না। তবে দ্রব্যগুণ মানেন। ওর দৃঢ় বিশ্বাস ওকে কেউ কিছু খাইয়েছে। বিষের ক্রিয়ায় এমনটি কি হতে পারে না?

আমি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানতে চাইলাম। তিনি বলতে শুরু করলেন:

আমাদের সুখের সংসার। প্রায় ২০ বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে। ভগবানের আশীর্বাদে অভাবের মুখ কোনোদিন দেখিনি। ছোট শহরে থাকি, কাজেই পাঁচজনে জানে ও মানে। এখানে আছি তিন বছর। বছরখানেক হল

শাশুড়ী ঠাকরুণ আমার কাছে আসেন চিকিৎসার জন্য। তাঁর অন্ননালীতে ক্যান্সার হয়েছিল। প্রায় আট মাস হাসপাতালে রাখি আমারই খরচায়। হাসপাতাল থেকে একরকম জবাব দেওয়ার পর ওঁর মেয়ের অনুরোধে শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ আমার ওখানেই এসে রইলেন। বুঝলেন স্যার, চিকিৎসার কিছু ত্রুটি আমি হতে দিইনি। বছরখানেক ধরে টিউব বদলানো, ইনজেকশান দেওয়া, সবই আমি ডাক্তার দিয়ে করিয়েছি। মাস ছয়েক আগে খাওয়া বন্ধ হল। নাক দিয়ে খাওয়ানোর চেষ্টা চলতে লাগল। মাঝে মাঝে সরমা অবশ্য বলত: দেখ না, বাইরে কোথাও রাখা যায় কিনা? দুর্গন্ধে তোমার ত খাওয়াই হচ্ছে না। আমি অবশ্য তাঁর কথায় কান দেইনি। কিন্তু এত চেষ্টা করেও তাঁকে বাঁচানো গেল না।

মরবার আগে শাশুড়ী ঠাকরুণ কেমন যেন হয়ে গেলেন। ষাট বছর বয়স, বিধবা; দুবছর ধরে মৃত্যু কামনাই করে এসেছেন। ঐ রকম যন্ত্রণা দুর্ভোগে কেই বা বাঁচতে চায় বলুন? কিন্তু মরবার দিন তিনেক আগে থেকে খালি বলতে লাগলেন—"আমি যাবো না, সরো আমি যাব না। আমার বড় ভয় করছে, আমি মরতে পারব না। তোকে ছেড়ে আমি যাব না।" তাঁর মৃত্যুতে সরমা খুব বেশী শোকার্ত হয়নি। বরঞ্চ তার কষ্টের লাঘব হল বলে স্বস্তির নিঃশ্বাসই ফেলেছিল। মাসখানেক আগে পাশের সরকার বাড়ী সত্যনারায়ণ পুজো ছিল। সরকারদের সঙ্গে আমার কিছুদিন হল সদ্ভাব নেই। সে অনেক কথা…। আমি চাই না যে, আমার স্ত্রী-ছেলেমেয়ে ওদের সঙ্গে মেলামেশা করে। ও আমাকে লুকিয়ে গিয়েছিল। টের পেলাম যখন রাত্রে ওকে বারদুয়েক উঠতে দেখলাম। বললে, সরকার বাড়ীর সিন্নি খেয়ে পেট গোলাচ্ছে। তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় ওর চীৎকার শুনলাম। হন্তদন্ত হয়ে গিয়ে দেখি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন ঠিক পায়খানার বাইরে। জ্ঞান হবার পর থেকে এই রকম অবস্থা। "মা মা তুমি এখান থেকে চলে যাও"—থেকে থেকে খালি এই কথা বলছেন। তাও জড়িয়ে জড়িয়ে অতি কষ্টে। ঠিক যেমন করে ওর মা শেষের দিকে বলতেন। এরপর থেকে খাওয়া বন্ধ হতে লাগল। প্রথমে শক্ত জিনিস, পরে ঝোলভাত, এখন তো জল পর্যন্ত গলা দিয়ে নামে না। প্রথমটায় রোজা এল। ঝাড়ফুঁক চলল. ফল হল না। তারপর তান্ত্রিক সন্ন্যাসী এসে যজ্ঞ করলেন। সবার এক কথা—ওর মায়ের আত্মা ওকে ভর করেছে। আমি স্যার, সায়েন্স গ্রাজুয়েট। বুজরুকিতে বিশ্বাস করি না। তবে জানেন ত' সেই সেক্সপীয়রের কথা—"দেয়ার আর মেনি থিংস অন্ আর্থ, হোরেশিও…।" তাছাড়া চেষ্টা সবদিক দিয়েই করা উচিত। শুধু সাধু সন্ন্যাসী নিয়েই আমি বসে নেই। ডাক্তারও দেখাচ্ছি। আজ তিনদিন হল কোলকাতায় এসে স্পেশ্যালিষ্ট

দেখিয়েছি। তাঁরা ত বললেন—না ক্যান্সার নয়; যদিও গলার কষ্ট শাশুড়ী ঠাকরুণেরই মত। কোথাও কোন দোষ খুঁজে পাচ্ছেন না। রক্ত পরীক্ষা করেও দোষ পাওয়া গেল না। দ্রব্যগুণে পাগল হয়,—আমি বিশ্বাস করি স্যার। আমার মনে হয় সরকারদের সিন্নিতে কেউ কিছু একটা মিশিয়ে দিয়েছে। এমনি সময় রোগিনী অস্পষ্ট ভাঙ্গা গলায় "অই-অই! না আমি যাব না......মা, আমি যাব না......" বলে চেঁচিয়ে উঠল।

পরীক্ষা করলাম। রক্তচাপ কম। নাড়ীর গতি মৃদু। এছাড়া বিশেষ কোনো উপসর্গ ধরা পড়ল না। শুধু বাঁদিকের হাতে ও পায়ে অসাড়তা লক্ষ্য করলাম। শুনলাম ভদ্রমহিলা চিরকালই দুর্বলমনা। অল্পেতেই উত্তেজিত হতেন, অল্পে আহত হতেন। কবিতা লেখার বাতিক ছিল। যেমন বেশী হাসতেন, হৈ চৈ করতেন, ঠিক তেমনি অল্পেতে মুষড়ে পড়তেন। কাঁদতে তাঁর বেশী সময় লাগতো না। হাসি-কান্না কখনও কখনও একই সঙ্গে ফুটে উঠত তার চোখে। মাকে খুব ভালবাসতেন। বিয়ের পর অনেক রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে মায়ের জন্য কেঁদেছেন।

বেশী ইতিহাস শোনবার প্রয়োজন ছিল না। সব মানসিক রোগের চিকিৎসকই এ-রোগ ভালভাবে জানেন। উনিশ শতকের শেষদিকে পশ্চিম ইউরোপে এই হিষ্টিরিয়ার রোগী খুব বেশী দেখা যেত। সাহিত্যে আবেগপ্রবণ, কোমল অসহিষ্ণু—প্রায়ই ফিট হয়, এমন নায়িকার সাক্ষাৎ মিলত খুব বেশী। শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের ব্যবহার ও চরিত্রে হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ বেশ স্পষ্ট। ফ্রয়েডের চিকিৎসাজীবন স্থুরু হয় এই রোগী দিয়ে। হিষ্টিরিয়ার কারণ সম্বন্ধে ফ্রয়েডীয়দের মতামত অনেকের কাছেই সুবিদিত, তা নিয়ে এখানে আলোচনা করব না।

পাভলভীয় বিচারে মেয়েটির নার্ভতন্ত্রের টাইপ 'নিস্তেজনাধর্মী' বা inhibitory,—সোজা কথায় মেয়েটি দুর্বল, তার সহ্য ক্ষমতা কম। আবার এর মস্তিষ্কে প্রথম সাংকেতিকতন্ত্রের প্রাধান্য, মনে অনুভূতি প্রবণতা বেশী—পাভলভের ভাষায় 'আর্টিস্ট টাইপ'। হিষ্টিরিয়া এই আর্টিস্ট টাইপের রোগ। মেয়ে-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই হিষ্টিরিয়া রোগী আছেন।

হিষ্টিরিয়ার ফিটের (fit) সঙ্গে সাধারণের পরিচিতি বেশী। হিষ্টিরিয়ার উপসর্গ কিন্তু শুধু ফিটেতেই সীমাবদ্ধ নয়। সর্বাঙ্গের আক্ষেপ, ইংরাজীতে যাকে বলে convulsion,—আর আজকাল খুব বেশী চোখে পড়ে না। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্যারালিসিস, অসাড়তা, অত্যধিক বেদনাবোধ, বধিরতা, দৃষ্টিহীনতা, বাক্‌শক্তি-হীনতা—এগুলি হিষ্টিরিয়ার খুব সাধারণ লক্ষণ। প্রথম মহাযুদ্ধের সংগ্রামী ফৌজের মধ্যে এই রোগের প্রসার ঘটেছিল ব্যাপকভাবে। আকস্মিক মানসিক

আঘাত ও বিপদ্‌পাতের আশু সম্ভাবনা থেকে হিষ্টিরিয়ার উৎপত্তি।

সুস্থ মানুষের বেলায় গুরুমস্তিষ্ক বাইরের জগতের সঙ্গে লেনদেন করে, সব কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নেবার ব্যবস্থা করে, মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশকে নিয়ন্ত্রিত করে। তাদের সুশৃংখল ক্রিয়াকলাপের দায়িত্ব গুরুমস্তিষ্কের। গুরুমস্তিষ্কের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে বাক্‌ ও চিন্তার স্তর, বিবর্তনের সিঁড়ির সব থেকে উঁচু ধাপ। এই বাক্‌ ও চিন্তাশক্তি আসলে সুস্থ মানুষের জাগ্রত অবস্থার সব কিছু ক্রিয়াকলাপ ও ব্যবহারের নিয়ামক ও শৃঙ্খলারক্ষক।

সরমার মত অধিকাংশ হিষ্টিরিয়া রোগীরই মস্তিষ্কে নিস্তেজনাধিক্য থাকে, মানে তারা অল্প আঘাতেই নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং তারা স্বভাবত অনুভূতিপ্রবণ। এই নিস্তেজনা তার দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্রকে অর্থাৎ বাচন ও চিন্তার স্তরকে প্রভাবিত করে; ফলে ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির তীব্রতা আরও বাড়ে ও সেখানে বিশৃঙ্খলা দেখা যায়, ব্যবহার ও চিন্তার সংহতি বিনষ্ট হয়।

সরমার ইতিহাস থেকে বোঝা গেল, অন্ননালীর ক্যান্সারের ভয় তার মনের মধ্যে সঞ্চিত ছিল। সরকার বাড়ীর সত্যনারায়ণের সিন্নি তিনি প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেননি। স্বামীর নিষেধে মনে বাধার সৃষ্টি হয়েছিল। তাছাড়া, ঐ সময় ক্যান্সার সংক্রামক কিনা এইরকম প্রশ্ন তুলেছিলেন একজন। সরমার গলা দিয়ে সিন্নি নামতে চাইছিল না—এইসব কারণে। গলধঃকরণের অসুবিধা তাঁর মনের গোপন ভীতিকে জাগিয়ে তুলল, মায়ের মৃত্যুপূর্ব প্রলাপ মনে পড়ল। এই অবস্থায় জ্যোৎস্না রাতে নিজের ছায়া দেখেও মানুষ ভয় পায়। এই ভয় মস্তিষ্কের কিছু কোষকে একেবারে অসাড় করে দিল; বিশেষ করে কণ্ঠনালীর ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রক কোষগুলোকে। ফলে ঘটল কণ্ঠনালীর মাংশপেশীর অনৈচ্ছিক আক্ষেপ—spasm; ভয় আরও বেড়ে গেল। বাক্‌যন্ত্রেও অসাড়তা আংশিকভাবে সংক্রামিত হল। রোজা, সন্ন্যাসী ও পরিবারের লোকদের কথাবার্তায় সরমার মনে 'মায়ের আত্মা তাকে ভর করেছে'—এই ধারণা হল বদ্ধমূল।

পাভলভের মতে হিষ্টিরিয়া রোগে দুটি সাংকেতিকতন্ত্র (যারা সাধারণত পরস্পর নির্ভর) পরস্পর নিরপেক্ষ হয়ে পড়ে। যেমন ঘটে মাদকদ্রব্যের প্রভাবে অথবা হিপনটিজম-এর প্রয়োগে। Chareot-এর মত পাভলভও মনে করেন হিষ্টিরিয়া রোগী সর্বদাই আংশিকভাবে সম্মোহিত। অনেক কারণেই এরকম ঘটে। আত্মীয় বিয়োগ, ব্যর্থ প্রেম, আর্থিক বিপর্যয়, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, আত্মসম্মানে আঘাত, অসুখী বিবাহিত জীবন—ইত্যাদির আঘাতে নিষ্ক্রিয়তা-প্রবণ, আর্টিস্ট টাইপের মধ্যে সহসা বা ধীরে ধীরে রোগ লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। মনে রাখা দরকার, এছাড়া প্রতিকূল সমাজব্যবস্থা, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতাবোধ প্রায় সব নিউরোসিসের জনক।

ভয় সাধারণত জীবনরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করে, কিন্তু ভয়ের আধিক্য কোষগুলোকে নিস্তেজিত করে; গুরুমস্তিষ্ক থেকে ভয়ের স্রোত নীচুর দিকে নামতে থাকে। ফলে একদিকে নিম্নমস্তিষ্কের প্রাণরক্ষক কেন্দ্রগুলি চঞ্চল হয়ে ওঠে, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুত হয়, রক্তচাপ বাড়ে, পেশীর মধ্যে অনুভূত হয় চাপা উত্তেজনা। অন্যদিকে দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্রের দুর্বলতা ও নিস্তেজনার দরুণ বিচার-বিবেচনা শক্তি কমে যায়; ভয়কে প্রতিহত করার শক্তি লোপ পায়। "সম্মোহিত অবস্থায় অভিভাবন" (suggestion under hypnosis) এক্ষেত্রে সব থেকে উপযুক্ত চিকিৎসা। আত্মসম্মোহিত অবস্থাতে যে রয়েছে, নিজের দেওয়া ক্ষতিকারক অভিভাবন থেকে তাকে মুক্ত করাই প্রাথমিক কর্তব্য। সম্মোহিত অবস্থায় তার আত্মসম্মোহিত ভাব দূর করে তাকে রোগমুক্ত করা সম্ভব।

রোগের মৌলিক কারণ নির্ণয় করার চেষ্টা না করে কেবল উপসর্গ উপশমের অভিভাবন দিলে রোগ সারবে না, সাময়িকভাবে উপশম ঘটবে। রোগী তার ভ্রান্ত সংস্কার, ধারণা ও অপরিণত ব্যক্তিত্ব নিয়ে পুরনো পরিবেশের মধ্যে যদি ফিরে যায় তবে এটাই স্বাভাবিক, আবার আঘাত লাগলে তার নতুন করে উপসর্গ দেখা দেবে। এ আর কোন রোগের বেলায় না ঘটে? সরমার বেলায় কি ঘটল বলি। পাঁচ-ছটা অভিভাবনের পরই ডাক্তারের মতামত অগ্রাহ্য করে তারা বাড়ী ফিরে গেল। রোগ লক্ষণ নেই, কিন্তু সরমার নার্ভতন্ত্র যে দুর্বল সেই দুর্বলই রয়ে গেল, রয়ে গেল তার পুরনো সংস্কার আর অন্ধ বিশ্বাস; এই সমাজ সম্পর্কে, ব্যক্তি ও সমাজের বিরোধ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের অভাব। বছরখানেকের মধ্যেই তাঁর স্বামীর চিঠি পেলাম। আবার সেই অবস্থা, শুধু অন্ননালী নয়, এবার কণ্ঠস্বরও সম্পূর্ণভাবে বন্ধ।

সরমার কণ্ঠনালী ও কণ্ঠস্বর দুইই বন্ধ; তবে তরলপদার্থ কোনোক্রমে গলাধঃকরণ করতে পারেন। ফিসফিস করে দুচারটে কথার উত্তরও দিতে পারেন। চোখের দৃষ্টিতে আগের মত সেই আতঙ্কের ভাব নেই, আর নেই সেই ভয়ার্ত চীৎকার। স্বামী মহাশয় এবার একটু নিস্তেজ। বিনীতভাবে জানালেন যে ছুটি নিয়ে এসেছেন, শহরতলীতে ভায়ের বাসায় কয়েক সপ্তাহ থাকবার ব্যবস্থা করেছেন, চিকিৎসা সম্পূর্ণ করে যাবেন এই ইচ্ছা। সরমার দিকে তাকাতে তিনিও প্রস্তাবে ইশারায় সায় দিলেন মনে হল; মৃত্যুভয় নেই, কাজেই এবার অনেক বেশী প্রকৃতিস্থ দেখলাম সরমাকে। এবারকার আক্রমণ কেবলমাত্র অঙ্গ বিশেষের কার্মিক অসাড়তাতেই নিবদ্ধ।

ক্রমশ অসাড়তা অনেকটা কমল। এখন খিচুড়ি, দুধভাত ইত্যাদি খেতে পারেন ও ফিসফিস করে আমার সব কথারই প্রায় উত্তর দিতে লাগলেন। এবার

তার মুখ থেকে অনেক নতুন তথ্য প্রকাশ পেল।

স্বামী মহোদয় খুব নিরীহ নন। বাইরে 'স্যার স্যার' করলে কি হয়; বাড়ীতে তিনি হুজুর, জবরদস্ত ও কড়া। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক নীরস, ঠাণ্ডা। কুড়ি বছর বিবাহিত জীবনে শুধু জৈবিক প্রয়োজনের তাগিদে ছাড়া তিনি স্ত্রীকে কাছে ডাকেন নি। স্ত্রীর কাছ থেকে তিনি ভালবাসা নয়, ভক্তি চেয়েছেন। ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে চেয়েছেন ভয়ার্ত শ্রদ্ধা। পিতা হিসাবে তিনি কঠোর কর্তব্যপরায়ণ। তা বলে তিনি ছেলেদের কারুর উপর শারীরিক নির্যাতন চালাতেন না। তাঁর বাঁকা কথা ও নীরব চাউনিতেই শুধু ছেলেমেয়ে নয়, সরমারও বুক কাঁপত। সরমা কোনোদিনই এই পরিবারে রান্নাঘরের বাইরে তার আধিপত্য জাহির করতে যেতেন না। স্বভাবভীরু মহিলাটি বিয়ের পর বয়স বাড়লেও ব্যক্তিত্বের দিক থেকে বাড়লেন না। তিনি রয়ে গেলেন ছেলেমানুষ, দায়িত্বগ্রহণে অপরাগ। মায়ের উপরই বিশেষ করে ছিল তাঁর নির্ভরতা আপদে-বিপদে মায়ের পরামর্শ মত তিনি চলতেন। স্বামীকে তুষ্ট করার জন্য মধ্যযুগীয় নানা তুকতাক, মন্ত্র-মাদুলির সাহায্য নিতেন। তাঁর ধারণা ছিল স্বামীর দেহ-ক্ষুধা পুরোপুরি তাঁকে দিয়ে মিটছে না। কেননা তাঁর নিজের মধ্যে ছিল হিমশীতলতা—যা স্বামীর জৈবিক আবেদনে উদ্দীপ্ত হত না। জানতেন না যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পারিক বিশ্বাস-শ্রদ্ধা-ভালবাসাই শুধু দৈহিক আকর্ষণকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। স্বামীকে খুশী করার অত্যধিক আগ্রহ অথচ মানসিক প্রস্তুতির অভাবের ফলে ভদ্রমহিলার নার্ভগুলো অতি পীড়িত হয়ে ঝিমিয়ে পড়ত। স্বামীর আলিঙ্গনে তিনি ধরা দিতেন অনেকটা যন্ত্রের মত, মানসিক সাড়া জাগত না।

মায়ের মৃত্যুতে ক্যান্সারের ভয় নয়; নিরাপত্তার অভাব তাঁকে সব থেকে বেশী বিচলিত করেছিল। নিজেকে নিরাশ্রয় অসহায় মনে হল। তাছাড়া মায়ের মৃত্যুর পর শরীর দুর্বল হওয়ার ফলে ভাবলেন স্বামীকে তৃপ্ত করবার অনুমাত্র শক্তিও অবশিষ্ট নেই। ভয় ভাবনা আরও বাড়ল। আংশিক চিকিৎসার পর বাড়ী ফিরে গিয়ে স্বামীকে খুশী করবার জন্য অযাচিতভাবে সাধ্যাতীত চেষ্টা করলেন। কেননা তাঁর দুর্বল মনে সন্দেহ হচ্ছিল স্বামীকে বুভুক্ষু রাখলে তাঁর ভালবাসা চিরকালের জন্য হারাতে হবে। এব্যাপারে স্বামী কিন্তু খুব উৎসাহিত নন। স্বামীর নিস্পৃহ ভাব তাঁকে আরও অস্থির করল। সন্দেহ আরও তীব্র হল। অন্য কোথাও তাঁর আসক্তি জন্মেছে ভেবে মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন ভদ্রমহিলা। কয়েকদিন ধরে সাহস সঞ্চয় করলেন। স্পষ্টাস্পষ্টি জিজ্ঞাসা করবেন সব কথা। জিজ্ঞাসা করবেন, তাঁর প্রয়োজন কি একেবারে ফুরিয়ে গেছে? ঘর সংসারের মামুলি কথা ছাড়া

অন্য কথা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনোদিন হয়নি। বিয়ের একুশ বছর পরে সরমা সরাসরি প্রশ্ন করবেন বলে ঠিক করলেন—তুমি কি আমাকে এখনও ভালবাস? সেদিন ছিল মায়ের মৃত্যুতিথি, সারাদিন উপবাসে কেটেছে, শরীর দুর্বল, উত্তেজনায় কাঁপছে। সেই রাতেই একটা বোঝাপড়া করবেন। রাতে স্বামী আসতে উত্তেজিত হয়ে উঠল দেহ মন। অনেক কিছু বলতে হবে, অনেক কিছু জানাতে হবে। লজ্জা-সংকোচ ভয় সমস্ত জোর করে দূরে ঠেলে সরমা কথা বলার চেষ্টা করলেন। কই? কথাতো বেরুচ্ছে না গলা দিয়ে। কে যেন গলা চেপে ধরেছে? খুব জোরে চেঁচিয়ে কথা বলার চেষ্টা করতে গলা দিয়ে শুধু অস্পষ্ট একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল, আর চোখ দিয়ে নামল শ্রাবণের ধারা। সরমা বুঝলেন তার কথা বলার শক্তি নেই। একদিকে লজ্জা-সংকোচ-ভয়, অন্যদিকে নিজেকে প্রকাশ করার আগ্রহ—দুই বিপরীত শক্তির সংঘর্ষে সরমার স্বরযন্ত্র বিকল হল।

এই রকম ক্ষেত্রে শুধু সরমা নয়, তাঁর স্বামীকেও চিকিৎসা ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করানো দরকার। না হলে সুফলের আশা সুদূর পরাহত।

নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা চলল। পুরনো সমাজব্যবস্থার নিরঙ্কুশ পুরুষপ্রাধান্য দাম্পত্যজীবনে কেমন করে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি আনতে পারে তার অনেক উদাহরণ দিলাম! স্বামী স্ত্রীর অসুস্থ সম্পর্ক সন্তানদের কিভাবে প্রভাবিত করতে পারে—বুঝিয়ে বললাম। যৌন শীতলতার মূল উৎস যে ব্যবহারিক জীবনের অজ্ঞানতা, পারস্পরিক সদ্ভাবের অভাব ও নানা ধরনের ভয় ভ্রান্তি—এ আলোচনাতে খুব কাজ হল। দুজনেই তাঁদের ভুলত্রুটিগুলি বুঝলেন। পারিবারিক শান্তি রাখতে ও সন্তানদের মঙ্গল ইচ্ছায় স্বামী তাঁর ব্যবহার সংশোধন করতে রাজী হলেন। অবশ্য তাঁর সদিচ্ছা কাজে পরিণত করা তাঁর পক্ষে সহজ নয়, আমি জানতাম। এতদিনের অভ্যাস ও আধিপত্যের মোহ পরিত্যাগ করা শুধু সৎ সংকল্পের উপর নির্ভর করে না। তবে স্ত্রীর মনে এর ফলে সুস্থ পরিবর্তন ঘটল। স্বামী সম্পর্কিত ভয় ভেঙ্গে যেতে তিনি অনেকটা সহজ হয়ে উঠলেন। স্বাস্থ্য ভাল হতে লাগল ও বিশ বছর পরে স্বামীর প্রতি সত্যিকারের আকর্ষণ তিনি অনুভব করতে লাগলেন। তিনি বুঝলেন, তিনি শুধু স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী নন, তিনি গৃহিণী, তিনি জননী। সংসারের সব কিছুর দায়িত্ব তাঁকে গ্রহণ করতে হবে। পুত্র-কন্যার ভবিষ্যৎ নিয়ে বিচার-বিবেচনা, চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। মধ্যযুগীয় সংস্কারের বেড়াজাল ভেঙ্গে ধীরে-ধীরে জেগে উঠতে লাগল এক নারী; নিজের ভাগ্য নিজে গড়বার শক্তি ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে!

হিষ্টিরিয়া (২)

এখানে আর একটি রোগীর কথা তুলব। প্রায় কুড়ি বছর আগের কথা। হাসপাতালের একজন রোগীর স্বর বন্ধ হয়ে যায়। সে ফুসফুসের যক্ষ্মারোগে ভুগছিল। সমস্ত ডিপার্টমেণ্ট ঘুরিয়ে পরীক্ষা করা হয়, কিন্তু কোনো কিছু কারণ পাওয়া যায় না। কথা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়েছে বলা চলে না, খুব চেষ্টা করে ফিসফিস করে কথা বলতে পারে; কিন্তু কয়েক হাত দূর থেকে সে কথা শোনা যায় না। রোগী তার ইতিহাস লিখে জানাল। পাশটাশ কিছু করেনি ছেলেটি, তবে বেশ চালাকচতুর।

তার ফ্রেনিক নার্ভ-এর উপর অপারেশন চলছিল, সেই অবস্থায় অপারেশন টেবিলে তার স্বর বন্ধ হয়। ছেলেটি বছর পাঁচেক রোগে ভুগছিল। এ-রোগের ওষুধপত্র, চিকিৎসাবিধি দেখলাম তার মোটামুটি জানা। ফ্রেনিক নার্ভ-এর অপারেশন ও তার ফলাফল ওর সুবিদিত। অপারেশনটি অতি সাধারণ পর্যায়ের, তাই বহির্বিভাগের রোগীদের উপর এ অপারেশন চলে। এ-অবস্থায় ছেলেটির ভয় পাবার কথা নয়। বিশেষজ্ঞের অভিমত functional paralysis of vocal chord-অর্থাৎ স্বরতন্ত্রীর কার্মিক (বিকলতা জনিত) অসাড়তা। ভয় ছাড়া এই অসাড়তার আর কি কারণ থাকতে পারে? ছেলেটি লিখে জানাল সে ভয় পেয়েছিল। কেন? অপারেশন করা হচ্ছিল স্থানিক অনুভূতির বিলোপ করে, তাকে অজ্ঞান করা হয়নি। সে সজাগ ছিল, ডাক্তারদের কথাবার্তা শুনছিল একাগ্রমনে। নার্ভটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, বড় বেশী রক্তপাত হচ্ছে—এইরকম কথাবার্তা শুনছিল। তার মনে হল বোধহয় তার উপর আনকোরা, সন্ত পাশ করা ডাক্তার কিংবা ছাত্র হাত পাকাবার বন্দোবস্ত করেছে। সে উদ্বাস্তুদের হাসপাতালের বাসিন্দা, তার প্রাণের বোধহয় কোনো দাম নেই। সে নিশ্চয়ই মরে যাবে—এ রক্তপাত বন্ধ হবে না...। এ ধরনের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে একটা হিমপ্রবাহ তার শিড়দাঁড়া বেয়ে নেমে এল। সে চীৎকার করে প্রতিবাদ জানাতে চাইল। আবার মনে হল, প্রতিবাদ জানালে হাসপাতাল থেকে বরখাস্ত করে দেবে নিশ্চয়ই। কোথায় সে যাবে? সত্যিকারের সে সময়ে এ শহরে তার মাথা গোঁজবার ঠাঁই ছিল না। তার আত্মীয় স্বজনরা তাকে পোষণ করতে রাজী নয়, সে ভালভাবেই তা জানত। নিজের এক পয়সার সামর্থ্য নেই। একদিকে প্রাণের ভয়ে চীৎকার করে প্রতিবাদ করার ইচ্ছা, আর একদিকে নিরাশ্রয় হবার ভয়ে সেই ইচ্ছাকে দমন করার চেষ্টা—এই সংঘাতে নিশ্চল অসাড় হয়ে গেল তার স্বরতন্ত্রী।

কয়েকদিনের মধ্যে সম্মোহন-অভিভাবনের সাহায্যে সে কণ্ঠস্বর ফিরে পেল। হাসপাতালের চিকিৎসকদের সামনে তাকে প্রদর্শন করে তার রোগ উপসর্গের

ব্যাখ্যা করা হল। কিন্তু সেখানেই চিকিৎসা শেষ হল না। বৈজ্ঞানিক চিকিৎসায় তার ফুসফুসের রোগ সারছিল না। এর মূলে ছিল তার রোগী হয়ে থাকবার বাসনা। ভাল হলে কোথায় থাকবে, কি খাবে কিছুরই ঠিক ছিল না। নানা কারণে মানুষের উপর এসে গিয়েছিল তার ঘৃণা ও বিদ্বেষ। আত্মবিশ্বাস ও অন্যের উপর বিশ্বাস—দুইই হারিয়ে বসেছে। তার আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে না আনলে, নার্ভতন্ত্রের সহনশীলতা না বাড়াতে পারলে, শুধু যে আবার হিষ্টিরিক উপসর্গ দেখা দেবার সম্ভাবনা থাকবে তাই নয়, তার দেহের রোগও সারবে না। চিকিৎসা আরও মাসচারেক চলল। সে হাসপাতাল ছাড়ার পর পুনর্বাসনের জন্যও সামান্য কিছু করতে হয়েছিল। এখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ, বিবাহিত, সন্তানের পিতা ও সরকারী কাজে নিযুক্ত। সরমার মত তাকে চিকিৎসার জন্য ফিরে আসতে হয় নি।

* * * *

নিউরোসিস যে একান্তভাবে সামাজিক রোগ তার প্রমাণ মিলবে এদের ও অন্যান্য রোগীদের ইতিহাসে। পাভলভ প্রবর্তিত চিকিৎসার আসল উদ্দেশ্য বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের সাহায্যে সমাজের প্রকৃত চিত্র রোগীর সামনে তুলে ধরা। সমাজ ও ব্যক্তি সম্পর্কের বিরোধ যতটা সম্ভব কমিয়ে রোগীর ভয় ও বিভ্রান্তি দূর করে অভিভাবন ও আশ্বাসের সাহায্যে তাকে রোগমুক্ত করা যায়। এছাড়া, পাভলভীয় শারীরবৃত্তমূলক ব্যাখ্যার সাহায্যে কার্মিক উপসর্গ-গুলোর তাৎপর্য নিরূপণও চিকিৎসার অঙ্গ। এখানে চিকিৎসকের ভূমিকা সক্রিয়, গঠনমূলকভাবে রোগীর জ্ঞান ও চৈতন্যকে প্রতিভাত করা—ফ্রয়েডীয় পদ্ধতির বিপরীত বলা চলে।

এইবার স্বরবন্ধ রোগীটির পূর্ব ইতিহাস বলছি। এখানে ওর নাম দেওয়া হল বল্লভ। পূর্ববঙ্গের এক বড় ব্যবসায়ীর দ্বিতীয় পক্ষের শেষ সন্তান, খুব আদরযত্নে পালিত। ৪৬-এর দাঙ্গাতে এদের পরিবার বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও, দেশ বিভাগের ফলে এদের ব্যবসাবাণিজ্যের অবনতি ঘটে। এই সময় পিতার মৃত্যু হয় ও বৈমাত্রেয় ভায়েরা ওকে পৃথকান্ন হতে বাধ্য করে। কয়েক হাজার টাকা ও বিধবা মাকে নিয়ে ষোল বছরের ছেলে বিপন্ন বোধ করল। বেশী লেখাপড়া জানে না, ব্যবসাবাণিজ্যের হদিশও অজানা। এ যাবতকাল বাপ-ভায়েদের উপর নির্ভর করে এসেছে সবকিছু ব্যাপারে; সহসা দাঁড়িমাঝিহীন এক ডিঙ্গিতে তাকে তুলে দেওয়া হল; সংসার সমুদ্র পার হবার দায়িত্ব সম্পুর্ণ তার। হিতাকাঙ্ক্ষীরা বোঝালেন বৈমাত্রেয় ভায়েরা তাকে ঠকিয়েছে, বিষয়-সম্পত্তির প্রাপ্য অংশ থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে। ফলে, একদিকে যেমন নিজেকে পরিত্যক্ত ও অসহায় বোধ করতে লাগল, অন্যদিকে তেমনি তার কিশোর মনে

সকলের উপর সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বাষ্প জমে উঠতে লাগল। সপরিবারে তার দাদারা দেশ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে এলেন। বল্লভ ইতিমধ্যে মায়ের পীড়াপীড়িতে বিয়ে করেছে। সেও তার স্বল্প পুঁজি নিয়ে কলকাতায় এল ভাগ্যান্বেষণে। মা ও স্ত্রীকে নিয়ে আসবার সঙ্গতি ছিল না, তাঁরা দেশেতেই রয়ে গেলেন। দাঙ্গার ভয়াবহতা ও পরবর্তীকালে সংখ্যালঘুদের দলে দলে বাস্তুভিটা পরিত্যাগ বল্লভ নিজের চোখেই দেখল। এর ফলে বৃদ্ধি পেল ভয় ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উৎকণ্ঠা ও অনিশ্চয়তা। কলকাতায় এসে ব্যবসায় লোকসান দিয়ে এক বছরের মধ্যেই সে তার পুঁজির সবটাই প্রায় খুইয়ে বসল। অংশীদারদের প্রাপ্য পুঞ্জীভূত ক্রোধ ও অবিশ্বাস দুনিয়ার উপর নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে নিজেকে এবার সম্পূর্ণ অসহায় মনে করতে লাগল। আশ্রয় নিতে হল এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাসায়। সেখানেও পেল অবজ্ঞা ও অনাদর। অন্তত সে তাই মনে করেছিল। ফলে অবিশ্বাস, অনাস্থা ও তিক্ততায় ভরে উঠল তার মন। এই অবস্থায় একদিন ফুসফুসের যক্ষ্মা রোগ ধরা পড়ল। রক্ত উঠল কাশির সঙ্গে। এর পরের ইতিহাস আরও করুণ, আরও নিষ্ঠুর।

বেসরকারী একটি হাসপাতালে স্থান পেল অনেক তদ্বির-তদারকের পর। সামান্য কিছু টাকা তখন তার সম্বল। হাসপাতালের অসৎ কর্মচারীদের লোভের আগুনে আহুতি দিতে গিয়ে বল্লব কপর্দকশূন্য হল।

অন্যসব রোগীর কাছে আত্মীয়স্বজন আসে। কেউ নিয়ে আসে দুটো ফল, কেউ আনে একগোছা ফুল। কিন্তু বল্লভ স্বজন পরিত্যক্ত। মা ও স্ত্রী পাকিস্তানে। দাদারা নিজের কাজে ব্যস্ত। ওর ব্যগ্র দৃষ্টি বিকেলবেলা গেটের দিকে চেয়ে চেয়ে হতাশায় ঝাপসা হয়ে ওঠে, জামার হাতায় চোখের জল মোছে।

আধুনিক ওষুধের গুণে ও ভাল হয়ে ওঠে। দাদাদের ঠিকানায় চিঠি যায় ওকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে যাবার জন্য। না আসেন দাদারা, না আসে চিঠির উত্তর। তিন তিনখানা চিঠির জবাব না পেয়ে কর্তৃপক্ষ ওকে বললেন,—ওর ভার তাঁরা বইতে অক্ষম, যেমন করে হোক বেড খালি করে দিতে হবে। পরদিন ওর দেহের তাপমাত্রা বাড়ল, কাশি সুরু হল। কয়েকদিন পরে ফটোতে দেখা গেল ফুসফুসে পুরনো ক্ষত আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

এরপর ওর স্থান হল সরকারী রিফিউজী হাসপাতালে। সেখানে স্টাফদের কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত বেশী সদয় ব্যবহার পেতে লাগল। বন্ধুবান্ধবও কিছু জুটল। অবসর সময়ে পড়াশুনা করে অনেক কিছু জানল, অনেক কিছু শিখল। কিন্তু রোগের পৌনঃপুনিক আক্রমণ থেকে মুক্ত হল না। যখনই ভাল হয়, সাধারণ নিয়মে ওকে হাসপাতাল ছাড়তে বলা হয়। তখনই দু' একদিনের মধ্যে আবার তাপমাত্রা বাড়ে, দেখা যায় কাশী ও অন্যান্য রোগলক্ষণ। এই

অবস্থায় ফ্রেনিজ নার্ভ-এর উপর অপারেশন করা হয় ও এর ছ'মাস পরে ওর সঙ্গে আমার পরিচয়।

স্বরবন্ধ হওয়ার কারণ পূর্বে আলোচিত হয়েছে। স্বরযন্ত্র প্রভাবক নার্ভগুলির উপর অপারেশনের সময় যুগপৎ উত্তেজক ও নিস্তেজক প্রবাহের চাপ তীব্র হওয়ায় স্বরযন্ত্র অসাড় হয়ে পড়ে। বিপরীতধর্মী উদ্দীপক এইভাবে শুধু স্বরযন্ত্র নয়, সমস্ত ইন্দ্রিয় ও দেহযন্ত্রকে বিকল করে দিতে যে সক্ষম, এ খবর চিকিৎসকদের অজানা নয়। কিন্তু এর বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা (শারীরবৃত্তিমূলক) পাভলভের আগে কেউ দিতে পারেন নি।

এ কেসটির আর একটি দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যখন যক্ষ্মা রোগের সব উপসর্গ ও রোগলক্ষণ দূরীভূত; থুথু, রক্ত ইত্যাদি ও এক্সরে রিপোর্টে হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হয়ে রোগীকে হাসপাতাল ছাড়তে নির্দেশ দিচ্ছেন; তখনই রোগীর রোগলক্ষণ দেখা দিচ্ছে। এক্সরে রিপোর্টও এ সময় সন্দেহজনক মনে হয়েছে। কারণ কি? রোগীর হাসপাতালের বাইরে থাকবার জায়গা নেই, সে বেকার ও রিক্তহস্ত। বাইরে গিয়ে সাতদিন পেট চালানোর মত সঙ্গতিও নেই। দ্বিতীয় হাসপাতালটিতে রয়েছেও সে বেশ স্ফূর্তিতে। বন্ধুবান্ধব জুটিয়েছে, রোগীদের জন্য একটা লাইব্রেরী গড়ে তোলবার কাজে লেগেছে, হাসপাতালের রাজনীতিতেও মাথা গলিয়েছে। রোগীদের ও কর্তৃপক্ষের কাছে সে একজন সক্রিয় কর্মী। জীবনের যা হোক একটা অর্থ খুঁজে পেয়েছে। হাসপাতালের বাইরে সে নিরাশ্রয়, নির্বান্ধব, অসহায়; হাসপাতালের মধ্যে খানিকটা নিরাপদ, নিশ্চিন্ত। এরই ফলে ডিসচার্জ নোটিশের সঙ্গে সঙ্গে রোগ উপসর্গের পুনঃপ্রকাশ।

এই ছেলেটিরও নার্ভতন্ত্রের (যখন আমি প্রথম দেখলাম) টাইপ পুরোপুরি না হলেও আংশিক দুর্বল; দাঙ্গা, পিতৃবিয়োগ ও পারিবারিক গোলযোগের প্রভাবে এরকম হয়ে থাকতে পারে। দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের থেকে প্রথম সাংকেতিক স্তর জোরালো। একদিকে দুনিয়ার উপর সন্দেহ অবিশ্বাস; আবার নির্ভর করার জন্য, বিশ্বাস করার জন্য আকুল আগ্রহ। নিষ্ঠুর পরিবেশ তাকে কিন্তু সিনিক করে তোলেনি। সুকোমল বৃত্তিগুলো ম্লান হলেও বিদ্যমান, আপাতরুক্ষতা দিয়ে ঢাকা। অন্যান্য চারিত্রিক প্রলক্ষণগুলি বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই গড়ে উঠেছে।

সম্মোহিত অবস্থায় অভিভাবনের সাহায্যে এর স্বরযন্ত্রের কার্মিক অসাড়তা দূর করা বিশেষ কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু চিকিৎসার উদ্দেশ্য শুধু রোগলক্ষণ দূর করা নয়, চিকিৎসার উদ্দেশ্য অসুস্থ চারিত্রিক প্রলক্ষণের (unhealthy character traits) নিরসন; ব্যক্তিত্বের বিকাশ, সমাজ বাস্তবের সম্যক

উপলব্ধি ও তদনুযায়ী পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন। বলাবাহুল্য, কাজটি বেশ কঠিন। তাছাড়া রোগযন্ত্রণা যতই তীব্র হোক না কেন, হিষ্টিরিয়া রোগী রোগকে অনেক সময় "শাপে বর" বলে মনে করে ও রুগ্নাবস্থা থেকে মুক্ত হতে চায় না। অপ্রীতিকর অবস্থার মুখোমুখি হওয়ার কষ্টকর পরীক্ষা থেকে হিষ্টিরিক রোগলক্ষণ অনেক সময় রোগীকে রক্ষা করে। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনের পার্লামেণ্টে 'আমেরিকার স্বাধীনতা' প্রসঙ্গে আলোচনার আগে নাকি গলা বসে যেত। তিনি কোনোদিনই এ আলোচনায় যোগ দিতে পারতেন না। পাভলভ বলেছেন—"The flight, the will to be sick is the most characteristic feature of hysteria।" অসুস্থতার দোহাই দিয়ে অক্ষমতাকে ঢাকা যায়। নিজের দুর্বলতা ও ভয় গোপন রেখে অন্যের সম্মান ও সহানুভূতি আকর্ষণ করা চলে। আগেই বলেছি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধরত সৈনিকদের মধ্যে হিষ্টিরিক অন্ধত্ব ও স্মৃতিভ্রংশের অনেক নিদর্শন আছে। প্রাণভয় ও আত্মসম্মান রক্ষার আকুলতা—এই দুই বিপরীতধর্মী উদ্দীপনার সংঘাত থেকে যুদ্ধকালীন হিষ্টিরিয়ার উৎপত্তি। হিষ্টিরিয়া রোগীর চারিত্রিক প্রলক্ষণ দূর করে তার মধ্যে সুস্থ মনোভাবের বিকাশ ঘটানো সময় ও পরিশ্রম-সাপেক্ষ, তবে অসম্ভব নয়।

এ রোগ সারাবার আর এক অন্তরায় এদের নঙর্থক স্ব-অনুভাবন বা negative auto-suggestion-এর অভ্যাস। দেহ সামান্যতম অস্বস্তি বোধ করলেই এদের মনে ভয়ের উদ্রেক হয় ও সাংঘাতিক সব অসুখের কথা ভাবতে থাকে। সেই সব রোগের কিছু কিছু লক্ষণও অভিভাবনের ফলে দেখা দিতে পারে। এতে রোগীর মনে তার ভ্রান্ত ধারণা আরও বদ্ধমূল হয় ও শেষ পর্যন্ত সে একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়ে।* তাছাড়া ভয়ে মস্তিষ্কবল্কল (cortex) অভিভূত হওয়ার ফলে ব্যথা বেদনা ইত্যাদি উপসর্গ আরও বেড়ে যায় ও ফলে ভয়ও বাড়তে থাকে। শুধু হিষ্টিরিয়া নয়, অন্যান্য অনেক রোগের ক্ষেত্রেও এই রকমই ঘটে থাকে।

এ থেকে কেউ যেন মনে না করেন যে রোগী মতলব করে রোগ উপসর্গ তৈরী করছে বা বাড়াচ্ছে। আসলে তার উচ্চমস্তিষ্ক পরিবেশের প্রভাবে দুর্বল

* The slight feeling of indisposition or unusual difficulty in any organic function is accompanied in the hysteric by the emotion of fear of a serious illness, and this is enough, ...not only to support but to intensify them to an extreme degree, making of the subject an invalid."
—Pavlov

হয়ে পড়ায় স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে না পারার জন্য এই বিপত্তি। পাভলভের কথায়—"intentional stimulation of symptoms" নয়—বরং বলা চলে "an example of fatalistic physiological relation।" উচ্চমস্তিষ্ক ক্রিয়াকলাপের স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনা রোগ নিরাময়ের প্রধান উপায়।

বল্লভের বেলায় আমাদের প্রধান করণীয় ছিল তার দৃষ্টিভঙ্গীর অস্বচ্ছতা দূর করে সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে সুস্থ মনোভাব আনয়ন। শুধু রোগ নয়, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার ভীতি ও নিরাপত্তাবোধের অভাব না কাটলে—সুস্থ হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। দাদারা তাকে বঞ্চিত করেছে, হাসপাতালে সে রূঢ় ও নিষ্ঠুর ব্যবহার পেয়েছে। মানুষ সম্পর্কে সে ভয় ও অবিশ্বাসের ভাব তার মধ্যে গড়ে উঠেছে সেটা দূর করাই চিকিৎসার প্রথম অঙ্গ। সমাজ ব্যবস্থার সঠিক বিশ্লেষণ ও পারস্পরিক সম্পর্কের মূল্য নিরূপণের প্রচেষ্টায় ক্রমশ তার সন্দেহ ও অবিশ্বাসের নিরসন ঘটল।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়, এক হিন্দু যৌথ-পরিবারের মধ্যে বল্লভের শৈশব-কৈশোর কেটেছে। গুরুজনের উপর অবাধ বিশ্বাস ও নির্ভরতার সঙ্গে সে পেয়েছে পারিবারিক গর্বান্ধতা। সর্বকনিষ্ঠ সন্তান হবার জন্য নিষ্ক্রিয় পরনির্ভরতা তার চরিত্রের প্রধান বিশিষ্টতা। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ফলে সে তাই অত উদ্বিগ্ন ও অস্থির। আত্মপ্রতিষ্ঠ হবার তাগিদ, যেটা এই প্রতিযোগিতাভিত্তিক যন্ত্র-সভ্যতার বৈশিষ্ট্য—তার মধ্যে নেই। নেই আত্মসচেতন ভাব ও আত্মনির্ভরতা। এ-যুগের নাগরিক সভ্যতার প্রলক্ষণ একটিও সে আয়ত্ত করতে পারেনি। তারপর অর্থাভাব ও যক্ষ্মারোগ তার হতাশাবোধকে আরও তীব্র করেছে, ভয় ও সন্দেহকে বাড়িয়ে তুলেছে। এই প্রতিযোগিতা ও বঞ্চনাভিত্তিক সভ্যতার স্বরূপ সে বোঝেনি ; তাই ভাইদের স্বার্থপরতা তাকে বেশীমাত্রায় আহত করেছে, মানুষের নির্মমতা তাকে অত্যধিক পীড়িত করেছে। নিজেকে মনে করেছে অযোগ্য, অবাঞ্ছিত, অপদার্থ।

মানুষে মানুষে সম্পর্কের আর একটা দিকও যে আছে, সহযোগিতা ও সমবায়ভিত্তিক নতুন চারিত্রিক প্রলক্ষণও যে এ-যুগের মানুষের মধ্যে বিকাশোন্মুখ —এই সত্য বুঝতে তার খুব বেশীদিন লাগল না। যৌথ পরিবার ভেঙ্গে পড়ছে, ভাই ভাই থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছে—এ যেমন সত্যি ; তেমনি সত্যি নতুন ভ্রাতৃত্বমূলক সংস্থা ও সমিতির উদ্ভব ও সভ্যদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ। দ্বিতীয় হাসপাতালে ভিন্ন জেলার, বিভিন্ন জাতের রোগীদের মধ্যে স্নেহ প্রীতি ও সহানুভূতির প্রকাশ দেখেছে। এমন চিকিৎসক ও কর্মী অনেক দেখল—যারা প্রথম হাসপাহালের কর্মীদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা চরিত্রের ; যাদের মানবতাবোধ

লোভের আগুনে পুরোপুরি ঝলসে যায়নি। চিকিৎসকের কাজ ছিল ধীরে ধীরে সমাজের বৈপরীত্যের ছবি তার চোখে তুলে ধরা, মানুষের উপর তার লুপ্তবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা ; তার মধ্যে অপরের প্রতি স্নেহ ও সহানুভূতির উদ্রেক করা। তার পরিবারকেন্দ্রিক নির্ভরতা থেকে বিমুক্ত করে তাকে ধীরে ধীরে সমাজসচেতন ও আত্মনির্ভর করে তোলা। সমাজসচেতন অর্থে সমাজবিন্যাস ও সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্যক উপলব্ধি।

আতঙ্ক (১)

অনেকে একলা বেরুতে ভয় পান। অফিসে কোনরকমে একলা যেতে পারেন, অন্য কোথাও যেতে গেলে সঙ্গী চাই। এরকম ধরনের রোগী হামেশাই আমাদের কাছে এসে থাকেন। একলা নয়, অবশ্য সঙ্গী নিয়ে। এঁরা প্রায়ই ভিড়ের ভিতর যেতে ভয় পান। ট্রামে বাসে উঠতে পাবেন না, উঠলেই নজর সবসময় বেরুবার পথের দিকে। সেখানে ভিড় জমতে দেখলেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে নেমে পড়বেনই। হেঁটেই অফিস থেকে বাড়ী ফেরেন, দরকার কি ট্রাম-বাসের খাঁচার মধ্যে মুর্গী-বন্দী হয়ে যাবার ? আর একবার ভয়ের উপসর্গ—যথা বুক ধড়ফড়, নাড়ী চঞ্চল, গায়ে ঘাম, গলা শুকিয়ে যাওয়া ইত্যাদির যে কোনো একটা দেখা দিলেই তখুনি এঁরা ছুটে যান ডাক্তারের কাছে—অবশ্য প্রথম চোটে নিজের ডাক্তারি নিজে করার পর।

এঁদের কেউ উঁচুতে উঠতে ভয় পান, কেউ গলিতে ঢুকতে পারেন না। এক নরসুন্দর ফৌজী আদমিকে কামাতে গেলে ভয়ে অস্থির হতেন। আর এক ভদ্রলোকের কথা জানি, যিনি রক্ত দেখলেই অজ্ঞান হয়ে যেতেন। এঁদের সব কিছুতেই ভয়, ভয়ে নিজের ও অপরের জীবন দুর্বিষহ করে তোলেন। এঁদের 'মৃত্যুভয়' প্রবল ; সন্দেহ এই যে হার্ট বা অন্য কোনো দেহযন্ত্র তাঁদের রুগ্ন বা বিকল, যে-কোনো সময় তাঁদের মৃত্যু হতে পারে। এক ভদ্রলোককে জানি যিনি একলা কোথাও যেতে হলে, পকেটে কোরামিন ও নাম-ঠিকানা লেখা কার্ড নিয়ে বেরুতেন। হৃদযন্ত্র যদি বিকল হয়ে যায় কোরামিন দিয়ে সচল করবার চেষ্টা করবেন ; যদি মৃত্যু হয় তাহলে পকেটের পরিচয়জ্ঞাপক কার্ড দেখে অন্তত মৃত্যুর খবরটা আত্মীয়-স্বজনরা জানতে পারবে। আর একজনকে জানি যিনি কয়েক-বছর ধরে বাড়ী থেকে এক ফার্লং চৌহদ্দির বাইরে কোথাও কোনদিন যেতে পারেন নি। যেতে গেলেই আতঙ্ক তাঁকে পেয়ে বসত। বুক ধড়ফড় করত, মাথা ঘুরত, চোখে অন্ধকার দেখতেন, "বায়ু ঊর্ধ্বগামী" হয়ে তার মাথায় ধাক্কা দিয়ে ভূপাতিত করে ফেলত। শেষোক্ত কথাগুলো অনেক রোগীর মুখেই শোনা যাবে। অর্ধশিক্ষিত কবিরাজদের দৌলতে এ ধারণাটা ব্যাপকভাবে আমাদের

দেশে চালু। পূর্বোক্ত ভদ্রলোকের চৌহদ্দি বেড়ে এখন বাগবাজারের বাড়ী থেকে এস্‌প্ল্যানেড অবধি দাঁড়িয়েছে।

এ-ছাড়া আছে বিশেষ কোনো রোগের ভয়; যক্ষ্মা বা ক্যান্সারের ভয় এর মধ্যে প্রধান। আবার 'পাগল হয়ে যাব বা যেতে পারি'—এই ধারণা কত লোককে যে অস্থির করে তোলে তার ইয়ত্তা নেই।

গুরুমস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের ধর্ম, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং মস্তিষ্কের দুটি সাংকেতিকতন্ত্রের পরস্পরনির্ভর ক্রিয়াকলাপের জ্ঞান ছাড়া এ ধরনের উপসর্গের ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। তার আগে দু-একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটাকে আরো বোধগম্য করে নেওয়া দরকার।

প্রথমে এক ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোকের (৪০) কথা বলব, যিনি রক্ত দেখলে মূর্ছা যেতেন। প্রায় দশ বছর আগে তাঁকে আমি প্রথম দেখি। একটা বড় কারখানার ড্রাফটসম্যান হয়ে আছেন বহু বছর ধরে। ইউনিভারসিটির পরীক্ষা-গুলোতে পাশ করে এসেছেন কিন্তু কর্মক্ষেত্রের পরীক্ষায় বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। দশ বছরে একটাও ইনক্রিমেণ্ট পাননি। কর্তৃপক্ষকে তিনি দোষ দিলেন না, স্বাস্থ্যের অজুহাত দেখালেন। বছরে প্রায় তিনমাস শয্যাশায়ী থাকেন—কোলকাতার এক নামকরা ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে। এই সময় রক্তচাপ কমে যায়, কিছুই হজম হয় না। প্রায় প্রতিদিন গ্লুকোজ ইনজেকশন চলে, সঙ্গে 'হাই-প্রোটিন ডায়েট' আর বিশ্রাম। চিকিৎসার ফলে ওজন কিছুটা বাড়ে, কিন্তু নড়াচড়া করতে পারেন না। পরে ধীরে ধীরে রক্তচাপ বাড়ে, ডাক্তার রায় দেন—বিপদমুক্ত। ভদ্রলোক কারখানায় যেতে শুরু করেন। এরকম চলছে দশ বছর ধরে। এক ডাক্তারবন্ধুর পীড়াপীড়িতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার কাছে যখন এলেন তখন শয্যাত্যাগ করেছেন কিন্তু কারখানায় যেতে শুরু করেননি। আমি দু'দিন ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং বাৎসরিক 'শয্যা গ্রহণের' কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করলাম। বছরের এই সময়টিতে কারখানায় গেলে কাজের চাপ বেশী পড়ে, কেননা ওঁর ঊর্ধ্বতন অফিসার (যাঁর সঙ্গে উনি ঘনিষ্ঠ) এই সময়ে তাঁর বাৎসরিক ছুটি উপভোগ করেন। কোনরকম দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে উনি অভ্যস্ত নন, ধারণা তাতে নার্ভ-এর উপর বেশী চাপ পড়বে ও স্বাস্থ্যহানি হবে। শয্যাশায়ী হবার অব্যবহিত আগে রক্তপাত দেখেন বা রক্তপাত ঘটতে পারে এমন কোনো ঘটনার সম্মুখীন হন। এবারকার কথাই বলি। মাংস কিনছেন দোকান থেকে; এমন সময় দেখলেন নর্দমা দিয়ে রক্তস্রোত বইছে, ভিতরে পাঁঠা কাটা হচ্ছে। গা ঘুলিয়ে উঠলো, মাথা ঘুরলো, চোখে অন্ধকার দেখলেন; চেনাজানা লোকেরা ধরাধরি করে বাড়ী পৌঁছে দিল। এর আগেরবার ঘটেছিল পাড়ার কতকগুলো ছেলে-ছোকরার সঙ্গে ঝগড়ার পর; তারা মাথা

ফাটিয়ে রক্তপাত করবে বলে শাসিয়েছিল।

ছোটবেলার ইতিহাস হাতড়ে এই রক্তভীতির হদিশ পাওয়া গেল। "দেশের বাড়ীতে পূজো। দাদা, কাকা, সব বাড়ী এসেছেন। ম্যালেরিয়ায় ভুগে সবে অন্নপথ্য করেছি; খুবই দুর্বল। নবমী পূজোর দিন সকালে বাড়ীর বাইরে রোদ পোহাচ্ছি, বড়রাও জড়ো হয়েছেন। অধ্যাপক কাকা পাশের বাড়ীর ডাক্তার কাকার সঙ্গে বোধহয় রাজনীতি চর্চা করছেন। উঠোনের হাড়িকাঠের দিকে তাকাতে গা গুলিয়ে উঠলো, কালকের সেই দৃশ্য মনে পড়ল। আমার পোষা "সোনা"র (পাঠা) গলা হাড়িকাঠে চাপা, সে করুণ স্বরে ডাকছে, ভৈরব কাতান তুলেছে; আমি ভয়ে চোখ বুঁজলাম। চোখ মেলতে দেখলাম ফিনকি দিকে রক্ত ছুটছে। মায়ের কোলে ঢলে পড়লাম। ঢাকের বাদ্যি ছাপিয়ে তখনও আমার কানে আসছে "সোনা"র সেই আর্তস্বর। ⋯হঠাৎ সোরগোল চীৎকার, দুই কাকাতে কী নিয়ে ঝগড়া বেধেছে, ঝগড়া হাতাহাতিতে দাঁড়িয়েছে। ডাক্তার কাকার ছেলেরা লাঠিশোটা নিয়ে রণস্থলে উপস্থিত। অধ্যাপক কাকা ছুটে গিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে ঝোলানো কাতানটা নিয়ে একলাফে উঠোনে নামলেন। আমার মাথা ঘুরে উঠলো। সোনার ডাক কানে এলো। চোখের সামনে হিজিবিজি কি সব দেখতে পেলাম। দেখলাম যেন ফিনকী দিয়ে রক্ত ছুটছে; আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। ⋯জ্ঞান হতেই মাকে জিজ্ঞাসা করলাম কাকাদের কি হয়েছে। শুনলাম ঠাকুরমা গিয়ে পড়ায় রক্তারক্তি ঘটেনি। ⋯আমাদের জেলায় সে আমলে খুন-জখম লেগেই থাকতো। শিক্ষিত বামুন কায়েতের ছেলেরাও লাঠি শড়কী চালাতে জানতো। এক-আধ-কাঠা জমির জন্য প্রতিবেশীদের মধ্যে মারপিঠ, ফৌজদারী ছিল খুব সাধারণ ঘটনা।"

এই ইতিহাস বলতে গিয়ে ভদ্রলোক মিনিট খানেকের জন্য সোফায় মাথা রেখে চোখ বুজলেন। তারপর চোখ খুলে বললেন—"এ ঘটনাটার কথা মনেই আসেনি এতদিন। ছোটবেলা থেকেই ভয়ের রোগে ভুগছি। বেনারসে যখন পড়ি তখনও ভুগেছি। একলা একঘরে থাকিনি কোনোদিন—কি জানি কখন কি হয়। দাঙ্গার সময় এখানে ছিলাম; পুরো তিনমাস বিছানা ছাড়িনি। দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মারামারির গল্প শোনাও সম্ভব নয়। মাথা ঝিমঝিম করে, ভয় হয়, বুঝি অজ্ঞান হলাম। কারখানায় ষ্ট্রাইক হলে ভয় হয়, কারখানায় যেতে পারি না। রাস্তায় কোনো হাঙ্গামা বেধেছে দেখলে বাড়ী ফিরে আসি।" ভদ্রলোক আবার চোখ বুঁজলেন।

এ কেসের বিশদ পর্যালোচনা এখানে করব না। ভয়, বিশেষ করে "রক্তভীতি" ব্যাপারটার বৈজ্ঞানিক কারণটাই শুধু বোঝাবার চেষ্টা করব। ভয় কি? পাভলভের কথাতেই বলি—ভয় গুরুমস্তিষ্কের নিস্তেজনাকালীন নিষ্ক্রিয়

আত্মরক্ষামূলক পরাবর্তের অভিব্যক্তি। হিপনয়েড বা প্রায় সম্মোহিত অবস্থার সঙ্গে ভয়ের সম্পর্ক আছে। এ অবস্থা মানুষ প্রায়শই অজানিতভাবে অতিক্রম করে। সব সময়ে জাগ্রত অবস্থা থেকে একে পৃথক করে দেখা যায় না। শারীরিক দুর্বলতা, মানসিক আঘাত ইত্যাদি এই অবস্থা আনয়নে সক্ষম। এই স্ব-বিরোধী (paradoxical) অবস্থায় অভিভাবন (suggestion) বিশেষ কার্যকরী হয়। এ অবস্থার কথা আগের দু'খণ্ডে আলোচিত হয়েছে।

বিশেষ পরিবেশে গুরুমস্তিষ্কের দুটি অংশ সংযোজিত হয়ে পরাবর্ত তৈরী হয়। শর্তাধীন পরাবর্ত মাত্রই ভঙ্গুর। এই পরাবর্ত অভিভাবনের সাহায্যে ভাঙ্গা যায়, আবার গড়াও যায়। বেকতেরেফ ও তারপর পাভলভের ল্যাবরেটরিতে এ নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে। মস্তিষ্কের বিশেষ অবস্থায় (নিস্তেজিত বা সম্মোহিত অবস্থায়) যখন কোষগুলির দৃঢ়তা (tone) কম, তখন এই সংযোজন স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে। এই অবস্থাকে সাধারণত বলা হয় obsessive state বা আবিষ্ট অবস্থা।

ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোকের 'ভয়'-এর শারীরবৃত্ত এবার অনুধাবন করা যাক। ম্যালেরিয়ায় ভুগে মস্তিষ্ক দুর্বল—এমনি অবস্থায় অষ্টমীপূজার দিন "সোনা"কে বলি দেওয়া হচ্ছে দেখলেন। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল—সোনার ধড়টা দু-একবার নড়ে উঠে নিষ্পন্দ হয়ে গেল। পরের দিন কাকাদের মধ্যে ঝগড়া মারামারির দৃশ্য দেখলেন চণ্ডীমণ্ডপের সামনে দাঁড়িয়ে। কাকা 'কাতান' (যা দিয়ে 'সোনা'র শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল) নিয়ে তেড়ে এলেন। অষ্টমীর দিনের সংযোজন নবমীর দিনে দৃঢ়তর হল। 'রক্ত' ও 'মৃত্যু'—বালকের মনে বিষম ভীতির সঞ্চার করল : এ-দুটি কথা সমার্থবাচক হয়ে দাঁড়াল বালকের কাছে। রক্ত-মৃত্যু-মূর্ছা—এই পর্যায়ে জটিল দৃঢ় সংযোজক পথ স্থাপিত হল মস্তিষ্কের মধ্যে। পরবর্তীকালে এরই অভিব্যক্তি চলল সারাজীবন ধরে।

এই প্রসঙ্গে অন্য এক চিকিৎসকের একটি রোগীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এক মিলিটারী ইউনিটের ক্ষৌরকার বড় অফিসারদের ক্ষৌরকর্ম করতে পারছিল না বছর পাঁচেক ধরে। যে মুহূর্তে বড়দরের কোনো অফিসার এসে দোকানে ঢুকতেন, ক্ষৌরকার উত্তেজিত হয়ে উঠতো, দুর্বল বোধ করতো, হাত-পা কাঁপত, ভয় হতো কামাতে গেলে সে নিশ্চয়ই একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসবে।* বিশেষ করে "কমাণ্ডার" কথাটাই শুনলেই সে ভয়ে বোবা হয়ে যেত।

---

* A pathological conditioned reflex to the given situation was formed and became firmly fixed, the reflex manifested itself in discoordination of movements resulting from overwhelming fear." —Pavlov

জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল যে পাঁচ বছর আগে এক ভদ্রলোককে কামাতে কামাতে সে পাশের ঘরে ঢোকে ক্ষুর শান দেবার জন্য। সেখানে দোকানের ম্যানেজার বসেছিলেন। তিনি ফিসফিস করে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন—"জানো কাকে কামাচ্ছ! উনি আমাদের ইউনিট কম্যাণ্ডার। ওর বুকে 'তিনটে তারা দেখছ ত'। খুব সাবধান, কেটেকুটে ফেলো না যেন।" এই সাবধান বাণীই কাল হল। ভয়ে তার হাত কাঁপতে লাগল। অতিকষ্টে সে ক্ষৌরকর্ম শেষ করল কিন্তু সেই থেকে কম্যাণ্ডার কেন—কোনো অফিসারকেই সে আর কামাতে পারছে না। তারা সিভিল ড্রেসে আসলে অবশ্য কোনো অসুবিধা হতো না। অবশ্য সে ক্ষেত্রে অফিসারের পোষাক ও অন্যান্য স্মারকচিহ্ন উদ্দীপকের কাজ করেছিল। বলাবাহুল্য অল্প কয়েকটি অভিভাবনেই (সম্মোহিত অবস্থায়) ভয় দূর করা হয়েছিল।

স্বাস্থ্যসম্পর্কিত সাবধান বাণী সময়বিশেষে কতখানি ক্ষতি করতে পারে সাধারণের সেটা জানা নেই। "মাঝে মাঝে বুকটা, প্রেসারটা, ভাল ডাক্তার দিয়ে দেখিয়ে নেবেন—এই অতি সাধারণ সাবধান বাণী বিশেষ অবস্থায় কোনো কোনো ব্যক্তির পক্ষে, রক্তচাপ বৃদ্ধি অথবা হৃদযন্ত্রঘটিত নিউরোসিসের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। প্রথম জীবনবীমা করতে গিয়ে বা চাকরীতে বহাল হবার প্রাক্কালে যে ডাক্তারী পরীক্ষা করা হয় সেটা দুর্বলচিত্ত লোকের পক্ষে একটা বিশেষ ব্যাপার। অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই সে সময় রক্তের চাপ একটু বাড়ে, ধমনীর স্পন্দন দ্রুততর হয় ও সাময়িক উদ্বেগ বা ভয়ের কিছু কিছু উপসর্গ দেহে প্রকাশ পায়। এই সময় যদি কোনো চিকিৎসক বলেন—"দেখুন মশায়, প্রেসারটা মাঝে মাঝে চেক করবেন" অথবা "সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলে থেমে থেমে উঠবেন" —তা হলে কি ঘটতে পারে তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

আতঙ্ক (২)

বেশ লম্বা চেহারা। 'ত' বাবু (৩৫) ছোট ভাইকে নিয়ে আমার কাছে এলেন ডাক্তার 'শ'-এর নির্দেশে। বছর দুয়েক ধরে নানারকম উপসর্গে ভুগছেন। ট্রামে-বাসে উঠতে পারেন না, বন্ধ জায়গায় থাকতে পারেন না, উপরওয়ালার কাছে যেতে পারেন না। সবার উপর আছে রক্তচাপ বৃদ্ধির ভয়। রক্তচাপ সত্যিই বেশী, ১৮০/১০০; তবে সব সময় বেশী থাকে না, ওঠানামা করে।

ইতিহাস থেকে জানা গেল উনি এক সরকারী অফিসের উচুতলার কেরানী। প্রথম বিভ্রাট ঘটে দুবছর আগে ডাক্তারী পরীক্ষার সময়। পরীক্ষায় পাশ করলে স্থায়ী হবে চাকরী, এ-অবস্থায় একটু-আধটু উৎকণ্ঠা সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক।

কিছুদিন আগে থেকেই একটি পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে 'ত' বাবু উৎকণ্ঠিত ছিলেন। এই অবস্থায় ডাক্তারবাবুর সামনে হাজির হলেন। রক্তচাপ বেশী, এই কারণে তিনি পরীক্ষায় ফেল করলেন। ডাক্তারবাবু বললেন, প্রেসারটা কমিয়ে আসবেন; সেই থেকে ভয়ের সূত্রপাত। পারিবারিক চিকিৎসকের অধীনে প্রেসার কমাবার ওষুধপত্তর খেতে লাগলেন, রক্তচাপ স্বাভাবিক পর্যায়ে নেমে আসতে আবার হাজির হলেন অফিস ডাক্তারের দরবারে। সকাল দশটায় স্বাভাবিক চাপ বেলা একটায় অস্বাভাবিকে দাঁড়িয়ে গেল। পারিবারিক চিকিৎসকের পীড়াপীড়িতে অফিস ডাক্তার এবার তাঁকে পাশ করিয়ে দিলেন; তবে বললেন, "প্রেসারের দিকে একটু নজর রাখবেন মশায়!" আতঙ্কিত 'ত' বাবু কোলকাতার অনেক নামকরা ডাক্তারকে একে একে কল দিতে লাগলেন। প্রেসারও ক্রমশ ওঠানামা বন্ধ করে বাড়তির দিকে ঝুঁকে রইল। অফিস যাতায়াত অনিয়মিত হয়ে উঠলো। কোনো লোকের করোনারী বা সেরিব্রাল থ্রম্বসিস হয়েছে শুনলেই আতঙ্কে অভিভূত হয়ে পড়েন। অনেকদিন এরকম কোনো খবর শুনেই আতঙ্কিত হয়ে অফিস থেকে বাড়ী চলে আসতেন।

মস্তিষ্কের নিস্তেজনা পর্বে অফিস ডাক্তারের কথায় তাঁর মনে যে ভয়ের উদ্রেক হয়েছিল, হিপ্‌নটিক অবস্থায় অভিভাবনের সাহায্যে সে ভয়ের সাময়িক নিরসন ঘটানো হলো। কিন্তু তিনি পুরোপুরি সুস্থ হলেন না। চিকিৎসার পরও মাঝে মাঝে পুরনো পরিবেশে আতঙ্কের আক্রমণ ঘটতো। এর কারণ তাঁর পারিবারিক ও অফিসের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান হচ্ছিল না। সে-সব কথা বর্তমান প্রসঙ্গে অবান্তর! আতঙ্কের সূত্রপাত এখানে শর্তাধীন পরাবর্তের নিয়মানুযায়ীই ঘটে। এ ভদ্রলোক হঠকারী (choleric) টাইপের মস্তিষ্কের অধিকারী।

আতঙ্ক (৩)

এবার সেই ভদ্রলোকের কথা—যিনি কোরামিন ও আইডেন্টিটি কার্ড পকেটে নিয়ে ঘুরতেন।

'দ' বাবু শহরতলীর এক কারখানার সরকারী কেমিষ্ট। কারখানার তৈরী মালের গুণাগুণ পরীক্ষার ভার এঁর হাতে। এঁর 'টেষ্টে' পাশ করলে তবে মাল পার্টিকে ডেলিভারী দেওয়া হয়। ভদ্রলোক এতদিন বেশ ভালো সাহেবের অধীনে কাজ করে আসছিলেন। তিনি নিজে দেখেশুনে পাশ করতেন, সহকারীর দায়িত্ব নিজেই যতটা পারতেন বহন করতেন। পুরনো সাহেব বদলী হলেন, নতুন সাহেব এলেন খাস বিলাত থেকে। মেজাজ খারাপ, উচ্চারণ আরও খারাপ; কাজকর্মের অভিজ্ঞতাও কম। কয়েকটা সরকারী অর্ডারের মাল ফেরত এলো—

স্যাম্পল-নির্দিষ্ট গুণাগুণের সঙ্গে গরমিলের জন্য। বড় সাহেব কেমিষ্ট সাহেবকে ডেকে বোধ হয় মিষ্টি-মধুর কিছু বললেন। কেমিষ্ট সহকারীকে ডেকে ঝাড়া আধ ঘণ্টা ধরে খাঁটি ককৃনি বুলিতে অনেক কিছু বললেন; 'দ' বাবুর কাছে বেশীর ভাগই তার "গ্রীক" মনে হলো। তবে ফল ঠিক মতই হলো। 'দ' বাবুর বুক ধড়ফড় করলো, গা দিয়ে ঘাম ছুটলো, হাত-পা কাঁপলো, মাথা ঘুরতে লাগল। নিজের ঘরে এসে তিনি পুরনো রেকর্ড খুঁজতে গিয়ে চোখে সর্ষে ফুল দেখে ভূমিশয্যা নিলেন। হৈ চৈ পড়ে গেল। মিলের মধ্যেই হাসপাতাল। মিলের ডাক্তার এলেন, ইন্‌জেকশান দিলেন; একটা বেডে নিয়ে সারা দিনরাত তাঁকে শুইয়ে রাখা হলো; ঘন ঘন রক্তচাপ পরীক্ষা করা হতে লাগল। 'হার্ট দুর্বল'— রায় দিলেন ডাক্তারবাবু। একমাস ছুটি নিয়ে 'দ' বাবু দেশ থেকে হাওয়া বদল করে এসে কাজে লাগলেন। তবে রোজই প্রায়, বিশেষ করে সাহেব ডেকে পাঠালেই তাঁর আতঙ্কের উপসর্গ দেখা দিতে লাগল; আর পুরনো রেকর্ড ঘাঁটবার আদেশ হলে ত' কথাই নেই। বেশ নিয়ম করেই মূর্ছার লক্ষণ দেখা দিত। সঙ্গীসাথী নিয়ে কোলকাতায় এসে (এখন আর একলা কোয়ার্টার বা ল্যাবরেটরীর বাইরে বেরুবার সাহস তাঁর নেই) বড় ডাক্তার দেখানো হলো; কার্ডিওগ্রাম করানো হলো। হার্টের কোন দোষ পাওয়া গেল না। কিন্তু অসুখ তাঁর চলতেই থাকলো। বছর দুই-তিন এইভাবে চললো। সাদা চামড়ার বদলে মাদ্রাজী কেমিষ্ট এলেন উপরওয়ালা হয়ে। কাজকর্মের ভয় খানিকটা কমলেও—রেকর্ড খোঁজার কথা উঠলেই মূর্ছার লক্ষণ দেখা দিত। আর বাইরে বেরুনো তাঁর একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। নিজের রোগলক্ষণ মিলিয়ে হরদম ওষুধ খাচ্ছেন তখন। কোরামিন ত' নিত্যসঙ্গী। হার্ট যে-কোন সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসতে পারে—এ সন্দেহ তাঁকে পেয়ে বসেছে। যে ডাক্তারবাবু 'হার্ট দুর্বল' বলেছিলেন, তিনি অনেক বড় ডাক্তারের রিপোর্ট, অনেক পুঁথিপত্তরের নজির দিয়েও 'দ' বাবুকে চাঙ্গা করতে পারলেন না। 'দ' বাবু 'হার্ট-এর অসুখের আতঙ্কে আচ্ছন্ন। আতঙ্ক পুরোদমে তখন তাঁকে পেয়ে বসেছে।

এই অবস্থায় মনোবিদের সঙ্গে দেখা করলেন চিকিৎসার জন্য। তৃতীয় দিন থেকেই একলা আসতে লাগলেন। ট্রেনে করে বারো মাইল, পরে বাসে দুই মাইল—অনেকদিন পরে একলা ভ্রমণ করলেন। 'কোরামিন' বা 'আইডেন্টিটি কার্ড' পরিত্যক্ত হল। খাওয়া দাওয়া স্বাভাবিকভাবে করতে লাগলেন। একটা কথা বলা হয়নি, ইনি উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের জন্য হজমশক্তিও হারিয়ে বসেছিলেন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁর আতঙ্ক ও উদ্বেগ সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হল। অনেক বছর হয়ে গেছে, জানি তিনি ভালই আছেন। সম্মোহিত অবস্থায় অভিভাবনের সাহায্যে তাঁর চিকিৎসা করা হয়েছিল। অবশ্য ব্যাখ্যামূলক

চিকিৎসা, যাকে বলে explanatory psychotheraphy, এক্ষেত্রে তারও বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ব্যাখ্যা ছাড়া শুধু অভিভাবন শিক্ষিত লোকের উপর অনেক সময় পুরো ফলপ্রদ হয় না।

এখানেও ঐ একইভাবে আতঙ্কের আতঙ্ক ও একই পদ্ধতিতে তার নিরসন।

গুরু মস্তিষ্কেস্থ দুটি অংশের এই বিকারমূলক স্থায়ী সংযোজনের ফলে মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশে ঘটে নঞর্থক আরোপ (negative induction)। তার ফলে আবার নিম্নমস্তিষ্ক ও অক্রিয় স্নায়ুকেন্দ্রে ঘটে উত্তেজনা (excitation in subcortex and vegetative centres)। এইভাবেই রোগ উপসর্গের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

সম্মোহিত অবস্থা পুরোপুরি নিস্তেজনার অবস্থা নয়। মস্তিষ্কের কিছু কিছু অংশ উত্তেজিত থাকে, এবং সেই স্থানগুলোর মারফত সম্মোহনকারী কর্তৃক রোগীর মস্তিষ্কে অভিভাবনের ধারণাগুলো প্রবিষ্ট করে দেওয়া হয়।* সম্মোহিত বা অনুরূপ অবস্থায় মস্তিষ্ক সামগ্রিকভাবে কাজ করে না; তাই এ অবস্থায় যে-কোন বিচ্ছিন্ন বা উদ্ভট ধারণা মস্তিষ্কে বাসা বাঁধতে পারে। এ উদ্ভট ধারণা যে কোনো বিষয়ে গড়ে উঠতে পারে। এ ধারণা অন্যের দেওয়া অভিভাবন অথবা স্ব-অভিভাবনও হতে পারে। শুধু ব্যক্তি নয়, একটা সম্প্রদায় বা জাতি পর্যন্ত উদ্ভট ধারণাচ্ছন্ন হয়ে বিকারগ্রস্ত হতে পারে। যে কোনো ভয়ের প্রোপাগাণ্ডা দিয়ে মস্তিষ্ককে আংশিকভাবে নিস্তেজিত করে দেওয়া সম্ভব। তুমি সংখ্যালঘু, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় তোমাকে যে-কোনো সময় আক্রমণ করতে পারে—এ ধারণা প্রচার করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ভয়ার্ত করে তুলে তার মনে যে কোনো উদ্ভট অসম্ভব ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। এ ধরনের ব্যাপার স্বাধীনতার আগে আমাদের দেশে অনেক হয়েছে, এখনও হচ্ছে।

হিটলারী আমলে জার্মানীতে রাজনৈতিক প্রচারের ধারার মধ্যেও দেখতে

* "Such concentrated excitation of a restricted section of the cerebral cortex with a weak and low tone of the cortex is accompanied by a strong negative induction which isolates the stimulation from all other influences." (Platanov)
"When man resumes his waking state after this suggestion he cannot do anything about this isolated stimulation because it is separated from all the rest." (Pavlov)

পাই—এই একই পদ্ধতি। "চারিধারে আমাদের শত্রু"; "প্রতিবেশী রাষ্ট্র আমাদের আক্রমণ করবার মতলব করছে;"—ইত্যাদি প্রচারের দ্বারা জনচৈতন্য ভয়াবিষ্ট ও নিস্তেজিত করে তোলা হয়েছিল। তখন অন্য জাতি সম্পর্কে কুৎসা অতি সহজে বিশ্বাস্য বলে অনেক জার্মানদের মনে হয়েছিল, কাজেই যুদ্ধবন্দীদের উপর পাশব অত্যাচার করতে নাৎসীদের আটকায়নি। পাভলভের মতে এই অবস্থায় একেবারে বাস্তববিরোধী ধারণাও মানুষের মনে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, এবং অবাস্তব উদ্ভট সাংঘাতিক মনোবৃত্তিও এইভাবে গড়ে তোলা সম্ভব।

আতঙ্কের আবেশ—আলোচনা

এই কালকে অনেক উদ্বেগ-আতঙ্কের কাল (age of anxiety) বলে অভিহিত করেছেন। মনের বেশীরভাগ রোগেই আতঙ্ক-উদ্বেগ উপসর্গ হিসেবে বিদ্যমান থাকে। সুস্থ মানুষের কাছেও ভয়ের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। অতীতে মনোবিদ্যার পুঁথিপুস্তকে ভয়ের কারণ অনুসন্ধানে ব্যক্তি-ইতিহাসের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে; ভয়ের সামাজিক কারণগুলো নিয়ে অনুসন্ধান ও আলোচনা সেই অনুপাতে কমই হয়েছে। আমরা এখানে আতঙ্ক ও আবেশের সামাজিক উৎস অনুসন্ধানের চেষ্টা করছি।

অবসেশন বা আবেশ নিয়ে নানা রকমের তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে। ইয়ুং, মর্টন প্রিন্স, ম্যাকডুগাল নিজ নিজ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অনেক আতঙ্কগ্রস্ত রোগীর বিবরণ পেশ করেছেন।

ইয়ুং তাঁর নিজস্ব বাক্-অনুষঙ্গ পদ্ধতিতে এক মহিলার ঘুম না হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করেন তখন তাঁর বয়স সাঁইত্রিশ। ঘুমোতে গেলেই মনে হত, ঘুম হবে না। ঘুম যদিও বা হয়, সে ঘুম আর ভাঙবে না। ভয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে বসতেন এবং প্রায় সারারাত জেগেই কাটাতেন। মহিলাটি শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী হওয়া সত্ত্বেও মনে করতেন তাঁর আবেশিক চিন্তা অন্য কেউ যদি শোনে তবে সেও অবসেশনে আক্রান্ত হবে; অন্য একজন চিকিৎসক এবং একজন পাদ্রী তাঁর চিন্তা-বৃত্তান্ত শুনে তাঁরই মত আবেশিক চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়েছেন। চিন্তাটা বেশ অদ্ভুত ধরনের। পাশের বাড়ীর একটি মেয়ের মৃত্যুর জন্য তিনি দায়ী। এই মৃত্যুটি ঘটবার আগে অন্য একটি ছেলের মৃত্যুর জন্য বহু বছর ধরে নিজেকে অপরাধী মনে করে আসছেন। ইয়ুং বাক্-অনুষঙ্গ পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে রোগিনীর অবচেতন স্তরের অভিলাষ ও কামেচ্ছা আবিষ্কার করলেন। মহিলাটিকে জানিয়ে দিলেন যে তাঁর আবেশিক চিন্তাগুলো অছিলা ও অজুহাত মাত্র; সত্যকে ঢাকা দেবার উপায়। আসলে তিনি অবদমিত কামেচ্ছা দ্বারা পীড়িত।

ইয়ু-এর মতে ভয়ের উপসর্গ অন্য কোন চিন্তাকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য ব্যবহৃত। পাপবোধ সংশ্লিষ্ট চিন্তাভাবনা ও ক্রিয়াকলাপের স্বপক্ষে যুক্তিজাল বিস্তার করে আত্মগ্লানি থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টা করেছিলেন ভদ্রমহিলা।

এবার মর্টন প্রিন্স-এর কথায় আসা যাক। মর্টন প্রিন্সের রোগিনীর আতঙ্কের বিষয়বস্তু ঘণ্টাঘর (বেল-টাওয়ার)। কোনো ঘণ্টাঘরের ধার দিয়ে আসতে গেলে আতঙ্কে অভিভূত হয়ে পড়ত মেয়েটি, ভয়ের সমস্ত আনুষঙ্গিক শারীরিক উপসর্গ দেখা দিত; এমনকি 'ঘণ্টাঘর' কথাটিও শেষের দিকে ভয়ের উদ্রেক করত। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেও ঘণ্টাধ্বনি বা ঘণ্টাঘরের এই ভীতির কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। এরপর সম্মোহিত অবস্থায় স্বয়ংক্রিয় লেখার মাধ্যমে মেয়েটির আতঙ্কের হদিশ মিলল। পঁচিশ বছর আগেকার একটি ঘটনা তার মনে পড়ল: একটি ঘণ্টাঘরের পাশে সে আকুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে, পাশের ঘরে মায়ের উপর অস্ত্রোপচার চলেছে, এদিকে প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর ঘণ্টাঘরের ঘণ্টাটি বেজে চলেছে, উৎকণ্ঠা ভয় এবং আকুলতা চরমে উঠেছে। অস্ত্রোপচারের সময় মায়ের মৃত্যু ঘটল।...পঁচিশ বছর ধরে এই ঘণ্টাঘরের ভয় মেয়েটিকে তাড়িত করছে; যদিও ভয়ের ঘটনাটি সে ভুলে গেছে। মর্টন প্রিন্স-এর মতে আতঙ্কের আবেগের মূলে থাকে অবদমিত সক্রিয় গূঢ়ৈষা (রিপ্রেস্‌ড এ্যাণ্ড এ্যাকটিভ কমপ্লেক্স)। পুরোপুরি বিষঙ্গিত অবস্থার সঙ্গে এর যথেষ্ট পার্থক্য।

চিকিৎসাপুস্তকে আমরা সে সব আতঙ্কের কাহিনী পাঠ করি তার অধিকাংশই প্রায় একই প্যাটার্নের। শৈশবে কোনো একটা অন্যায় কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ার ফলে প্রথম ভয়ের সূত্রপাত।

মর্টন প্রিন্স, ম্যাক্‌ডুগাল প্রমুখ চিকিৎসক সম্মানবোধকে অতিমাত্রায় গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁদের মতে "সেলফরিগার্ড"-এর "সেন্টিমেন্টর"-এর সঙ্গে জড়িত বলে ঘটনাটি মনে থাকে না; কিন্তু আনুষঙ্গিক ভয়ের অনুভূতি থেকেই যায়। আত্মসম্মানবোধকে অতি প্রাধান্য দিয়েও ঘটনাটি ভুলে যাওয়ার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা এইসব রোগ কাহিনী থেকে পাওয়া যায় বলে মনে হয় না। মায়ের মৃত্যু বেদনাদায়ক নিঃসন্দেহ, কিন্তু আত্মমর্যাদা বা অহংকার ক্ষুণ্ণ হবার মত ঘটনা এটা নয়। কাজেই বিস্মৃতির অন্য কারণ আছে কিনা ভেবে দেখা দরকার।

ম্যাকডুগাল তাঁর "এ্যান আউটলাইন অফ্‌ এ্যব্‌নরমাল সাইকোলজি" পুস্তকে ডাঃ ব্যাগবাই ও ডাঃ রিভার্স-এর কয়েকটি কেসের উল্লেখ করেছেন। মনোরোগের চিকিৎসকদের কাছে কাহিনীগুলো সুপরিচিত। পাঠকদের অনেকের কাছে কেসগুলি বিশেষ কৌতূহল-উদ্দীপক মনে হতে পারে। দুটি কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করছি।

একজন চিকিৎসক অনেকদিন ধরে সঙ্কীর্ণ স্থানের ভয়ে ভুগছিলেন। প্রথম দিকে ব্যাপারটিকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। কিন্তু মাঝে মাঝে একটি অনির্দিষ্ট ভয়ে তিনি অভিভূত হয়ে পড়তেন। কথা বলতে গিয়ে তোত্‌লামি দেখা দিত। কিছুদিন একজন ফ্রয়েডিয়ান পরীক্ষককে দিয়ে চিকিৎসিত হবার ফলে বুঝলেন গোলমালটা যৌন-সংক্রান্ত; কিন্তু তার ফলে উপসর্গ একটুও কমল না। এরপর তাঁকে যুদ্ধে যেতে হল। এই সময় পরিখার মধ্যে আত্মগোপন করে থাকতে গিয়ে দেখলেন যে তাঁর সঙ্কীর্ণ স্থানের ভয় বেশ একটা বড়দরের উপসর্গ; কিছুতেই পরিখায় থাকতে পারতেন না; সারারাত তিনি পরিখা ছেড়ে পায়চারি করে ঘুরে বেড়াতেন। ক্রমশ অন্যান্য উপসর্গ দেখা দিতে তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে হাসপাতালে ফেরত পাঠানো হল। এখানে ডাঃ রিভার্সের নির্দেশে তিনি স্বপ্নবৃত্তান্ত লিখতে লাগলেন। এইভাবে শৈশবের একটি স্মৃতি তাঁর মনে এল: বয়স তখন চার কি পাঁচ; তাঁদের বাড়ীর পাশে এক বৃদ্ধ পুরনো জিনিষ-পত্রের ব্যবসা করত। দু-এক পয়সা দিয়ে বাচ্চাদের বশীভূত করে বৃদ্ধ পুরনো জিনিষপত্র সংগ্রহ করত। একদিন বাড়ী থেকে কোনো একটা জিনিষ নিয়ে বৃদ্ধকে দেবার পর শঙ্কিত মনে ফিরে আসবার সময় দেখলেন, সরু অন্ধকার গলির দরজাতে ছিটকিনি দেওয়া; ছিটকিনিতে তাঁর হাত পৌঁছয় না। এমনি সময় গলির অন্যদিক থেকে একটা কুকুর গর্জন করে উঠল, ভয়ে তাঁর প্রায় মূর্ছা যাবার উপক্রম। ......ঘটনাটা বিবৃত করতে গিয়ে বত্রিশ বছর বয়সেও তাঁর সারা দেহে ভয়ের উপসর্গ দেখা দিল। এই ঘটনাটি মনে আসার পর থেকে আতঙ্কের আবেশ অনেকটা দূর হল।

এখানে ঘটনাটি বিষঙ্গিত নয়, অবদমিত। অন্যায় ও অপরাধবোধের সঙ্গে জড়িত বলেই স্মৃতির কোঠা থেকে বিলুপ্ত।

অন্য একটি ঘটনা। পঞ্চান্ন বছরের এক ভদ্রলোক বাল্যকাল থেকে এক অদ্ভুত আতঙ্ক রোগে ভুগছেন: তার ভয় পেছন থেকে কেউ এসে তাঁকে আক্রমণ করবে। চলবার সময় মুহূর্মুহু পিছনে ফিরে তাকাতে হয়; ঘরে বসবার সময় দেওয়ালের দিকে পিঠ ফিরে বসেন। এই সময় একবার কার্য উপলক্ষে বাল্যকাল যে শহরটিতে কাটিয়েছিলেন, সেই শহরে তাঁকে আসতে হয়। এক বৃদ্ধ মুদি গল্প প্রসঙ্গে তাঁকে জানায় যে শৈশবে তার দোকানের সামনে দিয়ে যাবার সময় তিনি এদিক-ওদিক তাকিয়ে একমুঠো মটরশুঁটি তুলে নিয়ে পকেটস্থ করতেন। একদিন মুদি একটা ড্রামের পেছনে আত্মগোপন করেছিল তাঁকে হাতেনাতে ধরার জন্য। যেই সে মটরশুঁটিতে হাত দেবে, অমনি মুদি পেছন দিক থেকে গিয়ে তার হাত চেপে ধরল; ভয়ে সে চীৎকার করে ওঠে এবং জ্ঞান হারিয়ে রাস্তায় পড়ে যায়।

ভদ্রলোকের ঘটনাটি মনে এল। কিছুদিনের মধ্যে পেছন থেকে আক্রান্ত হবার ভয় দূর হয়ে গেল।

এই দুটি কাহিনীর মধ্যে লিবিডোতত্ত্বের ছোঁয়াচ নেই। ইয়ুং-এর কেসের মত জটিলতাও নেই। পাভলভীয় শরীরবৃত্তিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই ধরনের কেসগুলো আমরা অন্যদিক দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

আজকের সমীক্ষকরাও ভুলে যাওয়া ঘটনা কিম্বা অবদমিত কামেচ্ছার সন্ধানে অনেক সময় ব্যয় করে থাকেন। ফ্রয়েডীয় লিবিডোতত্ত্বের সঙ্গে এক্‌জিসটেন-শিয়াল তত্ত্বের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা আধুনিক মনঃসমীক্ষা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু ভয়ের সামাজিক অস্তিত্ব নিয়ে, সমাজের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ নিয়ে এঁরা আশানুরূপ উৎসাহ দেখিয়েছেন বলে মনে হয় না। এরিক ফ্রম, কারেন হর্নি প্রমুখ নয়া ফ্রয়েডিয়ানরা অবশ্য সামাজিক 'ট্রমা' সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন, যন্ত্রযুগের বিভীষিকা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন, আন্তর্মানবিক সম্পর্কের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার প্রকোপ দেখে হতাশ হয়েছেন। কিন্তু ভয়ের নিরসন সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে 'ইষ্টার্ন মিষ্টিক' অথবা 'জেন-বুদ্ধিজম'-এর শরণাপন্ন হয়েছেন। বিশেষ ধরনের সমাজব্যবস্থা যে ভয়ের জনক সেই সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের কোনো ইঙ্গিত তাঁরা স্পষ্টভাবে কোথাও দিয়েছেন বলে মনে হয় না। আমরা বর্তমানে এসব জটিল আলোচনার মধ্যে যাব না। শুধুমাত্র ভয়ের সামাজিক কারণগুলো অতি সংক্ষেপে নির্ণয় করবার চেষ্টা করব।

নিউরোটিক ভয় রজ্জুকে সর্পভ্রম করার মত ব্যাপার নয়। সাপ নয় এটা রজ্জু এটা বুঝতে পারলেই ভয় চলে যায়; কিন্তু নিউরোটিক ভয় অত সহজে যেতে চায় না। ভয়ের কারণ নেই তবু নিউরোটিকরা ভয় পাচ্ছে: কেন? শৈশব ইতিহাসের সঙ্গে ভয়ের সম্পর্ক রয়েছে নিশ্চয়ই; বস্তুত যে সমাজে নিউরোটিক বড় হয়েছে, শিক্ষা পেয়েছে, সেই সমাজের মধ্যেই রয়েছে ভয়ের আসল কারণ। তা হলে, ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব বা ব্যক্তিগত ঘাত-প্রতিঘাতের ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করা কোনো মতেই উচিত নয়। একথা ঠিক নয় যে ভয়ের কারণ শুধু রোগীর নির্জ্ঞানের গভীরে, তার অবদমিত কামেচ্ছার মধ্যে, তার বিষয়ীমুখীন অভিব্যক্তির মধ্যে। ভয় সমাজে, ভয় আন্তর্মানবিক সম্পর্কের মধ্যে, ভয় ব্যক্তি ও সমষ্টির সম্পর্ক নির্ধারণের ত্রুটির মধ্যে।

ব্যক্তি-মালিকানাভিত্তিক সমাজে আমরা সকলেই অল্প-বিস্তর স্বার্থপর ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক হতে বাধ্য। আমার স্বার্থ ও অন্যের স্বার্থের সংঘর্ষের ফলে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণীত ও নির্ধারিত। আমি এই প্রতিযোগিতামূলক সমাজে টিকে থাকতে চাই, বড় হতে চাই। অন্য সকলেও তাই চায়। এ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, বন্ধু-ভ্রাতা ইত্যাদি সব সম্পর্কের মধ্যেই

প্রতিযোগিতা ও ঈর্ষা প্রকাশ পেতে বাধ্য। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চয়তা, বর্তমান সম্পর্কে নিরাপত্তা যেখানে নেই ; সেখানে ব্যক্তিমনে উদ্বেগ, অশান্তি ও ভয় থাকা স্বাভাবিক। আমরা টুকরো, খণ্ডিত মানুষ হিসেবে নিজেকে মনে করি, কাজেই ভয় পাই। আমরা সম্মান প্রতিপত্তি অর্থ সন্ধানে সারা দিনরাত ব্যস্ত, কাজেই হীনমন্যতায় ভুগছি। প্রতিযোগিতামূলক সমাজের যত উঁচুতেই উঠি না কেন, আমার থেকে শক্তিশালী, প্রতিপত্তিশালী মানুষের দেখা পাবই, এবং তাকে ভয় করব এবং হিংসা করব। তা ছাড়া, সমাজের যেখানে উঠেছি সেখান থেকে পদস্খলনের ভয় ত আছেই। নিউরোটিকের সঙ্গে সাধারণ সুস্থ মানুষের পার্থক্য এই যে, নিউরোটিক দলবদ্ধভাবে কাজ করতে শেখেনি, ব্যক্তি ও সমষ্টির সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারেনি। সাধারণ সুস্থ মানুষ ধ্বংস ও প্রতিযোগিতামূলক প্রবৃত্তির সঙ্গেই শুধু পরিচিত নয় ; সৃজনমূলক সহযোগিতা-ভিত্তিক প্রবৃত্তির সঙ্গেও পরিচিত। সুস্থ মানুষ এই ধরনের 'গ্রুপ এ্যাকৃটিভিটি'র মধ্যে জীবনের অর্থ খুঁজে পায় আর নিউরোটিক প্রায়ই ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে অকৃতকার্য হয়। মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে নিউরোটিকরা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, মানুষকে ভয় পায়,—অনেক সময় অকারণে। সেই ভয়ই প্রতিফলিত হয় হৃদ্‌যন্ত্রে, ফুসফুসে এবং অন্যান্য অনেক আন্তরতন্ত্রে।

সুস্থ মানুষও মাঝে মাঝে অযৌক্তিক ভাবে ভয় পায়। কিন্তু নিউরোটিকের ভয় তার চৈতন্যকে প্রায়শ আচ্ছন্ন করে রাখে, ভয়ের পিছনে বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তি থাকে না, পরিবেশের বিশ্লেষণে অনেক সময়েই ভুল করে এবং তাকে অপাত্রে ন্যস্ত করে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

তা বলে নিউরোটিককে অসামাজিক বা সমাজবিদ্বেষী অপরাধী বলা ঠিক হবে না। ভয় ও সন্দেহ নিউরোটিককে অসুখী করে, ভয় সন্দেহ থেকে সে মুক্ত হতে চায় ; মানুষকে ভালবাসতে চায়, মানুষকে বিশ্বাস করতে চায়। ভয়, সন্দেহ, ঘৃণা তাকে সমাজবিদ্বেষী ক্রিয়াকলাপে কদাচ আকৃষ্ট করে। সমাজ বিদ্বেষীমূলক অপরাধ এদের দ্বারা খুব কমই অনুষ্ঠিত হয়। আসলে এরা সমাজের দ্বন্দ্ববিরোধের তাৎপর্য বুঝতে পারে না। নিজের অসাফল্যের জন্য, হয় নিজেকে কিংবা অপরকে দায়া মনে করে। কাজেই সন্দেহ অবিশ্বাস কাটিয়ে বিশ্বাস ভালবাসা এদের মনে সহজে দানা বেঁধে উঠতে পারে না। শারীরবৃত্তিক ব্যাখ্যার সময়ে দেখা যাবে যে মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্থানে উত্তেজনার আধিক্যের জন্য এরা বিশেষ ধরনের অনুভূতির প্রাবল্যে কষ্ট পায়। কোনো নিউরোসিসের রোগীকে যদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার জীবন-ইতিহাস জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, সে মানুষের কাছ থেকে দুর্ব্যবহার ও ভাল ব্যবহার প্রায় সমমাত্রাতেই

পেয়েছে। অথচ দুর্ব্যবহারের ঘটনাগুলো মনে করে রেখেছে; ভাল ব্যবহারের ঘটনাগুলো প্রায়শ ভুলে গেছে। কারণ, তার শৈশব থেকে সংগঠিত ব্যক্তিগত ধ্যানধারণার সঙ্গে দুর্ব্যবহারের ঘটনাগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ। মানুষ ও সমাজ সম্পর্কিত আশৈশব প্রতিপালিত অভিজ্ঞতা প্রক্ষোভ সমন্বিত হয়ে এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে চেতনার বিকারকে, আতঙ্কের আবেশকে দূর করা যাচ্ছে না। বহির্বাস্তবের বিশ্লেষণ তার প্রক্ষোভসমন্বিত আবেশকে প্রভাবিত করতে পারছে না। কারণ কি? মস্তিষ্কের এক বিশেষ অবস্থা আবেশ যুক্তি-বুদ্ধিকে দূরে ঠেকিয়ে রাখছে।

এইবার বস্তুবাদসম্মত ব্যাখ্যামূলক সাইকোথেরাপি সম্পর্কে দু'এক কথা বলা দরকার।

ব্যাখ্যামূলক সাইকোথেরাপির কোন বাঁধা সড়ক নেই, কোনো ফর্মুলা বা নির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই। ফ্রয়েডিয়ানদের অবাধ-অনুষঙ্গ, ইয়ুংপন্থীদের শব্দ-অনুষঙ্গ বা স্বপ্ন-বিশ্লেষণ নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধাধরা পথে চলে। সেইরকম কোনো পূর্বনির্দিষ্ট ছকের মধ্যে এই চিকিৎসাকে ফেলা যায় না। ব্যক্তিকে 'ইনডিভিজুয়াল' মনে করেও ব্যাখ্যামূলক সাইকোথেরাপিতে ব্যক্তিকে পুরোপুরি সামাজিক মনে করা হয়। এক জায়গায় তার সঙ্গে সমাজের আরো অনেকের মিল; এই মিল বা সাধারণ সামাজিক মানসিকতা ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে কিন্তু পিষ্ট করে না। রোগীর শ্রেণী-আনুগত্য, সামাজিক অবস্থান, সমাজ ও দুনিয়া সম্পর্কে ধারণা, চিকিৎসকের পক্ষে অবশ্য জ্ঞাতব্য। তার মস্তিষ্কের টাইপ সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা না থাকলে ওষুধ নির্বাচনে বিশৃঙ্খলা ঘটতে পারে; অন্তত ওষুধের মাত্রা নির্ণয়ের দিক থেকে উত্তেজনা-নিস্তেজনার পরিমাণ বিচারের বিশেষ প্রয়োজন আছে। রোগীদের কাহিনী পড়ে পাঠকরা যেন না মনে করেন যে এই প্রতিযোগিতা-মূলক ধ্বংসাত্মক সমাজে সকলেই বুঝি নিউরোটিক হতে বাধ্য; কোনো কোনো মনস্তাত্ত্বিক এই ধরনের মতবাদ প্রচার করেও থাকেন। সমাজই রুগ্ন, কাজেই মানুষও রুগ্ন হতে বাধ্য; এ ধারণা ভ্রান্ত ও আপত্তিজনক। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য আগেই জানানো হয়েছে। খুবই অস্বাস্থ্যকর সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, টলষ্টয়, লেনিন, রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া গেছে। আজকের রুগ্ন সমাজেও বহু সুস্থ সংগ্রামী মানুষ রয়েছেন যাঁরা সামাজিক মঙ্গল ও মানুষের কল্যাণের জন্য সর্বস্ব পণ করে লড়াই-এ নেমেছেন। সমাজের মধ্যে বিরোধ-দ্বন্দ্ব, সুস্থতা-অসুস্থতা, ভালমন্দ দুই দিকই রয়েছে। যাঁর এই অভিজ্ঞতা হয়েছে তার পক্ষে নানারকম ঝড়ঝাপটা সত্ত্বেও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখা সম্ভব। সাইকোথেরাপির প্রধান উদ্দেশ্য জ্ঞানকে সম্প্রসারিত করা, দৃষ্টিভঙ্গীকে বৈজ্ঞানিক করা। বিশ্লেষণী শক্তিকে তীক্ষ্ণ

করে বিচারবুদ্ধি যুক্তিকে জাগিয়ে তোলা। তা বলে বুদ্ধি বা বিচার ক্ষমতা থাকলে নিউরোসিসের সম্ভাবনা নেই, এ ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাও মানসিক-রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন। আবার 'গ্রুপ এ্যাকটিভিটি'র পক্ষে আমার পক্ষপাতিত্ব দেখে কেউ যেন এ ধারণা পোষণ না করেন যে যারা দলবেঁধে কাজকর্ম করে, তারা বোধহয় কোনোদিনই অসুস্থ হয় না। সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে বহুরকমের মানসিক রোগ দেখা যায়। উপরতলার নেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, নেতৃত্ব বজায় রাখা, ইত্যাদি কারণের জন্য সাইকোসোমাটিক বিশৃঙ্খলার খুবই প্রাদুর্ভাব। রক্তচাপের ভয় নয়, সত্যিকারের হাই ব্লাডপ্রেসার, কোলাইটিস, পেপ্‌টিক আলসার—ইত্যাদি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বড়কর্তাদের রোগ নেতাদের মধ্যেও বিরল নয়।

সাইকোথেরাপিতে চিকিৎসক নিরপেক্ষ থাকেন না। অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতির চিকিৎসকদের মত তাঁরা নিরপেক্ষ থাকা প্রয়োজনও মনে করেন না, কিন্তু তা বলে প্রত্যেক রোগীকে বিশেষ কোনো মতবাদে দীক্ষিত করতে তাঁরা চান না। উপসর্গের পার্থক্য, রোগীর শিক্ষাদীক্ষা, ধ্যান-ধারণা, ব্যাখ্যাগ্রহণ ক্ষমতা ইত্যাদি বিচার-বিবেচনা করে ব্যাখ্যামূলক সাইকোথেরাপিকে ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী করে তোলা হয়। সব রোগীর পক্ষে আবার ব্যাখ্যামূলক চিকিৎসা উপযুক্ত নয়।

সবরকম মানসিক চিকিৎসার ক্ষেত্রেই চিকিৎসক এবং রোগীর পারস্পরিক সম্পর্ক চিকিৎসার ফলাফলকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এই সম্পর্ক গড়ে উঠতে বেশী সময় লাগে না। ফ্রয়েডিয়ানরা এই সম্পর্কের উপর প্রয়োজনের অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। যদিও এ কথা ঠিক যে. চিকিৎসক-রোগীর সম্পর্ক সুস্থ ও স্বাভাবিক হলে চিকিৎসার সুফল লাভের সম্ভাবনা থাকে বেশী।

আবেশের শারীরবৃত্ত ও বিকারতত্ত্ব নিয়ে পাভলভের ল্যাবরেটরীতে কাজ হয়েছিল। আবেশ (obsession)-এর বস্তুবাদী ব্যাখ্যা প্রারম্ভেই নিবেদন করছি।

আতঙ্কের আবেশ বা অন্য যে কোনো আবেশের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে গেলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে মানুষের চিন্তা-ভাবনা, কার্যকলাপ বুঝি যুক্তিবুদ্ধির প্রভাবমুক্ত। বুঝতে পারছি অসুখ নেই, তবু ভয় থেকে মুক্ত হতে পারছি না কেন? জানি ল্যাম্পপোষ্টটা ছুঁয়ে যাওয়া অর্থহীন, তবু না ছুঁয়ে পারি না। কেন? তাহলে নিশ্চয়ই আমার ভাবনাচিন্তা, ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রক অন্তরের কোনো অদৃশ্য শক্তি যার ওপর আমার কোনো এক্তিয়ার নেই। অনেক রোগী এই

ধরনের প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে আরো বেশী আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন অথবা দৈবশক্তি ও রহস্যময়তার ধারণায় আচ্ছন্ন হয়ে রোগমুক্তি সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েন। বস্তুবাদীদের প্রতিফলনতত্ত্ব অনুযায়ী সব রকমের মানসিক ক্রিয়াকলাপ মস্তিষ্কত্বকের উপর বহির্বাস্তবের প্রতিক্রিয়া থেকে ঘটছে, সবরকমের বিষয়ীমুখীন ধ্যানধারণা বাইরের জগতের ঘাত-প্রতিঘাত থেকে উদ্ভূত হচ্ছে। আবেশগ্রস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে এ তত্ত্ব কি মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে না? রজ্জুকে সর্প মনে করার মধ্যে অনেক সময় ভ্রান্তির অবকাশ থাকতে পারে কিন্তু রজ্জুকে রজ্জু মনে করা সত্ত্বেও যদি রজ্জু দেখে সর্পভীতি জাগে তাহলে এই আবেশিক ভ্রান্তিকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব? বহির্বাস্তব সঠিকভাবে মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হচ্ছে না, শুধু এই বললেই ব্যাপারটা ঠিকমত বোধগম্য হবে না। ব্যক্তির অভিজ্ঞতার অপ্রতুলতা, বহির্বাস্তকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করার অক্ষমতা আবেশিক ভ্রান্তি ঘটাতে পারে। আবার প্রক্ষোভজনিত কারণেও ভ্রান্তি ঘটতে পারে। একটা বিশেষ বাস্তব অবস্থায় আতঙ্কের সঞ্চার হয়েছিল, পরিবেশের সেই অবস্থায় বাস্তবকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা লুপ্ত হয়েছিল। পরবর্তীকালে পরিবেশের এই বিশেষ অবস্থা প্রক্ষোভ সঞ্চার করে বিশ্লেষণী ক্ষমতাকে নিষ্ক্রিয় করে তুলতে পারে। বস্তুবাদীরা এইভাবে প্রতিফলনতত্ত্বকে প্রয়োগ করে আবেশের ব্যাখ্যা করতে পারেন। রহস্যবাদ বা অজ্ঞেয় দৈবশক্তির বা নির্জ্ঞানতত্ত্বের আশ্রয় না নিয়েও আতঙ্কের আবেশ সম্বন্ধে মনস্তত্ত্বসম্মত ধারণায় আসা সম্ভব। মনে রাখা দরকার যে, প্রতিফলনতত্ত্বের সমর্থকরা কখনও মনে করেন না যে প্রতিফলন একটি নিষ্ক্রিয় ঘটনা। আরশিতে প্রতিবিম্বিত মুখচ্ছবি আর মস্তিষ্কে প্রতিফলিত বহির্বাস্তব এক ধরনের ব্যাপার নয়। মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়া ব্যক্তির পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য বহু শর্তসাপেক্ষ। যে ব্যক্তি ভূত-প্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, তার পক্ষে গভীর রাতে শ্মশানে বসে পক্ষীশাবকের কান্না শুনে মূর্ছা যাওয়া স্বাভাবিক। পক্ষীশাবকের কান্নাকে প্রেতশিশুর কান্না বলে মনে না হলেও পরিবেশের অন্যান্য শর্ত থেকেই ভূতপ্রেতের অবিশ্বাসীর মনেও ভীতির সঞ্চার ঘটতে পারে। সেই ভীতির তরঙ্গ মস্তিষ্কের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে মূর্ছা না ঘটলেও ভয়ে দেহমন সাময়িকভাবে বিকল হয়ে যেতে পারে। আরো মনে রাখা দরকার, মস্তিষ্ককোষ দেহের ভিতরকার যন্ত্রপাতির অবস্থা দ্বারা সাময়িকভাবে অনেকখানি প্রভাবিত হতে পারে। বাইরের ঘটনার সঠিক বিশ্লেষণ এই অবস্থায় কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। মোট কথা, প্রতিফলন ঠিক আলোকচিত্র নয়, ব্যক্তি মস্তিষ্কের বিশেষ অবস্থার দ্বারা প্রতিফলন অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবিত হতে বাধ্য। অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন—'কগনিশন' বা বাস্তবের জ্ঞান কোনো সময়েই কি পুরোপুরি বাস্তবানুগ, অবজেকটিভ নয়? আমরা কি আপেক্ষিক বা আংশিক

জ্ঞানার্জনের মধ্য দিয়েই চিরকাল চলব ? 'এ্যাবসলিউট কগনিশন' লাভের উপায় কি ? আবেশের পাভলভীয় ব্যাখ্যা জানা থাকলে এই সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া হয়তো সহজ হবে।

আবেশগ্রস্তের ইতিহাস (১)

শংকরবাবুর কথা লিখতে গিয়ে মনে পড়ছে, কত কৌশলে, কত সন্তর্পণে তিনি চিকিৎসার কথা পেড়েছিলেন। কতদিন ধরে শুধু তত্ত্বগত আলোচনার স্তরে চিকিৎসককে আটকে রেখেছিলেন, নিজের সমস্যাগুলো কল্পিত কোনো রোগীর সমস্যা বলে আমার কাছে চালাতে চেয়েছিলেন। শংকরবাবু প্রথমদিন ফোনে বললেন, তিনি কতকগুলো মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার মীমাংসা খুঁজছেন, অনেকের সঙ্গে সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু সঠিক মীমাংসার পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

তিনি এলেন নির্ধারিত সময়ে। মার্জিত দোহারা চেহারা, তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টি, বয়স প্রায় পঞ্চাশ। পোষাক-পরিচ্ছদে আভিজাত্যের ছাপ। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন ও একটা সিগারেট হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হয়ে রইলেন। মনে হল, সমস্যাটা মনে মনে সমাধানের চেষ্টা করছেন অথবা কিভাবে আমার কাছে কথাটা তুলবেন, তাই ভাবছেন। সমস্যার অজুহাত নিয়ে যাঁরা আলোচনা করতে আসেন, তাঁরা এদিক-ওদিক কিছুক্ষণ বিচরণ করার পরই ব্যক্তিগত প্রশ্নের অবতারণা করে থাকেন। এ-ক্ষেত্রেও সেইরকমই হবে মনে হল। আধুনিক মনস্তত্ত্বের সমস্যা নিয়ে আমার এখানে বিমূর্ত আলোচনা যে হয় না, এমন নয়। তবে তার জন্য কেউ যেচে মূল্য দিতে চান না। একটু পরেই ভদ্রলোক মুখ খুললেন :

আমার সমস্যা 'মোটিভেশন', মানে প্রেষণা নিয়ে। আমাদের প্রেষণা পুরোপুরি অযৌক্তিক ও বাধ্যকারী মনে করেও আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। আবার নিজের 'মোটিভ' (উদ্দেশ্য) কোনো সময়েই স্পষ্ট হয়ে আমার কাছে ফুটে উঠছে না। কোনো বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতির কথা আমি বলছি না। আমি বলছি আমাদের প্রাত্যহিক চলাফেরা ব্যবহারের কথা। এই ধরুন, সেদিন আপনাকে ফোন করলাম ; করেই মনে হল—কেন ? আপনার কথা বছর দুয়েক আগে এক বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম। তারপর বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম। কেন আপনার কথা সেদিন মনে হল ? কেন সেদিন আপনাকে ফোন করলাম ? আপনি কি আমার সমস্যার উপর কোনো নতুন আলোকপাত করতে পারবেন ? আপনাকে ফোন করা, আপনার এখানে নির্ধারিত সময়ে আসা, আপনার কাছে আমার সমস্যা তুলে ধরা, এগুলো কি আমার সংজ্ঞান মনের অভিলাষ না

আমার নির্জ্ঞানের প্রেষণা? প্রথমে এইটেই ঠিক হোক। আপনার কাছে আসার আসল উদ্দেশ্য কি?—এই কথাগুলো ধীরে ধীরে বলে সিগারেট ধরালেন শংকরবাবু। আমার উত্তরের প্রত্যাশা তিনি করছেন না, আরো কিছু বলার জন্য তৈরী হচ্ছেন। নীরবে সিগারেটটা নিঃশেষ করলেন। তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বলে চললেন:

আমি বিশ্বাস করতে চাই যে যুক্তিহীন এক বাধ্যকারী শক্তি আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। শুধু আমাকে নয়, আমাকে, আপনাকে, দুনিয়ার সকলকে। আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই। রাস্তায় এইমাত্র এক ভিক্ষুক শেষ নিঃশ্বাস ফেলল, পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ছেলেটি রক্তবমি করে মারা গেল, গুপ্ত-ঘাতকের হাতে একজন মানুষ প্রাণ হারাল,—এর দায়দায়িত্ব সমাজের নয়, ব্যক্তির ত' নয়ই। পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ লোক অনাহারে থাকে, এক-চতুর্থাংশের মাথার উপর আস্তানা নেই, ভিয়েতনামে প্রত্যহ খুন হচ্ছে, আরব-ইস্রাইল বিরোধ উস্কানী পেয়ে বেড়ে চলেছে; এতে আমার আপনার কিছু করবার আছে কি? যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগ করবার কোনো মানেই হয় না। আমরা তা করিও না। প্রতিবাদ মিটিং করি, হয়ত কিছু চাঁদাও দিতে পারি আর দিতে পারি সংবাদপত্রে বিবৃতি। একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এর প্রত্যেকটি নির্জ্ঞান প্রণোদিত; উদ্দেশ্যমূলক কিন্তু উদ্দেশ্য আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। উদ্দেশ্য জানা যেত যদি তা হলেই বা কি লাভ হত?

—দেখুন, দর্শনের আলোচনায় আমি অভ্যস্ত নই। এবিষয়ে আমার কোনো জ্ঞান নেই। আপনার সমস্যা মনে হচ্ছে দার্শনিক। আমার সঙ্গে আলোচনায় আপনার কোনো লাভ হবে না।

—না, না সমস্যাটা মনস্তত্ত্বেরই।

সেদিন এবং তারপর আরও তিনটে ছুটির দিনের সকালবেলাটা এভাবেই ভদ্রলোকের বক্তৃতা শুনতে হল; আমি শ্রোতা, তিনি বক্তা। এ্যারিষ্টটল, সক্রেটিস প্লেটো, এ্যাকুইনাস, কাণ্ট, হেগেল, কণাদ, ষড়দর্শন, জেন্‌বুদ্ধবাদ, যুদ্ধ, শান্তি, মার্কস, লেনিন, মাও ইত্যাদি—ঐ তিনদিনে বহুবার উচ্চারিত হতে শুনলাম শংকরবাবুর মুখে।

সপ্তাহ কয়েক পর তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন। বললেন, আজ আলোচনাটা প্রোফেশন্যাল লেভেলে হবে, কাজেই চার্জ নিতে হবে। আমার এক বন্ধুর কথা, কদিন ধরে বলাবলি করেও বলতে ভুলে গেছি, ভেতরের ঘরে চলুন,—বুঝতেই পারছেন আলোচনাটা প্রাইভেট।

এইভাবে পাণ্ডিত্যের প্রাচীর তুলে বন্ধুর বেনামীতে শংকরবাবু ধীরে ধীরে আমার কাছে নিজের কাহিনী পেশ করলেন। কাহিনীতে বিশেষত্ব নেই। আগে

তাঁর স্বনামীতেই কাহিনী বিবৃত করব, পরে ভদ্রলোকের বিশেষ "এ্যাপ্রোচ"-র ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করব।

শংকরবাবু স্ত্রীর সঙ্গে এক ঘরে থাকতে ভয় পাচ্ছেন। প্রথম ভয়ের আবির্ভাব হয়েচিল পাঁচবছর আগে। তখন তাঁরা থাকতেন উত্তর কোলকাতায়, পৈত্রিক বাড়ীতে। বিয়ে হয়েছে প্রায় ২২।২৩ বছর ;—হ্যাঁ। একটি মেয়ে আছে। গত-বছর সে আমেরিকায় চলে গেছে রিসার্চ স্কলারশিপ নিয়ে। সে যাবার পর থেকে ভয়টা আরও বেড়েছে। এখন ওঁরা আছেন লেকপল্লীতে। শংকরবাবু এখন কিছু করেন না। কোনোদিনই রোজগারের চেষ্টা করেননি। সামান্য যা কিছু পৈত্রিক বিষয়-আশয় আছে, তাতেই কোনোরকমে চলে যায়। পুরোপুরি "লিজার ক্লাসের" মানুষ।

কি ধরনের ভয় ? উত্তরে বললেন, ভয় হত্যার। একলা থাকলে আমি ওকে খুন করব, এই ভয়ে আমি অস্থির হয়ে পড়েছি।

প্রথম যেদিন কথাটা মনে এল, সেইদিন থেকেই পড়াশুনো করছি। পড়াশুনোই আমার একমাত্র কাজ ; নেশা পেশা দুইই। অবসেশান-কমপালশান সম্বন্ধে আমার কিছু জ্ঞান আগেই ছিল। এই পাঁচ বছরে সেটা আরও বেড়েছে। যত পড়ছি, ভয় ততই বাড়ছে। এ অসুখ সারবার নয়। আমার মনে হয়, একদিন আমি সত্যিই করুণাকে খুন করে বসব।

জিজ্ঞাসা করলাম, ওঁকে কিছু বলেছেন কি ?

—না, হাজার চেষ্টা করেও বলতে পারিনি। বলিনি কেন ? করুণা যদি মনে করে আমার 'সাবকনসাস' কি 'আনকনসাসে' এই খুনের ইচ্ছা আছে, তাহলে কি উপায় হবে ? ও আমাকে ঘৃণা আর ভয় করতে শুরু করবে। আমার সঙ্গে একলা হলে আতঙ্কে চীৎকার করে উঠবে।

—আপনি কি সত্যি মনে করেন যে, এই হত্যার ইচ্ছা আপনার গোপন মনে লুকিয়ে আছে ?

—যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে ত' মনে হয় অসম্ভব, এ হতেই পারে না। আমি করুণাকে খুবই ভালবাসি। যাকে চরম ঘৃণা করি তাকেও আমি খুন করতে পারি না। জিঘাংসা-প্রবৃত্তি আমার সংজ্ঞানে ত নেই। কিন্তু নির্জ্ঞানে ? যুক্তি দিয়ে বুঝি, অথচ মনের মধ্যে ধরে রাখতে পারি না। কি ট্রাজেডি বলুন ত ! আমার বিপদ ঘটে রাত্রিতে। রাত্রির অন্ধকারে কখন সেই রক্তপিপাসু জানোয়ারটা মনের আগল খুলে বেরিয়ে আসবে—সেই ভয়ে সারা রাত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকি, ঘুমুতে পারি না। এখন আর আমরা এক ঘরে শুই না। করুণাকে অনেক কষ্টে রাজি করিয়েছি। আমি পড়ার ঘরে ডিভানে রাত কাটাই। একটা হোটেলে ঘর নিয়ে রেখেছি দুপুরটা কাটাবার জন্য। রাত্তিরটা কাটে

অস্বাভাবিক একটা তীব্র অনুভূতির মধ্য দিয়ে। ঘুমের ওষুধ খেতে ভয় পাই। ঘুমুতে ভয় পাই, সমনামবুলিষ্ট হয়ে যদি খুন করে বসি! তাই জেগে থাকি। মদ খেতে ভয় পাই ; সেই ঘুমিয়ে পড়ার ভয়। তাই বসে-বসে খালি সিগ্রেট আর সিগ্রেট ...ধরিয়েই যাচ্ছি একটার পর একটা। আর ঘড়ি দেখছি।

শংকরবাবুর বলার মধ্যে গ্রীক ট্রাজেডির নায়কের অসহায়ত্বের ভাব এমন করুণভাবে ফুটে উঠল, যে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম।

—চিকিৎসা? না কোন চিকিৎসাই করা হয়নি বলা চলে। প্রথমত, আমি জানি চিকিৎসাতে কোন ফল নেই ; দ্বিতীয়ত, বন্ধুর সমস্যা বলে যাঁদের কাছে উপদেশ চেয়েছি, তাঁরা সকলেই ট্রাংকুইলিজার খেতে বলেছেন। ট্রাংকুইলিজার খেতে হবে, কোনটা খেতে হবে, কোনটার কি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া একি আপনাদের চেয়ে কম জানি মনে করেছেন? নিজের নির্দেশমত ট্রাংকুইলিজার অনেক খেয়েছি, আর খাই না। না, সাইকো-এ্যানালিসিস করা হয়নি। করা হয়নি ঠিক নয়। শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়নি, বলাই ঠিক।

চিকিৎসা শুরু হতে ভয়ের আদি পর্বের একটা ঘটনা শংকরবাবুর মনে পড়ে গেল। বললেন :—ভাবতে খুবই আশ্চর্য লাগছে। সাত বছর আগে -তখন আমি প্রায় তেতাল্লিশ, ২০/২১ বছরের শুভ্রার সঙ্গে আলাপ হয় বেনারসে। ইউনিভারসিটিতে ফিজিকস্ পড়ে। ভারী প্রাণবন্ত মেয়েটা। স্ত্রীর দূর সম্পর্কের বোন। ওদের বাড়ীতেই আমরা অতিথি। ১০/১২ বছর পরে শুভ্রাকে দেখলাম, ভালো লাগল। পুরুষালি ধরনের হাব ভাব, বেনারসে আসবার আগে চণ্ডীগড়ে থাকত। পাঞ্জাবী মেয়েদের সাজ-পোযাক, মুখে হিন্দী-ইংরাজীর খই ফুটছে ; বাংলা খুব ভাল জানে না। বাস্কেট বল টিমের ক্যাপটেন, সাইকেল রেসে চ্যাম্পিয়ন। ওর কাঠখোট্টা ধরনের ভঙ্গী ও কথাবার্তার জন্যই বোধহয় ওকে ভাল লেগেছিল। বাড়ীর মেয়েরা ঠিক করল তারা চিত্রাঙ্গদা অভিনয় করবে। শুভ্রা সাজবে চিত্রাঙ্গদা। আমাকে করতে হবে তদারকি। কয়েকদিন রিহার্সাল চলার পর আমার মনে হতে লাগল শুভ্রার সঙ্গে চিত্রাঙ্গদার যেন অনেকখানি মিল আছে। শুভ্রা একদিন অনেক লোকের মাঝখানে বলে ফেলল যে শংকর-দাকে অর্জুনের রোলটা দেওয়া হোক ; দিলীপ পারবে না। বয়সের কথা তুলে শুভ্রার প্রস্তাব আমি নাকচ করে দিলাম। আমার স্ত্রীও সুযোগ্য সহ-ধর্মিনীর মত এ ব্যাপারে আমাকে যথাযোগ্য সাহায্য করলেন। অভিনয়ে আমার ভয় ছিল, কোনোদিন ষ্টেজে নামিনি। অভিনয় হয়ে গেল। মোটামুটি সফলই বলা চলে। আমরা কোলকাতায় ফিরে এলাম। ....সত্যিই অবাককাণ্ড। বছর দুই কেটে গেছে, একদিন স্বপ্ন দেখলাম—আমি বনে বন্দুক দিয়ে হরিণ শিকার করতে গেছি। একটা হরিণ মারব বলে বন্দুক তুলেছি, এমন সময়

হরিণটা নির্ভয়ে আমার দিকে মুখ তুলে চাইল ; ও বোধহয় কোনদিন মানুষ দেখেনি, বন্দুক চেনে না। বন্দুক নামিয়ে নিলাম। পেছন থেকে কে যেন বলল, নামালে কেন ? গুলি কর। তাকিয়ে দেখলাম চিত্রাঙ্গদার বেশে শুভ্রা। ঘুম ভাঙার পর দেখি গা দিয়ে গল গল করে ঘাম বেরুচ্ছে। বেড স্থইচ টিপে আলো জাললাম। করুণার মুখের দিকে তাকালাম ; ওর চোখদুটো আধবোঁজা। করুণার একটা হাত আমার বুকের উপর ছিল। হঠাৎ মনে হল হরিণটার চোখ দুটো ঠিক করুণার আধবোঁজা চোখের মতন। আমি কি করুণাকেই গুলি করতে গিয়েছিলাম ? আতঙ্কে সারা শরীর শিউরে উঠল। বিছানা থেকে উঠে পড়লাম। সেই রাত্রে যে ভয় ঢুকলো, সে ভয় এখনও আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি স্বপ্ন ও প্রতীক নিয়ে অনেক পড়েছি, অনেক ভেবেছি। আমি শুভ্রার নির্দেশে স্ত্রীকে খুন করতে চাই,—কোনভাবে স্বপ্নটার সে রকম ব্যাখ্যা করা যায় না। অনেক চেষ্টা করেও আমি নিজের বিরুদ্ধে মামলা খাড়া করতে পারলাম না। শুভ্রাকে ভাল লেগেছিল কিন্তু সে ভাল লাগাকে ভালবাসা বলা যায় না। কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে শুভ্রা এল কেন ? তবে কি নির্জ্ঞানে বাসা বেঁধেছে সে ? আর আমি তাই নির্জ্ঞানের প্রেষণায় স্ত্রী-ঘাতক হতে চাই। যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে যতই নিজেকে বোঝাই ততই যেন বেশী করে ভয় আমাকে পেয়ে বসে। খোঁজ নিয়ে শুনলাম শুভ্রা (আগেও স্ত্রী এই সংবাদ পেয়েছিলেন) বিলেতে গিয়ে একজন পাকিস্তানীকে বিয়ে করেছে। বিলেতে গেছে পড়াশুনা করতে।

কোনোদিন শুভ্রাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে চাইনি। করুণাকে ছাড়া অন্য কোন মেয়েকে আমি এ যাবত ভালবাসিনি।

শংকরবাবুর অনুসন্ধিৎসা, নতুন জ্ঞানলাভের আন্তরিক ইচ্ছা প্রধানত চিকিৎসাকে সাফল্যমণ্ডিত করেছিল। মাস দুয়েক ধরে শংকরবাবু আমার নির্দেশমত বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞান বিষয়ক অনেক কিছু পড়লেন। অন্যদিকে পণ্ডিত হলেও এদিকে ওঁর জ্ঞান বেশ কম ছিল। আমার ঐ বিষয়ে সামান্য জ্ঞানের দরুণ সহজেই ওঁর সঙ্গে র‍্যাপোর্ট তৈরী হল। অবসেশনের মস্তিষ্কবিজ্ঞান জানলেন। এ রোগ সারে না—এই ভুল ধারণা থেকে মুক্ত হলেন। খুব সম্ভব স্বপ্ন সম্বন্ধে ভ্রমাত্মক ধারণা থেকে শংকরবাবুর ভয়ের সূত্রপাত।

সোজাসুজি চিকিৎসার জন্যে আসলেন না কেন ?

এর উত্তরে উনি বললেন, আমি চিকিৎসার মধ্যেও নতুন কিছু শিখতে চেয়েছিলাম। তাই আমার 'এ্যাপ্রোচ' আপনার কাছে অদ্ভুত ঠেকেছিল। অধিকাংশ জায়গায় দেখলাম আমি যা জানি, তাঁরাও তাই জানেন ; কেউ আমার থেকে কম ; কেউ-বা সামান্য বেশী। নতুন কিছু শেখবার নেই। কিন্তু আপনি

আমার অধীত বিদ্যা সম্বন্ধে অজ্ঞ হলেও, নতুন কিছু শেখাতে পারবেন মনে হল, তাই চিকিৎসায় মন বসেছিল।

শংকরবাবুর কাছেও আমি অনেক কিছু শিখেছি। অনেক রোগীর কাছ থেকেই, মন দিয়ে তার কথা শুনলে, নতুন কিছু জানা যায়।

চিন্তারোগ (Psychasthenia)

সঞ্জীব সেনের অফিসের ডাক্তার আমাকে ফোনে এবং চিঠিতে রোগের আংশিক ইতিহাস জানিয়েছিলেন। সঞ্জীব সেন স্বয়ং এসে পুরোপুরি ব্যাপারটা জানালেন :

আমি এ কাজের উপযুক্ত নই, কাজটা আমার পক্ষে কঠিন। আমার মনে হয়, আমার মাথার মধ্যে কিছু নেই। কোনো কর্মচারী আমার চেম্বারে ঢুকলে আমি ঘাবড়ে যাই। তার সঙ্গে কিভাবে কথা বলব বুঝতে পারি না। 'আপনি' না 'তুমি', 'বস' না 'বসুন'—কি বলে কথা আরম্ভ করব, ধরতে পারি না। অন্য সবাই কেমন দুমিনিটের মধ্যে ফাইলের পাতা উল্টে, ভাবনা-চিন্তা না করে নোট লিখে ফেলে ; আমি পারি না। কেন পারি না ? ভয় হয়, ভুল হবে। টেবিলের ওপর ফাইল জমতে থাকে। ষ্টেনোকে ডেকে পাঠাই চিঠি ডিকৃটেট করব বলে। সে এসে দাঁড়িয়ে থাকে, আমি এক লাইনও ডিকৃটেট্ করতে পারি না। মুচকি হেসে ষ্টেনো চলে যায়। আমার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা কি আমি জানি। বড় কর্তাকে আর ডাক্তারবাবুকে খুলে বলেছি। খুলে বলেছি বলা ঠিক হবে না, মানে—ঠিকমত বলতে পারিনি। আমার ক্ষমতা কম, বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের অভাব ; আমার মত লোকের পক্ষে কোনো দায়িত্বপূর্ণ চাকরীতে থাকা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। আমি আমার পুরনো পোষ্টে ফিরে যেতে চাই, এ প্রমোশন আমার সহ্য হচ্ছে না। আমি যে কোনো সময় মারাত্মক রকমের ভুল করে বসতে পারি, যার ফলে অনেকের ক্ষতি হয়ে যাবে। আমার পকেটে দুখানা চিঠি সব সময়ে থাকে ; একখানা 'রেজিগনেশন-লেটার', অন্যখানা পুরনো পোষ্টে ফিরে যাবার আবেদন পত্র। কোন্‌টা যে বড় কর্তাকে দেব, বুঝতে পারি না। আসলে কোনো কিছুই আমি আজকাল বুঝতে পারি না। কি করা উচিত, ঠিক করতে পারি না। কোনো ব্যাপারেই কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারি না।

সঞ্জীব সেনের চেহারায় বিশেষত্ব আছে। রোগা, লম্বা, গালের হাড় বের করা ; মাথাটা দেহের তুলনায় অনেকটা বড়। কিন্তু চোখ দুটো উজ্জ্বল ও বুদ্ধিদীপ্ত।

অফিসের রিপোর্ট থেকে জানলাম সঞ্জীব সেনের এই অবস্থা খুব বেশীদিনের নয়। মাস-আষ্টেক আগে তাঁর প্রমোশন হয়েছে। তখন থেকে এই ধরনের মানসিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। এর আগে তিনি ভালোভাবেই কাজকর্ম করতেন। কোনো দিনই তিনি হৈ-চৈ, মেলামেশা, গল্পগুজবের মধ্যে থাকতেন না। নিজের ফাইল পত্র নিয়ে নিজের মনে কাজ করে যেতেন, অবসর সময়ে বই খুলে বসতেন। নাটক, নভেল, সিনেমা-থিয়েটারে তাঁর কোনো দিনই রুচি ছিল না। দর্শনশাস্ত্রের এম-এ। রাজনীতি ও দর্শন—এই নিয়েই ছিল তাঁর সবকিছু পড়াশুনো। ছুটির দিনগুলো লাইব্রেরীতে কাটত। এখন বয়স পঁয়ত্রিশ; অবিবাহিত। খুড়তুতো ভাইয়ের পরিবারে একটা ঘরে একলা থাকতেন; অনেকটা পেয়িং গেষ্টের মত। পরিচিত মহলে 'বুক-ওয়ার্ম' বলে দুর্নাম ছিল। দু-চারজন সহপাঠি, যারা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের হোমরা-চোমরা অধ্যাপক, তারাই শুধু ওঁর কাছে মাঝে মাঝে এসে অতি-আধুনিক রাজনীতিক দর্শন নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা করতেন, নতুন বইয়ের সন্ধান নিতেন। এক বন্ধু ওঁর সম্বন্ধে আরো কিছু বললেন: ওর একটা মস্ত বড় দোষ ছিল, যার জন্যে পরীক্ষায় বা জীবনে ও সফল হতে পারল না। কোন মতটা ঠিক, কোনটা আঁকড়ে ধরলে সত্যে পৌঁছুনো যাবে—এই নিয়েই ছিল ওর চিন্তা। শেষ পর্যন্ত কোনো কিছুই ও আঁকড়ে ধরেনি, সত্যও খুঁজে পায়নি। কোনো কিছুই বিশ্বাস করে না, কোনো কিছুই মেনে নিতে পারে না। দিনকতক একটা কলেজে চাকরী করেছে; ছাত্ররা ওকে পছন্দ করল না। কেন না, অন্যকে 'ইমপ্রেস' করার ক্ষমতা ওর নেই। নিজেও কোনো কিছুতে 'ইমপ্রেসড' হয়নি কোনোদিন। কলেজ ছেড়ে অফিসে ঢুকল, বেশ চলছিল। 'কেরিয়ার' তৈরীর তাড়া নেই, উচ্চাকাঙ্ক্ষার তাগিদ নেই, শুধু পড়া আর জানা। এমন কিছু জানতে চায়, যা জানলে সন্দেহ চলে যাবে মনে শান্তি আসবে। ভেবেছিল দর্শন যা দিতে পারেনি, ধর্মশাস্ত্রে যার সন্ধান মেলেনি, বোধহয় বিজ্ঞান তা দিতে পারবে। কিন্তু আইনষ্টাইন, প্ল্যাঙ্ক, হাইসেনবার্গ নাকি ওর সন্দেহ আরো বাড়িয়ে দিল।

সঞ্জীববাবুর কাছে তাঁর শৈশবের ইতিহাস জানা গেল না। সঞ্জীববাবু প্রথমটায় কোনো কিছুই বলতে চাইলেন না, বা পারলেন না। অসহায়ের মত শুধু অনুরোধ করতে লাগলেন তাঁকে ছেড়ে দিতে, চিকিৎসায় তাঁর কিছু ফল হবে না। আবার নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়ে আমার কাছে যাতায়াতও ছাড়লেন না।

সঞ্জীব সেন দার্শনিক টাইপের মস্তিষ্কের অধিকারী; কিন্তু সহ্যশক্তি কম,—দুর্বল, নিস্তেজনাপ্রবণ। ভুগছেন সাইকাস্থেনিয়া রোগে। রূপরস-গন্ধে ভরা পৃথিবী সঞ্জীব সেনদের কাছে অর্থহীন। এরা সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে,

সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। দায়-দায়িত্ব নেই, চিন্তা ভাবনা নেই, সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজন নেই, নির্দেশ দেবার দরকার নেই, এমনি ধারা কাজকর্ম পেলে এরা কোনো মতে নিজেদের চালিয়ে নিতে পারে। অন্যথায় বিপদ ঘটে। যেমন সঞ্জীববাবুর ঘটেছে।

তবে সাধারণত অন্য কোনো মানসিক সঙ্কটের মধ্যে না পড়লে সঞ্জীববাবুর মত অতখানি বিপর্যস্ত হতে বড় বেশি কাউকে দেখা যায় না। সঞ্জীববাবুর অসুস্থতার মূলে অন্য কোনো মানসিক আঘাত আছে বলে মনে হল। কয়েক দিনের মধ্যেই ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে জানা গেল।

সঞ্জীব সেনের সঙ্গে আলাপ আলোচনার অনেক সূত্র আমার হাতে এল। কয়েকদিনের চেষ্টার ফলে তাঁর বিশ্বাসও খানিকটা বাড়ল। আলোচনা প্রসঙ্গে সাধন-ভজন, তন্ত্রমন্ত্র, সমাজনীতি, রাজনীতি, সন্দেহ, বিশ্বাস ইত্যাদি নিয়ে অনেক কথা হল। খুব জোর দিয়ে কোনো কথা বলা সঞ্জীবের স্বভাব নয়। খুব ধীরে ধীরে এবং অল্প কথায় তিনি যা বললেন, তা থেকে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিধি অনুমান করা গেল।

জীবনের অর্থ কি? মানুষ কি নিয়ে বা কিসের জন্য বাঁচে, কাজ করে, নতুন নতুন সৃষ্টি করে? সাধন, ভজনের আসল তাৎপর্য কি? মনকে এক কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করে শান্তি ও শক্তি পাওয়া? সমাধি ত একরকমের আত্ম-সম্মোহন। সাধারণ মানুষ সাধন-ভজন, আত্মসম্মোহন না করেই বাঁচার আনন্দ পায় কি করে? ভালবেসে? নিজেকে অন্যের মধ্যে মিশিয়ে দিয়ে? এইরকম নানা প্রশ্ন তুলতে লাগলেন। আমি হাল ধরে রইলাম, তাঁর আত্মজিজ্ঞাসার স্রোত যাতে সন্দেহ-অবিশ্বাস-অনিশ্চয়তার খাতে না গিয়ে বিশ্বাস-আনন্দের জীবনাশ্রয়ী পথে প্রবাহিত হয়, সেই চেষ্টা করতে লাগলাম। এইভাবে ক্রমশ বিবাহ ও নারী পুরুষের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে সঞ্জীববাবু আত্মপ্রকাশ করলেন ঃ

—একটি মেয়েকে ভালবেসেছিলাম। রীতা খুব ভাল মেয়ে, আমার কাকিমার ভাইঝি। ওকে আমি কিছুদিন পরীক্ষার আগে 'কোচ' করেছিলাম। আমি কোনোদিন ভালবাসা জানাতে পারিনি। সে ক্ষমতা আমার নেই। রীতা আমাকে ভালবেসেছিল কি? মনে হয় বাসেনি। কেননা আমার মাথাটা দেহের তুলনায় বড়। ছোট বেলায় সবাই আমাকে এই নিয়ে খ্যাপাতো। বলত, ঝাঁটার কাঠির ওপর গোল আলু। ওকে বোধ হয় কাকীমা রাজী করিয়েছিলেন, কিন্তু আমি রাজী হতে পারলাম না। কোনো মেয়ে আমাকে ভালবাসতে পারবে না, আমি জানি। তাছাড়া ওর একটা দোষও ছিল। তাই বিয়ে করতে সাহস হল না। ও অসাধারণ সুন্দরী। আপনি অবাক হয়ে গেলেন? অবাক হওয়ারই কথা। সুন্দরী হওয়া কি অপরাধ? আমার মা নাকি খুব সুন্দরী

ছিলেন। সুন্দরী হয়ে তিনি অপরাধ করেছিলেন। নিজে অসুখী ছিলেন, বাবাকে অসুখী করেছিলেন। তাই রীতার সঙ্গে বিয়েতে মত দিতে পারলাম না। ভালবাসা শান্তি আনে, সন্দেহ দূর করে। আবার ভালবাসা থেকে সন্দেহ জন্মায়। বাবার ভালবাসা তাঁর মনে সন্দেহ এনেছিল, তাঁকে অসুখী করেছিল। কিন্তু বাবা কি ভালবেসেছিলেন? মনে হয় না। তিনি বোধ হয় আমার মত হীনমন্যতায় ভুগতেন। তাই ভালবাসতে পারেন নি। বাবা আসলে ছিলেন সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী। সুন্দরী নারী তাঁর সাধন-ভজনের পথে বাধা। আমার মনে হয় আমি ভালবাসা পেলে, ভালবাসতে পারলে হীনমন্যতা কাটিয়ে উঠতে পারতাম। কিন্তু ভালবাসতে ভয় হয় -- যদি ভালবাসা থেকে সন্দেহ আসে।

এরপর ভদ্রলোক আমার কাছে আসা বন্ধ করলেন। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে কোথায় যেন চলে গেলেন। মনে হয় না তিনি ভাল হয়েছেন।

হিংসা রোগ (আলোচনা)

শীতলবাবু আমার অনেককালের পুরনো বন্ধু। মাঝে মাঝে দেখা হয়ে থাকে এবং দেখা হলেই আমরা নানারকমের আলাপ-আলোচনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিই। জানতাম না যে এবার শীতলবাবু নিজের প্রয়োজনে আমার কাছে এসেছেন। তাঁর মনে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। কোনোটারই সমাধান করতে পারছেন না, পুরনো জ্ঞান-বিদ্যা কাজে লাগছে না। পেশা ছিল সাংবাদিকতা, বর্তমানে অবসর নিয়েছেন। বয়স ষাটের কাছাকাছি। রক্তচাপ ও রক্তে চিনির পরিমাণ বেশী হওয়ার দরুণ কর্মক্ষমতা কমে গেছে, কিন্তু চিন্তাক্ষমতা বোধহয় বেড়েছে। সবকিছু নিয়েই চিন্তা করা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। এ চিন্তা যেন কূলকিনারাহীন সমুদ্রবিশেষ। কোনো প্রশ্নের উত্তর মিলছে না চিন্তা করে, কোনো সমস্যার সমাধান হচ্ছে না জ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োগ করে। ঘুম ও হজমের গোলমাল হচ্ছে। ঠিক চিকিৎসার জন্য আসেননি, তবে বর্তমান পরিস্থিতিটা বুঝতে পারলে বোধহয় তাঁর মনের অস্থিরতা কমবে, শরীরটাও হাল্কা হবে, এই তাঁর বিশ্বাস। তিনিই কথাটা তুললেন। প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, চিন্তা ইত্যাদি মনের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করা তাঁর পক্ষে অত্যাবশ্যক। তাহলেই হয়ত আজকের সমাজ ও মানুষকে বুঝতে পারবেন। দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙবে না।

—অতি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মানুষে মানুষে লড়াই বেঁধে যাচ্ছে। মত্ত পশুর মত মানুষ মানুষের টুঁটি কামড়ে ধরছে। পূজোর চাঁদা দিতে না পারার জন্য প্রাণ দিতে হচ্ছে। ছোরাছুরি ত' চলছেই, তার উপর আবার নতুন আমদানী

হয়েছে বোমা-বন্দুক। শব্দে কানে তালা ধরবার উপক্রম। পনেরো বছরের ছেলে অবলীলাক্রমে যুদ্ধ-চীৎকার করে পকেট থেকে বোমা নিয়ে পড়শীর গায়ে ছুঁড়ে মারছে। তাদের কথা আমি বুঝতে পারছি না, আমার কথাও তাদের বোঝাতে পারছি না। হিংসাপ্রবৃত্তি দুর্দম হয়ে উঠছে। প্রক্ষোভের তাড়নায় যুক্তি-বুদ্ধি দেশ থেকে পালিয়েছে। আপনারা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা রাখতে বলছেন। কি করে রাখা যায় আমি ত' ছাই, কিছুই বুঝতে পারছি না।

এই বলে তাঁর আগমনের আসল কারণ জানালেন। কয়েকদিন হল বোমা-পটকার শব্দ শুনলেই তাঁর হৃৎকম্প আর ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ হচ্ছে। পাড়ায় শব্দ লেগেই আছে। দুই কান থেকে অনেকখানি তুলো বের করে বললেন, কানে তুলো দিয়ে রেখেও শব্দ আটকানো যাচ্ছে না; অন্য পাড়ায় যাবেন যে সে উপায়ও নেই। বিদেশে পাড়ি দেবার শক্তি ও সাহস পাচ্ছেন না; শরীরের অবস্থা ভাল নয়।

জটিল সমস্যা। এ সমস্যা, বিশেষ কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে নয়। শীতলবাবুর সমস্যা ব্যক্তিগতও নয়। সমস্যার গভীরতা ও ব্যাপকতা নিয়ে দেশবিদেশের মনস্তাত্ত্বিক সমাজতাত্ত্বিকরা অস্থির হয়ে উঠেছেন। সমস্যাটি শুধু শীতলবাবুর পাড়ার সমস্যা নয়, এ সমস্যা বোধহয় সব দেশেই দেখা দিয়েছে। এ নিয়ে আলোচনা করতে বসলে রাত কাবার হয়ে যাবে, তবুও হয়ত সমাধানের সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে ভরসা এই, যে তাঁর মনের উপর যে প্রতিক্রিয়া ঘটেছে, সেটা একান্তই ব্যক্তিগত। তাঁর বাড়ীর সামনে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে খণ্ডযুদ্ধ চলেছে। কর্ণপটাহ তাই বিশেষভাবে পীড়িত। আমাদের পাড়ায় কয়েক সপ্তাহের মত একটা হোটেলে, নিদেনপক্ষে একটা নার্সিংহোমে যদি ঘর নিয়ে থাকেন, তবে হয়ত শব্দের দরুন যে দৈহিক উপসর্গ দেখা দিয়েছে, সেগুলোর উপশম হতে পারে। আমাদের পাড়ার আবহাওয়া তত বেশী উত্তপ্ত নয় বর্তমানে। শীতলবাবু আমার কথায় রাজী হলেন এবং একঘন্টার মধ্যে সব বন্দোবস্ত করা গেল। পরদিন তিনি একটা নার্সিংহোমের অধিবাসী হলেন।

এরপর চিকিৎসা উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে যে সব আলোচনা চলল তার সারাংশ পাঠকদের জানাচ্ছি।

হঠকারী কাজ এক টাইপের মানুষ চিরকালই করে আসছে—শীতলবাবু তা জানেন। তাঁর সমস্যা অন্য। বর্তমানে অনেক লোকই এইরকম হঠকারিতার ব্যাপৃত হয়ে পড়েছে। অল্প কারণেই তাদের মধ্যে প্রক্ষোভের আতিশয্য দেখা যাচ্ছে। এর কারণ কি? মস্তিষ্কের টাইপ কি এক 'জেনারেশনের' মধ্যেই পাল্টে গেছে? সকলেই 'হঠকারী' টাইপের মানুষ হয়ে উঠেছে? না। তা ঘটেনি। তবে সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটেছে। সেই পরিবর্তনের পরিচয় দেবার

আগে প্রক্ষোভ সম্বন্ধে আরো দু'একটা তথ্য সরবরাহ করছি।

প্রক্ষোভের মৃদুতম অথচ দীর্ঘস্থায়ী অভিব্যক্তির নাম মেজাজ, ইংরিজি প্রতিশব্দ—'মুড'। আমাদের মেজাজ রোজই ঠিক একরকম থাকে না। রাত্রে ভাল ঘুম না হলে, দেহের বিপাকক্রিয়া ভালমত না চললে, মেজাজ ভাল থাকে না। আর্থিক অস্বচ্ছলতা, পুত্রকন্যার ব্যবহার, স্ত্রীর সঙ্গে সামান্য খিটিমিটি ইত্যাদি অনেক কারণেই মেজাজ বিগড়ে যেতে পারে। গুমোট গরম, দিনরাত আকাশঢাকা মেঘ, ভূমিকম্প সাইক্লোনের সম্ভাবনা সম্পর্কে আবহাওয়াবিদদের ভবিষ্যদ্বাণীও আমাদের মেজাজ খারাপ করে দিতে পারে। সামাজিক ও প্রাকৃতিক—দুই রকমের কারণই মেজাজকে প্রভাবিত করে। নানা কারণে মেজাজ আবার ভালও থাকে অনেকদিন ধরে। প্রক্ষোভের প্রবলতম অভিব্যক্তিকে ইংরিজী ভাষায় বলা হয় 'অ্যাফেক্ট'। তীব্রতম আবেগ ভূমিকম্পের মত আমাদের নাড়া দিয়ে যায়। কোনো কিছু আর তখন যুক্তিবুদ্ধির নিয়ন্ত্রণে থাকে না। সেই মুহূর্তে আমরা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে অসামাজিক যে কোনো কাজ করে বসতে পারি। ফলাফল সম্পর্কে কোনো চিন্তা ভাবনার অবকাশ থাকে না।

বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতির আলোচনা বা শীতলবাবুর সমস্যার সমাধান এক কথার ব্যাপার নয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের প্রতিযোগিতা, সহযোগিতা, প্রীতি-বিরোধ ইত্যাদির বিচার দু-চারদিনের কেন, দু-চার সপ্তাহেও শেষ হবে না। বর্তমানে কেবল প্রক্ষোভ ও যুক্তিবুদ্ধির প্রসঙ্গে এই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই।

ইতিমধ্যে শীতলবাবুর শব্দ-আতঙ্ক অনেকটা কমেছে। তিনি আমার কথাতে মন বসাতে পারলেন।

আজকাল মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অনেকটা বেড়েছে সেই জ্ঞানের সাহায্যে প্রক্ষোভকে বিশেষ করে তার ধ্বংসাত্মক-নঙর্থক প্রকাশকে বুঝতে চেষ্টা করা যাক। তার আগে হিংসার 'জেনেসিস' সম্পর্কে কিছু বলা দরকার।

—দলবদ্ধভাবে যে ধ্বংসাত্মক হিংসাত্মক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেগুলোর মধ্যে গণ হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। হিংসা সাধারণত আত্মরক্ষাপ্রবৃত্তির দেশকালাশ্রিত অভিব্যক্তি। আদিম মানুষকে প্রকৃতির দুর্যোগের, বিশেষ করে হিংস্র প্রাণীর সঙ্গে লড়তে গিয়ে, হিংসাবৃত্তিকে জাগিয়ে রাখতে হয়েছে। হিংস্র প্রাণী দেখে সে যেমন ভয় পেয়েছে, রহস্যময় প্রকৃতির ভয়ঙ্কর খেলা—যথা সাইক্লোন, বন্যা, আগুন, ভূমিকম্পকে, সে তেমনি ভয় করেছে। ভয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে হিংস্র হয়েছে, অজানা সব কিছুকে শত্রু মনে করে আঘাত

করতে চেয়েছে। আবার ভয়ের বস্তুর কাছে আত্মসমর্পণ করে অহিংস হয়ে ভয়কে সাময়িকভাবে দূর করতে চেয়েছে। প্রায়শ যৌথভাবে সে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছে। তারপর মানুষের জ্ঞান বেড়েছে, অনেক কিছু জেনেছে, প্রকৃতিকে খানিকটা বশে এনেছে; কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য হিংসার প্রবৃত্তি ছাড়তে পারেনি। পরে ব্যক্তি সম্পত্তির সৃষ্টি হয়েছে, ব্যক্তি-সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে ইতি-মধ্যে একদল প্রতিপত্তিশালী হয়ে অন্য দলকে শক্তি ও হিংসা দিয়ে বশে রেখেছে। ধর্মভিত্তিক সংগঠনের মধ্যেও হিংসার প্রকোপ ও প্রবণতা সমানে থেকে গেছে; কেননা ধর্মীয় সংগঠন চালাতে সম্পত্তি রাখতে হয়েছে, বাড়াতে হয়েছে। তারপর রাষ্ট্রস্বার্থের নামে দলবদ্ধ হয়ে হিষ্টিরিক হুঙ্কার দিয়ে মানুষ নিধন যজ্ঞে মেতেছে। ধর্মের নামে, দেশের নামে মানুষ খুন করে বীর হয়েছে, শহীদ হয়েছে, আর্থিক পুরস্কারও মিলেছে। সমাজ আমাদের হিংসার প্রবণতাকে প্রশ্রয় দিয়ে জীইয়ে রেখেছে বললে কি খুব মিথ্যে বলা হবে? কয়েকবছর আগেও একটা ইংরেজের প্রাণ নেওয়া অনেকের কাছে গৌরবের বিষয় ছিল, আর ইংরেজের নেটিভ নিধন তার সামাজিক সম্মান বাড়াবার একটা প্রশস্ত উপায় বলেই গণ্য হত। এই বুদ্ধের দেশে আমরা কি ধর্মের লড়াই, গোষ্ঠীর লড়াই করে বীরধর্ম প্রকাশ করতে কখনো ইতস্তত করেছি? বিরল ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিয়ে অনায়াসে বলা চলতে পারে যে, আত্মরক্ষার সহজ প্রবৃত্তিকে সামাজিক শর্তাধীন হিংসার পরাবর্ত দিয়ে মহিমান্বিত করতে আমরা দ্বিধাবোধ করিনি। হিংস্র যারা হতে পারেনি, তারাও ধর্মের খাতিরে, দেশের স্বার্থে, পার্টির নামে, বেশিরভাগ সময়েই হিংসাকে নীরব অনুমোদন দিয়েছে। আমার পরিবারের, গ্রুপের বা দেশের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হিংসার আমরা নিন্দা করেছি, অন্যথায় প্রশ্রয় দিয়েছি। আজ হিংসার হুঙ্কার দ্বারপ্রান্তে সদাসর্বদা ধ্বনিত হতে শুনে আপনি অস্থির হয়ে উঠেছেন; যতদিন আপনার অগোচরে হিংসা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, আপনি ভয় পাননি।

—আপনি এসব কি উল্টোপাল্টা কথা বলছেন? আপনি কি শেষ পর্যন্ত প্রবৃত্তিবাদী মনস্তাত্ত্বিক হয়ে পড়লেন মশাই?

—না ঠিক উল্টো। আমি বলতে চাইছি যে হিংসা সামাজিক পরাবর্ত, সহজাত নয়। সুতরাং মানুষের ভবিষ্যৎ রক্তাক্ত নয়, ভয়ঙ্কর নয়। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে অন্য সবাইকে নিঃশেষ করার প্রয়োজন নেই, শুধু এটাই মানুষের বোঝা দরকার।

—আরে মশাই, বোঝাচ্ছেই বা কে, আর বুঝছেই বা কে?

—হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত অবস্থায় মানুষ চিরকাল থাকে না? এরাই বুঝবে, আর আপনারাই বোঝাবেন। আমি বরং আপনাকে মনোবিজ্ঞানের দু'একটা কথা বলি। পণ্ডিতরা মানুষের এই অবস্থা নিয়ে অনেক কিছু গবেষণা

চালাচ্ছেন। তাঁরা দেখেছেন যে মস্তিষ্ক খুব বেশীক্ষণ একটা বিষয়ে মনোনিবেশ করতে পারে না; বারবার এক কথা শুনলেও তার মস্তিষ্কের কার্যকলাপের বিশৃঙ্খলা ঘটে। সংবাদ সরবরাহ ও সংগ্রহের গোলযোগ ঘটেছে এযুগে। মাস-মিডিয়ার কুফল নিয়ে আলোচনা চলেছে আজকাল। একই কথা বারবার বলা হচ্ছে এবং অজস্র অপ্রয়োজনীয় সংবাদ দিনরাত চোখ-কানকে পীড়িত করে চলেছে। কতকগুলো তথ্য মস্তিষ্কের কতকগুলো কোষকে বারবার উত্তেজিত করে এখন স্থায়ী হয়ে সেখানে বাসা বেঁধেছে। সেই কোষগুলো অকেজো হয়ে পড়েছে, ফলে অন্যগুলোর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। এই ভাবে কিছু মানুষ অবসেশনের রোগী হয়ে পড়েছে; যুক্তিধর্ম অবসেশনকে আয়ত্তে আনতে পারছে না। ভালমন্দ বোঝার ক্ষমতা তাই সাময়িকভাবে হ্রাস পেয়েছে। আমরা জানি, ভয় পেলে মানুষের সতর্কতা ও আত্মরক্ষার ক্ষমতা কমে যায়। আজ সুকৌশলে নানাভাবে মানুষকে ভয় দেখানো হচ্ছে। পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়, জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ভয়, জল ও বায়ু দূষিত হবার ভয়, ইত্যাদি নানারকমের ভয়ের কাহিনী সংবাদপত্রের পাতায় পরিবেশিত হচ্ছে। এছাড়া আছে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আক্রমণের ভয়—বিশেষ করে সেই সম্বন্ধে প্রোপাগাণ্ডা। সর্বোপরি নিরাপত্তার অভাব আর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুশ্চিন্তা সকলকেই ভীত সন্ত্রস্ত করে রেখেছে। এই অবস্থায় সামান্যতম কারণেই মানুষ মরিয়া হয়ে উঠে বিশৃঙ্খল আচরণে প্রবৃত্ত হতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এই সময়ে অদরকারী সংকেতেও পরাবর্ত দেখা দিয়ে থাকে। তাই ত' এমন হচ্ছে। এই হচ্ছে প্রক্ষোভ আধিক্যের কারণ। গণহিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীরা ভয় পেয়ে শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে। হাতের কাছে যা পাচ্ছে তাই ভাঙছে, যাকে দেখেছে তাকেই আঘাত করছে। আমি একথা বলছি না যে সকলেই রোগে ভুগছে। হয়তো শতকরা পাঁচজন অসুস্থ। বাদবাকী পঁচানব্বই জন কি করছে? তারা অসুস্থ না হলেও কমবেশী সংশয়াচ্ছন্ন, উদ্বিগ্ন। তবে তারা সুস্থ সক্রিয় হয়ে উঠবে,—হয়ত কিছু সময় লাগবে। উত্তেজনার শেষে নিস্তেজনার বিস্তার বা নিস্তেজনা-অন্তে উত্তেজনার সঞ্চার মস্তিষ্কের সাধারণ ধর্ম। এই সমাজব্যবস্থায় হিংসা একেবারে পরিহার করা দুঃসাধ্য; কিন্তু অপ্রয়োজনীয় হিংসাকে প্রতিরোধ করা মোটেই দুঃসাধ্য নয়।

ভর হওয়া, ভূতে পাওয়া (Possesed)

ভর হওয়া, ভূতে পাওয়া রোগীদের সম্পর্কে কয়েকজন ভারতীয় চিকিৎসক কিছু মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন। এদের লেখা থেকে জানা গেল যে, প্রেতাবিষ্ট ও দেবাবিষ্টদের মধ্যে বেশীর ভাগ ভুগছেন হিষ্টিরিয়া ও স্কিজোফ্রেনিয়া

রোগে ; অল্প সংখ্যক 'ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ' রোগীও এদের মধ্যে আছেন। স্কিজোফ্রেনিয়ার বাংলায় কোনো উপযুক্ত পরিভাষা নেই। 'চিত্রভ্রংশ বাতুলতা' বলা ঠিক কিনা জানি না। এই রোগে এবং প্রায় সব উন্মাদ রোগেই বাস্তবের সঙ্গে রোগীর সম্পর্কচ্যুতি ঘটে। হিষ্টিরিয়ার মত নিউরোসিসে (বাংলায় 'উদ্বায়ু' বলা হয় ; আমার মনে হয়, নিউরোসিস কথাটি বাংলায় চালু হওয়া উচিত) বাস্তবের সঙ্গে সাময়িকভাবে সম্পর্কচ্যুতি ঘটলেও, রোগী মোটামুটি বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে পারে ; 'ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ' রোগীকে বাংলায় 'খেদোন্মত্ত বাতুলতা' বলা চলে ; মাঝে মাঝে রোগী উগ্র হলে কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণ করে ; কোনো সময় বা বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে ও কথাবার্তা খাওয়া-দাওয়া সব ব্যাপারে তার আগ্রহ চলে যায়।

খেদোন্মত্ত বাতুলদের মধ্যে বেশীর ভাগই অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত ; উচ্চশিক্ষিত-দের মধ্যে এই অবস্থা কম দেখা যায়। এইসব রোগীদের পরিবারে ধর্মপ্রবণতা প্রবল, কুসংস্কারও প্রচুর। হিন্দুদের মধ্যে ডাক্তাররা এই রোগের প্রাদুর্ভাবের আধিক্য লক্ষ্য করেছেন। মেয়েরাই প্রধানত আক্রান্ত হয়, পুরুষরা কম। পুরুষ রোগীদের মধ্যে পুরোহিত ও দেবাধিষ্ঠানের সেবায়েতদের সংখ্যাই বেশী। রোগাক্রান্তদের অধিকাংশই বিবাহিত, পারিবারিক জীবনে এরা হয় অসুখী অথবা অতিমাত্রায় দায়িত্বভারপীড়িত। স্কিজোফ্রেনিয়া সব দেশে সব রকম লোকের মধ্যে ক্রমবর্ধমান।

মানসিক আরোগ্যশালার ডাক্তারদের রিপোর্ট থেকে জানা গেছে যে, মাঝে মাঝে ভর হওয়া রোগ সংক্রামক ব্যাধির মত আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে গণ-হিষ্টিরিয়ার আকারে ব্যাপকভাবে দেখা দিতে পারে। রাঁচীর উপকণ্ঠে পল্লী অঞ্চলে, ১৯৬৬ সালে, এইরকম গণ-হিষ্টিরিয়ার প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। ভার্মা, শ্রীবাস্তব ও সহায়-এর রিপোর্ট থেকে সংক্ষিপ্তভাবে এই গণ-হিষ্টিরিয়ার বিবরণ তুলে ধরছি।

১৯৬৬, ২৭শে মে সন্ধ্যায় এগার বছরের, একটি মেয়ে কুয়ো থেকে কলসী ভরে জল নিয়ে আসছিল, সঙ্গে ছিল তার দিদি। হঠাৎ তার হাত কাঁপতে লাগল, মাথা দুলতে লাগল, সারা দেহ ভারী মনে হল। 'আমি এসেছি, আমি এসেছি'—বলে সে চিৎকার করে উঠল। রোজা ডাকা হল। রোজা আসতেই মেয়েটি তাকে বকতে লাগল এবং বিরক্ত করতে নিষেধ করল। গম্ভীরভাবে জানাল যে, সে 'বড়িমা' বা দুর্গাজি। তাকে ত্যক্তবিরক্ত করলে শাস্তি পেতে হবে। রোজা শুনবে কেন? মেয়েটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে চেঁচাতে লাগল, তার থেকে আরো দ্রুত মাথা ঝাঁকাতে সুরু করল, আর আগুন জেলে তার মধ্যে ধুপ-ধুনো ফেলতে লাগল। বড়িমা আর রোজার মধ্যে আরম্ভ হল বেশ একটি ছোটোখাটো খণ্ডযুদ্ধ। মেয়েটি তখন অগ্নিকুণ্ড থেকে একমুঠো জলন্ত কয়লা

হাতে তুলে নিয়ে রোজাকে বলল—'এই নে প্রসাদ, আমাকে জ্বালাস নে'। সকলে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল জ্বলন্ত কয়লা হাতে নেওয়া সত্ত্বেও মেয়েটি নির্বিকার। মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন নেই। হাত পুড়ল না, এমন কি ফোস্কা পর্যন্ত পড়ল না। তখন রোজার চৈতন্য হল। মেয়েটির পায়ে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগল। মেয়েটির বাবা মা এবং উপস্থিত সকলেই ভয়ে ভক্তিতে অভিভূত হয়ে পড়ল। বড়িমার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে অপরাধের মার্জনা চাইল। বড়িমা মার্জনা করলেন। মেয়েটি তার মাকে জানাল যে তারা মানত রক্ষা করেননি, তাই বড়িমা নিজে তার প্রাপ্য মানত নিতে স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছেন। এগার বছরের মেয়েটির মত কথা বলছে না; বাবা-মাকে নাম ধরে ডাকছে, সকলের সঙ্গে বয়োবৃদ্ধার মত ব্যবহার করছে, চালচলনে মুরুব্বিয়ানার ভাব ফুটে উঠেছে, কণ্ঠস্বরেরও বিকৃতি ঘটেছে। সকলকে আদেশ করছে, নানারকম নির্দেশ জারী করছে; কেউ জুতো পায়ে বা চশমা চোখে দিয়ে তার ঘরে ঢুকতে পারবে না, লাল পোশাক কেউ পরবে না, তার অমতে কোন কিছুই ঘটবে না। বাড়ীর লোক, পাড়ার লোক, গ্রামের সব লোক একেবারে ভয়ে তটস্থ, ভক্তিতে গদগদ। বাড়ীর সামনে ভিড় জমে গেল, শঙ্খ ঘণ্টা বাজতে লাগল। রাশি রাশি ফুল এল, মালাচন্দন দিয়ে তাকে তুষ্ট করার চেষ্টা চলল। দলে দলে লোক ভাগ্য জানল, ভবিষ্যতের বাণী শুনল, নিজেদের সমস্যা সমাধানের পরামর্শ চাইল। পরে ভিড় আরো বাড়ল। গ্রামান্তর থেকে, এমনকি রাঁচী শহর থেকেও দলে দলে লোক ছুটল বড়িমাকে দর্শনের আশায়। মেয়েটির উত্তেজনা তখন বেড়েছে, মাথা আরো দ্রুত, আরো ঘনঘন নড়ছে। এক ব্যক্তি প্রশ্নের উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে কিছু মন্তব্য করাতে 'বড়িমা' ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। কিন্তু তার থেকেও অনেক বেশী উত্তেজিত হলেন এক পঁয়ত্রিশ বছরের বিবাহিতা মহিলা। তিনি এতক্ষণ বড়িমার পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিলেন, এখন অসন্তুষ্ট লোকটিকে শাস্তি দেবার জন্য উন্মাদের মত ছোটাছুটি করতে লাগলেন; তাকে হাতের কাছে না পেয়ে শাপশাপান্ত করে তখনকার মত নিরস্ত হলেন। একটু পরে তাঁরও ঘন ঘন ফিট হতে লাগল। তিনি নিজেকে 'ছোটমা' বলে ঘোষণা করলেন।

ক্রমশ এই ধর্মোন্মাদনা আরো ছড়িয়ে পড়ল। দুই মাতাকে একটি ঘরে সমাদরে আশ্রয় দেওয়া হল। কয়েকজন বর্ষীয়সী মহিলা চব্বিশ ঘণ্টা ধরে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করতে লাগলেন। ঘরে দিবারাত্র ধুপধুনো পুড়তে লাগল। ৩০শে মে আঠার বছরের আর একটি কুমারী মেয়ের ভর হল; তার হল কালীর ভর। চার নম্বরের ভরগ্রস্ত রোগী একটি আট বছরের বালক। তাকে ভর করলেন দেবাদিদেব মহাদেব।

৩১শে সন্ধ্যায় বাইশ বছরের একটি বিবাহিতা তরুণীর দেহে আশ্রয় নিলেন 'মাঝলীমাতা' বা মেজমা। সেই রাত্রে আর একটি তরুণী 'সাঁঝলি মা' বলে নিজেকে ঘোষণা করলেন। বড়িমা, ছোটিমা, মাঝলিমা, সাঁঝলিমা সবই স্থানীয় দেবী। শীতলাদেবীর ভগ্নী বলে এরা পরিচিত। ২৭শে মে এই গণ-হিষ্টিরিয়ার সূত্রপাত, ৩১ তারিখ চরমে উঠে ঘটল পরিসমাপ্তি। এক সপ্তাহের মধ্যেই দেবীরা স্বস্থানে প্রস্থান করলেন, এবং রোগীরা যে যার বাড়ী ফিরে এল।

রাঁচীর আরোগ্যশালার ঐ চিকিৎসকদের মতে সবকটি ভরগ্রস্তই মনের সমস্যাভারে পীড়িত ছিল। কোনোমতেই তাদের সমস্যা সমাধান মিলছিল না। ধর্মোন্মাদনার সুযোগ নিয়ে তারা সাময়িকভাবে বাস্তব থেকে পালাবার চেষ্টা করছিল। ঐ এলাকায় ঐ সময়ে হাম-বসন্তও ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছিল। বসন্ত রোগকে স্থানীয় অশিক্ষিত অধিবাসীরা 'মায়ের দয়া' বলে মনে করে, রোগ মনে করে না।

'ভর' এপিডেমিক আকারে দেখা না দিলেও বিক্ষিপ্তভাবে সব সময়েই গ্রামাঞ্চলে দেখা দিয়ে থাকে। এইরকম এক রোগীর কথা বলছি।

বাগনানের কাছাকাছি এক গ্রাম থেকে এক রবিবার সকালে চার-পাঁচজন মেয়ে-পুরুষ একটি সাতাশ-আটাশ বছরের বিবাহিতা মেয়েকে নিয়ে উপস্থিত। মেয়েটির অবস্থা শোচনীয়। কপালের এক জায়গায় কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে, অনাবৃত দেহের কয়েক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন। সে মেয়েটি আর্তস্বরে চিৎকার করছে—'আমাকে ছেড়ে দাও, আমি চলে যাচ্ছি, আমাকে ছেড়ে দাও। পণ্ডিতের কাছে আমি যাব না।' মেয়েটি খুবই পরিশ্রান্ত ছিল। আশ্বাস ও অভয় দেওয়াতে মিনিট কুড়ির মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল। আমাকে 'পণ্ডিত' অর্থাৎ রোজা ভেবে ভয় পাচ্ছিল। দুই 'পণ্ডিতের' কয়েকদিনের চিকিৎসার চিহ্ন তার গায়ে মুখে অজস্র ছিল। এইবার অনন্ত মাজির কাছ থেকে স্ত্রী কুন্তীবালার 'ভর' হওয়ার ইতিবৃত্ত শুনলাম।

প্রায় বারো বছর আগে ওদের বিয়ে হয়েছে; অনন্ত মাজির বয়স তখন ২৪, কুন্তীর ১৬। অনন্ত কলে কাজ করত, মাসকতক হল ছাঁটাই হয়েছে, পাঁচটি ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে এখন শ্বশুরের সংসারে অবাঞ্ছিত অতিথি। আট মাস বেকার। মিথ্যে বদনাম দিয়ে তাকে নাকি বরখাস্ত করা হয়েছে! সে আদালতে মামলা করে ক্ষতিপূরণ আদায় করবে। শ্বশুরমশাই-এর অবস্থা মোটামুটি ভাল। কিন্তু তিনি লোক ভাল নন। কুন্তী চায় না বাপের বাড়ীতে সে গলগ্রহ হয়ে থাকে। অনন্তেরও ঘরজামাই হবার ইচ্ছে নেই। অনন্ত কুন্তীকে কয়েকদিন ধরে বলছিল বাপের কাছ থেকে পাঁচশো টাকা ধার হিসেবে চাইতে, ঐ টাকা দিয়ে বাগনানে সে একটা মুদিখানার দোকান খুলবে। কুন্তীকে রাজী করাতে না পেরে অনন্ত এক রাত্রে ওকে একটু বেশী বকাঝকা করেছিল

এবং ওকে এখানে রেখে দেশান্তরী হবে বা আত্মঘাতী হবে বলে ভয় দেখিয়েছিল। সেই রাত্তিরেই কালীর ভর হয়েছে কুন্তীর। ভোর নাগাদ কুন্তীকে কালীবাড়ীর দরজার সামনে ঘুমন্ত অবস্থায় পাওয়া গেল। ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিতেই সে তর্জন-গর্জন স্বরু করে দিল। অনন্তকে মহাদেব হয়ে তার পায়ের তলায় শুতে বলল, বাপকে গড় হয়ে প্রণাম করতে বলল। মাকে বলল, চুল কেটে ফেলে মাথা ন্যাড়া করে কালীপূজোর আয়োজন করতে। সকলে তাকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। বাবা মা গড় করে প্রণাম করলেন, সাধ্য-সাধনা করে ঘরে নিয়ে যেতে চাইলেন। কুন্তী যাবে না। মন্দিরের পাশে তালপাতার ছাউনী করে কুন্তীর অস্থায়ী বাসস্থান নির্মিত হল। প্রায় দিগম্বরী হয়ে সে অনবরত কথা বলছিল, তখন তাকে দেখলে ভয়-ভক্তি না করে কারুর উপায়ান্তর ছিল না। চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল, এলোচুলে বুক মুখ ঢাকা, মাথাটা অনবরত ডাইনে বাঁয়ে ঘুরছে, হাতের মুঠো খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। আশে পাশের গাঁ থেকে অনেক লোক দেখতে এল, অনেকে অনেক কথা বলল, কুন্তী কোনো কথার উত্তর দিল না। কালীবাড়ীর সেবায়েত শ্রীধর পণ্ডিত দিন তিনেক পরে গ্রামে ফিরে এলেন। এই তিনদিন কুন্তীর সামনে দুধ, সন্দেশ, কলা, বাতাসার পাহাড় জমল। হাজার হাজার মেয়ে পুরুষ গড় হয়ে ওকে প্রণাম করছে। এয়োতিরা ওর মাথার সিঁদুর চেয়ে নিচ্ছে। কিন্তু শ্রীধর পণ্ডিত ফিরে আসতেই সব গণ্ডগোল হয়ে গেল। এই তিনদিন তার মন্দিরের পাওনাগণ্ডা তালপাতার ঘরের কুন্তীর সামনে জড়ো হয়েছে দেখে তিনি বোধহয় চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সরাসরি অনন্তর শ্বশুরমশায়কে জানালেন যে কালী নয়, দুষ্ট প্রেতিনীতে ভর করেছে কুন্তীকে। এখনই ঝাড়ফুক দরকার; অবিলম্বে ঝাড়ফুক আরম্ভ হয়ে গেল। জোর করে তালপাতার চালা থেকে কুন্তীকে বাড়ীতে আনা হল। দড়ি দিয়ে হাত-পা বেঁধে প্রেতিনীর সঠিক পরিচয় জানবার চেষ্টা চলল। অনন্তের মুখে পণ্ডিতের জিজ্ঞাসাবাদের পদ্ধতির কথা শুনলাম। ফুটন্ত তেল ও লোহা দিয়ে ওর পায়ের তলায় ও গায়ে ছ্যাঁকা দেওয়া হল; তার আগে অবশ্য মৃদুতম পদ্ধতিতে অর্থাৎ ঝাঁটা ও জুতোর আঘাত দিয়ে চেষ্টা করা হয়েছিল। প্রেতিনীর যদিও বা পরিচয় মিলল, কিন্তু কুন্তীর আশ্রয় সে ছাড়তে চায় না। তখন দ্বিতীয় পণ্ডিত এলেন, বোধহয় প্রথম পণ্ডিতের গুরু। দুজনে মিলে চব্বিশ ঘণ্টা ধস্তাধস্তি করেও ফল পেলেন না। পরদিন কুন্তীর ঘন ঘন ফিট হতে লাগল। সে বলতে লাগল, 'আমি চলে যাচ্ছি, আমাকে ছেড়ে দাও।' ছেড়ে যাওয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাঁরা দেখতে চাইলেন। বাড়ীর সামনের আমগাছের একটা ডাল ভেঙ্গে পড়লে তাঁরা বিশ্বাস করবেন, প্রেতিনী সত্যি সত্যি ছেড়ে গেছে। প্রেতিনী ছেড়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও প্রমাণ দেখাতে পারল না। লোকমুখে

খবর পেয়ে বাগনান থেকে কুন্তীর ভাই কয়েকজন ছাত্র ও একজন ডাক্তার এনে পণ্ডিতদের হাত থেকে মেয়েটিকে অতিকষ্টে বাঁচালেন। না হলে হয়ত এই অত্যাচার আরো কিছুকাল চলত।

ঘণ্টা দেড়েক পরে কুন্তীর ঘুম ভাঙল। মিনিট পনেরো তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে দেখলাম তার মানসিক অবস্থা প্রায় স্বাভাবিক, শুধু শারীরিক দুর্বলতা আছে। পণ্ডিতদের মারধোরের কথা তার মনে আছে। তার আগের চব্বিশ ঘণ্টার কথা কিছু মনে নেই। স্বামীর অন্যায় আবদারের কথা শুনে তার রাগ হয়েছিল। কোন মুখে সে বাপের কাছে টাকা চাইবে? এর আগে স্বামী আরো কয়েকবার তার বাবার কাছ থেকে নানা অজুহাতে টাকা নিয়ে ফেরত দেয়নি। স্বামী তাকে ছেড়ে চলে যাবার ভয় দেখাতে সে সত্যিই আতঙ্কিত হয়েছিল। ঘুম আসছিল না। গভীর রাত্রে দরজা খুলে মায়ের মন্দিরের সামনে লুটিয়ে পড়ে এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ চেয়েছিল। বুঝলাম, আমার কাছে আসবার অনেক আগেই তার হিষ্টিরিয়া বা ভর কেটে গেছে। বোধহয়, ভরের সময়কার কোনো কিছুই তার মনে নেই।

প্রেমরোগ

প্রেমজ ও কামজাত মনোরোগ অনেকদিন থেকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এসেছে। গোঁড়া ফ্রয়েডিয়ানদের লিবিডোতাত্ত্বিক ধারণা (সব রকমের নিউরোসিস মূলত কামজাত) অবশ্য আজকাল অচল: হর্ণি, সুলিভ্যান, ফ্রম প্রমুখ সাইকো-এ্যানালিষ্টরা পর্যন্ত ফ্রয়েডীয় ইডিপাস ও আনুষঙ্গিক তত্ত্বকে নিউরোসিসের কারণ বলে মনে করেন না।* মানবজাতির ইতিহাসে ইডিপাস

---

* The closed monolithic system constructed laboriously by Freud had been split down the middle under the impact of developments in science of anthorpology. The pre-historic source of the innate mental constructs had been discarded as untenable in the face of universal rejection of the myth of the primal horde.........They (Horney, Fromm, Sullivan) pointed out the inconsistency and proposed to resolve it by repudiating the alleged innate memories as well as the supposed prehistoric reference.... No longer could the development of the individual psyche be said to be pre-determined by raciai memories and to have the inevitability of a recapitulation of the course of pre-history (The Failure of Psycho-analysis : H. K. Wells. International Publishers, New York. 1963 pp 135, 136)

যুগ কোনদিন ছিল না। সেই যুগের স্মৃতিবাহী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অথবা নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব অস্বীকার ছাড়া অন্য কোনো উপায় পাচ্ছেন না হর্ণি, স্থলিভ্যান, ফ্রম।* আমরা এখানে যৌন-বিকারের বস্তুবাদসম্মত কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করব। নাটকের রাজা ইডিপাস নাটকের মধ্যেই আবদ্ধ থাকুন।

ব্যাপকার্থে প্রেম ও কাম-ঘটিত মনোরোগ বলতে কেবলমাত্র যৌন-প্রবৃত্তি সংক্রান্ত উচ্চমস্তিষ্কের কার্মিক বিশৃঙ্খলা বোঝায় না। প্রধানত দুভাবে এই রোগ দেখা দিতে পারে: অপ্রতিদত্ত প্রেমের ফলে মস্তিষ্কের আচ্ছন্নতা জাতীয় মনোবিকার, আর জটিল যৌন-পরাবর্তক্রিয়ার গোলযোগ—পাভলভীয় পরিভাষায় যাকে বলা হয় উচ্চমস্তিষ্ক প্রভাবিত আন্ত্রিক বিশৃঙ্খলা বা বিকার (cortico-visceral pathology)।

অতৃপ্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষা, অপ্রতিদত্ত প্রণয়, অবাঞ্ছিত মিলন, প্রিয়জনের মৃত্যু; ইত্যাদি আঘাত কাব্য-উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসেবে পরিগণিত হলেও মনস্তত্ত্বেরও বিষয়বস্তু। এবিষয়ে পাভলভের উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।**

প্রথমে অতৃপ্ত বাসনার ফলে আচ্ছন্নতা বা অবসেশনের কথা বলা যাক। যে কোনো অপূর্ণ প্রক্ষোভ বা অদম্য বাসনা মস্তিষ্ককোষকে অত্যধিক মাত্রায় উত্তেজিত করে; এই অতিপীড়নের ফলে উচ্চমস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের বিশৃঙ্খলা ঘটে। দুর্বল উত্তেজনাধর্মী মস্তিষ্কে হতাশা ও বিষণ্ণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে; প্রেমাস্পদের চিন্তা মস্তিষ্কে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে যে অন্য কোনো জীবনধর্মী চিন্তা আর সেখানে স্থান পায় না। ধীরে ধীরে জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত অপরাপর শর্তাধীন পরাবর্তগুলো দুর্বল হতে থাকে; স্বাভাবিক জীবনাকর্ষণ, আত্মরক্ষামূলক ও সদর্থক পরাবর্তগুলি স্তিমিত হয়ে পড়ে। চিকিৎসা ও অন্যান্য

---

* "Deprived of this stock of interim memory-drivcs, the Id ceases to exist, and without Id Freud's system collapses in upon itself like a house of cards." (Ibid p 137)

** "......a long series of shocks, such as the loss of dear ones, unrequited love and other deceptions in life connected with injury to one's self-respect evoke, in a weak person the strongest reactions attended by abnormal,—so-called somatic symptoms." সেচেনফের মতে এই ধরনের অদম্য আবেগ "is destined to lead to various so-called self sacrifies, i.e. is likely to disregard all biological impulses, even that of self preservation" "......these phenomena are all essentially reflexes, only complicated by an admixture of passionate elements."

(Pavlov, Selected Works Moscow)

যথাযথ বিধিব্যবস্থা অবলম্বন না করলে আত্মহত্যা এদের ক্ষেত্রে অসম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রে আবার প্রেমাস্পদের চিন্তা থেকে অন্যান্য ব্যক্তিগত বা সামাজিক অথবা প্রাকৃতিক নেতিবাচক অবসেশন এদের মনকে পেয়ে বসে। এরা অনেকে মনে করে দুরারোগ্য ব্যাধি হয়েছে; অথবা মনে করে সূর্যের তাপ একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে, আমাদের এই প্রিয় গ্রহ পৃথিবী সেদিন হিমশীতল হবে, জীবনের অস্তিত্ব থাকবে না; অন্যে হয়ত মনে করে পারমাণবিক যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, পৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্য। এর যে কোনো একটি কারণ হতাশ-প্রেমিকের আত্মহননের পক্ষে যথেষ্ট। আমরা যে সব হতাশ-প্রেমের রোগী পাই তারা বেশির ভাগই বিষণ্ণতা বা কোনো আচ্ছন্নতার উপসর্গ নিয়েই প্রথম চিকিৎসার জন্য আসেন।

প্লাটানভ-এর একটি রোগীর ইতিহাস দিয়ে সুরু করি। ২৮ বছরের একটি মেয়ে স্বামী পরিত্যক্তা হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে; তাঁর প্রধান উপসর্গ ছিল দর্শন ও শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের অমূল প্রত্যক্ষ (হ্যালুসিনেশন)। স্বামীর কণ্ঠস্বর ও স্বামীর চেহারা তিনি অনবরত দেখতেন। এক পলিক্লিনিকে ছয় মাস চিকিৎসাতে কোনো উন্নতি দেখা গেল না। প্লাটানভের ক্লিনিকে আসার পর তিনি বুঝলেন স্বামীকে মেয়েটি ভুলতে পারছে না। স্বামী তখন দেশত্যাগী। প্লাটানভ অভিভাবনের মারফত স্বামীকে ভুলে যেতে বললেন ও আরও বললেন, তাঁর অলীক দর্শন ও শ্রবণ থেকে তিনি চিরতরে মুক্ত হবেন। পাঁচটি অভিভাবনের পর মেয়েটি পুরো সুস্থ হল।

এইবার মনোবিদের কয়েকটি রোগীর ইতিহাসের বিবরণ থেকে প্রেমজ নিউরোসিসের তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করব।

(ক) ২১।২২ বছরের একটি মেয়েকে তার মা নিয়ে এলেন চিকিৎসার জন্য। ঘুম হয় না, ক্ষিদে নেই, শীর্ণ-পাণ্ডুর চেহারা, বিষণ্ণতার প্রতিমূর্তি; কিন্তু চোখ দুটোতে অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য। দু'বার বি. এ. ফেল করেছে; অথচ ফেল করবার মত মেয়ে নয়, আগেকার পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। মা ও মেয়ে অন্য কোনো কারণ বললেন না। মেয়েটিকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেও পিতার মৃত্যু ছাড়া মানসিক আঘাতের আর কোনো হদিশ মিলল না। অনন্যোপায় হয়ে উপসর্গ উপশমের অভিভাবন দিতে হল। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য নতুন শর্তাধীন পরাবর্ত গঠনের চেষ্টাও চলল। মেয়েটির স্নায়ুতন্ত্র খুব দুর্বল নয়। বিষণ্ণতা কেটে গেল, পড়াশুনায় মন বসল, বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হল, মুখে হাসিও ফুটল। পরের বার মেয়েটি পরীক্ষায় কৃতকার্য হল। কিন্তু তার স্বভাব-চরিত্র ও ব্যবহারে এল অস্বাভাবিক পরিবর্তন। অনেকদিন পর্যন্ত এদের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার ফলে মেয়েটির

খবর মাঝে মাঝে পেতাম। সরল, নরম, হাসিখুশী স্বভাবের মেয়েটি ক্রমশ উগ্র, ঝাঁঝালো, সন্দেহবাতিকগ্রস্ত হয়ে উঠল। এদেরই এক আত্মীয়ের মুখে শুনলাম এই উপসর্গের মূলে ছিল ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী। আমার কাছে আসবার বছর তিনেক আগে মেয়েটি একটি ছেলের সঙ্গে প্রেমে পড়ে। প্রথম পুরুষের পদক্ষেপে কিশোরীর মনোমুকুল প্রস্ফুটিত হল। কাব্য করে আত্মীয়টি বললেন—যৌবন নিকুঞ্জে ফুল ফুটল, কোকিল ডাকল, মেয়েটি অভিভূত হল। প্রথম প্রেমের পরিণতি নিয়ে কিশোরী প্রেমিকা মোটেই মাথা ঘামালো না। বিবাহ সম্ভব নয়; কিন্তু ও অবস্থায় দুস্তর সাগর বা উত্তুঙ্গ পর্বতমালাও বাধা বলে মনে হয় না। কিছুদিন পরে মেয়েটি বুঝল, সে একজন 'প্রফেশনাল লাভারকে' ভালবেসেছে। তার মত প্রেমিকা পুরুষটির জীবনে আরও অনেক এসেছে এবং তখনও আসছে। কাজেই ঝগড়া হল। পুরুষটি মেয়েটির প্রথম প্রেমের উষ্ণতা উপভোগ করেছে, আর তাকে প্রয়োজন নেই। সে অন্য মেয়ের সঙ্গে (ওকে অপমান করার জন্যই) বেশী করে মিশতে লাগল। কিশোরীর মনে আঘাত লাগল। হীন চরিত্রের পুরুষের প্রতি আসক্তি এসেছিল,—এই চিন্তায় মেয়েটি মরমে মরে গেল। অথচ প্রথম প্রেমিকের প্রেমনিবেদন ভোলাও সহজ নয়; ঘটলো নিউরোসিস। এই অবস্থায় পরীক্ষায় ফেল করাই স্বাভাবিক। মেয়েটির সাময়িক রোগ উপসর্গ দূর হল বটে কিন্তু তার পুরুষের উপর বিদ্বেষ ও সন্দেহ স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেল। আসল ইতিহাস না জানার জন্য মেয়েটিকে সম্পূর্ণ সুস্থ সামাজিক করে গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। তার খবর এখনও পাই। সে বিয়ে করেনি, অসুখী অতৃপ্ত জীবন যাপন করছে।

(খ) ৩২ বছরের 'ল' বাবু এলেন চিকিৎসার জন্য। ঘুম হচ্ছে না, খিদে নেই, জীবনের প্রতি অনাসক্ত, কাজ কর্মে আগ্রহ নেই, ওজন কমে যাচ্ছে। ঘুমের বড়ি খেয়ে দু'বার আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছেন। ঘুমের ওষুধের মাত্রাধিক্যে সবসময় কথাবার্তা জড়ানো। চলতে গেলে টলে পড়ে যান। তিনি বললেন: 'আমাকে ভুলিয়ে দিন ডাক্তারবাবু, মেয়েটির চিন্তা থেকে আমাকে মুক্ত করুন, দিনরাত ওর চিন্তা আমাকে পেয়ে বসেছে, চোখের সামনে সবসময় ওর মুখ ভাসছে। তিনমাস আমি এক মুহূর্তের জন্যও অন্য চিন্তা মনে আনতে পারিনি। হয় ওর চিন্তা থেকে আমাকে মুক্ত করুন, না হলে জীবন থেকে আমাকে ছুটি দিন। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।' —এই ধরনের খেদোক্তির পর ভদ্রলোক জানালেন:

"মেয়েটিকে প্রথম দর্শনেই আমি ভালবাসলাম। আমি এক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের এক আঞ্চলিক শাখার সম্পাদক। গত নির্বাচনের সময় মেয়েটি আমাদের দলে যোগ দিল। আমার সঙ্গেই প্রথম যোগাযোগ ঘটল। আমার

প্রথম দর্শনের দুর্বলতা মেয়েটির কাছে অজানা রইল না। তার ভাবভঙ্গীতে অবহেলার ভাব ছিল না, বরং আমার পরোক্ষ প্রেম নিবেদন সে উপভোগই করত। অন্য সবার চেয়ে আমার দিকেই তার বেশি নজর ছিল। তার সহৃদয় ব্যবহার আমাকে ক্রমশ উৎসাহিত করে তুলল। একদিন তাকে না দেখলে আমি চোখে অন্ধকার দেখতাম, কাজকর্মে ভুল হত। মনে হত সব সময় আমার সামনে ও থাকুক, আমি দু'চোখ ভরে দেখি। মনে হত ওই আমার জীবন, ওর জন্যই বাঁচা। ওকে দেখলেই আমার দেহমন উদ্বেল হয়ে উঠত।

"কিছুদিন পর দেখলাম অন্য ছেলেদের দিকেও সে নজর দিচ্ছে। আমার সহকারীর প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব আমাকে অস্থির করে তুলল। ঈর্ষার আগুনে আমি পুড়তে লাগলাম। সহকারীর সঙ্গে ওকে হেসে কথা বলতে দেখলেই আমার চোখমুখ দিয়ে আগুন বেরুত। বুকের কাছে একটা ব্যথা বোধ করতাম। সহ্য করতে না পেরে একদিন স্পষ্টই ওকে বললাম: তুমি 'শ'র সঙ্গে অত মেলামেশা করছ—ওটা ভাল নয়, সকলের নজরে পড়েছে, তোমাদের মধ্যেকার সম্পর্ক সবাই বুঝতে পেরেছে। ব্যঙ্গ ভরে ও বলল: আপনার অত গায়ের জ্বালা কেন? আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, আমার কি করা উচিত আমি ঠিক জানি, দলের লোকদের এতে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। আরও বেশি করে সে ওর সঙ্গে ফ্লার্ট করতে শুরু করল। বুদ্ধি বিবেচনা সব হারিয়ে ফেললাম, কাজকর্মে অবহেলা সকলের নজরে পড়ল। অন্তরঙ্গ বন্ধুরা ওকে ভুলে যেতে পরামর্শ দিল; বলল, মেয়েটি তোমার উপযুক্ত নয়; রূপ, গুণ বা চমকপ্রদ কিছুই ওর নেই। থাকার মধ্যে আছে ফ্লার্ট করার ক্ষমতা।...আমি এসব বুঝি, তা সত্ত্বেও ভুলতে পারছি না; আমি অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি, পারবও না।"

থেমে থেমে কথাগুলো বলে ভদ্রলোক চুপ করলেন। উপযুক্ত অভিভাবনের ফলে ভদ্রলোক রোগ মুক্ত হলেন, মেয়েটিকে ভুলতে পারলেন।

এই কেসটি বিবৃত করার বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। প্রথম কেসে বর্ণিত মেয়েটি তার প্রেম-কাহিনী গোপন করেছিল; তাই প্রত্যক্ষ অভিভাবন দেওয়া সম্ভব হয়নি, এবং সে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারেনি। এখানে ভদ্রলোক অকপটে সবকিছু বললেন। তাঁর মেয়েটিকে ভুলে যাবার ইচ্ছায় আন্তরিকতা ছিল। তাই চিকিৎসায় এত সহজে সুফল পাওয়া গেল। কোনো কোনো চিকিৎসক মনে করেন যে প্রেমাস্পদকে ভুলে যাবার অভিভাবন কোনোক্রমেই কার্যকর হয় না।* ফোরেল

* It would be useless to suggest to a person in love hatred and antipathy for her or his lover, since the feeling of sexual love is much stronger than the influence of outside suggestion (Forel, 1910).

নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। আসলে যদি কেউ আন্তরিকভাবে প্রেমাস্পদকে ভুলতে না চায়—তবে শুধু অভিভাবনের সাহায্যে ফল হবে না। এছাড়া আগেই বলেছি, অতি দুর্বল মস্তিষ্কে যদি কোনো ধারণা একবার বদ্ধমূল হয়—সে ধারণা বা মনোভাব দূর করা বেশ কষ্টকর। এই ক্ষেত্রে রোগীকে তার পছন্দমত কোনো সামাজিক কাজের দায়িত্ব দিয়ে তাকে ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত করে তোলা হল চিকিৎসকের প্রাথমিক কর্তব্য। সামাজিক সম্পর্কের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, আন্তর্মানবিক সম্পর্কের মূল উদ্ঘাটন, সমাজে তার নিজস্ব মূল্য নির্ধারণ—এই সব ব্যাপারে তাকে সাহায্য না করে কেবলমাত্র "ভুলে যাওয়ার" অভিভাবন নিষ্ফল হতে বাধ্য। সব থেকে বড় কথা—নিজের ব্যক্তিত্ব ও কাজকর্মের গুরুত্ব সম্পর্কে তাকে অবহিত করা। প্রেমের প্রতিদান না পেলে সাধারণ হীনমন্যতার ভাব মনকে আচ্ছন্ন করে, চিকিৎসকের আশু কর্তব্য এই হীনমন্যতা থেকে তাকে মুক্ত করা।

অসমন্বিত বিবাহ প্রসঙ্গ

কোনোদিনই সব বিবাহ সমন্বিত ও সুখের ছিল না। আজ আগের থেকে দাম্পত্যজীবন অনেক বেশি অস্থির ও অসমন্বিত হয়ে উঠেছে। কারণ নিহিত রয়েছে সামাজিক অস্থিরতার মধ্যে, যৌন অতৃপ্তির মধ্যে নয়। স্ত্রীজাতির সমানাধিকার দাবী ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের সুযোগ বৃদ্ধির ফলে আজ বিবাহবন্ধনের সাত পাক খুলতে আর চোদ্দ পাকের প্রয়োজন হচ্ছে না।

আজেবাজে গল্প উপন্যাসে, মনস্তত্ত্বের পত্রপত্রিকায়, বিবাহিত নারীর জন্য পুরুষের প্রতি আসক্তির যেসব বিবরণ পাওয়া যায়, আমার অভিজ্ঞতা ও ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সেগুলো মেলে না। আধুনিকদের মধ্যে একদল মনে করেন, অসুখী দাম্পত্যজীবনের মূল কারণ স্বামী স্ত্রীর মধ্যেকার যৌনসম্পর্কের অসঙ্গতি। "ব্যাড সেক্স এ্যাড্জাষ্টমেণ্ট লিড্স টু ব্যাড ম্যারেজ।" আমার অভিজ্ঞতা উল্টো কথা বলে: "ব্যাড ম্যারেজ লিডস টু ব্যাড সেক্স এ্যাডজাষ্টমেণ্ট।" অসমন্বিত বিবাহের ফলেই যৌন সম্পর্কের অসমন্বয় ঘটে। সামগ্রিক জীবন যৌনজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, যৌনজীবন সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে না। বহু দম্পতির ঘরোয়া ও যৌনজীবনের ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করেই আমি এ সিদ্ধান্তে এসেছি।

সুখী ও সুস্থ বিবাহের প্রাথমিক শর্ত স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মানসিকতার পরিণত অবস্থা ও সংগতি। দুজনেরই একমত, একপথ, এক চিন্তা হবে—একথা বলছি না।

বাস্তবজীবনে সেরকম কদাচিৎ ঘটে, বা ঘটেই না। পরিণত ব্যক্তিত্বের অধিকারীরা পরস্পরকে বুঝতে পারার ফলে নিজেদের পার্থক্য সত্ত্বেও সহজেই সামঞ্জস্যবিধান করতে পারে। অপরিণত ব্যক্তিত্বের অধিকারীরা সেটা পারে না। শুধু বিবাহিত জীবনে নয়, সমাজজীবনেও এরা সুখ ও সাফল্যলাভ করতে পারে না। বহু ব্যাপারে মিল না থাকলেও পরিণত ব্যক্তিত্বের অধিকারীদের দাম্পত্যজীবন সুখের হয়ে থাকে। তবে মিল বা সঙ্গতি যত বেশি থাকবে দাম্পত্যজীবনে সুস্থতা ও শান্তি তত বেশি হবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তরুণ তরুণীরা প্রেম ও বাছাই করে বিবাহ করলেই যে বিবাহ স্থায়ী বা সুখের হবে, এমন নয়। কেন না সমাজের নিজস্ব অস্থিরতা, দ্বন্দ্ব, অবক্ষয়, ব্যক্তিকে ও বিবাহকে প্রভাবিত করবেই। সুস্থিত, সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজে পরিণত ব্যক্তিত্বের সংখ্যা বেশি থাকার দরুণ সুখী দাম্পত্যজীবনের সম্ভাবনা বেশি। এছাড়া, বহুকাল ধরে নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে সমাজের প্রায় সর্বস্তরে পুরুষ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর ফলে নারীর মনে বিষম প্রতিক্রিয়া ঘটেছে ও ঘটছে, এবং তার দরুণ আজ বিবাহিত জীবন প্রায় দেশেই অস্থির এবং অসুস্থ।

(গ) এবার একটি অসুখী বিবাহের কাহিনী বলছি। মেয়েটির নাম অঞ্জনা। হাসিখুশি নিটোল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ১৯/২০ বছরের মেয়ে, বিয়ের বছরখানেক পরেই অসুস্থ হয়ে পড়ল। দাঁতে ব্যথা, আর বাঁ পাটা অসাড় হয়ে যাচ্ছে। দাঁতের ডাক্তার, নিউরোলজিষ্ট ও অন্যান্য চিকিৎসকরা উপসর্গের কোনো কারণ খুঁজে পেলেন না। দাঁতগুলো পড়ে যাবে, সে বুড়ী হয়ে যাবে—এই ভয়ে সে আচ্ছন্ন। আরো বেশী ভয় পা অসাড় হয়ে যাবার; তা হলে শ্বশুরবাড়ীর কাজকর্ম সে করতে পারবে না। স্বামীর কাছে শুনলাম, সহবাস ইচ্ছা প্রথমে প্রবল ছিল, বর্তমানে ঐ ব্যাপারে উৎসাহ নেই। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেও কোনো মানসিক দ্বন্দ্ব বা আঘাতের খবর মিলল না। শুধু এইটুকু জানা গেল যে বিয়েতে মেয়েটি রাজী ছিল না; আর দাঁতের অসুখের ভয় বিয়ের আগে থেকেই ছিল। মেয়েটির দাঁতগুলি বেশ সুগঠিত ও হাসলে তাকে বেশ সুন্দর দেখায়। অন্য কারণ খুঁজে না পেয়ে বাধ্য হয়ে উপসর্গ নিরসনের অভিভাবন দিতে হল। মনে হল, বাপের বাড়ীর আদর যত্ন ও আকর্ষণ তাকে স্বামীর দিকে আকৃষ্ট হতে দিচ্ছে না। অভিভাবনে বলা হল—স্বামীর ওপর তার আকর্ষণ জন্মাবে, সংসারভীতি থাকবে না। ফল পাওয়া গেল। স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী যেতে সে রাজী হল। কিন্তু বছর দুয়েক পরে আবার পুরনো উপসর্গ নিয়ে হাজির। এর মধ্যে একটি সন্তান হয়েছে। স্বামীরও আগের থেকে ভাল লাগছে মেয়েটিকে। এবার মাসখানেক চিকিৎসার পর উপসর্গ কমল, ও আবার স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী ফিরে গেল। সংসারে বেশ মন বসেছে খবর

পেলাম। সহসা একদিন মেয়েটি এসে উপস্থিত ; এবার একলা। সমস্ত উপসর্গ ফিরে এসেছে, উপরন্তু একটি অজানা আশঙ্কায় সে অস্থির। তার স্বামীর চাকরীর ব্যাপারে কি একটা গোলযোগ ঘটেছে, সে বলল। স্বামীর চাকরি যাবে আর তার সংসারের সব কিছু জিনিষ কোম্পানি কেড়ে নিয়ে যাবে। ষ্টোরের হিসেবের কি একটা গোলমাল, তার স্বামী ষ্টোরকিপার। "এত সাধের সংসার কত করে আমি সাজিয়েছি, আমার সব কিছু চলে যাবে ডাক্তারবাবু!" —আর্ত ব্যাকুলতা ফুটে উঠল ওর চোখেমুখে। আমি অনেক সান্ত্বনা দিলাম। ভাবলাম, সত্যিই এতদিনে স্বামীর সংসারে ওর আসক্তি জন্মেছে, বাপের বাড়ীর টান কমে গেছে। সে চলে যাবার দুদিন পরেই স্বামী এসে হাজির। তার কাছে শুনলাম ও ঝগড়াঝাটি করে চলে এসেছে, চাকরির ব্যাপারে সত্যিই একটা গোলযোগ ঘটেছিল, তবে তা মিটে গেছে। এই ব্যাপার নিয়ে স্বামী একদিন বলেছিল যে, তার চাকরি গেলে ওরতো সুবিধেই হবে, বাপের বাড়ীতে স্থায়ী আড্ডা জমাতে পারবে। এই নিয়ে বচসা হল। স্বামীর মেজাজ খুব ঠাণ্ডা নয়, সে উত্তেজিত হয়ে স্ত্রীকে ধাক্কা মেরে ঘর থেকে বার করে দিল। তারপর মেয়েটি একলাই কলকাতায় চলে এসেছে। স্ত্রীকে রেখেই স্বামী কর্মস্থলে ফিরে গেল। এর দুদিন পরে অঞ্জনার নাটকীয় আবির্ভাব। চোখেমুখে অনিদ্রা ও দুশ্চিন্তার ছাপ, বেশবাস অবিন্যস্ত। এসেই বলল : "আমি এতদিন সব কথা গোপন করেছি ডাক্তারবাবু, আমি আজ সব কথা বলব। আপনাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে একথা অন্য কাউকে বলবেন না। ...আমি মোটেই ভাল মেয়ে নই। আপনি সব শুনে আমাকে ঘৃণা করবেন না : বলুন, আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না।" এই বলে সে আমার পা জড়িয়ে ধরল ; ওর দুচোখ বেয়ে জল পড়ছে, দেহ থর থর করে কাঁপছে। আমি অনেক করে আশ্বস্ত করার পর সে চেয়ারে বসে যা বলল তার সারাংশ এই :—ওর বয়স তখন ১৮ বছর। বঙ্কিমবাবু ওর থেকে অনেক বড়, প্রায় পঁয়ত্রিশ ; ওকে প্রাইভেট পড়াতে এলেন। তিনি বিবাহিত, ছেলে-মেয়ে অনেকগুলি। তিনি খুব যত্নের সঙ্গে পড়াতেন। তাঁকে ওর খুব ভাল লাগত। ক্রমশ তিনি পরিবারের বন্ধু হয়ে গেলেন। ওকে নিয়ে এদিক-ওদিক বেড়াতে যেতেন। একটু একটু করে তিনি অঞ্জনাকে প্রশংসা করতে শুরু করলেন,—রূপের প্রশংসা। ছোট্ট মেয়েদের যেমন বড়রা প্রশংসা করে। আদর আর প্রশংসা ক্রমে মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। অঞ্জনা প্রশংসা আর আদরে গলে যেত। সে ভদ্রলোককে ভালবেসে ফেললো।....পরীক্ষাতে ভাল ফল হওয়াতে বঙ্কিমবাবুর ওপর ওর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আরও বেড়ে গেল। কোনো কারণে তিনি একদিন না এলে ওর রাগ হয়। তিনি শ্বশুরবাড়ী বা স্ত্রীর সম্বন্ধে কোনো কিছু বললে হিংসে হত। বাড়ীর লোকেরা বোধহয় কিছুটা সন্দেহ করলেন।

ওকে বিয়ে দেবার তোড়জোড় চলল। প্রথমটায় ও বেঁকে বসেছিল। বঙ্কিমবাবুর দাঁতের অসুখের জন্য ওর মন তখন উদ্বিগ্ন। ও খুবই বিস্মিত হল আর দুঃখ পেল, যখন দেখল, বিয়ের ব্যাপারে মাষ্টারমশাই অর্থাৎ বঙ্কিমবাবুই উদ্যোগী হয়ে সম্বন্ধ ঠিক করে ফেলেছেন। অভিমানে ও রাগের বশে ও বিয়েতে মত দিয়ে বসল। তখন থেকেই দাঁতের ব্যথার সূত্রপাত। বিয়ে হয়ে গেল। পায়ের একটা যন্ত্রণার জন্য বঙ্কিমবাবু বিয়েতে আসতে পারলেন না। এরপর থেকে ওর পায়ের অসাড় ভাবের আবির্ভাব। ......"আমি বঙ্কিমবাবুকে ঘৃণা করি ডাক্তারবাবু, ভালবাসতে চাই না। আমার স্বামীকে আমি একান্তভাবে ভালবাসতে চাই—দেহমন সর্বস্ব দিয়ে ভালবাসতে চাই। পারি না কেন? স্বামী আমার জন্য কত খরচ করছেন, আমার জন্য কত দুঃখ সইছেন। আমার গায়ে হাত তুলেছেন কিন্তু আমি দোষ দিতে পারি না। আমি তাঁকে সর্বস্ব দিতে পারি না কেন?"—করুণভাবে কেঁদে উঠল মেয়েটি কথাগুলো বলতে বলতে। তারপর পেটে হাত চেপে শুয়ে পড়ল। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল, ডান-দিকের তলপেটে অসহ্য যন্ত্রণা। ওর স্বামীরও পেটে ঐ জায়গায় মাঝে মাঝে তীব্র যন্ত্রণা হয়, আমি জানতাম।

স্বামী ও স্ত্রীর মানসিকতার বৈষম্য, রুচি সংস্কৃতির পার্থক্য এবং দুই পরিবারের জীবনযাত্রায় দু'ধরনের মান—এই অসুখী বিবাহের কারণ। মেয়েটি পিতামাতার কনিষ্ঠ সন্তান হওয়ার দরুণ খুবই আদরে লালিত; তাদের পরিবার স্বামীর পরিবারের তুলনায় অনেক উদার ও আধুনিক মনোভাবাপন্ন। স্বামী ভালমানুষ কিন্তু সংরক্ষণশীল; স্ত্রীকে ভালবাসে কিন্তু মর্যাদা দিতে চান না। তার মনে আবেগ কল্পনার স্বল্পতার দরুণ স্ত্রীকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না, অঞ্জনার মনে বঙ্কিমবাবুর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল, প্রেম ছিল না; স্বামীকে ভালবাসে, কিন্তু শ্রদ্ধা করতে পারছে না। স্বামীর কাছে অপমানিত হয়ে কুমারী জীবনে ফিরে যাবার ইচ্ছে হয়, তার ফলে কৈশোরের শ্রদ্ধাস্পদ মাষ্টারমশাইকে প্রেমিক কল্পনা করে। তার বিবরণী ভ্রান্তিমূলক (ডিলিউশন), পরের কয়েকদিনের আলোচনায় সে সেটা বুঝতে পারে।

অঞ্জনার মস্তিষ্কে প্রথম সাংকেতিকতন্ত্রের প্রাধান্য, সে হিষ্টিরিক টাইপও অত্যন্ত অভিভাবনশীল। স্ব-অভিভাবনের (autosuggestion) ওর মধ্যে প্রথমে মাষ্টারমশায়ের রোগ উপসর্গ ও পরবর্তীকালে স্বামীর রোগ উপসর্গ দেখা দিয়েছে। একদিকে কুমারী জীবনে ফিরে যাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, আবার অন্যদিকে আন্তরিক ইচ্ছে স্বামীর কাছে পুরোপুরি আত্মনিবেদন করার। এই মানসিক দ্বন্দ্ব ওকে অসুস্থ করেছে। দুই জনের সঙ্গে একাত্মীভবনের চেষ্টায় ওর শরীরে দুই জনেরই রোগ উপসর্গ দেখা দিয়েছে। মানসিক যন্ত্রণা রোগ যন্ত্রণায় রূপান্তরিত হয়েছে।

প্রথমদিকে যদি মনের কথা অকপটে খুলে বলত, মনে হয় এতদিন ধরে ওকে যন্ত্রণা সহ করতে হত না।

অমূলপ্রত্যক্ষ (Hallucination)

'হ্যালুসিনেশন' ও 'ডিলুইশনের' শারীরবৃত্তিক ও বিকারতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। আমরা প্রথমে 'হ্যালুসিনেশন' (বাংলায় বলা হয় মায়া বা অমূলপ্রত্যক্ষ) নিয়ে আলোচনা করব, পরে 'ডিলুইশন' (বাংলায়—মোহ বা ভ্রান্তি) এর শারীরবৃত্ত ও বিকারতত্ত্ব বোঝাবার চেষ্টা করব।

আমরা জানি, উপলব্ধির বস্তু সব সময়েই মস্তিষ্কে একটা ছাপ রেখে যায়। কোনো কিছু দেখলে বা শুনলে, তার স্পষ্ট বা অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব মনের মধ্যে জেগে থাকে ;—বহির্বাস্তবের প্রতিফলনের মূর্ত উপলব্ধি। বাক্-স্ফূর্তির পর শিশুর প্রতিবিম্বের জগৎ বাড়তে থাকে। ভাষার সাহায্যে মূর্ত উপলব্ধিগুলোকে সামান্যীকৃত করা চলে। একই ধরনের প্রতিবিম্বকে এক সাধারণ নামে অভিহিত করা যায়। এইভাবে সাধারণ ধারণা বা কল্পনার উদয় ঘটে ; মূর্ত ধারণা সামান্যীকরণ ও বিমূর্তকরণের ফলে 'কনসেপ্টে' পরিণত হয়। 'কনসেপ্ট' বা প্রত্যয়ের সাহায্যে আমরা বিভিন্ন বস্তু বা ঘটনার মধ্যেকার সম্পর্ক বুঝতে পারি, এছাড়া এমন অনেক কিছু জানতে পারি যা প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রিয়গোচর হতে পারে না ; কেবলমাত্র ভাষার সাহায্যে সেগুলো প্রকাশ করা চলে। 'গাছ' বা 'চেয়ার' বলতে যে সামান্য বিমূর্ত কল্পনার প্রকাশ, প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূত কোনো বিশেষ ছবির সঙ্গে তাকে মেলানো চলে না। অথচ সবরকমের চেয়ার বা গাছের সঙ্গে তার সম্পর্ক থেকে যায়। এই সাধারণ মূর্তি ও বিমূর্ত কল্পনা সৃষ্টি দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

এরপর বিচারক্ষমতার উন্মেষ ঘটে। সংবেদন, উপলব্ধি, প্রত্যয়, সর্বোপরি বিচার-ক্ষমতা ;—এই নিয়ে মানুষের অবধারণার জগৎ। 'আকাশে মেঘ জমেছে, বৃষ্টি হতে পারে', 'ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে, হয়ত কোথাও আগুন লেগেছে'—এই ধরনের কথাবার্তার মধ্যে মানুষের বিচার-ক্ষমতার পরিচয় মেলে। মায়া-মোহ ইত্যাদির বিকারতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় স্বাভাবিক অবধারণার শারীরবৃত্তের জ্ঞান অপরিহার্য, তাই এই ভূমিকা।

'হ্যালুসিনেশন' বা অমূলপ্রত্যক্ষের বিকারতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার আগে বোঝা দরকার ব্যাপারটা কি ? ভুল দেখা বা ভুল শোনা বললে সবটা বলা হয় না। 'ইলিউশন'-এর প্রতিশব্দও মায়া, 'ইলিউশন' ও 'হ্যালুসিনেশন'-এর মত উপলব্ধির বিশৃঙ্খলা। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে আছে মৌলিক পার্থক্য। সুস্থ স্বাভাবিক মানুষেরও দৃষ্টিবিভ্রম শ্রুতিবিভ্রম ঘটতে পারে ; দৃষ্টি বা শ্রুতির বিশৃঙ্খলা মাত্রেই

'হ্যালুসিনেশন' নয়। 'অপটিক্যাল ইলিউশন'-এর সঙ্গে স্কুলের ছাত্ররাও পরিচিত। একটা লাঠিকে জলে ডুবিয়ে রাখলে ভাঙ্গা মনে হয়; জলের ভিতরের ও বাইরের অংশ আর অবিচ্ছিন্ন মনে হয় না। জল ও বাতাসের প্রতিসরাঙ্ক (রিফ্রাকটিভ ইনডেক্স) আলাদা হবার দরুন এইরকম দেখায়। অমনোযোগিতার দরুনও উপলব্ধির বিভ্রম ঘটতে পারে। আলো কম থাকলে আমরা আগন্তুককে পরিচিত ব্যক্তি বলে ভুল করতে পারি। শোনার গণ্ডগোল হলে আমরা পরিচিত শব্দকে অপরিচিত বলে মনে করতে পারি: এ-রকম ঘটে উদ্দীপনার মাত্রাল্পতার জন্য। ক্রোধ বা ভয়ের বশবর্তী হয়েও আমরা ভুল শুনে থাকি, ভুল দেখে থাকি। মানসিক রোগেও এই রকমের 'ইলিউশনের' সৃষ্টি হতে পারে। আবার শারীরিক পীড়াতে যদি কোনো কারণে চৈতন্যের বিশৃঙ্খলা ঘটে, তা হলেও দৃষ্টিবিভ্রম, শ্রুতিবিভ্রম ঘটতে পারে। এই সব ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়প্রান্তিক উদ্দীপনার বস্তুর অবস্থিতি রয়েছে, কিন্তু বস্তুটির উপলব্ধি ঠিকমত হচ্ছে না। ডাক্তারকে হয়ত খুনী মনে করে এবং স্টেথসকোপকে পিস্তল ভেবে রোগী ভয়ে আঁতকে উঠছে। 'হ্যালুসিনেশন'-এর ক্ষেত্রে উদ্দীপকের অবস্থিতির প্রয়োজন হয় না। দুই-ই উপলব্ধির গোলমাল: 'ইলিউশনের' বেলায় উপলব্ধির মূলে উদ্দীপক আছে, 'হ্যালুসিনেশনের বেলায়—ইন্দ্রিয়প্রান্তকে উত্তেজিত বা উদ্দীপ্ত করার কোনো বস্তু নেই—উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষের কোনো মূল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু 'হ্যালুসিনেশনের' রোগীর কাছে উপলব্ধি কখনও ভ্রান্ত মনে হয় না।

'অইতো সে দেখতে পাচ্ছে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তার মৃতা স্ত্রী জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে; এইমাত্র সরে গেল।' আতঙ্কের দৃষ্টিতে জানালার দিকে তাকিয়ে 'হ্যালুসিনেশনের' রোগী এইরকম বলবে, অথবা অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে থাকবে। শ্রুতিজনিত অমূল-প্রত্যক্ষের (অডিটারি হ্যালুসিনেশন) রোগী কান চেপে ধরে ফিসফিস করে বলবে—'শুনতে পাচ্ছেন, ওরা সুরু করে দিয়েছে; বলছে ফিরে যাও, তোমার নিজের দেশে ফিরে যাও। ওইতো ঘরের বাইরে থেকে ওরা আমার নাম করে ডাকছে, আর ফিরে যেতে বলছে।' 'হ্যালুসিনেশন'-এর প্রকৃতি অনুযায়ী রোগীর ব্যবহার পাল্টায়। রোগী উত্তেজিত হতে পারে, ভয় পেতে পারে, আনন্দে অধীর হয়ে দুহাত তুলে নৃত্যগীত শুরু করে দিতে পারে। সুস্থ লোকের এ রকম ঘটতে দেখা যায় না। 'হ্যালুসিনেশন' বেশির ভাগ সময়েই অসুস্থতার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং কোনো সময়েই ভ্রান্ত উপলব্ধির জন্য দায়ী বস্তু রোগীর দৃষ্টিপথে, শ্রুতিপথে থাকে না। কিছু অসুস্থ লোক দৃষ্টিমায়া শ্রুতিমায়ার দৌলতে অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে প্রসিদ্ধি লাভ করে থাকেন। তাঁদের দাবী সম্পর্কে কোনোরকম

বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধান চালানো হয়েছে বলে শুনিনি। প্রায় সকল ধর্মের আদিগুরু ও প্রচারকরা শ্রুতি ও দৃষ্টিজনিত অমূলপ্রত্যক্ষ ক্ষমতার কথা বলেছেন ও এই ক্ষমতার বলে সাধারণের কাছে শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন; ঈশ্বরকে দেখা ও তাঁর বাণী শ্রবণ করার জন্যেই তাঁরা ঈশ্বরের প্রেরিত বা নির্ধারিত প্রতিনিধি বলে বিবেচিত হয়েছেন।

আগেই বলেছি, 'হ্যালুসিনেশন'-এর বিকারতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় নানা মুনির নানা মত।

ইন্দ্রিয়ের প্রান্তস্থ গ্রাহী অংশের অসুস্থতা বা বিশৃঙ্খলার জন্যে দৃষ্টিবিভ্রম, শ্রুতিবিভ্রম ইত্যাদি ঘটে থাকে;—এই ছিল এক সময়কার প্রচলিত ধারণা। আধুনিক গবেষণার এই তত্ত্ব অগ্রাহ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। 'হ্যালুসিনেশন'-এর রোগীদের স্পর্শেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়ের কোনো ত্রুটি পরীক্ষায় ধরা পড়েনি। অডিটারী (শ্রবণসম্পর্কিত) নার্ভ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার পরও শ্রুতিজনিত 'হ্যালুসিনেশন' থেকে যায়; অন্ধ দর্শন-ইন্দ্রিয়ভিত্তিক 'হ্যালুসিনেশনে' ভুগে থাকে—এই থেকে প্রান্তিক তত্ত্বকে (পেরিফেরাল থিওরি) সম্পূর্ণভাবে নাকচ করা যেতে পারে।

জার্মান মনোরোগবিদ ভার্ণিকের কেন্দ্রীয় তত্ত্ব (সেণ্ট্রাল থিওরি) অনুযায়ী 'হ্যালুসিনেশন'-এর জন্য দায়ী মস্তিষ্কত্বকের কোষবিশেষের উত্তেজনা। দর্শন কেন্দ্রের কোষগুলোর উত্তেজনা থেকে 'ভিসুয়াল হ্যালুসিনেশন' বা দৃষ্টিসম্পর্কিত মায়া, শ্রবণকেন্দ্রের কোষের উত্তেজনা আনে শ্রবণসম্পর্কিত মায়া। বিভিন্ন ইন্দ্রিয় কেন্দ্রে তড়িৎপ্রবাহ পাঠিয়ে বিভিন্ন ধরনের 'হ্যালুসিনেশন' বা দৃষ্টিবিভ্রম সৃষ্টি করা যায়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী শারীরবৃত্তিক ব্যাখ্যা, অর্থাৎ কি ঘটছে সেটা জানা গেল, কিন্তু কেন ঘটছে সেটা বোঝা গেল না।

এরপর পাভলভ ও তাঁর সহযোগীদের আবিষ্ক্রিয়া 'হ্যালুসিনেশন' বুঝতে আরো খানিকটা সাহায্য করেছে। স্বপ্ন ও মায়ার ব্যাখ্যায় পাভলভের 'সম্মোহন পর্ব' (হিপনটিক ফেজ) ও 'প্রহরীস্তম্ভ' (গার্ড-পোস্ট) মতবাদ বিশেষ উপযোগী। নিদ্রাকালীন নিস্তেজনায় মস্তিষ্কের সব কোষ সমানভাবে প্রভাবিত হয় না। কিছুসংখ্যক কোষের নিস্তেজনার মাত্রা কম থাকে, কিছুসংখ্যক হয়ত আদৌ নিস্তেজিত হয় না। সেই সব জায়গায় উত্তেজনার আধিক্য দেখা যায়। এই জায়গাগুলোকে পাভলভ 'গার্ড পোস্ট' বা প্রহরীস্তম্ভ নাম দিয়েছেন। স্বপ্ন ও মায়ার মূলে আছে এই অতিনিস্তেজিত ও উত্তেজিত কোষগুলোর ক্রিয়া-প্রক্রিয়া। পরবর্তীকালে ঔষধ প্রয়োগে কোষগুলোর উত্তেজনার জড়ত্ব বা অনড়ত্ব দূর করার ফলে অনেক ক্ষেত্রে স্বপ্ন বা মায়া দূর করা সম্ভব হয়েছে। পাভলভের মতবাদ এইভাবে সমর্থিত হয়েছে।

ঘুমের অবস্থায় স্বপ্ন আর জাগ্রত অবস্থায় মায়া (হ্যালুসিনেশন), পাভলভের মতে একেই ধরনের শারীরবৃত্তিক ব্যাপার। সম্মোহনের বিভিন্ন দশা বা পর্বের মতবাদ মায়ার বিকারতত্ত্বের উপর আরো খানিকটা আলোকপাত করেছে। জাগ্রত অবস্থায় সব কোষগুলো সমানভাবে জেগে থাকে না ; কিছুসংখ্যক কোষ আধাজাগ্রত আধাঘুমন্ত অবস্থা (উত্তেজনা-নিস্তেজনার মাঝামাঝি) থেকে ক্রমশ পুরো ঘুমন্ত অবস্থার দিকে যেতে থাকে। এই কোষগুলোর জাগ্রত থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় পরিবৃত্তির প্রধান তিনটি পর্বের কথা আগে উল্লেখ করেছি। দ্বিতীয় পর্ব (যাকে বলা হয়, 'প্যারাডক্সিক্যাল ফেজ' বা স্ববিরোধী পর্ব) স্নায়ুতন্ত্রের শক্তিমান উদ্দীপনায় সাড়া দেয় না, অথচ অতি দুর্বল উদ্দীপনায় উত্তেজিত হয়। বহির্বাস্তবের জোরালো উদ্দীপনা - যা মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হয়ে স্বাভাবিক উপলব্ধি ঘটায়, এখন শক্তিহীন। অনেক আগেকার উপলব্ধির ছাপ বা প্রতিবিম্ব, যা স্বাভাবিক অবস্থায় শক্তিহীন, এখন শক্তিশালী হয়ে মায়া বা অলীক উপলব্ধির সৃষ্টি করেছে। শুধু তাই নয়, উপলব্ধ বস্তু বহির্জগতে অভিক্ষিপ্ত হয়ে অলীক উপলব্ধির বাস্তব অস্তিত্ব সম্পর্কে রোগীর মনে দৃঢ়প্রত্যয় এনে দিচ্ছে। স্বপ্ন ও মায়ার মধ্যেকার আসল পার্থক্য সকলেরই জানা। সুস্থ অসুস্থ সব মানুষই স্বপ্ন দেখে, কিন্তু মায়া বা 'হ্যালুসিনেশন' প্রায়শই অসুস্থ মস্তিষ্কের ধর্ম।

শ্রুতিবিভ্রমের রোগীর সাক্ষাৎ আমরা বেশি পেয়ে থাকি। এদের নিয়ে গবেষণাও বেশি হয়েছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে জানা গেছে যে প্রথম সাংকেতিক স্তরের উত্তেজনা প্রক্রিয়ার জড়ত্ব, 'প্যারাডক্সিক্যাল' পর্বের আবির্ভাব এবং শ্রবণকেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত ও দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের কিছু কোষের বিকার, এই তিন কারণে শ্রবণভিত্তিক 'হ্যালুসিনেশন' সৃষ্টি হয়।

এইবার সমরবাবুর কাহিনী থেকে 'হ্যালুসিনেশন'-এর মনস্তাত্ত্বিক কারণ বোঝাবার চেষ্টা করা হবে।

সমরবাবুর বয়স বত্রিশ। স্ত্রীর সঙ্গে চিকিৎসার জন্য এলেন। সঠিকভাবে বলতে গেলে বলা উচিত, স্ত্রী সমরবাবুকে একরকম জোর করে নিয়ে এলেন। সমরবাবু শ্রুতিবিভ্রমে ভুগছেন, কিন্তু তিনি সেকথা স্বীকার করেন না। তিনি মনে করেন, এই রকম কথা বা নির্দেশ সবার কানেই আসছে। তিনি বিশেষ ক্ষমতায় অধিকারী হবার দরুণ নির্দেশগুলো শুনতে পাচ্ছেন, অন্যেরা শুনছেন না বা শোনার চেষ্টা করছেন না। তাঁর দু'একজন বন্ধুও নাকি নির্দেশ শুনে থাকেন।

সমরবাবু এক সরকারী সংস্থার গুদামরক্ষক ছিলেন। তিন বছর হল সেই গুদামের কিছু মাল চুরি হয় বা মালের হিসেব মেলে না। সেই সময় থেকে তিনি কথা বা নির্দেশ শুনতে পাচ্ছেন। প্রথম দিকে শুনতেন, পাশের ফ্ল্যাটের

লোকেরা তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করছে। এক রাত্রে পাশের ফ্লাটে গিয়ে তিনি চেঁচামেচি হৈ-হল্লা করেন, তাঁকে জোর করে নিজের ফ্লাটে ফিরিয়ে আনতে হয়। এর পর থেকে চিকিৎসা আরম্ভ হয়। প্রথম দিকে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। তাঁর স্ত্রীর মুখে শুনলাম 'ট্রাংকুইলাইজার' জাতীয় ওষুধে নাকি তাঁর উত্তেজনা বেড়ে যেত, তাই হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা চলতে থাকে। হোমিওপ্যাথিতে কিছু ফল পাওয়া যায়। মাথা ঠাণ্ডা হল, রাগ কমল। কিন্তু কথা বা নির্দেশ তিনি শুনতেই থাকলেন। এখন আর পাশের ফ্ল্যাটে নয়, তাঁর সম্বন্ধে কোনো মানহানিকর আলোচনাও নয়; কথাগুলো আসতে থাকল অনেক দূর থেকে, নির্দিষ্ট কতকগুলো নির্দেশের আকারে—কাজেই আবার এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা সুরু হল। এবার তাঁকে রাখা হল 'সিকিয়াট্রিস্ট'-এর চিকিৎসাধীনে। কিন্তু এবারও 'ট্রাংকুলিজারে' মাথা গরম হল, উত্তেজনা বাড়ল। আবার হোমিওপ্যাথিতে যেতে হোল।

এই তিন বছরে তাঁকে দুবার বদলী করা হয়েছে। এখন আর তিনি গুদাম-রক্ষক নন, গুদামের একজন কেরাণী। মাল চুরির ফয়সলা একরকম হয়ে গেছে। বিভাগীয় তদন্তে কয়েকজন অল্পবিস্তর শাস্তি পেয়েছে। সমরবাবুর বিরুদ্ধে কোন চার্জ টেকেনি; তবে হয়রানি হয়েছে প্রচুর। প্রথমদিকে সাময়িক-ভাবে বরখাস্ত করা হয়েছিল, পরে আবার তাঁকে চাকরীতে নিয়োগ করা হয়েছে। প্রথমদিকে কয়েক মাস অসুস্থতার জন্য তিনি নিয়মিত অফিসে যেতে পারেননি। এখন নিয়মিত অফিসে যান। সেখানেও নির্দেশ শোনেন, বাড়ীতে এসেও নির্দেশ শোনেন। মাঝে মাঝে রাস্তার লোকেরা তাঁর পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁর সম্বন্ধে দু'একটা খারাপ কথা বলে যায়। সেই সময় তিনি উত্তেজিত হয়ে তাদের পিছু পিছু হাঁটতে থাকেন, অথবা মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলেন, তবে আগের মত রেগে গিয়ে গালমন্দ করেন না। রাত্রে প্রায়ই জেগে জেগে দূরাগত নির্দেশ শুনতে থাকেন।

আমার সামনে বসেও তিনি বললেন, তিনি নির্দেশ শুনতে পাচ্ছেন। কি ধরনের নির্দেশ? এক এক সময় এক এক ধরনের নির্দেশ শোনা যায়। একটি বা দুটি কথায় বহুদূর থেকে তাকে সাবধান করে দেওয়া হয়। সব সময়েই ইংরেজীতে নির্দেশ আসে। 'হল্ট'! 'সাইলেন্স'! 'লভ্ দাই নেবার'! এই তিনটি নির্দেশই আজকাল বেশি শুনছেন। এর আগে শুনতেন অন্য ধরনের নির্দেশ। 'গো এ্যাহেড'—এগিয়ে যাও! এই নির্দেশটি বছরখানেক আগে শুনতেন। তার আগে আরো অনেক ধরনের কথা শুনেছেন; সব এখন মনে নেই।

প্রথমদিকে কি শুনতেন? অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারলেন না। স্ত্রীর কাছে জানলাম, তখন তিনি মাল চুরির ব্যাপার নিয়ে অনেক কথা শুনতেন।

কোনো সময় শুনতেন যে প্রতিবেশীরা তাঁকে দোষী মনে করছে, কোনো সময় আসল অপরাধীদের নাম তাঁর কানে বাতাসে ভেসে আসত। কোনো সময় আবার কে বা কারা যেন তাঁকে অন্যকে আঘাত করার নির্দেশ জানাত। বিভাগীয় তদন্তের পর আর এ ধরনের কথাবার্তা তিনি শুনতেন না। এখন যা শুনছেন তা অনেক দূর থেকে আসছে, মৃদু কিন্তু স্পষ্ট।

ভদ্রলোকের সঙ্গে তিনবার সাক্ষাৎকারের পরও তাঁকে বোঝাতে পারলাম না যে তিনি ভুল শুনছেন। তবে এই নির্দেশ তাকে চঞ্চল করে, অস্থির করে, একথা তিনি স্বীকার করলেন। এই নির্দেশ বন্ধ করলে তিনি অখুশী হবেন না। এই নির্দেশের সঙ্গে মাল চুরির ব্যাপারের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে, তিনি মানতে চাইলেন না।

সমরবাবুকে দেখে মনে হবে তিনি শান্তশিষ্ট স্বভাবের নির্বিরোধী মানুষ। চিকিৎসার প্রয়োজন নেই জেনেও স্ত্রীর অনুরোধে চিকিৎসা করতে এসেছেন। স্ত্রীর উপর বিশেষ নির্ভরশীল। স্ত্রীকে মাঝে মাঝে আঘাত করতে চেয়েছেন (রোগের প্রথম দিকে), কিন্তু কোনোদিন আঘাত করেননি। ওষুধপত্র স্ত্রীর নির্দেশে নিয়মিত খেয়ে আসছেন। এঁরা নিঃসন্তান। প্রায় আট বছর হল বিয়ে হয়েছে।

সমরবাবু শৈশবে বাবা-মাকে হারিয়ে মিশনারীদের কাছে মানুষ হন। তাঁর স্ত্রীও তাঁরই মত মিশনারীদের বোর্ডিং স্কুলে থেকেছেন। দুজনেরই-শৈশব কৈশোর বাংলার বাইরে কেটেছে। এঁরা দীক্ষিত নন, কিন্তু নিয়মিত বাইবেল পড়েন। একটা ছোট শহরের শান্ত পরিবেশে দিন কাটিয়ে কোলকাতা এঁদের কারুরই ভাল লাগছে না। আত্মীয়স্বজন বলতে বিশেষ কেউ আছেন বলে মনে হয় না। অসুস্থ, অস্থিরমতি স্বামীকে এই তিন বছর ধরে ভদ্রমহিলা একাই সামলে এসেছেন। সে যে কত কঠিন কাজ সেটা আমি বুঝি।

সমরবাবু কোনো কিছু বলতে চান না। স্ত্রীর বয়স অল্প, তাঁর কাছ থেকে এঁদের পারিবারিক ইতিহাস বেশী কিছু পাওয়া গেল না। আমার কাছে এঁরা যেন কিছু কথা গোপন করতে চান। ওষুধে কাজ হয় না কেন? —স্ত্রীর এই অনুযোগ। আর স্বামী ত' ধরেই নিয়েছেন দূরাগত বাণী সবার কাছেই আসছে। কিন্তু শোনার বা বোঝার সৌভাগ্য সকলের হয় না। এদিক থেকে তিনি অন্যের থেকে বিশিষ্ট শক্তির অধিকারী।

চতুর্থদিনে সমরবাবু মুখ খুললেন। খুব অল্পমাত্রায় ট্রাংকুইলিজারে কাজ হয়েছে মনে হল। আগে মাথা ঠাণ্ডা করার ওষুধ খেয়ে মাথা গরম হয়েছে, উত্তেজনা বেড়েছে, শুনেই আমি বুঝেছিলাম ভদ্রলোকের মস্তিষ্ক কোষগুলোর কিছু অংশ স্ববিরোধী (প্যারাডক্সিকাল) অবস্থায় রয়েছে; তাই স্বাভাবিক মাত্রার

ওষুধে বিপরীত ফল হয়েছে। সমরবাবু দূরাগত নির্দেশের উৎস সম্পর্কে আমাকে অবহিত করলেন।

মধ্য ভারতের এক ছোট শহরের গির্জা সংলগ্ন কবরখানা থেকে নির্দেশবাণী ধ্বনিত হচ্ছে। ফাদার ড্যানিয়েলের সমাধি থেকে নির্দেশ আসছে। এ গোপন কথা তিনি বিশ্বাস করে শুধু আমাকেই জানালেন। অন্য কাউকে একথা জানালে নরকের আগুনে জ্বলে মরতে হবে। কাল রাতে সমরবাবু আমাকে গোপন কথা জানাবার নির্দেশ পেয়েছেন। নীলাকে অর্থাৎ স্ত্রীকে এখনো জানানো চলবে না। আরো অনুতাপ, আরো শুদ্ধির পর নীলা একথা জানার অধিকারী হবে।

সমরবাবু শুধু মায়া নয়, মোহেও আচ্ছন্ন ; হ্যালুসিনেশন ও ডিলুইশন—দুই-ই সমরবাবুকে পীড়িত করছে। রোগ-বৃত্তান্ত নিয়ে অগ্রসর হবার আগে 'ডিলুইশন'-এর স্বরূপ জানা দরকার।

মোহ ও ভ্রান্তি (Delusion)

'ডিলুইশন' (বাংলায়—মোহ বা ভ্রান্তি) রোগগ্রস্তের মিথ্যা ধারণা ও মতামত। এই মিথ্যা ধারণা তর্ক করে বা ন্যায়শাস্ত্রের দোহাই পেড়ে দূর করা যায় না। বস্তুর সঠিক বিন্যাস ও অবস্থান দেখেও 'ডিলুইশন'-এর রোগী তার ভ্রান্তিকে আঁকড়ে ধরে থাকে। বাস্তবের বিকৃত প্রতিফলন থেকে ভ্রান্তির সৃষ্টি। অনেকে মোহ বা ভ্রান্তিকে প্রধানত প্রাথমিক ও আনুষঙ্গিক—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। মায়ার (হ্যালুসিনেশনের) সঙ্গে সম্পর্কিত ভ্রান্তিকে বলা হয় আনুষঙ্গিক বা সেকেণ্ডারী। সমরবাবুর ভ্রান্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ে।

ভ্রান্তি অন্যদিক থেকে আবার সংবেদনমূলক ও ব্যাখ্যামূলক—এই দুই ভাগে বিভক্ত। সংবেদনমূলক ভ্রান্তি মূর্ত, স্পষ্ট, প্রথম সাংকেতিক স্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত, আর ব্যাখ্যামূলক ভ্রান্তি যুক্তিতর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, বিমূর্ত চিন্তারাজ্যের ব্যাপার, দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত।

আমরা আত্মপ্রাসঙ্গিক ভ্রান্তি (ডিলুইশন অফ রেফারেন্স) ও নির্যাতনমূলক ভ্রান্তির (ডিলুইশন অফ পারসিকিউশন) সঙ্গে সব থেকে বেশি পরিচিত।

আত্মপ্রাসঙ্গিক 'ডিলুইশন'-এর রোগী মনে করে আশেপাশের সব কিছুই তার সঙ্গে সম্পর্কিত। সবাই তাকে দেখছে, তার সম্বন্ধে কথা বলছে, তাকে নিয়েই আলোচনা করছে, তার কথা ভেবেই অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করছে। চেনা-অচেনা সকলেই তার প্রসঙ্গেই মত্ত। ও কেন তার দিকে তাকিয়ে হাসল? ওরা কানে কানে কি কথা বলল। নিশ্চয়ই আমাকে নিয়ে কথা বলছে। সিগারেটের ধোঁয়ায় রিং তৈরীর ওর কি সত্যি দরকার ছিল? নিশ্চয়ই আমাকে উদ্দেশ্য করেই রিং তৈরী করেছে। ও সেদিন বাঁ হাত দিয়ে আমার চাবিটা নিল,

আমাকে অশ্রদ্ধা দেখানোর জন্য নিশ্চয়ই। ঘরে ঢুকেই দেখলাম সবাই হাসি
থামিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে আছে ; এর নিশ্চয়ই একটা অর্থ আছে। এইরকম
নানাভাবে আত্মপ্রাসঙ্গিক ভ্রান্তির উপসর্গ রোগীর কথাবার্তায় বেরিয়ে আসে।
অতি তুচ্ছ বা সাধারণ ঘটনাকে বিকৃত করে তার থেকে আত্মপ্রাসঙ্গিক তাৎপর্যপূর্ণ
অর্থ বের করে 'ডিলুইশন'-এর রোগী।

নির্যাতনমূলক ভ্রান্তি প্রথমদিকে আত্মপ্রাসঙ্গিক রূপে দেখা দিয়ে পরে আরো
জটিল রূপ ধারণ করে। সমরবাবু 'হ্যালুশিনেশন'-এর সঙ্গে নির্যাতনমূলক ভ্রান্তিতে
ভুগছেন।

ভুল বিশ্বাস, ভ্রান্তি, মোহ (ডিলুইশন) আত্মপ্রসঙ্গ থেকে ক্রমশ নির্যাতনের
প্রসঙ্গে চলে যেতে পারে। কোনো সময় রোগী বলে যে বিশেষ কয়েকজন চেনা
লোক তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, তার ক্ষতি করতে চেষ্টা করছে, তার খাবারে
বিষ মেশাচ্ছে ; ইত্যাদি। কোনো কোনো রোগীর নির্যাতনের ভ্রান্তি আবার
অতটা স্পষ্ট নয় ; তার ক্ষতি করবে, তাকে জব্দ করবে, তার বিরুদ্ধে
ষড়যন্ত্র হচ্ছে—সবই বলবে, কিন্তু নির্যাতনকারী বা ষড়যন্ত্রকারীদের সনাক্ত
করবে না।

আরো নানা ধরনের ভ্রান্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। হীনমন্যতার ভ্রান্তি,
প্রবঞ্চিত হবার ভ্রান্তি, রোগাতঙ্কের ভ্রান্তি, বিশালতা ও চমৎকারীত্বের ভ্রান্তি—
ইত্যাদি নানা ধরনের ভ্রান্তির রোগীর সঙ্গে চিকিৎসকেরা পরিচিত।
বর্তমানে শুধু এইটুকু জানানো দরকার যে আপাতদৃষ্টিতে ভ্রান্তিরোগ
(ডিলুইশন) ও আবেশ (অবসেশন) অনেকটা এক রকমের মনে হলেও,
এদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে এবং সে পার্থক্য খুব সহজেই নজরে
পড়ে। 'অবসেশনের' রোগী স্বীকার করবে যে ব্যাপারটা ভুল, কিন্তু সে তবু
ধারণাটা ছাড়তে পারছে না। অন্যলোক তার রোগ-বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা
করতে যাবে কেন ? বুদ্ধি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে ব্যাপারটা অসম্ভব মনে হয়, কিন্তু
তবু বিশ্বাসটা বা অভ্যাসটা পাল্টাতে পারছে না। কিন্তু 'ডিলুইশন'-এর রোগী
এ ধরনের কথা কখনও বলবে না। তার ভ্রান্তির মধ্যে সন্দেহের কোনো অবকাশ
থাকে না। 'অবসেশন'-এর রোগীর মত সে আত্মসমালোচনা করে না, অথবা ভ্রান্ত
ধারণা থেকে মুক্ত হবার জন্য কোনোদিন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় না। যুক্তি
তর্ক দিয়ে সাময়িকভাবেও তার ভ্রান্তি সম্পর্কে তাকে সজাগ করা যায় না।

ভ্রান্তি নানা ধরনের মানসিক রোগেই দেখা দিতে পারে। তবে ভ্রান্তির
সঙ্গে 'প্যারানইয়া' রোগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। 'প্যারানইয়া' শব্দটি গ্রীক থেকে
এসেছে। গোড়াতে সব প্রলাপের রোগী 'প্যারানইয়া' রোগে ভুগছে, এই রকম
বলা হত। পরবর্তীকালে শৃঙ্খলাবদ্ধ একমুখী ভ্রান্ত ধারণা বা চিন্তাকে 'প্যারানইক

সিনড্রোম' বলে অভিহিত করা হয়। প্রথমে এই শৃঙ্খলাবদ্ধ একমুখী চিন্তার মধ্যে রোগীর চেনা-অচেনা নানা লোকের উপস্থিতি থাকে, রোগীকে এই চিন্তার নাটকে কোনো ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যায় না। পরবর্তীকালে অবশ্য রোগী নিজেও জড়িয়ে পড়ে নাটকে বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বিশুদ্ধ প্যারানইয়া রোগীর মায়া (হ্যালুসিনেশন) থাকে না। তাদের ধারণার মধ্যে লজিকের অভাব দেখা যায় না। অবশ্য ধারণার ভিত্তিতেই থাকে কোনো এক অবাস্তব কল্পনা যেটাকে বাদ দিলে এদের বক্তব্য বা যুক্তিতর্কের মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা আছে বলে মনে নাও হতে পারে। 'জানালাটা খোলা চলবে না। কেননা সামনের পার্কে সাদা পোশাকে পুলিশ ঘোরা-ফেরা করছে'। 'আমার পাশের বাড়ীর ভদ্রলোক এক গোপন যন্ত্র বসিয়ে আমাদের পার্টির সকলের চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করে চলেছে।' 'আমি ক্যানসার-এর প্রতিষেধক অব্যর্থ এক ওষুধ আবিষ্কার করেছি, কিন্তু প্রয়োগ করার সুযোগ পাচ্ছি না'; এই রকম ধরনের অবাস্তব চিন্তা বা ধারণা দিয়ে সুরু করা হয়, তারপর কিন্তু রোগীর চিন্তাধারা ও বক্তব্য পুরোপুরি লজিক মেনে চলে। আবার এমন কতকগুলো ধারণা বা বিশ্বাসের কথা রোগী বলতে পারে, যা ডাক্তারের পক্ষে ভ্রান্ত কি সঠিক নির্ণয় করা দুরূহ। 'শ্যামলবাবু একজন পুলিশের গুপ্তচর বা সি আই-এর এজেন্ট' অমলবাবুর একথা 'ডিলুইশন' না সঠিক—এ বিচার করা চিকিৎসকের পক্ষে সত্যিই কঠিন হয়ে পড়ে। কয়েকদিন কথা বলার পর এবং আত্মীয়স্বজনের কাছে আরো বিশদ খবরাখবর জানবার পর বোঝা যায় একথাগুলো 'প্যারানয়েডের ডিলুইশন' না সন্দেহবাতিকের সন্দেহের অভিব্যক্তি। 'স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত আছে'—স্বামীর এই অভিযোগ সত্য না মিথ্যা—ডাক্তারের পক্ষে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। অন্য আচরণের বা কথাবার্তার অসঙ্গতি না থাকলে এই সব রোগীর রোগ নির্ণয় রীতিমত কঠিন হয়ে পড়ে। এর উদ্ভবের কারণ নিয়ে আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়া যাক।

'হ্যালুসিনেশন', 'ডিলুইশন' ইত্যাদি উদ্ভব সম্পর্কে এখনও বিজ্ঞানীরা সুস্পষ্ট কোনো ধারণায় আসতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। তবে বিজ্ঞানভিত্তিক ধারণায় পৌঁছুবার পন্থা খুঁজে পাওয়া গেছে বলে অনেকে মনে করছেন। 'হ্যালুসিনেশন' সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলা হয়েছে, এবার 'ডিলুইশন ও চিন্তারাজ্যের বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে কিছু বলছি। তা না হলে, সমরের রোগ উপসর্গ আমাদের কাছে রহস্যাবৃত থেকে যাবে।

চিন্তার বিশৃঙ্খলা, অদ্ভুতত্ব ও ভ্রান্তি সম্পর্কে পুরনো মনোবিজ্ঞানীরা নানাধরনের মতবাদ পোষণ করেন। উন্মাদের প্রলাপ আদিম মানুষের চিন্তার সঙ্গে তুলনীয় —এই তত্ত্ব একসময় খুবই প্রচলিত ছিল। পূর্ব-পুরুষের স্বভাবপ্রাপ্তি ঘটে

উন্মত্ততায়, অর্থাৎ ক্রমবিকাশের ঘটে বিপরীতমুখী প্রত্যাবর্তন :—খুবই রোমান্টিক এই তত্ত্ব। এই ভাববাদী তত্ত্বের পাশাপাশি চালু ছিল চৈতন্যের সঙ্কোচন তত্ত্ব। 'সাইকিক টোন' বা নার্ভের গ্রাহীক্ষমতার হ্রাস ঘটে, তাই ধারণাও চিন্তার রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়ে থাকে। আর একদল মনে করেন মস্তিষ্কের 'ফ্রন্টাল লোবে' (সামনের দিকে) অসুস্থ পরিবর্তন ঘটার ফলে চিন্তার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় আর 'টেমপোরাল লোবে' পরিবর্তন ঘটার দরুণ ভ্রান্তি বা 'ডিলুইশন' উদ্ভূত হয়।

এই সব ধারণা পরীক্ষা-নিরীক্ষাভিত্তিক নয়। মানসিকতার শারীরবৃত্তিক কারণ সম্বন্ধে এঁরা উদাসীন। বাস্তব পরিবেশকে এঁরা আমল দেন না। মস্তিষ্কের উপর বহির্বাস্তবের প্রতিফলন থেকে যে সর্বপ্রকার মানসিক ক্রিয়ার উদ্ভব—দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের এই মতবাদকে অগ্রাহ্য করার ফলে এঁরা বিজ্ঞানভিত্তিক কোনো তত্ত্বের কাছাকাছি যেতে পারছেন না।

চিন্তার বিশৃঙ্খলা বিশেষ করে 'অবসেশন' সম্পর্কিত পাভলভীয় ধারণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। ল্যাবরেটরীতে কুকুরের উঁচু জায়গার আবেশিক আতঙ্ক (অবসেশিভ ফোবিয়া) সৃষ্টি করার বিবরণ আমাদের জানা আছে। অনড় উত্তেজিত কোষগুলোর পাশের কোষগুলি নিস্তেজিত হয়, এও আমরা জানি। এই নিস্তেজনা যদি মস্তিষ্কের অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে, তবে ভুল ধারণা সম্বন্ধে আর সংশয়ের কোনো অবকাশ থাকে না ; অর্থাৎ রোগীর 'ক্রিটিক্যাল অ্যাটিচিউড' নষ্ট হয়, সে আত্মসমালোচনা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। 'অবসেশন'-এর রোগী নিজের ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কে অবহিত, কিন্তু 'ডিলুইশন'-এর রোগী নিজের ধারণা সম্পর্কে একেবারে স্থির-নিশ্চয়। মস্তিষ্কের অন্য অংশের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, অর্থাৎ যুক্তিতর্ক ইত্যাদি, নিস্তেজনা-তরঙ্গের ব্যাপ্তি ও গভীরতার জন্য অনেক অংশকে কোনো মতেই প্রভাবিত করতে পারে না।

মস্তিষ্কের অন্য একটি অবস্থা—যাকে বলা হয় অতিস্ববিরোধী বা 'আলট্রাপ্যারাডক্সিক্যাল্ ফেজ', ভ্রান্তির পোষক ও ধারক। এই অবস্থায়, আমরা জানি, সদর্থক উদ্দীপনা নঙর্থক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। যারা ভালবাসে তাদের শত্রু মনে হয়, যারা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাদের উপর অবিশ্বাস সন্দেহের উদ্রেক হয়। বেনারস থেকে কোলকাতাগামী ট্রেনে চড়ে রোগী মনে করে সে উল্টোদিকে—লক্ষ্ণৌ অভিমুখে যাচ্ছে।

পাভলভের মতে ভ্রান্তি এই দুটি শারীরবৃত্তিক ব্যাপারের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ ভ্রান্তি বা 'ডিলুইশন'-এর উদ্ভবের মূলে আছে প্রথমত কোষের বিকারগত অনড়ত্ব, আর দ্বিতীয়ত অতিস্ববিরোধী অবস্থা। এই দুটি ব্যাপার একসঙ্গে বা পর পর ঘটতে পারে। সেই অনুযায়ী উপসর্গের হেরফের ঘটে থাকে।

পাভলভ-তত্ত্ব 'হ্যালুসিনেশন', 'ডিলুইশন'-এর সব কিছুর ব্যাখ্যা দিতে না পারলেও প্রাকৃতবিজ্ঞান অনুমোদিত পথে উন্মাদ রোগের এই দুই গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ বোঝবার প্রথম পদক্ষেপ।

মায়ামোহ (হ্যালুসিনেশন, ডিলুইশন) ইত্যাদি নানারকমের উপসর্গের ব্যাখ্যা খুঁজতে আজকাল বিজ্ঞানীরা সিবারনেটিক্সের সাহায্য নিচ্ছেন। মানসিক রোগের অনুরূপ অবস্থা কুকুর-বানরের মধ্যেও ভেষজ সাহায্যে তৈরী করা হচ্ছে। এই সব সম্পর্কে সামান্য কিছু সংবাদ পরিবেশন করছি।

ইন্দ্রিয়পরিবাহিত সংবাদ থেকে মস্তিষ্ককে বঞ্চিত রাখলে মানসিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে, এ খবর আগেই জানিয়েছি। ক্যানাডার মনোবিজ্ঞানী, ডঃ হেবের একটি পরীক্ষার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। কয়েকজন সুস্থ যুবককে ছোট একটি অন্ধকার শব্দরোধী শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরের মধ্যে ছত্রিশ ঘণ্টা থেকে দশদিন পর্যন্ত স্পর্শানুভূতি বঞ্চিত করে রাখার বন্দোবস্ত করা হল। হাতে দস্তানা পরিয়ে ও কার্ডবোর্ডের টিউব লাগিয়ে স্পর্শন অনুভূতি রহিত করা হয়েছিল। ছত্রিশ ঘণ্টার পর থেকে নানারকমের বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে লাগল। এই নিঃসঙ্গ অবস্থা, এই ইন্দ্রিয়ের নিষ্ক্রিয়তা, কোনো মস্তিষ্কই সহ্য করতে পারল না। 'হ্যালুসিনেশন ও ডিলুইশন'-এর উপসর্গ সবার মধ্যে প্রকাশ পেল। মহাকাশ-শারীরবৃত্তের অতি-আধুনিক গবেষণার ফলাফল থেকেও প্রমাণিত হয়েছে যে মস্তিষ্ককে ইন্দ্রিয়ানুভূতি থেকে বঞ্চিত রাখলে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। মস্তিষ্কের কয়েক হাজার মিলিয়ন নার্ভকোষের সমন্বিত ক্রিয়াকলাপের জন্য ইন্দ্রিয়গুলি সচল ও সক্রিয় থাকা অত্যাবশ্যক। এই অবস্থায় স্বাভাবিক ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে, ঘুম হয়, দুরূহ গানিতিক প্রশ্নের উত্তরও সঠিকভাবে দেওয়া যায়। মস্তিষ্কের কোনো রোগ হয়েছে বলা চলে না, আবার মানসিক ক্রিয়াকলাপ স্বাভাবিকভাবে চলছে— একথাও বলা চলে না। তপস্যারত ও কৃচ্ছ্রসাধনকারী ধর্মগুরুদের ভগবদ্দর্শন এই ধরনেরই ব্যাপার।

ল্যাবরেটরীতে কুকুর ও বানরকে ভেষজ-দ্রব্য ইনজেকশন দেবার পর তাদের নানাধরনের বিচিত্র ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে। কোনোটা হয়তো মাতালের মত টলছে, কোনোটা ঘাড় গুঁজে বিচিত্রভঙ্গীতে শুয়ে আছে, কোনোটা বা পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। একটা বানর শোয়া অবস্থা থেকে ধড়মড়িয়ে উঠে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে কান খাড়া করে কোনোকিছু শোনবার চেষ্টা করছে, অন্য একটা ভয়ে জড়সড় হয়ে খাঁচার কোণে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের দেখে বোঝা যায় যে, তাদের মধ্যে মানসিক রোগের উপসর্গ দেখা দিয়েছে। অবশ্য পশুর উপর শারীরিক রোগের অনুরূপ অবস্থা তৈরী করা যতটা সোজা মানসিক রোগের অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি করা তত সহজ নয়। মানবমন গুণগতভাবে পশুমন থেকে

আলাদা, কাজেই রোগবৈশিষ্ট্যও স্বতন্ত্র। এই সব পরীক্ষা থেকে এটুকুই শুধু বোঝা যায় যে কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্যের ক্রিয়ায় স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা বৃদ্ধির ফলে উন্মাদরোগের কিছু কিছু উপসর্গের সৃষ্টি হতে পারে।

এক একসময় দেখা যায় যে ইলেক্‌ট্রনিক কম্পিউটার তার নির্দিষ্ট কর্মসূচী পালন করার পরিবর্তে একই বৃত্তে ঘুরে চলেছে। বার বার করে একটা অপারেশনই করে চলেছে, পরবর্তী অপারেশন করতে পারছে না। যন্ত্রটার যেন মাথা খারাপ হয়েছে। অনেকে মনে করেন, এই অবস্থার সঙ্গে মানবমনের অবসেশন, ডিলিউশনের তুলনা চলতে পারে। কোনো কোনো মাদকদ্রব্য স্নায়ু প্রবাহের অগ্রগতি রোধ করে তাকে এইরকম একই বৃত্তে বাহিত করতে পারে।

সাধারণত, এক ব্যাপারে বেশিক্ষণ মনঃসংযোগ করার ক্ষমতা মানুষের থাকে না। এই রকম পুনর্বৃত্তি ঘটলে, একই ব্যাপারে বা একই চিন্তায় ডুবে যেতে বাধ্য হলে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। অন্য সব চিন্তা ভাবনার পরিবর্তে একটি বদ্ধ ধারনা বা চিন্তা অনবরত মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে, ফলে নির্যাতনমূলক অথবা আত্মম্ভরী ভ্রান্ত ধারণার (ডিলুইশন অফ পারসিকিউশন অর ডিলুইশন অফ গ্রাঞ্জার) বশবর্তী হয়ে পরিবেশকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে না।

সিবারনেটিকস বিশারদদের মতে মস্তিষ্কের সংবাদ পরিবহন ও সংবাদ সঞ্চয় প্রক্রিয়ার ত্রুটী থেকে মানসিক রোগের, বিশেষ করে 'হ্যালুসিনেশন-ডিলুইশন'-এর উৎপত্তি। অপ্রয়োজনীয় পুনর্বৃত্তির কাজে ব্যাপৃত থাকে অনেকগুলো নার্ভকোষ, কার্যকর কোষের সংখ্যা বহুলাংশে হ্রাস পায়, কাজেই তাদের দিয়ে মস্তিষ্কের সব রকম জটিল কাজকর্ম চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। যেসব খবর মূল্যহীন, যাদের বাতিল করা দরকার, তারাই স্মৃতিপটে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে এই সব স্মৃতি থেকে ভ্রান্ত ধারণার উদ্রেক ঘটে। অস্তিত্ব নেই এমনি সব জিনিসের প্রতিবিম্ব মস্তিষ্কে অভিক্ষিপ্ত হয়, অমূলপ্রত্যক্ষ বা 'হ্যালুসিনে-শন'-এর উদ্ভব হয়।

এবার পাভলভের শর্তাধীন পরাবর্তের সাহায্যে ব্যাপারটা বোঝা যেতে পারে। খাদ্যের সঙ্গে অনেকবার শর্তাধীন উদ্দীপক (ঘন্টাধ্বনি বা আলোকপাত বা যে কোনো ইন্দ্রিয় উত্তেজনা) সংযুক্ত হলে তবেই উদ্দীপকটি খাদ্যের সঠিক সংকেত বলে বিবেচিত হয়। এইভাবে অবান্তর বা ভুল উদ্দীপনার উত্তেজনা থেকে মস্তিষ্ক নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। কেবলমাত্র সঠিক সংকেতে মস্তিষ্ক সাড়া দিয়ে থাকে। রিফ্লেক্স মাত্রেই বহির্বাস্তবের নির্ভুল প্রতিফলন। সুস্থ মস্তিষ্কের ধর্ম শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় উদ্দীপনাকে, সঠিক সংকেতকে গ্রাহ্য করা, আমল দেওয়া। কোনো কারণে মস্তিষ্কের এই ক্ষমতা, কেবলমাত্র সঠিক সংকেতে সাড়া দেবার ক্ষমতা যদি নষ্ট হয়ে যায় (যেমন ভয় পেলে বা মাদকদ্রব্য

সেবনে হয়ে থাকে) অবান্তর উদ্দীপকগুলোও রিফ্লেক্স তৈরী করতে পারে। এইভাবে অপ্রয়োজনীয় সংবাদের ভিড়ে মস্তিষ্ক ভরতি হয়ে যায়, সঠিক সংবাদ গ্রহণ, বহন বা স্মরণ করার ক্ষমতা কমে যায়। পরিবেশের ভ্রান্ত প্রতিফলন ঘটতে থাকে মস্তিষ্কে। অসমর্থিত সংকেত রুগ্ন রিফ্লেক্সের জন্ম দেয়। উদ্দীপক গুলো সঠিক রিফ্লেক্স তৈরী করতে পারে না, তার ফলে উদ্দীপকজাত স্নায়ুস্পন্দনগুলি পরস্পরের পিছনে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। এছাড়া, সঞ্চিত সংবাদের বিশৃঙ্খলা থেকেও ডিলুইশন, হ্যালুসিনেশন-এর সঞ্চার হতে পারে। বিশেষ অবস্থায় প্রাণী খাদ্যের সংকেতকে তৃষ্ণার সংকেত বলে ভুল করতে পারে। এ-নিয়ে একটা পরীক্ষার কথা এখানে উল্লেখ করা চলে।

ঘণ্টার শব্দ শুনিয়ে ও আলো দেখিয়ে একটা কুকুরকে অনেক জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পায়ের চাপে একটা যন্ত্র চালিয়ে খাবার উপায় শেখানো হয়। ক্ষুধার্ত না হলে ঘণ্টা ও আলোর উদ্দীপনায় সে সাড়া দেবে না। এখন তার গলায় খানিকটা খুব নোনতা মাংসের ঝোল ঢেলে দেওয়া হল। ক্ষুধার বদলে তৃষ্ণায় অস্থির হল কুকুর। এই সময় ঘণ্টা বাজালে ও আলো দেখালে, কুকুর এই সংকেতকে তৃষ্ণা মেটাবার সংকেত মনে করে সাড়া দিল। তৃষ্ণার্ত মস্তিষ্ক-বিশ্লেষণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, তৃষ্ণা মেটাবার পুরনো রিফ্লেক্স খাদ্য-সংকেতে পরিবর্তিত হয়েছে : ল্যাবরেটরীতে তৈরী ভ্রান্তির অনুরূপ অবস্থা।

যন্ত্র ও পশু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার খবরের পর আবার মানুষের কথায় ফিরে আসা যাক। পরস্পর-সম্পৃক্ত প্রণালীবদ্ধ ভ্রান্তি (সিসটেমেটাইজড ডিলুইশন) প্যারানইয়া রোগের উপসর্গ। ম্যানিয়া বা স্কিজোফ্রেনিয়া রোগেও ভ্রান্তি দেখা দিয়ে থাকে। আমরা বর্তমানে প্যারানইয়া নিয়েই আলোচনা করব।

প্রণালীবদ্ধ ভ্রান্তি কিভাবে উদ্ভূত হয়? মৌলিক ভ্রান্তির সঙ্গে অন্যান্য ধ্যান-ধারণাকে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা থেকে ভ্রান্তি পরস্পর-সম্পৃক্ত ও প্রণালীবদ্ধ হয়ে থাকে। রোগী তার প্রধানতম মৌলিক ভ্রান্তিবিলাসকে আঁকড়ে ধরে, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ঘটনার স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যার সাহায্যে এর যাথার্থ্য ও যৌক্তিকতা প্রমাণ করার চেষ্টা করে। তার নিজের ভুল বিশ্বাসকে যুক্তিসহ করার প্রচেষ্টা প্যারানইয়া রোগীর বিশেষত্ব। নিজের 'ডিলুইশন'-এর বাইরে রোগীকে পুরোপুরি সুস্থ ও স্বাভাবিক মনে হয়। 'ডিলুইশন'-এর সঙ্গে সম্পর্কিত ঘটনা বা ব্যাপারের বেলায় কিন্তু রোগী তার 'ডিলুইশন' বা ভ্রান্তিকেই প্রাধান্য দেবে এবং এইসব সংশ্লিষ্ট ঘটনার ব্যাখ্যা করবে মৌলিক ভ্রান্তির পরিপ্রেক্ষিতে। এই ভ্রান্তির সঙ্গে তার আবেগ অনুভূতি গভীরভাবে জড়িত থাকার ফলে সংশ্লিষ্ট ঘটনার সুবিধামত ব্যাখ্যা উদ্ভাবন তার পক্ষে সহজ হয়ে থাকে। প্যারানইয়াকে একটা আলাদা রোগ বলে প্রথম মনে করেন ক্রেপলিন। তাঁর মতে অন্তর্জাত কারণের

ফলে এই রোগের আবির্ভাব ঘটে। চিরস্থায়ী অনড় ভ্রান্ত বিশ্বাস সত্ত্বেও রোগী
অন্য সব দিকে সুস্থ স্বাভাবিক থাকে ; অন্য সব ইচ্ছা, চিন্তা বা কাজের বেলায়
সে যুক্তিহীন নয়। ক্রেপলিনের মতে এই রোগ সারে না। এখনকার চিকিৎসকরা
তা মনে করেন না।

আর একদল বিশেষজ্ঞের মতে (বুলার, ম্যাকডুগাল) প্যারানইয়াকে রোগ
বলা উচিত নয়। তাঁরা বলেন যে নিজের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা সকলেরই থাকে,
স্বাভাবিক এই অবস্থার চরম অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায় ডাক্তারদের কাছে
আসা রোগীদের মধ্যে। নির্যাতনমূলক ও আত্মম্ভরিতার ডিলুইশন অল্পবিস্তর
সবারই আছে ; চরম অবস্থাতেও রোগী নিজের কাজকর্ম ভালভাবেই করে যেতে
পারে। বুলারের অভিমত এই যে, বিশেষ অবস্থায় সকল মানুষই আত্মপ্রাসঙ্গিক
চিন্তাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। প্রক্ষোভতাড়িত মানুষ মাত্রেই অন্তত সাময়িকভাবে
যুক্তিহীন হয়ে পড়ে। এই অবস্থা যদি বারবার ঘটতে থাকে, অথবা এই
ভ্রান্তি যদি দূর করা না হয়, তবেই ক্রেপলিনবর্ণিত 'প্যারানইয়া' রোগ দেখা
দিয়ে থাকে। অন্তর্জাত কারণের থেকে বহির্জাত মানসিক কারণ প্রাণালীবদ্ধ
অনড় ভ্রান্তবিশ্বাস উৎপাদনে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। আসলে
প্যারানইয়া ঘটনাবিশেষের প্রতিক্রিয়া। কোনো মানসিক আঘাত না পেলে,
আয়ত্তাধীন নয় এমন অবস্থার মধ্যে না পড়লে, প্রণালীবদ্ধ 'ডিলুইশন' দেখা দিতে
পারে না। একটা কিছু বড়দরের কাজ করে নাম করবার ইচ্ছা অনেকেই
মনে মনে পোষণ করে। বুদ্ধি বা চরিত্রগত দৈন্যের জন্য সাফল্যলাভ করতে
না পারলে একদল লোক ভাগ্যকে দায়ী করে মনে শান্তি লাভ করে। যদি
ভাগ্যকে দায়ী করা না যায়, অথবা নিজের দৈন্যকে স্বীকার করতে না পারা
যায়, তবে স্বাভাবিকভাবেই আমরা পরিবেশের উপর দোষারোপ করব। অন্যের
দোষে, অন্যের বাধা বা শত্রুতামূলক আচরণের জন্যে আমি অভীষ্টলাভে অক্ষম
হয়েছি—তখন এইরকম চিন্তাধারাকে আমরা প্রশ্রয় দেব। এইভাবে নির্যাতন-
মূলক ভ্রান্তি জন্মলাভ করে। আবার আমি যদি হালকা হাসিখুশি স্বভাবের
লোক হই, তবে কল্পনায় অভীষ্ট লাভ করে বাস্তব থেকে সরে গিয়ে আত্মম্ভরিতা
ও জাঁকজমকের ভ্রান্তিকে আঁকড়ে ধরব।

ম্যাগডুগাল সুস্থ মানুষের 'ডিলুইশন' ও রুগ্ন 'ডিলুইশন'এর মধ্যে কোনো
প্রকার গুণগত পার্থক্য দেখতে পাননি। যখন ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে ভুল
ধরতে পারা যায় না, বন্ধু-বান্ধব শুভানুধ্যায়ীর পরামর্শে ভ্রান্তি দূর হয় না,
যখন প্রণালীবদ্ধ ভ্রান্তি অনড় অচল হয়ে যায় ; তখনই ম্যাকডুগালের মতে
'ডিলুইশন'কে 'মরবিড' বলা চলে। 'আমার বরাতটাই খারাপ', 'ভাগ্য চিরকালই
আমাকে বিড়ম্বিত করছে', 'সৎ ব্যক্তি কখনও সাফল্য লাভ করে না' ; ইত্যাদি

অতি সাধারণ উক্তি আমরা অনেকের মুখেই শুনে থাকি। প্যারানইয়ার রোগীর মুখে এইসব উক্তিরই চরম অভিব্যক্তি শোনা যায়। 'সবাই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে', 'কেউ আমাকে চায় না', সকলেই আমার অমঙ্গল চায়'—প্যারানইয়া রোগীর এ সব কথা প্রলাপের পর্যায়ে পড়ে।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞানীরা মাত্রাগত পরিবর্তন গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরিত হবার প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী। তাঁরা প্যারানইয়ার মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশ সুস্থ থাকা সত্ত্বেও, প্যারানইয়াকে একটা প্রতিক্রিয়ামূলক অসুস্থতা মনে করেন। মূল কারণ দূর করা সম্ভব হলে, পরিবেশকে সহনীয় করে তুলতে পারলে, প্যারানইয়া রোগ সারে। অবশ্য অনেক সময় সে সুযোগ থাকে না অথবা দীর্ঘস্থায়ী ভ্রান্ত বিশ্বাস পরিত্যাগ করা কোনো কোনো ক্ষেত্রে রোগীর পক্ষে অবাঞ্ছনীয় হতে পারে।

ম্যাকডুগালের মতে প্যারানইয়ার রোগীর গোপনমনে পাপবোধ বা হীনমন্যতাবোধ লুকিয়ে থাকার দরুণ সে তার ভ্রান্তবিশ্বাস আঁকড়ে ধরে। অবদমনের ফলে আত্মসমালোচনা করতে অপারগ হয়; কাজেই ভ্রান্তি ক্রমশ সুসংগঠিত ও প্রণালীবদ্ধ হতে থাকে। আমার সামান্য অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, সবসময় এরকমটি ঘটে না। স্ত্রীর ব্যাভিচারে দৃঢ়বিশ্বাসী কয়েকজন রোগীর কথা আমি জানি যাদের অবদমিত কোনো কামেচ্ছার সন্ধান পাওয়া যায়নি। সাইকোথেরাপিতে তারা সুস্থ হয়েছে। পাভলভীয় পদ্ধতিতে তাদের চিকিৎসা করা হয়েছে। কতকগুলি কোষ উত্তেজনাস্তরে অনড় হয়ে রয়েছে, এবং সম্মোহন-পর্বের 'আলট্রা-প্যারাডক্স' পর্যায়ে রয়েছে স্নায়ুতন্ত্র;—এই দুটি পাভলভীয় প্রত্যয়কে ভিত্তি করে চিকিৎসা চলেছিল।

নির্যাতনমূলক ভ্রান্তি আত্মম্ভরিতাকেন্দ্রিক ভ্রান্তি পরস্পরের পরিপূরক একই রোগীর মধ্যে এই দুই ধরনের 'ডিলুইশন' দেখা দিতে পারে। সবাই রোগীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, এই ধারণার মূলেও রয়েছে আত্মম্ভরিতার ইঙ্গিত। রোগী একজন বিরাট পুরুষ না হলে সকলে তার বিরুদ্ধে যাবে কেন? সকলে রোগীকে অপমান করছে, ভূতপ্রেতের উৎপাতে টেকা যাচ্ছে না, সব দল তার দলের বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে; এ সবই নির্যাতনমূলক 'ডিলুইশন'-এর দর্শন। রোগীর স্ত্রী ব্যাভিচার করছে—এচিন্তার মূলেও রয়েছে নির্যাতনের 'ডিলুইশন'। অন্য দেশের রাষ্ট্রনায়ক রোগীর চিন্তার হদিশ পেয়ে রোগীর দেশের পুলিশকে তার বিরুদ্ধে নিয়োগ করেছে; এই ধরনের বিশ্বাসের মূলে একই সঙ্গে নির্যাতনমূলক ও আত্মম্ভরিতার ভ্রান্তি কাজ করছে। রোগীর শিক্ষাদীক্ষা পেশা ইত্যাদির সঙ্গে তার ডিলিউশন বিশেষভাবে সম্পর্কিত।

এইবার সমরবাবুর উপসর্গগুলোর তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা করা যেতে পারে।

সমরবাবুর শ্রুতিবিভ্রমের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথমদিকে তিনি গুদামের চুরির আসামীদের নাম শুনতেন। আসামীদের মধ্যে তাঁরও নাম ছিল, তাই তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়তেন। একবার পাশের বাড়ীর লোকদের অপমান পর্যন্ত করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, আশেপাশের সকলেই তাঁকে চোর মনে করছে। শ্রুতিবিভ্রমের সঙ্গে ভ্রান্তি, মায়ার সঙ্গে মোহ যুক্ত হয়ে তাঁকে অস্থির ও অসুস্থ করে তুলেছে। 'হ্যালুসিনেশন' ও 'ডিলুইশন' একই সঙ্গে তাঁকে পীড়িত ও প্রভাবিত করছে। প্রথম দিকে 'হ্যালুসিনেশন'-এর প্রভাব 'ডিলুইশন'-এর থেকে বেশি ছিল ; অবশ্য এটা আমার অনুমান। কেননা সেই সময়কার কোনো বিস্তারিত বিবরণ আমি পাইনি। বর্তমানেও 'হ্যালুসিনেশন' শুনছেন, কিন্তু অস্পষ্টভাবে কথাগুলো কানে আসছে। ফাদার ড্যানিয়েল নির্দেশ দিচ্ছেন :—'হল্ট ! সাইলেন্স ! লাভ দাই নেবার ! থাম ! চুপ কর ! প্রতিবেশীকে ভালবাস।' শ্রুতিবিভ্রম বা অডিটারী 'হ্যালুসিনেশন'-এর উৎসটি তাঁর নিজস্ব কল্পনা, ভ্রান্তি বা 'ডিলুইশন'। এখন ফাদার ড্যানিয়েল সম্বন্ধে এবং স্ত্রীর সম্বন্ধে তিনি কতকগুলো ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করছেন, যেগুলো তার মানসিকতাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করছে। ফাদার ড্যানিয়েল সম্বন্ধে তাঁর স্ত্রী কোনো আলোকপাত করতে পারলেন না। মধ্য ভারতের সেই ছোট্ট শহরে ড্যানিয়েলের কোনো সমাধি আছে কিনা—এ সম্পর্কেও কোনো সঠিক তথ্য মিলল না। ড্যানিয়েলের নির্দেশ স্ত্রীকে শোনানো চলে না কেননা সে অনুতাপ করে শুদ্ধ হয়নি।

আমার মনে হল ভদ্রলোকের রোগ এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে এসেছে। গুদামের চুরির ব্যাপার মিটে যাওয়ার পর দ্বিতীয় পর্যায় সুরু হয়েছে। প্রথম-দিকের নির্যাতনভিত্তিক 'ডিলুইশন' এখন স্ত্রীর সতীত্বের প্রতি সন্দেহভিত্তিক 'ডিলুইশনে' রূপান্তরিত হয়েছে। স্ত্রীকে সরাসরি সন্দেহের কথা তিনি বলেননি। স্ত্রীকে সন্দেহ করছেন আবার স্ত্রীর উপর একান্তভাবে নির্ভর করছেন। স্ত্রীর উপর সন্দেহের কারণ তার মস্তিষ্কের অতিস্ববিরোধী অবস্থা। যখন পাড়া-প্রতিবেশী অফিসের সকলে তাকে গোডাউনের চুরির ব্যাপারে সন্দেহ করেছে, তখন স্ত্রী তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন, সর্বপ্রকারে সাহায্য করেছেন। স্ত্রীর ভালবাসা ও বিশ্বাস এখন তাঁর মস্তিষ্কে বিপরীত ধারণার সৃষ্টি করেছে। স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার চিন্তা মনে আসার আগেই ফাদার ড্যানিয়েলের সতর্কবাণী কানে ভেসে আসছে। 'হল্ট ! থাম !' স্ত্রীকে সন্দেহ সংক্রান্ত কোনো কিছু বলবার চিন্তা মনে আসতেই শুনতে পাচ্ছেন ড্যানিয়েলের নির্দেশ, 'সাইলেন্স ! চুপ !' কোনো কথা নয়। প্রতিবেশীরাই তাঁকে চুরির ব্যাপারে সন্দেহ করেছে, প্রতিবেশী পুরুষদের সঙ্গেই স্ত্রী ভ্রষ্টা। প্রতিবেশীদের ঘৃণা করার

বা অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার চিন্তা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই কানে বেজে উঠছে ড্যানিয়েলের উপদেশ—প্রতিবেশীকে ভালবাস। সন্তান না হবার কারণ হিসেব সমরবাবু আমাকে প্রথমে স্ত্রীর জরায়ু সংক্রান্ত রোগের কথা বলেছিলেন। পরে স্ত্রী স্বামীর সামনেই আমাকে জানালেন, যে তিনি স্ত্রীর সঙ্গে বহুদিন সহবাস করেননি। স্ত্রীর সান্নিধ্য সমরবাবুকে আর উত্তেজিত করছে না, তাঁর দেহ মনের উত্তাপ অন্তর্হিত।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই শৈশব থেকে মাতৃস্নেহে বঞ্চিত। সমরবাবুর মস্তিষ্ক দুর্বল নিস্তেজনাপ্রবণ। প্রথম বা দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের কোনোটিরই বিশেষ প্রাধান্য নেই। নীরস কর্তব্য পালন ও কঠোর নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে মানুষ হবার ফলে অনেকখানি যান্ত্রিক ভাবাপন্ন। সব কিছুর প্রতি আকর্ষণ বা আগ্রহ কম। ন্যায়-অন্যায় নীতি-দুর্নীতি সম্পর্কে মনের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট ছক কাটা ছিল। চুরির ব্যাপারে বিভাগীয় তদন্তের সময় তাঁকে নানারকমভাবে জেরা করা হয়। কোনো কোনো অফিসার স্পষ্টভাবে না হলেও পরোক্ষে তাঁর সততার সম্বন্ধে কিছু কিছু বিরূপ মন্তব্য করেন। সমরবাবু দুর্বল অথচ নীতিবাগিশ মনের উপর এই সব মন্তব্য অশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং এর প্রতিক্রিয়াতেই তিনি বোধহয় অসুস্থ হয়ে পড়েন ও অপরাধজ্ঞাপক 'হ্যালুসিনেশন' শুনতে থাকেন।

চুরির অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাবার পর রোগের গতি পরিবর্তিত হল কিন্তু রোগ সারল না। 'গোডাউন' রক্ষকের পদ থেকে অপসারিত হয়ে অন্যত্র বদলি হওয়ায় অবমাননার জালার উপশম ঘটল না। হীনমন্যতার 'ডিলুইশন', ভদ্রলোককে পীড়িত করতে লাগল। তারই অভিব্যক্তিস্বরূপ স্ত্রীর প্রেমে সন্দেহ ও অবিশ্বাস।

'আমি অপদার্থ, আমার এমন কোনো গুণ নেই যার জন্যে স্ত্রী আমাকে ভালবাসতে পারে বা শ্রদ্ধা করতে পারে'—এই কথা স্পষ্টভাবে একদিন সমরবাবু আমাকে জানালেন। 'তাছাড়া, 'আমি শক্তিহীন, আমি বীর্যহীন। আমার উপর এতবড় একটা অবিচার করা হল, অথচ আমি প্রতিবাদ করতে পারলাম না। চাকরী ছাড়ার শক্তি নেই, উপরওয়ালাদের বিরুদ্ধে মামলা করারও ক্ষমতা নেই।'

সমরবাবু এই নগরীর কোলাহল ছেড়ে শৈশবের সেই শান্ত শহরটিতে ফিরে যেতে চান। কিন্তু শহরটিতে এখন নাকি অনেক লোকের বসতি, সেখানে গিয়েও স্বস্তি পাওয়া যাবে না, শান্তি পাওয়া যাবে না। শহরটির এক প্রান্তে শান্ত নিরালা পরিবেশ আছে—সেটা সমাধিস্থান। সমরবাবুর মন সেই সমাধিস্থানের আশে-পাশে ঘোরাঘুরি করছে। শুধু তাই নয়, সমরবাবু মনে মনে নিজেকে কফিনের মধ্যে স্থাপিত করেছেন। কফিনটি উদ্যানের এক কোণে রাখা হয়েছে। মাটির

তলা থেকে অনেক আত্মা উঠে এসেছে। নিঃশব্দে চলাফেরা করছে। এইবার সমরবাবুর কফিনটি কবরের মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু নামানো গেল না। ফাদার ড্যানিয়েলের নির্দেশ শোনা গেল,—'হল্ট!' সবাই থেমে পড়ল। যে-যার কবরের মধ্যে আবার ঢুকে পড়ল। 'প্রতিবেশীকে ভালবাস'— ড্যানিয়েলের কণ্ঠস্বর। সমরবাবু ছোট্ট শহরের কবরখানা থেকে আবার ফিরে এলেন জনাকীর্ণ কোলকাতার পথে। নীলা অনুতপ্ত হোক, নীলা শুদ্ধ হোক। তাহলেই ওকে সমরবাবু গ্রহণ করতে পারেন। নীলার সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করা চলে না, আবার তাকে পরিত্যাগ করাও সম্ভব নয়। নির্দেশ আসবে, একদিন ড্যানিয়েলের নির্দেশ আসবে; নীলাকে গ্রহণ করতে নির্দেশ দেবেন ড্যানিয়েল। সেইদিন সমরবাবু জানতে পারবে নীলা শুদ্ধ হয়েছে। অনুতাপের আগুনে পুড়ে শুদ্ধ হয়েছে; নীলাকে, নীলার দেহকে গ্রহণ করা যাবে।

আমার সামনে বসে একদিন বিড়বিড় করে এই ধরনের কথা, এই ধরনের অভিলাষ ব্যক্ত করলেন। ফলে, আমার কাছে ওর মনের কথা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। নীলার কাছে সমরবাবু নিজের হৃত সম্মান প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তাঁর ধারণা হয়েছে স্ত্রীর কাছে, প্রতিবেশীর কাছে তাঁর সম্মান চলে গেছে, তাই তাদের অন্যভাবে অভিযুক্ত করে নিজের সমপর্যায়ে আনতে চাচ্ছেন। বর্তমানকে এড়িয়ে অতীতে পলায়ন করার ইচ্ছে মনে জেগে মিলিয়ে যাচ্ছে। তাঁর নিজের কফিনটা সমাধিস্থ করা যায়নি: অর্থাৎ বর্তমানের কোলাহল-মুখরিত জীবনকে তিনি পরিত্যাগ করতে পারছেন না, গ্রহণ করতে চান। কিন্তু সামর্থ্যের অভাব বোধ করছেন। তাঁর সত্তা এখনও পুরোপুরি খণ্ডিত হয়নি। জীবনমুখীন চিন্তাধারার প্রাধান্য লক্ষিত হচ্ছে। ড্যানিয়েল কে? সমরবাবু জানেন না। ন্যায়বিচারের প্রতীক কি ড্যানিয়েল? ড্যানিয়েলের নির্দেশ কি কালের অমোঘ নির্দেশ। সমরবাবু বলতে পারেন না। 'ডিলুইশন'-এর রোগীরা সব ব্যাপারে সংকেত প্রতীকের সন্ধান খোঁজে। ড্যানিয়েলের বাণীর মধ্যে কোনো বিশেষ প্রতীক খুঁজে পাচ্ছেন না কেন সমরবাবু? সমরবাবুর 'হ্যালুসিনেশন' আরো অস্পষ্ট হয়ে আসছে। ড্যানিয়েলের নির্দেশ কিছুদিনের মধ্যেই শ্রুতিগম্য রইল না। স্ত্রীর উপর সন্দেহের তীব্রতাও কমের দিকে। হয়ত এটা একটা অসুস্থ সন্দেহ,—এই রকমও একদিন বললেন। সমরবাবু আরোগ্যের পথে চলেছেন। সমরবাবু ভাল হয়ে যাবেন।